বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

খুতুবাতে যুলফিকার



খুতুবাতে যুলফিকার
[২৫ ও ২৬তম খণ্ড]

মূল

মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী

অনুবাদ

মুফতী শাফি বিন নূর

দাওরায়ে হাদীছ, জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

সম্পাদনা

মাওলানা মোহাম্মদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)
মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা
সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা
প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক : মাওলানা শহীদুল ইসলাম
দারুল উলূম লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭
স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা
প্রচ্ছদ : দি ব্রাইট

মূল্য : ৪৫০ টাকা মাত্র

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২৫

- গুনাহ্ কীভাবে পরিত্যাগ করবেন
- কুরআনপ্রেমের ক্রিয়া
- কেয়ামতের আলামত
- শাহাদাতের তামান্না
- তাওবার উপকরণ
- খতমে বোখারি শরীফ
- কতগুলো ক্রিয়াশীল দু'আ
- হৃদয়ের ওপর মেহনত করুন
- গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকুন

এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-২৬

- আল্লাহপ্রেমের ভিত্তি
- আল্লাহর নৈকট্যের স্তরসমূহ
- তাওবা কাকে বলে?
- ফেকাহ্ ও তাছাওউফের বুনিয়াদ
- আত্মীয়তার বন্ধন
- কুধারণার বিষ
- আটটি আশ্চর্য বিষয়

সূচি নির্দেশিকা

খুতুবাতে যুলফিকার-২৫

গুনাহ্ কীভাবে পরিত্যাগ করবেন

গুনাহ্ পরিত্যাগ করা জরুরি কেন? /২৩
নেক আমলের নূরকে ধরে রাখুন /২৪
শয়তান অনেক বড় শত্রু /২৬
গুনাহ্ ছাড়ার ওপর মেহনত করা উচিত /২৬
নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর হওয়া অনেক বড় নেয়ামত /২৮
মানুষ গুনাহ্ ছাড়বে কীভাবে /২৮
আল্লাহওয়ালাগণ কীভাবে গুনাহ্ থেকে বাঁচেন /২৯
গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার সহজ পন্থা /৩০
দুটি বড় নেয়ামত /৩১
গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার আশ্চর্য ঘটনা /৩২
আল্লাহর একটি আদেশের কাছে আমাদের দৃষ্টি অবনত হয়ে গেছে /৩৩
আল্লাহ্ দেখছেন /৩৪
রাবেয়া বছরির দুটি বিশেষ দু'আ /৩৪
কোনো গুনাহকেই ছোট মনে করবেন না /৩৫
কাকে বলে তাছাওউফ? /৩৬
তরিকত কী? /৩৬
ইজতেমার মধ্যে দু'আ করবে /৩৬
দীনদারদের সবচেয়ে বড় চাওয়া কী /৩৬
তাওবা কী? /৩৮
তিন কাজে আল্লাহর সাহায্য মিলে /৪০
গুনাহমুক্ত দিন কাটাবে /৪১

কুরআনপ্রেমের ক্রিয়া

কুরআনের প্রভাব /৪৫
কুরআনপ্রেমের প্রভাব /৪৬

কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষতি /৪৭
আল্লাহর কুরআন শ্রবণ /৪৭
কুরআনপ্রেমের একটি ঘটনা /৪৮
কুরআনপ্রেমের অবারিত বরকত /৪৯
কুরআনের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রেম /৪৯
কুরআনের প্রেমে সমাধান হয়ে যায় সকল সমস্যা /৫০
সকল অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূরকারী /৫০
কুরআনের প্রভাব ও হৃদয়ের প্রশান্তি /৫১
এই কুরআনের প্রভাবে মুক্তি পাই রোগ থেকে /৫২
সাহাবায়ে কেরামের গভীর অনুরাগে কুরআন পাঠ /৫৫
কুরআনের লক্ষ্য /৫৬
মানবজীবনে কুরআন /৫৭
জীবনে কুরআনের আসক্তি থেকে কুরআনের ক্রিয়া তৈরি হয় /৫৮

কেয়ামতের আলামত

কেয়ামতের নিদর্শন /৬৩
চোখে দেখা কেয়ামতের আলামত /৬৩
কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে দেখা যাবে যেসব নিদর্শন /৬৫
আমাদের এই বর্তমানকাল /৬৮
দুনিয়ার প্রতি অতি অনুরাগ কেয়ামতের আলামত /৬৮
পূর্বের লোকদের স্থূলাভিষিক্তি /৬৯
দুনিয়ার কামনা-বাসনা /৭০
সম্পদ ও আপদ /৭১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৭২
দুনিয়াপূজার আসল রূপ /৭২
দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার কৌশল /৭৩
কামাই-রোজগার ফরজ কখন /৭৪
দুনিয়ার নানা মনযিল ও মানুষ /৭৪
একটি শিক্ষামূলক ঘটনা /৭৯
পিঠের বোঝা /৭৯
আল্লাহর সাথে মোলাকাতের প্রস্তুতি /৮১
আল্লাহর সাথে মিলনের আগ্রহ /৮৩

শাহাদাতের তামান্না

শাহাদাতের স্বপ্ন /৮৭
শিশুদের শাহাদাতের তামান্না /৮৮
ল্যাংড়া সাহাবির জিহাদের উদ্দীপনা /৯০
একজন মহীয়সী নারীর শাহাদাতের তামান্না /৯১
এক নারীর রাসূলপ্রেম /৯২
এক নারীর ধৈর্য ও সহনশীলতা /৯৪
মুমিন কিংবা মুনাফিক /৯৪
হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাহাদাতের তামান্না /৯৫
বীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদের শাহাদাতের তামান্না /৯৬
শিশুদের শাহাদাতের তামান্না /৯৭
শাহাদাতের তামান্নায় মুজাহিদের ঘোড়া /৯৭
শহীদের মর্যাদা /৯৮
শহীদের আকাঙ্ক্ষা /৯৯
শহীদের ঘোড়ার মর্যাদা /৯৯
শহীদের মর্যাদা /৯৯
শহীদ বান্দা জীবন্ত থাকে /১০০
শহীদের রূহ বের হওয়ার দৃশ্য /১০১
শাহাদাতের দু'আ /১০১

তাওবার উপকরণ

তাওবা কাকে বলে? /১০৫
আল্লাহর মহান শান /১০৬
উভয় জাহানের সাফল্য কী? /১০৬
তাওবার দশ উপকরণ /১০৭

খতমে বোখারি শরীফ

আনন্দঘন মুহূর্ত /১৩৯
কিছু জরুরি কথা /১৪০
رَبٌّ শব্দের মর্মকথা /১৪১
আল্লাহর লালনপালন /১৪২
কে প্রথম শিক্ষক? /১৪৩
লালনপালন করেন কে? /১৪৬

যথাসময়ে নেয়ামত দেন কে? /১৪৭
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ /১৪৮
রব কে? /১৪৮
রবের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিন /১৫০
রবের সাথে সম্পর্ক গড়া সবচেয়ে সহজ কাজ /১৫২
সব বয়সেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া যায় /১৫৪
দু'আ কবুলের দিন /১৫৫
আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি /১৫৭
ছাত্রীরা ঘরে কীভাবে দীনের কাজ করবে? /১৫৮
হযরতজির উপদেশ ও দু'আ /১৫৯
আমরা চেষ্টা করব; ফল দেবেন আল্লাহ /১৬০

কতগুলো ক্রিয়াশীল দু'আ

আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলি /১৬৫
আল্লাহর নেয়ামতরাজির মূল্যায়ন /১৬৬
শুয়ে ঘুমুতে পারা অনেক বড় নেয়ামত /১৬৮
পলক পড়াও একটি নেয়ামত /১৬৮
দু'আর গুরুত্ব /১৬৯
স্রষ্টা ও সৃষ্টির কাছে প্রার্থনার পার্থক্য /১৭০
চাওয়ার পন্থা ও পদ্ধতি /১৭৪
দু'আ করানো এবং দু'আ নেওয়ার মাঝে পার্থক্য /১৭৫
দু'আ প্রার্থনায় আমাদের ভুলসমূহ /১৭৬
আল্লাহই উত্তম ফয়সালা করেন /১৭৮
দু'আ করতেই থাকবে /১৭৯
দু'আ চাইতে থাকলেই কবুল হয় /১৮০
দু'আ প্রার্থনার ভুল তরিকা /১৮১
মন দিয়ে দু'আ করলেই কবুল হয় /১৮১
প্রাণ উজাড় করে প্রার্থনা করবে /১৮৩
আমার শৈশবের একটি ঘটনা /১৮৩
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ফল প্রার্থনার ঘটনা /১৮৩
স্ত্রী আছিয়ার দু'আর ঘটনা /১৮৪
হযরত ওমর (রাযি.)-এ শাহাদাত প্রার্থনার ঘটনা /১৮৫
আল্লাহ কামনার চেয়েও বেশি দেন /১৮৬
আল্লাহর রহমত খুবই বিস্তৃত /১৮৮

হৃদয়ের ওপর মেহনত করুন

শান্তির অন্বেষায় প্রতিটি মানুষ /১৯৩
কেন এই সঙ্কট উত্তরণের পথ পাওয়া যাচ্ছে না? /১৯৫
অস্থিরতা ও পেরেশানির সমাধান কি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি? /১৯৬
উচ্চশিক্ষা কি এই অস্থিরতার সমাধান? /১৯৬
উন্নত রাজনীতি কি এর সমাধান? /১৮৬
পেরেশানির উত্তম ব্যবস্থাপত্র /১৯৭
অশান্তির মূল কী? /১৯৭
রোগ নিরূপণ /১৯৯
এ ফাসাদের চিকিৎসা /২০৪
সাহাবায়ে কেরামের হামদরদী ও ভাতৃপ্রেম /২০৪
ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর আমল /২০৫
মনে-মনে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের অঙ্গীকার করবে /২১১

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন

গুনাহ কাকে বলে? /২১৫
গুনাহের প্রভাব /২১৫
গুনাহের দিকসমূহ /২১৯
কেয়ামতে গুনাহের সাক্ষ্য /২২১
গুনাহ পরিত্যাগের জন্য একটি বিস্ময়কর নসীহত /২২৩
মুসলমানের জন্য পথ দুটি /২২৬
পেরেশানির কারণ গুনাহ /২২৭
নিজেকে রবের হাওয়ালা করে দিন /২২৯
জেনেবুঝে গুনাহ করা /২৩১
সুখ বান্দাকে গাফেল করে, দুঃখ তাকে জাগ্রত করে /২৩১
গুনাহ তো ছাড়তে হবেই /২৩২
বান্দার কাজ বন্দেগি করা /২৩২
নেককার ও বদকারের পেরেশানি ও মুসিবতের মাঝে পার্থক্য /২৩৩
শয়তানের ফাঁদ ও প্রতারণা দুপ্রকার /২৩৮
আল্লাহর প্রতিদান গ্রহণ করতেই হবে /২৪১
আল্লাহ দান করে খুশি হন /২৪২

খুতুবাতে যুলফিকার-২৬

আল্লাহপ্রেমের ভিত্তি

মহব্বতের খামির /২৫১
মহব্বতের অবস্থান ও ফলাফল /২৫২
তোমার ওপর আমার কিছু অধিকার আছে /২৫২
নবীজির আরেকটি দু'আ /২৫৪
নবীজির আরেকটি দু'আ /২৫৫
দোতরফা প্রেম : একটি আদর্শ কেইস /২৫৬
মাহবুবের সাথে মিলনের আকুলতা /২৬৫
মহব্বত ও মারেফতের আবশ্যকতা /২৫৭
প্রকৃত নেয়ামতদাতার সাথে মহব্বত /২৫৮
মারেফতের বুনিয়াদ /২৫৮
দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের ফল /২৫৮
আল্লাহর মহব্বতের শেষ ফলাফল /২৫৯
এক পা আগে বাড়ুন /২৬০
নিঃস্বার্থ ভালোবাসা /২৬১
সত্য মহব্বতের দলিল /২৬১
মহব্বতের হাকীকত /২৬৩
এলাহিপ্রেমের ছয় বিষয় /২৬৩
আল্লাহর সাথে মহব্বত কেমন হবে /২৬৮
এসে গেছে সেই যামানা /২৬৯
হযরত থানবি (রহ.) এক আশ্চর্য তথ্য প্রদান করেছেন /২৭০
ভালোবাসার পরীক্ষা /২৭১
ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী /২৭২
আসল ও নকল চেনার উপায় /২৭৩
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার পুরস্কার /২৭৪
একটি প্রশ্ন ও তার অপনোদন /২৭৪
ইবাদাতের নগত পুরস্কার /২৭৫
আল্লাহর পর্যবেক্ষণ /২৭৬
চমৎকার একটি কথা /২৭৬

ভালোবাসার ঝরনাধারা /২৭৭
আহলে মহব্বতের সংস্রব গ্রহণের নির্দেশ /২৭৮
আল্লাহকে নারাজ করার ক্ষতি /২৭৮
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রতিদান /২৭৯
মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ /২৭৯
সবরকারী লোক /২৮০
আল্লাহর পড়শী /২৮০
একটি অমূল্য সুসংবাদ /২৮১
সামান্য আমলেই জাহান্নাম হতে মুক্তি /২৮৩
আমাদের গুনাহের অবস্থান /২৮৩
আল্লাহকে দিল থেকে ডাকে যে /২৮৪
তার কান্নাকে আল্লাহ এত পছন্দ করলেন /২৮৫
তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই /২৮৫
মাফ করার বাহানা দেখুন /২৮৫
তাহলে আল্লাহ আমাকে কবে দান করবেন? /২৮৬
মহব্বতের ইশারা /২৮৬
মেহনতে মহব্বত মিলে /২৮৭
আল্লাহকে যে কামনা করে /২৮৮
আল্লাহপ্রেমিকদের কাফেলা /২৯০
আল্লাহর কাছেই চেয়ে নিন আল্লাহকে /২৯০

আল্লাহর নৈকট্যের স্তরসমূহ

সবচেয়ে বড় নেয়ামত /২৯৫
কী করে পাওয় যাবে আল্লাহর নৈকট্য /২৯৬
আদব প্রথম অলংকার /২৯৬
দীন পুরোটাই আদব /২৯৭
আদব ও ইল্‌মে নাফে' /২৯৮
হযরত আনোয়ার শাহ (রহ.)-এর আদব /২৯৮
হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর আদব /২৯৯
হযরত গোলাম রাসূল পুনটুবি (রহ.)-এর আদব /৩০০
ইল্‌মে নাফে' প্রাপ্ত হলে আমল নসিব হবে /৩০১
আমলে হেকমত মিলে /৩০১
হেকমত কাকে বলে? /৩০২

হেকমতের সুফল দুনিয়াবিমুখতা /৩০৪
দুনিয়াবিমুখতার সারকথা /৩০৫
দুনিয়াত্যাগের ফলে আখেরাতের ভাবনা নসিব হয় /৩০৬
আখেরাতের ধ্যানেরই নাম আল্লাহর নৈকট্য /৩০৭
নেওয়ার তরিকা দুটি /৩০৮
সম্পর্কের দ্বারা নেওয়া /৩০৮
বান্দার আমল ফেরেশতাদের দেখানো /৩০৯
দোতরফা ভালোবাসা /৩০৯
ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর দু'আ /৩১০
তাওবার দর্শন /৩১০
গুনাহ কাকে বলে? /৩১৫

তাওবা কাকে বলে?

তাওবার গুরুত্ব /৩১৬
তাওবার আলোচ্যবিষয় /৩১৬
আল্লাহর ও বান্দার মাঝে দশটা প্রতিবন্ধক /৩১৭
জ্ঞানী ও সহনশীল সত্তা আল্লাহ /৩১৮
আল্লাহ হান্নান-মান্নান– সহানুভূতিশীল ও অনুগ্রহশীল /৩১৮
মূর্খতা দূরত্ব তৈরি করে /৩১৯
পরিচয় ভালোবাসা তৈরি করে /৩১৯
বেদআত কীভাবে শুরু হয়? /৩২১
আমল কবুল হওয়ার শর্ত দুটি /৩২৩
সুন্নত ও বেদআতের মধ্যে পার্থক্য /৩২৪
চতুর্থ পর্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া /৩২৫
সগীরা গুনাহ কীভাবে কবীরা হয়ে যায় /৩২৫
কাউকে মানে না যে /৩২৯
ইমাম আযম আবুহানীফার মর্যাদা /৩৩০
ফিকহের মজলিসে শূরা /৩৩১
ইমাম আবুহানীফার মেধা /৩৩১
তাওবার নিয়ত /৩৩২
তাওবার রোকন /৩৩৪
তৃতীয় রোকন লজ্জিত হওয়া /৩৩৫
তাওবা কীভাবে করবে /৩৩৫

গুনাহ কীভাবে ছাড়বে /৩৩৮
তাওবা কবুলের আলামত /৩৪৬
তাওবা করা আল্লাহর কাছে প্রিয় কাজ /৩৪৯
তাওবার এরাদা করুন /৩৫০
আম্বিয়া কেরাম ও মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার শান /৩৫১
এবার তাওবা করে নিন /৩৫৪

ফেকাহ্ ও তাছাওউফের বুনিয়াদ

তাছাওউফ ও সুলূকের মেহনত /৩৫৯
বাইয়াতের উদ্দেশ্য /৩৫৯
শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত /৩৬০
ইল্‌মে তাছাওউফ ইল্‌মে ফিকহেরই মতো সুবিন্যস্ত /৩৬১
ফেকাহ সংকলিত হলো কীভাবে /৩৬১
ইল্‌মে ফিকহের বীজ বপন করেছেন হযরত
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) /৩৬১
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর ইল্‌মি শান /৩৬২
হযরত আলকামা পানি সিঞ্চন করেছেন /৩৬৩
ইবরাহীম নখয়ী ফসল কেটেছেন /৩৬৪
সেই ফসল মাড়িয়েছেন হাম্মাদ /৩৬৪
ফিকহের ফসল পিষেছেন ইমাম আবুহানীফা /৩৬৫
ইমাম আযমের ইল্‌মি অবস্থান /৩৬৬
৪০ বছর ইশার উজু দিয়ে ফজর নামায! /৩৬৭
চলুন, ব্যাপারটা হাদীছে খোঁজ করি /৩৬৯
ইমাম আবু ইউসুফ খামিরা তৈরি করেছেন /৩৭০
সেই খামিরা দিয়ে রুটি পাকিয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) /৩৭১
ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ইল্‌মি অবস্থান /৩৭২
আজ আমাদের কাজ শুধু রুটি খাওয়া /৩৭৩
তাছাওউফের মেহনত কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত /৩৭৩
তাছাওউফের মেহনতের মাকসাদ /৩৭৪
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কীভাবে নসিব হবে? /৩৭৪
তিনটি বুনিয়াদি কথা /৩৭৫
ক্ষুধার্ত থাকার ফজিলত /৩৭৫
সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানব /৩৭৬

ক্ষুধার দশটি উপকারিতা /৩৭৭
দুটি অপছন্দনীয় জিনিস /৩৭৭
মাকামে মুনাজাত ও মাকামে মুলাকাত /৩৭৭
খালি পেটের মজা /৩৭৯
আজই সময় /৩৮১
আল্লাহ-অন্বেষীদের অবস্থা /৩৮১
আমাদের ইবাতদ এখন প্লাষ্টিকের ফুলের মতো /৩৮২
তিনটি সূক্ষ্ম কথা /৩৮৩
দু-ধরনের বীজ /৩৮৭
দু-ধরনের প্রাণী /৩৮৮
দু-প্রকারের মানুষ /৩৮৮
গাছপালাও আমাদের চেয়ে উত্তম /৩৮৮
আসল মাকসাদ ভুলো না /৩৮৯
অবিচলতার প্রয়োজনীয়তা /৩৯০
তরবারির ছায়ায় মামূলাত /৩৯১
কেন সুযোগ হয় না? /৩৯১
অনুতপ্ত হওয়ার বরকত /৩৯২
আল্লাহর রহমতের ভরসা /৩৯৪
আল্লাহ অসহায়দের সহায় /৩৯৪
হযরত ঈসা (আ.)-এর ফরমান /৩৯৫
বান্দার অপেক্ষায় আল্লাহ /৩৯৬

আত্মীয়তার বন্ধন

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম /৪০১
দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক /৪০১
ইসলামের সৌন্দর্য /৪০২
কাকে বলে আত্মীয়তা রক্ষা? /৪০৩
শক্তিশালী সমাজের বুনিয়াদ চারটি /৪০৩
শরীর ও রূহের দৃষ্টান্ত /৪০৪
ঘরে দীন দেহে রূহের মতো /৪০৫
মানুষ ও রোবটের মাঝে পার্থক্য /৪০৬
প্রেম শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে হতে হবে /৪০৮
শরীয়তে মুহাম্মদীর সুন্দর শিক্ষা /৪০৯

আত্মীয়তা রক্ষার উপকারিতা /৪১২
মহব্বত বৃদ্ধি /৪১২
সম্পদ বৃদ্ধি /৪১২
হায়াত বৃদ্ধি /৪১৩
রিযিক প্রশস্ত হয় /৪১৩
অপমৃত্যু থেকে হেফাযত /৪১৩
গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায় /৪১৪
আমল কবুল হয় /৪১৪
জান্নাতের হকদার হওয়া /৪১৪
রহমত নাযিল হবে /৪১৪
বরকত নাযিল হয় /৪১৫
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় /৪১৫
আত্মীয়তা ছিন্ন করার ক্ষতিসমূহ /৪১৫
জান্নাত থেকে মাহরুম হবে /৪১৬
জুমার বরকত থেকে মাহরূম ৪১৬
আল্লাহর রহমত হতে মাহরুমি /৩১৭
তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা নিষেধ /৪১৭
পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও /৪১৭
নিজের হিসাব নিন /৪১৮
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ুন /৪১৮

কুধারণার বিষ

যিকিরের অবস্থান /৪২১
কলবের যিকিরের ফজিলত /৪২২
'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ' সৃষ্টির পথ ও পদ্ধতি /৪২২
যাতি ও সিফাতি তাজাল্লির মাঝে পার্থক্য /৪২৩
আল্লাহ-আল্লাহ যিকির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত /৪২৩
একটি প্রশ্নের জবাব /৪২৪
আল্লাহ-আল্লাহ বলার মজা /৪২৫
আল্লাহ শব্দের প্রভাব /৪২৫
অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা কখন সৃষ্টি হয় /৪২৬
কাকে বলে বদগুমানি /৪২৬
বদগুমানির চিকিৎসা /৪২৭

হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত /৪২৮
হযরত আলী হাজবিরির দৃষ্টান্ত /৪২৮
আত্মার ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ /৪২৯
গুনাহকে ঘৃণা করুন– গুনাহগারকে নয় /৪২৯
সুধারণা এমনই হওয়া চাই /৪২৯
মুমিনের সজাগ দৃষ্টি /৪৩০
হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.)-এর সজাগ দৃষ্টি /৪৩০
হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত /৪৩১
অন্তদৃষ্টিও আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে /৪৩১
বদগুমানির হাতিয়ার ক্রিয়া করে কখন /৪৩২
বদগুমানির অপারেশন /৪৩২
ধোপার কাছে ময়লা কাপড়ই যায় /৪৩৩
লাইলাতুল কদরেও মাহরুমি /৪৩৩
নাজাতের ফয়সালা আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন! /৪৩৩
আত্ম-অবলোকন ও অপদৃষ্টি /৪৩৪
মুরীদের জন্য শায়খ হচ্ছেন আয়নার মতো /৪৩৫
আল্লাহওয়ালাদের পাত্র /৪৩৭
রক্তপণ দিতেই হলো! /৪৩৮
বদগুমানি একটা আখলাকি রোগ /৪৩৮
নবীজির ব্যাপারে এক যুবকের বদগুমানি /৪৩৯
আল্লাহর ওপর বদগুমানি /৪৪২
কাঁদার স্থান /৪৪৩

আটটি আশ্চর্য বিষয়

কাফের ও মুমিনের জীবন-কল্পনায় পার্থক্য /৪৪৭
দুনিয়ার ধোঁকা /৪৪৮
৮০ বছরের বৃদ্ধকে ধোঁকা /৪৪৯
এক সেক্রেটারী সাহেবকে ধোঁকা /৪৪৯
আশ্চর্য আটটি বিষয় /৪৫০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

খুতুবাতে যুলফিকার

২৫তম খণ্ড

গুনাহ্ কীভাবে পরিত্যাগ করবেন

'শয়তান মানুষের সামনে সমস্ত বিষয়কে খারাপভাবে উপস্থাপন করে। মানুষ গুনাহ করে; অথচ গুনাহকে গুনাহই মনে করে না। বিষয়টাকে খুবই হালকা মনে করে। একটা গুনাহ করতে গিয়ে বলে, এটা-ই শেষ; আর গুনাহ করব না। এভাবে বরং উল্টো আরও গুনাহই হয়ে যায় এবং গুনাহ চলতেই থাকে।

একদিকে আমরা তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করি, তাকবীরে উলা ধরার জন্য ছুটতে থাকি আর অন্য দিকে দৃষ্টিকে অপবিত্র করে ফেলি। কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই। জবানে এমন শব্দ বলে ফেলি, যার দ্বারা মানুষের হৃদয় আক্রান্ত হয়। আমাদের এই অসতর্কতা আমাদের আমলি জীবনের পথে প্রথম বাধা।

উদাহরণটা এমন যে, এক দিকে আমরা আল্লাহর দিকে ছুটছি আবার অন্যদিকে শয়তানের রশি আমাদের পেছন থেকে টেনে ধরছে। গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

গুনাহ কীভাবে পরিত্যাগ করবেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

গুনাহ পরিত্যাগ করা জরুরি কেন?

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সব গুনাহ পরিত্যাগ করো।'[১]

গুনাহ বলা হয় আল্লাহর নাফরমানি ও নবীজির সুন্নত অমান্য করাকে। আমরা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে যত গুনাহ করি, আল্লাহ তা'আলা সব গুনাহ-ই পরিত্যাগ করার হুকুম দিয়েছেন। গুনাহের দৃষ্টান্ত ক্যান্সারের মতো। কারও শরীরের কোনো অঙ্গে ক্যান্সার হলে ডাক্তাররা বলেন, তার একটাই চিকিৎসা যে, অঙ্গটা কেটে ফেলতে হবে। যদি অঙ্গটা কেটে ফেলে দেওয়া না হয়, তাহলে এক অঙ্গ থেকে আরেক অঙ্গে, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে– এভাবে গোটা দেহেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়বে এবং একসময় এই ক্যান্সারই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

গুনাহেরও চিকিৎসা একটিই। আর তা হচ্ছে গুনাহ পরিত্যাগ করা। যদি মানুষ গুনাহ পরিত্যাগ না করে, তাহলে সেটা তার আত্মিক মৃত্যুর কারণ

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০

হয়। গুনাহের আরেকটি দৃষ্টান্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত দেওয়ার মতো। চাই সেটি ছোট হোক বা বড়। কারণ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যত ছোটই হোক না কেন তা মানবের ক্ষতি করবেই করবে যদি তাতে হাত দেওয়া হয়।

তেমনিভাবে গুনাহের কাজ করলেও মানুষের ক্ষতি হয়। চাই গুনাহটা ছোট হোক বা বড়। গুনাহের দৃষ্টান্ত বিচ্ছুর মতো। বিচ্ছু ছোট হোক বা বড় হোক মানুষকে দংশন করে। তাই মানুষ বিচ্ছুকে ভয় করে। ঠিক তেমনি আমাদের উচিত গুনাহকে ভয় করা, গুনাহের ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করা। একব্যক্তি নবীজির খেদমতে হাজির হলো। বড় সুন্দর একটি প্রশ্ন করল লোকটি। বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইবাদাতগুজার বান্দা হতে চাই। তার এই নিবেদনের প্রেক্ষিতে নবীজি বললেন–

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

'সব রকম গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো; তুমি সবচেয়ে বড় ইবাদতগুজার বান্দা হয়ে যাবে।'

সুতরাং যেব্যক্তি সর্বতোভাবে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, চোখকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে, যবানকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে, কানকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে, লজ্জাস্থানকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে; মোটকথা, যেব্যক্তি নিজের সর্বাঙ্গকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে এবং সর্বদা এই ভাবনায় থাকবে যে, আমার পক্ষে আমার আল্লাহর কোনো নাফরমানি না হয়ে যায়, আমার নবীর কোনো সুন্নত ছুটে না যায়, যে এভাবে জীবন যাপন করতে পারবে, সে অত্যন্ত দ্রুত বেলায়েতের নূর হাসিল করতে পারবে। সে অতি দ্রুত আল্লাহওয়ালা হয়ে যেতে পারবে। কারণ, সে নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করতে পেরেছে। গুনাহের ক্ষতি থেকে সে বেঁচে গেছে। ফলে বেলায়েতের মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়া তার জন্য সহজ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ও অলিদের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এখানেই।

নেক আমলের নূরকে ধরে রাখুন

একজন সাধারণ মানুষও যদি কয়েকবার এমন আমল করে যে, তার সিনা নূর দ্বারা ভরে যায়, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়; কিন্তু সে যদি পরহেযগার না হয় এবং চোখ দ্বারা গুনাহের জিনিস দেখে, জবানে গুনাহের বিষয় বলে, কানে গুনাহের বিষয় শোনে, তাহলে তার হৃদয়ের সেই নূর হারিয়ে যায়।

একটি উদাহরণ লক্ষ করুন। আপনি একটা ড্রাম পানি দিয়ে পূর্ণ করতে চাচ্ছেন। বড় একটা মটর ফিট করে আপনি পানি ঢালার ব্যবস্থা করেছেন। মটর চালুও করলেন। কিন্তু ড্রামটার নিচ দিয়ে যদি বড় একটা ছিদ্র থাকে, তাহলে শক্তিশালী মটর দ্বারা পানি তুললেও সেই ড্রাম ভরবে না। কিন্তু যদি আপনি ঝালাই করে ছিদ্রটা বন্ধ করে দিতে পারেন, তাহলে বড় ও শক্তিশালী মটর না হয়ে সামান্য চিকন একটা পাইপ দিয়েও যদি তাতে পানি ঢালার ব্যবস্থা করেন, তাহলে দেখবেন, একসময় আপনার ড্রাম অবশ্যই পানিতে ভরে যাবে। কারণ, পানি নির্গমনের ছিদ্রটা বন্ধ। ফলে পানি যতটুকুই পড়ুক তা সঞ্চিত হয়ে যাবে।

আমাদের সাধারণ মানুষ আর আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থাও ছিদ্রওয়ালা আর ছিদ্রছাড়া ড্রামের মতো। আমরা নেক কাজ করি বটে; কিন্তু সাথে-সাথে আবার গুনাহও করি। ফলে নেক কাজের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

অলি হওয়ার জন্য লম্বা-লম্বা তাসবীহ আর নফল ইবাদতের দরকার নেই। বরং গুনাহ পরিত্যাগ করা জরুরি। তাই আমাদের উচিত এমন মেহনত করা, যার ফলে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের নাফরমানি আমাদের শরীর দ্বারা ঘটবে না। এ-বিষয়টির প্রতি সর্বদা-ই খেয়াল রাখা উচিত। নফস এত নিকৃষ্ট যে, এই নফসই মানুষের সামনে গুনাহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে পেশ করে। আমাদের অবস্থা এমন যে, অন্যের চোখের পশমও আমাদের কাছে বড় মনে হয় আর নিজের ভেতরকার হাজারো দোষকে কিছুই মনে হয় না। নফস এমন নিকৃষ্ট যে, অন্যের ব্যাপারে সামান্য দোষত্রুটির সন্দেহ হলেই তাকে ঘৃণা করতে দ্বিধা হয় না; অথচ নিজের অন্যায়-অপরাধ সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কেউ খারাপ ভাবে না।

আমাদের উচিত এই মেহনত করা যে, এই দেহসত্তা দ্বারা আমরা কোনোরূপ গুনাহের কাজ ঘটতে দেব না। ব্যাপারটা আবার এমনও নয় যে, আপনি আজ ইচ্ছে করবেন আর কালই সব রকম গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। বরং এই নফ্সটা বড়ই পাজী, অনেক পুরনো পাপী। ফাঁকফোকর খুঁজতেই থাকে।

ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں

'পাপ-অন্যায় ভেতরে-ভেতরে মনের গভীরে ছবি তৈরি করে নেয়।'

শয়তান অনেক বড় শত্রু

শয়তান এমন দুশমন যে, একটা মূর্তি ভেঙে দিলে সে নতুন নতুন মূর্তি তৈরি করে নেয় । শয়তান চব্বিশটা ঘণ্টা-ই পেছনে লেগে থাকে ।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ

'আমি তাদের জন্য কিছু সঙ্গী নিযুক্ত করে দিলাম । ফলে তারা তার সামনে খারাপকে ভালো হিসেবে পেশ করল ।'[১]

শয়তান মানুষের সামনে সমস্ত বিষয়কে খারাপভাবে উপস্থাপন করে । মানুষ গুনাহ করে; অথচ গুনাহকে গুনাহই মনে করে না । বিষয়টাকে খুবই হালকা মনে করে । একটা গুনাহ করতে গিয়ে বলে, এটা-ই শেষ; আর গুনাহ করব না । এভাবে বরং উল্টো আরো গুনাহই হয়ে যায় এবং গুনাহ চলতেই থাকে ।

একদিকে আমরা তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা করি, তাকবীরে উলা ধরার জন্য ছুটতে থাকি আর অন্য দিকে দৃষ্টিকে অপবিত্র করে ফেলি । কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাই । জবানে এমন শব্দ বলে ফেলি, যার দ্বারা মানুষের হৃদয় আক্রান্ত হয় । আমাদের এই অসতর্কতা আমাদের আমলি জীবনের পথে প্রথম বাধা ।

উদাহরণটা এমন যে, এক দিকে আমরা আল্লাহর দিকে ছুটছি আবার অন্যদিকে শয়তানের রশি আমাদের পেছন থেকে টেনে ধরছে । গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ।

গুনাহ ছাড়ার ওপর মেহনত করা উচিত

গুনাহ ছাড়া খুবই কঠিন কাজ । যখন আপনি কিছুদিন এই মেহনত করবেন, তখন আপনার বুঝে আসবে, নেক কাজ করা বড়ই সহজ; কিন্তু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন । মিথ্যা থেকে বাঁচার মেহনত আপনাকে জীবনভর করতে হবে । এক সালেক চল্লিশ বছর শায়খের দরবারে থেকে মেহনত চালায় । শায়খ তাকে মিথ্যা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন । চল্লিশ বছর মেহনতের পর অবস্থা এমন হলো যে, অন্যরা তাকে ভালো-মন্দ যা-ই বলছে, সেদিকে তার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই । যা সত্য, তা-ই অবলীলায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে । এবার তার ব্যাপারটা বুঝে এল ।

---

১. সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ : আয়াত ২৫

ہزار خوف ہو لیکن نیا ہو دل کی رفیق

یہی رہا ہے ازل قلندروں کا طریق

'হাজারো শঙ্কা-ভয় হোক তাতে কী। জবান তখন হয়ে যায় হৃদয়েরই বন্ধু। এটিই হলো সফল ও সার্থক মানুষদের রীতি।'

মিথ্যা পরিত্যাগ করা সহজ কাজ না কঠিন কাজ বুঝতে হলে একটু মেহনত করে দেখুন।

مصحفے ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم

تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

'আমরা যখন গুনাহ ত্যাগ করতে যাব, তখন দেখব, একটু-না-একটু জখম তো হবেই হৃদয়ে। তোমার হৃদয়ে বহু কাজ সহজসাধ্য মনেই হবে।'

মানুষ যখন মেহনত করে না, তখন মনে করে, ব্যাপারটা বড়ই সহজ–করা যাবে। কিন্তু যখন মেহনত শুরু করে এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার সাধনা করতে থাকে, তখনই প্রকৃত বিষয় ঝুঝে আসে।

دل ہمہ داغ داغ شو

پنبہ کجا کجا نہم

'সমস্ত হৃদয়ই তো আক্রান্ত। ব্যান্ডেজ করব কোথায়।'

মেহনত শুরু করলে বোঝা যায়, উঠতে গুনাহ। বসতে গুনাহ। চলতে গুনাহ। সব সময়ই গুনাহ। আমাদের দ্বারা শুধুই গুনাহ হয়ে যায়। শয়তান তো সর্বদার জন্যই গুনাহকে দেমাগের মধ্যে বসিয়ে দেয়। এমনকি রক্তগরম যুবকদল তো এমনও হয় যে, একদিকে নামায পড়তে থাকে, আরেক দিকে তার মন গুনাহের বাজারে দৌড়াতে থাকে। এই যে মনের ছোটাছুটি এর থেকে মুক্তির জন্য চাই মেহনত। চাই মুজাহাদা।

শুনে রাখুন, রুটি খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার নাম মুজাহাদা নয়। আল্লাহ যে-জিনিস হালাল করেছেন, তা পরিত্যাগ করার মধ্যে ফায়দা কী? হ্যাঁ; ইনসাফের সাথে খাওয়া চাই। যতটুকুই খাবে, আল্লাহর শোকর আদায় করবে। সত্যিকার মুজাহাদার অর্থ হলো, নফস যা চায়, যা কামনা করে, তা পরিত্যাগ করা, গুনাহ ছেড়ে দেওয়া। এটি অবশ্যই মুশকিল কাজ। এই যে তরবিয়তি মজলিস এর উদ্দেশ্য এটিই যে, আল্লাহর কাছে ক্ষমতা অর্জনের জন্য দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার

তাওফীক দান করুন। যদি গুনাহ ত্যাগ করার ক্ষমতা-ই অর্জিত না হয়, তবে মুখে থাকবে তাসবিহ আর অন্তরে থাকবে গুনাহের স্পৃহা।

তো এই তাসবিহের ফায়দাটা কী? মানুষের উচিত আপন হাকীকত ও বাস্তবতাকে অনুধাবন করা। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন কিনা। অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন। আপনার অন্তরই আপনাকে বলে দেবে, আপনি কতখানি পানির মাছ। অন্তরই বলে দেবে, এই, তুমি তো মানুষের সামনে বড়ই ভালোমানুষি প্রকাশ কর; কিন্তু তোমার আসল রূপ তো এমন-এমন। আমাদের প্রত্যেকটি কাজের খোঁজ আল্লাহর কাছে আছে। তিনি কার মনে কী আছে সে-ব্যাপারে সম্যক অবগত।

মানুষের সামনে তো আমরা ভালোই নেককার হয়ে যাই। মনে রাখবেন, আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকা চলে না। তিনি ভালো করেই জানেন কে সত্যিকার ভালো মানুষ। তাই সঠিক জীবন যাপনের জন্য, সফলতার জীবন লাভ করার জন্য সর্বপ্রকার গুনাহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া সম্ভব নয়।

নিজের দোষ দৃষ্টিগোচর হওয়া অনেক বড় নেয়ামত

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) সুন্দর একটি কথা বলেছেন। মাকতুবাত শরীফে তিনি বলেছেন, 'যখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কোনো বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন সেই বান্দার গুনাহগুলো তার সামনে স্পষ্ট করে দেন। এটি আল্লাহর অনেক বড় দয়া ও অনুগ্রহ।'

একব্যক্তি এক বুযুর্গকে বলল, হযরত! আমি গুনাহ যতই ত্যাগ করি, ততই নতুন-নতুন দোষ আমার সামনে প্রকাশ হতে থাকে। বুযুর্গ বললেন, আরে! পরিপূর্ণ ও প্রকৃত মানুষের গুণ তো এটিই। অন্যথায় মানুষ দুনিয়ার দৃষ্টিতে নেককার হতে পারে, প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হতে পারে, ওপরে-ওপরে তাকে আল্লাহর অনুগত বান্দা মনে হবে; কিন্তু বাস্তবে সে হবে মহাপাপী। সে হবে খোদার নাফরমান। গোপনে সে খোদার দুশমনিমূলক কাজ করবে। হাতে তাসবীহ থাকবে; কিন্তু হৃদয়ে গুনাহের স্বাদ–এই হবে তার অবস্থা।

মানুষ গুনাহ ছাড়বে কীভাবে

প্রশ্ন হলো, মানুষ গুনাহ ছাড়বে কীভাবে?

শুনুন, যখন কোনো বিষয়ের ক্ষতির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়, তখন সেই বিষয়টি পরিত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, সাপ দেখতে

কত সুন্দর। কোনো-কোনো সাপের গায়ে চমৎকার নকশা অঙ্কিত থাকে। তার মানে শরীরটাও তার দারুণ। কিন্তু বলুন তো, একটুখানি হাতে ধরে দেখতে ইচ্ছে হবে কি এই সুন্দর সর্পটাকে? কেন হাত লাগাবেন না অমন রূপসি সাপের গায়ে? কারণ, ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সাপের দংশনে মৃত্যুরই সম্ভাবনা প্রবল। সে-কারণেই আপনি ধরতে চাইবেন না।

তো সাপের ক্ষতির কথা আপনার সামনে স্পষ্ট। তাই আপনি সাপ ধরা থেকে বিরত থাকেন। তেমনিভাবে গুনাহের ক্ষতি যখন স্পষ্ট হবে, তখন গুনাহ থেকে বিরত থাকও সহজ হবে। আল্লাহওয়ালাগণ ভাবেন, যদি গুনাহ করি, তাহলে আমার রূহানি মৃত্যু হয়ে যাবে। রূহানি মৃত্যুর ভয়ে তারা গুনাহের কাছেও যান না। গুনাহের ক্ষতিকর দিক তো এই যে, গুনাহের কারণে অন্তর মরে যায়। অন্তরের মৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়।

আরেকটি উদাহরণ নিন। মনে করুন, একটা পেয়ালায় করে আপনার সামনে একশো মিষ্টি রাখা হলো। বলা হলো, ভাই! এই মিষ্টিগুলোর সবগুলোই ভালো; শুধু একটা মিষ্টিতে বিষ মেখে দেওয়া হয়েছে। বলুন, আপনি কি ওই মিষ্টিগুলো খাবেন, নাকি বিরত থাকবেন? অবশ্যই বিরত থাকবেন। কারণ, কোনটাতে বিষ মেশানো হয়েছে, তা আপনি জানেন না। সেজন্য একটাও খাবেন না।

তো দেখুন, আমরা যখন কোনো জিনিসের মাঝে ক্ষতি আছে বলে দৃঢ় অবগতি লাভ করি, তখন জেনেশুনে সেই জিনিসটার কাছেও যাই না।

কেউ ইচ্ছে করে বিদ্যুত স্পর্শ করে না। কারণ, মানুষ ভালো করেই জেনে নিয়েছে, বিদ্যুতে হাত লাগলেই মৃত্যু ঘটে। তেমনি আল্লাহওয়ালাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে, গুনাহ করলে ক্ষতি হয়। তাই তাঁরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলেন। আল্লাহর নেক বান্দারা নিজে-নিজেই গুনাহ থেকে বিরত থাকেন। কারণ তারা জানেন গুনাহের ক্ষতি অত্যন্ত নির্মম ও কঠিন।

আল্লাহওয়ালাগণ কীভাবে গুনাহ থেকে বাঁচেন

এক যুবক এক বুযুর্গকে বলল, হুজুর। আপনি গুনাহ পরিত্যাগ করতে বলেন। আমি যুবক মানুষ। চলার পথে নজর তো ঠিক রাখতে পারি না। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করব। হযরত বললেন, ভাই! এদিকে এসো। এই যে দুধে টইটম্বুর পেয়ালাটা দেখছ, এটা অমুক জায়গার কবরের অমুক অংশে অমুক বুযুর্গকে দিয়ে এসো। তবে এক

ফোঁটা দুধও যেন না পড়ে। আমি এই লোকটিকে তোমার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। যদি এক ফোঁটা দুধ পড়ে যায়, তাহলে তোমাকে সে দুটা থাপ্পর মারবে।

যুবক বলল, ঠিক আছে। দুধভর্তি পেয়ালাটা তুলে দেওয়া হলো যুবকের হাতে। যুবক হাঁটতে শুরু করল। তার সাথে চলল থাপ্পর মারার লোকটিও। বড় সতর্ক হয়ে চলতে লাগল যুবক। আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগল। এক পর্যায়ে যথাস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

অত্যন্ত খুশী মনে ফিরে এল যুবক। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর যুবক? কজন নারীর চেহারা দেখেছ? যুবক বলল, হযরত। সেদিকে তো চিন্তা-ই যায়নি, মনে তো কাউকে দেখার কল্পনাও আসেনি।

বুযুর্গ বললেন, কেন? আজ কল্পনাও এল না? যুবক বলল, কীভাবে দেখব। যদি সামান্য দুধ পড়ে যায়, তাহলে তো থাপ্পর মারার জন্য একজন সাথে আছেই। তাই ভয়ে-ভয়ে বড় সতর্কতার সাথে হেঁটেছি।

এবার বুযুর্গ বললেন, আল্লাহওয়ালাদেরও এ-রকমই অবস্থা। কারণ, আত্মা নামক পেয়ালাটা যদি পতিত হয়ে যায়, তাহলে কেয়ামতের দিন কঠিন শস্তির সম্মুখিন হতে হবে। তাই তাদেরও দৃষ্টি গুনাহের দিকে সামান্যতমও ধাবিত হয় না।

গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার সহজ পন্থা

আল্লাহ ইমাম গায্যালি (রহ.)কে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি বড় চমৎকার একটি কথা বলেছেন যে, 'সবচেয়ে বড় আলেম সেই ব্যক্তি, অন্যের তুলনায় যার নিজের সামনে নিজের পাপের ক্ষতি বেশি স্পষ্ট। কারণ, সে গুনাহ থেকে অতখানিই বিরত থাকে।

এক হার্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এক লোকের মেহমান হলেন। লোকটি গোশত, পোলাও আর শাকসবজির নানা আইটেম পরিবেশন করেছে। ডাক্তার সাহেব শুধু শাক-সবজি খাচ্ছেন। মেজবান বেচারা গোশত খেতে খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকল। মেজবানকে খুশি করার জন্য ডাক্তার সাহেব ছোট এক টুকরা গোশত নিলেন। লোকটি আরো পীড়াপীড়ি করল। এবার ডাক্তার সাহেব মুখ খুললেন। বললেন, ভাই! আপনি ভালো করেই জানেন আমি হার্ট বিশেষজ্ঞ। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, গোশতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চর্বি উৎপাদক উপাদান আছে। ফলে তা হার্টের ক্ষতি করে। আমি গোশত নিতান্তই কম খাই।

দেখুন, এই ডাক্তারের কাছে হার্টের জন্য গোশতের অপকারিতা স্পষ্ট। তাই তিনি তা থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করছেন। তার জন্য গোশত পরিত্যাগ করা সহজ হয় কেন? কারণ, তার কাছে এর ক্ষতি বেশি স্পষ্ট। তেমনিভাবে যার কাছে গুনাহের ক্ষতি যত বেশি স্পষ্ট হবে, সে গুনাহ থেকে তত বেশি আত্মরক্ষা করতে পারবে। মনে রাখতে হবে, গুনাহ কেয়ামতের দিন মানুষকে বরবাদ করে দেবে। সে-কারণেই তো আমাদের দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بَيْنِیْ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِیْ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ভয় কামনা করি, যা আমার ও আমার গুনাহের মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।'

দুটি বড় নেয়ামত

আল্লাহর ভয় একটি বড় নেয়ামত। আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট এই নেয়ামতটি প্রার্থনা করা যে, 'হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে তোমার এমন ভয় দান করে দাও, যা আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করবে।'

তো একটি বড় নেয়ামত হলো আল্লাহর ভয়। ভালো করে শুনে নিন– একটি নেয়ামত হলো আল্লাহর ভয়। আরেকটি বড় নেয়ামত হলো আল্লাহর ভালোবাসা। এই দুটি নেয়ামত যার ভাগ্যে জুটে যায়, মনে রাখবেন, তামাম দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ ও সৌভাগ্য তার নসিব হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয় আর আল্লাহর ভালোবাসা। যার মনে আল্লাহর ভয় থাকবে, সে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। আর যার মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে, সে ইবাদতের স্বাদ পেয়ে যাবে। এই দুটি নেয়ামত প্রাপ্ত হলেই সফলতা এসে যাবে সহজে।

دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے
ہم بھی تیرے خیال سے یکے نہیں گئے
لوگوں نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا
اک ہم تیرے سوال سے آگے نہیں گئے

'দিন-রাত মাস-বছর থেকে আগে যেতে পারেনি।
আমরাও তোমার ভাবনা থেকে আগে যেতে পারিনি।

লোকেরা তোমার কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করে নতুন কিছু।
আমরা তোমার কাছে সেই পুরানো জিনিসই চাই।'

তাই আমরা আল্লাহর কাছে একদিকে তাঁর ভয় প্রাপ্তির, আরেক দিকে তাঁর ভালোবাসা প্রাপ্তির প্রার্থনা করব। এই দুটি নেয়ামত যদি পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের জীবনে চলে আসবে বসন্তের বাহার। তখন আমরা নিজেদের গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারব। আল্লাহর ভয় হৃদয়ে এলে তো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা একেবারেই সহজ হয়ে যায়।

গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার আশ্চর্য ঘটনা

সালমান ইবনে ইয়াসার বন্ধুদের সঙ্গে হজ করতে গেলেন। পথিমধ্যে একস্থানে খানাপিনার সামগ্রী কমে গেল। বন্ধুরা বলল, আপনি খিমার মধ্যে অবস্থান করুন; আমরা পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। বন্ধুরা চলে গেল। সালমান দেখলেন, খিমার দিকে কোথাও থেকে এক মহিলা এল। এসে তাঁকে লক্ষ করে কী যেন বলল। বোঝা গেল, কিছু চাচ্ছে সে। সালমান তাকে একটা রুটি দিতে গেলেন। এবার মহিলার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গেল। বলল, আমি তো রুটি চাই না। একজন নারীর একটি পুরুষের কাছে যা চাওয়ার থাকে তোমার কাছে আমি তা-ই চাই।

হযরত সালমান একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে মনে-মনে ভাবলেন, আহা! আমি তো আল্লাহর দরবারে হাজিরা দিতে হজে এসেছি। শয়তান এই মহিলার মাধ্যমে আমার ঈমান নষ্ট করে দিতে চাচ্ছে। একথা ভেবেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, আহ! শয়তান আমাকে ধ্বংস করার জন্য এখনও আমার পেছনে লেগে আছে। এখনও সে আমাকে আল্লাহ থেকে পৃথক করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!

তাঁকে কাঁদতে দেখে লজ্জায় মহিলা দূরে সরে গেল। কাঁদতে-কাঁদতে হযরত সালমান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখলেন। হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁকে মোবারকবাদ জানালেন। হযরত সালমান বললেন, হযরত! আপনি কত মহান! যুলাইখা আপনাকে বলেছে–

هَيْتَ لَكَ

'এসো। এসো।'[১]

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

আর তার থেকে বাঁচার জন্য আপনি বলেছেন–

مَعَاذَ اللّٰهِ

'আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।'[১]

হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, আমি আল্লাহর নবী। আমার সাথে আল্লাহর কুদরতি সাহায্য ছিল। ফলে আমি গুনাহ থেকে বাঁচতে পেরেছি। কিন্তু তুমি তো উম্মত। উম্মত হয়ে এমন গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারা তো আরও বড় আশ্চর্যের বিষয়।

দেখুন, যখন হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও বিশ্বাস বিদ্যমান থাকে, তখন গুনাহ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়।

আল্লাহর একটি আদেশের কাছে আমাদের দৃষ্টি অবনত হয়ে গেছে

সাহাবায়ে কেরাম এক শহরে গেলেন। রোমানরা তাদের নারীদের উলঙ্গ করে ছেড়ে দিল। মুসলমানদের সেনাপতি ঘোষণা দিলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

'আপনি মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের চোখগুলোকে সংযত রাখে।'[২]

পুরো বাহিনীর সদস্যরা দৃষ্টি অবনত করে ফেলল। বিজয় লাভ করে মুসলমানরা মদীনায় এসে সবাইকে এ সংবাদ শোনালেন। কেউ একজন বলল, রোমান প্রাসাদগুলো কতটুকু উঁচু? সৈনিকরা বলল, আরে! আমীরের মুখে সেই আয়াতটি শোনার পর আমরা দৃষ্টিকে এতখানি অবনত করে রেখেছি যে, চোখ তুলে সেখানকার প্রাসাদগুলোর দিকেও আর তাকাইনি।

কাফেররা তাদের নারীদের ছেড়ে দিয়েছিল এজন্য যে, মুসলমানরা তো বহুদিন ঘরছাড়া। নারী দেখলেই তারা গুনাহে জড়িয়ে পড়বে আর পরাজিত হবে।

তো দেখুন, আল্লাহর ভয় হৃদয়ে পূর্ণ ছিল বলেই এত বড় ক্ষতি থেকে পুরো মুসলিম বাহিনী বেঁচে গেল।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩
২. সূরা নূর : আয়াত ৩০

আল্লাহ্ দেখছেন

দেখুন, মানুষ যদি বুঝতে পারে, একটা ছোট বাচ্চাও তাকে দেখছে, তাহলেও কিন্তু সে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। অথচ, আল্লাহ সর্বদা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন আর আমরা গুনাহ করে বেড়াচ্ছি! বোঝা গেল, আমাদের বিশ্বাস দুর্বল। বিশ্বাস যদি মজবুত থাকত যে, আল্লাহ্ আমাদের দেখছেন, তাহলে মানুষ গুনাহের কাজ করত না।

তাবেঈনের মধ্যে এক বুযুর্গ ছিলেন আতা ইবনে আবু রবাহ। তাঁর চমৎকার একটি কিতাব আছে 'ইকমালুশ শিয়াম' । হযরত ইয়াহইয়া সাহেব রমজান মাসে কিতাবটি আপন মজলিসে তালীম করতেন। অনেক ইসলাহী কথা আছে সেই কিতাবে। ইমাম আযম (রহ.)-এর ওস্তাদগণের তালিকায় তাঁর নাম আছে। ইমাম বোখারি قال العطاء (আতা বলেছেন) বলে তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। সেই মহান বুযুর্গ বলেন, একবার আল্লাহ আমার অন্তরে ইলহাম করলেন, আমার বান্দাদের বলে দাও, যখন মানুষ গুনাহ করে, তখন তারা সেই দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়, যেসব দরজা দিয়ে মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু আমি যে-দরজা দিয়ে তাদের দেখছি, সেটি তারা বন্ধ করে না। তারা কি মানুষ থেকেও আমাকে হীন মনে করে?

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকলে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা বড়ই সহজ বিষয় হয়ে যায়। আল্লাহই তখন তাকে হেফাযত করে নেন।

রাবেয়া বছরির দুটি বিশেষ দু'আ

আল্লাহর কিছু বান্দা এমন আছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

'আমার কিছু বান্দা আছে, যাদের ওপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।'[১]

হযরত রাবেয়া বছরি আল্লাহর তেমনই এক প্রিয় বান্দী।

তিনি দু'আ করলেন, হে রব্বে কারীম! দিনটি তো চলে গেল। রাত এসে গেল। দুনিয়ার বাদশাহরা তাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তোমার দরজা তো এখনও খোলা। আমি তোমার সামনে আমার আঁচল প্রসারিত করেছি।...'

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৪২

বলুন, এমন করে বললে আল্লাহর কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে?

রাবেয়া বছরি আরেকটি দু'আ করেন–

'হে আল্লাহ! যেমনিভাবে আপনি আসমানকে জমিনের ওপর পতিত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনিভাবে শয়তানকে আমার ওপর থেকে প্রতিহত করুন।'

আমরা যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের কাছে এভাবে দু'আ করতে পারি, তাহলে অবশ্যই তিনি তা কবুল করবেন। আমাদের এভাবে দু'আ করা উচি যে, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু আমাদেরকে বাঁচিয়ে দেওয়া আপনার পক্ষে অতি সহজ। তাই আমাদের গুনাহ থেকে রক্ষা করুন। আপনার আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন।

হযরত আতা (রহ.)-এর নিকট আরেকটি ইলহাম হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমাদের রিযিক সামান্য কম হলেই তোমরা আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ শুরু করে দাও। অথচ যখন তোমাদের গুনাহভর্তি আমলনামা আমার কাছে পেশ করা হয়, তখন আমি তোমাদের কোনো শেকায়েত করি না। দেখুন, আল্লাহ কত বড় মেহেরবান!

কোনো গুনাহকেই ছোট মনে করবেন না

দুটি বিষয় আছে বড়ই বিস্ময়কর। একটি হলো আল্লাহর ইল্‌ম তথা জ্ঞান। আরেকটি তাঁর হিল্‌ম তথা সহনশীলতা। আল্লাহু আকবার! আমরা অন্য বান্দার সাথে নরম ব্যবহার করি। কারণ, আমরা বাস্তবতা জানি না। আমরা বহু কিছুই জানি না। অথচ মানুষ গুনাহের ইচ্ছে করলে আল্লাহ তার অন্তরের গভীর বিষয়টিও জানেন। কত ইল্‌ম আল্লাহর! এত কিছু জেনেও তিনি সয়ে যান। গজব দিয়ে ধ্বংস করে দেন না। কত বড় মেহেরবান আমাদের মালিক আমাদের ওপর!

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

'আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত ও সহনশীল।'[১]

আল্লাহ গুনাহ করার পর আমাদের সুযোগ প্রদান করেন। আমাদের তো উচিত সুযোগকে কাজে লাগানো, সত্য মনে তাওবা করা, ছোট-বড় সর্বপ্রকার

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৫১

গুনাহ থেকে তাওবা করে ফিরে আসা। কোনো ছোট গুনাহই বারবার করলে তা আর ছোট থাকে না।

ইমাম ইবনে কায়্যেম বড় আশ্চর্য কথা লিখেছেন। বলেছেন, হে বন্ধু! এটা দেখো না যে, গুনাহটা ছোট, না বড়। বরং সেই আল্লাহর মহানুভবতা, মহত্ত্ব ও বড়ত্বকে দেখো, যে আল্লাহর নাফরমানি তুমি করছ।

মনে করুন, কেউ বলল, আমি অমুক মন্ত্রী সাহেবের সঙ্গে সামান্য বেয়াদবি করি। তখন মানুষ কী বলবে? বলবে, বেটা! মন্ত্রীর সঙ্গে বেয়াদবির ব্যাপারে কি বেশি-কমের কোনো কথা চলে? সামান্য ভুলেই তো বড় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ছোট-ছোট ধূলিকণা আর কঙ্কর জমা হতে-হতেই তো পাহাড় হয়ে যায়। তাই গুনাহকে ছোট মনে করবে না। আল্লাহর নিকট আজই তাওবা করে নেওয়া উচিত। তাসাওউফের উদ্দেশ্য এটিই।

কাকে বলে তাছাওউফ?

হযরত সাইয়্যেদ সুলাঈমান নদভী হযরত থানভী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, তাসাওউফের উদ্দেশ্য কী? থানবি (রহ.) বললেন, মানুষের রগরেশা থেকে গুনাহের প্রভাব বের হয়ে যাওয়াই তাসাওউফের উদ্দেশ্য। এত বেশি ফিকির ও মেহনত করতে হবে, যেন গুনাহের প্রভাব বের হয়ে যায়।

তরিকত কী?

একব্যক্তি আমাদের হযরতের কাছে প্রশ্ন করল, তরিকতের স্তরে কে পৌঁছতে পেরেছে? তিনি জবাব দিলেন, যৌনকামনার সাথে সম্পৃক্ত যত গুনাহ আছে, সব গুনাহ থেকে যেব্যক্তি বাঁচতে পারল, বলা হয় সে তরিকতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছে।

এবার আমাদের নিজের অবস্থার দিকে আমরা লক্ষ করি। আমরা তরিকতের কোন স্তরে আছি? আমরা গুনাহমুক্ত জীবন গঠন করতে পারলেই পরে তরিকতের উচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারব।

ইজতেমার মধ্যে দু'আ করবে

আমরা ঘরে বসে দু'আ করলে দু'আ কবুল হতেও পারে, না-ও হতে পারে। ইজতেমার মধ্যে দু'আ করলে ফায়দা অনেক। কত নেক বান্দা বিদ্যমান। কত শায়েখ উপস্থিত। এখানে তাওবা কবুল হওয়া সহজ। তাই এসব ইসলাহী ইজতেমার মধ্যে দু'আ করা চাই।

দীনদারদের সবচেয়ে বড় চাওয়া কী

আমাদের মধ্যে অনেক দীনদার মানুষ আছেন, যারা কেউ তাবলীগে, কেউ শাইখের খানকায়, কেউ মাদরাসা-মসজিদে খেদমতে লেগে আছেন। বহু বড়-বড় গুনাহ থেকে তাঁরা বেঁচে আছেন। শুধু দু-একটা গুনাহ তাঁর মাঝে থেকে যায়। এই দু-একটা গুনাহের কারণেই তারা বেলায়াতের স্তরে পৌঁছা থেকে বঞ্চিত হন।

حسرت ہے اس مسافر مضطر کے حال پر

جو تھک کہ رہ گیا ہو منزل کے سامنے

আহ! সেই মুসাফিরের জন্য আফসোস, যে কষ্ট করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিল; অথচ মনযিলের একেবারেই কাছাকাছি এসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে থাকল!

সামনেই তো মনযিল। অল্প অগ্রসর হলেই চলে। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে বসেই থাকল। কষ্ট করল; কিন্তু অল্পের জন্য মনযিলে পৌঁছতেও পারল না।

কত ভাইয়ের অবস্থা এমন যে, তার চেহারায় সুন্নত, দাড়ি সুন্নতি, লেবাস সুন্নতি। কিন্তু হয়তো চোখের গুনাহ বা দিলের গুনাহ কিংবা জবানের গুনাহের কারণে বেলায়েতের দরজা প্রাপ্ত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর সঙ্গে নেসবত তো তখনই নসিব হবে যখন মানুষ শতভাগ গুনাহমুক্ত হতে পারবে। অবশ্য একশোতে একশো ভাগ গুনাহমুক্ত হওয়া কষ্টকরও বটে।

আমি তখন প্রাইমারী স্কুলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের বাসার গলিপথ দিয়ে মাঝে-মাঝে একব্যক্তি পথ অতিক্রম করত। লোকটি পাতিলে কালি করত। (এক প্রকারের পাতিল আছে, যেগুলোতে মাঝে-মাঝে কালি লাগানো হতো।) তো একবার আমরা পাতিলে কালি লাগাতে দিলাম। কালি লাগানোর দৃশ্য আমি বেশ উপভোগ করতাম। লোকটাকে দেখলাম, এক প্রকার মেডিসিন দিয়ে আগের কালি-ময়লা সব ঘষেমেজে পরিষ্কার করে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এমন করলেন কেন? উত্তর দিলেন, যদি ঘষেমেজে পরিষ্কার না করি, তাহলে ভালো করে লাগে না এবং অল্পতেই উঠে যায়।

আমাদের অন্তরও গুনাহের কারণে কালিযুক্ত হয়ে যায়। তাই যারা আকাবিরে কেরামের কাছে ইসলাহের জন্য আসত, আগে তাদের গুনাহমুক্ত করা হতো। আগে গুনাহ পরিত্যাগ করতে পারলে অল্প মেহনতেই

তাসাওউফের রং ধরে যায়। আল্লাহর সঙ্গে নেসবত তৈরি হয়ে যায়। তো আমাদের উচিত নিজেদের পরিচ্ছন্ন, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে নেওয়া।

দেখুন, শরীয়তে নাপাক দু-প্রকার। নাজাসাতে হাকীকি ও নাজাসাতে হুকমি। নাজাসাতে হাকীকি যেমন পেশাব-পায়খানা। নাজাসাতে হুকমি যেমন গোসল ফরজ অবস্থায় থাকা। গোসল ফরজ অবস্থায় শরীর শত পরিষ্কার হলেও মসজিদে প্রবেশ করা যায় না।

তেমনি এক ব্যক্তি মুশরিক। সে সত্তরবারও যদি সমুদ্রে গোসল করে, তবুও সে পবিত্র হতে পারবে না। আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

'নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক।'[১]

এটা ও নাজাসাতে হুকমি।

মোহতারাম হাজিরীন! গুনাহ একটা নাজাসাতে হুকমি। এই নাপাকি চোখে দেখা যায় না। যে-অঙ্গটি গুনাহ করে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটি নাপাক হয়ে যায়। চোখ দ্বারা গুনাহ করলে চোখ নাপাক হয়ে যায়। মুখ দ্বারা গুনাহ করলে মুখ নাপাক হয়ে যায়। নাপাক হয়ে গেলে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তাই তো হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, উজু করার কারণে উজুর অঙ্গ থেকে নাপাকি দূর হয়ে যায়। আকাবিরে কেরাম ঘর থেকে উজু করে মসজিদে যাওয়ার পথে ভুলক্রমে গুনাহের বিষয়ে নজর পড়লে আবার উজু করে নিতেন। তাঁরা ভাবতেন, চোখের গুনাহের দ্বারা চোখ নাপাক হয়ে যায়। এমনই সচেতন থাকতেন তাঁরা। আমাদেরও উচিত গুনাহের নাপাকি থেকে নিজেদের পবিত্র করে নেওয়া।

তাওবা কী?

গুনাহ নামক নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়ার নাম তাওবা। মানুষ যদি সত্য হৃদয়ে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মুছে দেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী গুনাহমুক্ত ব্যক্তির মতো।'

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ২৮

আল্লাহ তাওবা আর পবিত্রতাকে একসাথে এভাবে বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের পছন্দ করেন আর পবিত্র লোকদেরও পছন্দ করেন।'[১]

আজকের এই মাহফিলে আমরা নাজাসাত থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করে নেব। আর কত নাপাক জীবন যাপন করব? গুনাহের এই নাপাকি গায়ে মেখে আর কত দিন ঘুরে বেড়াব? একদিন তো সত্যিই তাওবা করে নেওয়া উচিত। আজই হোক-না সেই দিনটি। পূর্ণ অঙ্গীকার গ্রহণ করি, জেনেবুঝে, ইচ্ছে করে আর কোনো গুনাহ করব না।

বুযুর্গানে কেরাম বলেছেন, যেব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় মন থেকে গুনাহ পরিত্যাগ করতে পারবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওই বান্দার দু'আ কবুল করে নেন। তাই আজই পূর্ণ তাওবার নিয়ত করে নেওয়া উচিত। এতে এক ধরনের পরিবর্তন আমাদের মধ্যে আসবে। গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা সহজ হয়ে যাবে। যদি একান্তই কোনো গুনাহ হয়ে যায়, সঙ্গে-সঙ্গে তাওবা করে নেব। নিজেকে গুনাহের মধ্যে রেখে দেব না।

মুজদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) লিখেছেন, এই উম্মতের মাঝে এমন পবিত্রাত্মা ব্যক্তিবর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের গুনাহ লেখার ফেরেশতা দীর্ঘ ২০ বছরও গুনাহ লেখার সুযোগ পায়নি। সুবহানাল্লাহ!

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোনো বান্দা গুনাহ করলে সঙ্গে-সঙ্গে এই গুনাহটা লিখে নেওয়া হয় না। ফেরেশতারা অপেক্ষা করে, বান্দা তাওবা করে নিলে গুনাহটা আর লেখে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক এক নারীর ঘটনা লিখেছেন, যিনি পুরো কথাবার্তা কুরআনের ভাষায় বলছিলেন। সেই নারীর বাচ্চা সংবাদ দিল, আজ ২০ বছর যাবত কুরআনের ভাষ্য ছাড়া অন্য কোনো শব্দ-বাক্য উচ্চারণ করেননি। সেই দিনটিতে আমাদের কী হবে, যেদিন আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, অমুক ব্যক্তিকে কেন কষ্ট দিয়েছ? অমুকের ওপর কেন বদনজর করেছ? অমুকের সম্পদ কেন কেড়ে নিয়েছ। এ সকল প্রশ্নের সেদিন কী জবাব হবে?

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২

তিন কাজে আল্লাহর সাহায্য মিলে

আমাদের বুযুর্গানে কেরাম বলেছেন, তিন কাজে আল্লাহর খাস সাহায্য পাওয়া যায়। যুবক ভাইয়েরা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করুন।

এক. কোনো বান্দা নেক নিয়তের সাথে মসজিদ বানানোর ইচ্ছা করলে তার ওপর আল্লাহ খাস সাহায্য নাযিল করেন।

দুই. কোনো যুবক নেক নিয়তে বিবাহ করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ রাবুল আলামীন তার ওপর খাস রহমত নাযিল করেন। সহায়সম্বল না থাকলেও তার ব্যবস্থা করে দেন।

তিন. কোনো বান্দা সত্য হৃদয়ে তাওবা করার নিয়ত করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

আমরা বলি, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না। এর কারণ, আমাদের তাওবা করার নিয়ত পাক্কা নয়। সত্য নিয়ত করলে আমাদের মালিক অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবেন। তিনি তো এমন ক্ষমতাশীল যে, বান্দাকে গুনাহ থেকে শতভাগ রক্ষা করতে পারেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেন–

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

'যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দয়া ও রহমত না হতো, তা হলো তোমাদের মধ্য থেকে কেউই পরিশুদ্ধ হতে পারবে না। আল্লাহ যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন।'[১]

আমাদের সমস্ত কাজ আর সফলতার সম্পর্ক তো আল্লাহর রহমতের একটি দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের ওপর আল্লাহর একটি দৃষ্টি পতিত হলেই তো সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে। আল্লাহ যার ব্যাপারে ইচ্ছে করেন, তার ব্যাপারে কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে সে সহজেই সফলতা পেয়ে যায়। আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। আজকের রাতটিতে এখানে আপনারা আছেন। এটি তো আকাবিরদের স্থান। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) বলেছেন, আকাবিরদের জায়গায় দু'আ কবুল হয়। তাই আসুন, দু'আ করি। এই

---

১. সূরা নূর : আয়াত ২১

সেলসেলার বুযুর্গানে দীনের ফয়েজ ও বরকত অর্জিত হবে। আল্লাহর রহমত নাযিল হবে।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কতই-না মেহেরবান। আজ তাঁর কাছে তাওবা করুন। শেষ রাতে উঠুন। তাহাজ্জুদ আদায় করুন। তাওবার জন্য নফল নামায পড়ুন। আল্লাহর সাথে সত্য ও মজবুত ওয়াদা করে নিন। দেখবেন, আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। আমাদের জন্য নিজেরা বাঁচা মুশকিল। কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচানো আল্লাহর জন্য সামান্যও কঠিন বিষয় নয়। অনেক সহজ তাঁর জন্য। তিনি সহজ করে দেবেন। আমাদের উচিত, গুনাহ থেকে বাঁচতে পূর্ণ ও সত্য নিয়ত করা। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দেবেন।

গুনাহমুক্ত দিন কাটাবে

আমাদের এই সেলসেলার এক বুযুর্গ খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার (রহ.) বলতেন, যদি আমি পীর-মুরিদি করতাম, তাহলে দুনিয়ার কোনো পীর মুরীদ পেত না। কিন্তু আমাকে তো আল্লাহ সুন্নত জিন্দা করার জন্য তৈরি করেছেন। তিনি একটি বড়ই বিস্ময়কর কথা বলেছেন। কথাটি শুনে হৃদয় শীতল হয়ে যায়। তিনি বলেন, যেব্যক্তি একটি দিন গুনাহমুক্তভাবে কাটাল, সে যেন দিনটি আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে থেকে কাটিয়েছে।

তো আমাদের উচিত হলো নিয়ত করে নেওয়া। বাকিটা আল্লাহ দেখবেন। তিনি গুনাহ থেকে আমাদের রক্ষা করবেন। তিনি আমাদের বাঁচাবেন। প্রয়োজন আল্লাহর রহমতের দরজায় করাঘাত করা। আল্লাহর দরজায় করাঘাত করা মানে কান্নাকাটি করা, চোখের পানি ঝরানো। কাঁদতে থাকলেই আল্লাহর দরজায় করাঘাত পড়বে। আর করাঘাতের পর করাঘাত করলে একদিন-না-একদিন দরজা খুলবেই। তাই আল্লাহর রহমতের দরজায় চোখের পানি ঝরিয়ে-ঝরিয়ে করাঘাত করলে একদিন-না-একদিন আল্লাহর রহমতের এই দরজা খুলবেই।

কবি কত চমৎকার করে বলেছেন–

میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے
میں وہ سائل جسے کوئی صدا یاد نہیں

'আমি চোখের পাতা দিয়ে বন্ধুর দুয়ারে করাঘাত করলাম,
আমি তো সেই ভিখারী, যার কোনো ভিক্ষার ভাষা জানা নেই।'

দেখুন, দু'আর হাত দিয়ে করাঘাত করা হয়। আবার চোখের পাতা দিয়েও করাঘাত করা যায়। চোখের পাতা দিয়ে করাঘাত করা মানে অশ্রু ঝরানো। আবার বান্দা যখন ক্রন্দন করতে থাকে, তখন তার নিজেরও খবর থাকে না সে কী চাইবে।

آو ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں
لوگ کہتے ہیں کہ عاصی کو خدا یاد نہیں

'এসো দিশাহারা এই মতাল বেলায়ই করে নেই একটি সেজদা,
লোকেরা তো াবলে অবাধ্য বান্দার নেই খোদার স্মরণ।'

আমরা গুনাহগার। আমরা আল্লাহর গুনাহগার বান্দা। কিন্তু হে মাওলা! আমরা তোমার হতে চাই। আজ আমরা আমাদের নফসের ইবাদতের শিকলে বন্দি। বদমাশ শয়তানের হাতে বন্দি। হে আল্লাহ! দুনিয়ার প্রত্যেক দুর্বলই সবলের সহায়তা কামনা করে। আমরা দুর্বল হে মাওলা! আমরা তোমার সহায়তা চাই। তুমি তো সবল। সর্বদা শক্তিশালী মাওলা তুমি। হে আল্লাহ! আমরা ঘর ছেড়ে এখানেও সমবেত হয়েছি। আমরা আরাম ছেড়ে এখানে খানকায় আকাবিরের স্থানে এসেছি। আমরা তাওবা করছি। তুমি চেয়ে দেখো, আমাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। হে মাওলা! তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের পবিত্র করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ওপর রাজি হয়ে যাও। আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমাদের চোখের অশ্রুকে কবুল করে নাও।

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لے
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

'হে আল্লাহ! তোমার দয়া ও অনুগ্রহের দ্বারা, তোমার করম ও রহমের শান দ্বারা আমাদের অশ্রুবিন্দুকে মুক্তার মতো কবুল করে নাও।

এই যে গড়িয়ে পড়া বিন্দুজল, তা তো আমার পরিশ্রমের ঘর্মধারা।'

হো আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওবা কবুল করে নাও। আমাদের মাফ করে দাও।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

কুরআনপ্রেমের ক্রিয়া

'কুরআনের আযমতের বিষয়টি আজও আমরা পূর্ণভাবে অবগত নই। অবশ্য দু-চারজনের কথা ভিন্ন। যদি জানতাম, তাহলে তো উঠতে-বসতে সর্বদা-ই আমরা কুরআনের তেলাওয়াতেই মগ্ন থাকতাম। কেমন এক আশ্চর্য কিতাব এই কুরআন! কিছু মানুষ কুরআনের কারী। কিছু মানুষ কুরআনের হাফেয। কিছু মানুষ কুরআনের আলেম। কিছু মানুষ কুরআনের দাঈ। কিছু মানুষ কুরআনকে প্রচার-প্রসারকারী। আর আল্লাহর ফজলে এমন এক দল সৌভাগ্যবান মানুষ আছে, কুরআনের মহব্বত যাদের নসিব হয়েছে। কুরআনের প্রেমের সাগরে তারা অবগাহন করছে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত তাদের চেহারাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সমুজ্জ্বল করুন। আমীন।'

কুরআনপ্রেমের ক্রিয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ط اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

কুরআনের প্রভাব

কুরআন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের পক্ষ থেকে মানবতার পয়গামের নাম। কুরআন একটি পথপ্রদর্শনকারী কিতাব। এই কুরআন মানবজাতিকে প্রদান করার উদ্দেশ্য কী? জবাবে ইরশাদ হচ্ছে–

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

'এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়নের জন্যে।'[১]

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলেছেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোক পথে নিয়ে আসুন।

কুরআনুল কারীম পথহারা বিভ্রান্ত মানবজাতির এক অনন্য দিশারী।

গোমরাহির আঁধারে ডুবে থাকা মানুষের জন্য হেদায়াতের নূর এই কিতাব।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ১

মানবের চলার পথকে আলো দানকারী এই কুরআন।

আল্লাহ থেকে দূরে অবস্থানকারী মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য দানকারী এই কিতাব।

আপনি নিশ্চয়ই চুম্বক দেখেছেন। চুম্বক যেখানেই পতিত হোক, সে লোহাজাতীয় জিনিসকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবেই। এই কুরআন মজীদও আল্লাহর রহমতকে আকর্ষিত করে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'যখন এই কুরআনে পাক পড়া হবে, তাকে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো এবং চুপ থাকো যেন তোমরা রহমতের ভাগিদার হতে পার।'[১]

যেখানেই কুরআনে পাকের তেলাওয়াত করা হয়, সেখানেই আল্লাহর রহমতের বারিধারা ঝমঝমিয়ে বর্ষিত হতে শুরু করে। এই কুরআন চুম্বকের মতো আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণকারী কিতাব। বিশ্বমানবতার জন্য এই কিতাব সমগ্র জীবনের সংবিধান। মানবজীবনকে প্রাণময়, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করার জীবন ব্যবস্থা। এটি আল্লাহর কালাম।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

تَبَرَّكُ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللهِ

'কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল করো। কারণ, এটি আল্লাহর কালাম।'

কুরআনপ্রেমের প্রভাব

'কুরআনের আযমতের বিষয়টি আজও আমরা পূর্ণভাবে অবগত নই। অবশ্য দু-চারজনের কথা ভিন্ন। যদি জানতাম, তাহলে তো উঠতে-বসতে সর্বদা-ই আমরা কুরআনের তেলাওয়াতেই মগ্ন থাকতাম। কেমন এক আশ্চর্য কিতাব এই কুরআন! কিছু মানুষ কুরআনের কারী। কিছু মানুষ কুরআনের হাফেয। কিছু মানুষ কুরআনের আলেম। কিছু মানুষ কুরআনের দাঈ। কিছু মানুষ কুরআনকে প্রচার-প্রসারকারী। আর আল্লাহর ফজলে এমন এক দল সৌভাগ্যবান মানুষ আছে, কুরআনের মহব্বত যাদের নসিব হয়েছে। কুরআনের প্রেমের সাগরে তারা অবগাহন করছে। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২০৪

তাদের চেহারাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানেই সমুজ্জ্বল করুন। দুনিয়ার মাঝে এটি এক আশ্চর্য কিতাব। যে তার তেলাওয়াত শোনে, সে-ই কেঁদে ওঠে দারুণ আবেগে। কেঁপে ওঠে তার মন।

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

'নিঃসন্দেহে আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি।'[১]

কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষতি

আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ। আজ আমরা একটি জিনিসকে বড় বেশি অবহেলা করছি। তা হলো কুরআন। ভাই! আপনার ঘরে যদি কোনো মেহমান আসে আর আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ না করেন, সে এক মাস যাবত আসতে থাকল আর আপনি তাকে সমাদর করলেন না, তাহলে বলুন, সে কি আপনার সাথে সম্পর্ক রাখবে? রাখবে না।

কুরআন মেহমান। বড়ই আফসোসের বিষয় যে, মাসের-পর-মাস এই কুরআন আমাদের ঘরে পড়ে থাকে। আমরা তাকে ছুঁয়েও দেখি না। আরে! সাধারণ মানুষের কথা কী আর বলব? এক তালেবুল ইল্‌ম আমার হাতে বাইয়াত হলো। সে দাওরা পাশ। বাইয়াতের পর সে শোনাল, শুরু থেকে দাওরা পর্যন্ত পুরো ৮ বছরের জীবনে সে এ-ই প্রথমবার রমজান মাসে কুরআন খতম করতে সক্ষম হয়েছে। এ-ই তো আমাদের জীবনের অবস্থা। এ-ই তো আমাদের কপাল। গাফলত আমাদের ছেয়ে ফেলেছে।

আল্লাহর কুরআন শ্রবণ

কুরআনের সাথে যদি আমাদের সত্যিকার ভালোবাসা ও মহব্বতের বন্ধন স্থাপিত হয়ে যায়, তবে তা হবে আমাদের জন্য মহা সৌভাগ্যের বিষয়। তাই তো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কোনো গায়িকা নারী যখন গান গায় আর লোকেরা সেই গান যেমন মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে, তেমিন আল্লাহ রব্বুল আলামীনও কোনো বান্দা কুরআন তেলাওয়াত করলে সেই তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। বরং আরো বহুগুণ বেশি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন। ফেরেশতাদের পড়ার ক্ষমতা নেই। তারা পড়তে জানে না। তারা কুরআনের পাঠ শ্রবণ করে। ফেরেশতাদের মধ্যে শুধু জিবরাঈল (আ.)কেই

---

১. সূরা জিন : আয়াত ১

রব্বুল ইয্যাত এ মাকাম দান করেছেন যে, তিনি কুরআন উচ্চারণ করতে পারতেন। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

'নিশ্চয় এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত, যে বড় ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী। আরশের মালিকের নিকট যার নৈকট্যপ্রাপ্ত স্থান রয়েছে। তিনি অনুগত ও আমানতদার। তিনি সেখানকার সরদার।'[১]

তো ফেরেশতাদের মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ.)ই শুধু কুরআন তেলাওয়াত করতে জানেন। তিনি তো নবীজির সাথে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। আর অন্য ফেরেশতাগণ কুরআন তেলাওয়াত করতে জানেন না। তারা শুধু কুরআন তেলাওয়াত শোনেন। দেখুন, দুনিয়াতে কেউ যদি কুরআন তেলাওয়াত করতে না জানে, তাহলে সে সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনলে দারুণভাবে আলোড়িত হয়। সে অনেক বেশি স্বাদ পায়। তাই যখন আল্লাহর কোনো বান্দা কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন সাথে-সাথে ফেরেশতারা তার চারপাশে এসে জমা হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে, ফেরেশতারা তার নিকটে আসতে-আসতে একেবারে তেলাওয়াতকারীর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে দেয়। কথাটা এভাবেই বলা সঙ্গত যে, ফেরেশতারা ওই কারী সাহেবের ঠোঁটে চুম্বন করতে শুরু করে।

কুরআনপ্রেমের একটি ঘটনা

ইমাম আসেম কুফি (রহ.) যার ধারা অনুসরণ করে আমরা কুরআনের তেলাওয়াত করি। তাঁর মুখ থেকে সর্বদা আশ্চর্য রকম এক সুবাস ছড়াত। তাঁর ছাত্ররা ভাবত, হযরত মনে হয় মুখে এলাচ রাখেন বা কোনো খুশবু মুখে ব্যবহার করেন। ছাত্ররা এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যেতেন। এক তালেবুল ইল্‌ম তাঁর খেদমত করত। সে একবার বিষয়টি নিয়ে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অতিশয় পীড়াপীড়ির কারণে তিনি একবার বললেন, না; আমি তো মুখে কিছু রাখি না। ছাত্ররা বলল, হযরত! এমন একটা সুবাস ছড়ায়, যা আমরা কোনোদিনই উপলব্ধি করিনি।

হযরত বললেন, একদিন রাতে আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখলাম। তিনি বললেন, আসেম! তুমি তো সারাটা দিন

---

১. সূরা তাকবীর : আয়াত ১৯-২১

তেলাওয়াত কুরআনে মশগুল থাক। নাও; তোমার ঠোঁটে আমি চুমু দিয়ে দিই। তাঁর ঠোঁটে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুমু দেওয়ার পর থেকেই মুখ ও ঠোঁট থেকে এমন সুবাস ছড়াচ্ছে।

কুরআনপ্রেমের অবারিত বরকত

কুরআনের সাথে মানুষের আসক্তির স্তরের ভালোবাসা থাকা দরকার। দেখুন, যখন কারও সাথে আপনার মহব্বত তৈরি হয়, তখন আপনার মধ্যে এই ভাবনা কাজ করে যে, লোকটির সাথে ওঠাবসা করা উচিত। আপনার মন তার সাথে সময় কাটাতে চাইবে। তো কুরআনের সাথে যদি আপনার মহব্বত থাকে, তাহলে কুরআনকে বুকে নিয়েই দিন গুজরান করতে চাইবে আপনার মন। আমাদের বুযুর্গানে দীন সকলেই আশেকে কুরআন ছিলেন। কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। আর যেব্যক্তি আশেকে কুরআন হবে, সে হাফেযও হয়ে যাবে, আলেমও হয়ে যাবে, কারীও হয়ে যাবে, আমলকারীও হয়ে যাবে, দাঈ হয়ে যাবে, কুরআনের প্রচার-প্রসারকারী হয়ে যাবে। কারণ, সে তো কুরআনের আশেক হয়ে গেছে। এটিই মানুষের জীবনের আসল সৌভাগ্য।

اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر
جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے

'এই যুগে তো সে-ই প্রকৃত ও বড় সৌভাগ্যবান, যে রাতে-দিনে সর্বদা কুরআন খুলে রাখে। কুরআনকে বুকে নিয়ে বাঁচে, কুরআনকে ধারণ করেই জীবন কাটায়।'

কুরআনের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রেম

সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য-অগণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা আশেকে কুরআন তথা কুরআনের প্রেমিক ছিলেন। তাঁরা কুরআনে পাকের তেলাওয়াত শুনতে বেচইন ও অস্থির হয়ে যেতেন। তাঁদেরই ব্যাপারে খোদ রব্বে কারীম বলে দিয়েছেন–

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ

'তারা যখন এই কুরআন শোনে, যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলের ওপর, তখন আপনি তাদের চক্ষুকে অশ্রুর বর্ষণে আচ্ছন্ন দেখবেন। কারণ, তারা এর সত্যতা জানে।'[১]

তো কুরআন শুনে কে কাঁদবে? নিশ্চয় যাঁর হৃদয়ে কুরআনের ভালোবাসা তীব্র, সে-ই কাঁদবে। তাঁরা কুরআন শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন না। তাঁরা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতেন। কাঁদতেন কুরআনের মহা সত্যকে উপলব্ধি করে। সাহাবায়ে কেরামের মহান এই সৌন্দর্য আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন কুরআনে কারীমে।

কুরআনের প্রেমে সমাধান হয়ে যায় সকল সমস্যা

বাস্তবেই এই কুরআন সকল সমস্যার সমাধানকারী কিতাব। অটল বিশ্বাস নিয়ে যদি বান্দা এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তবেই সকল সঙ্কট ও সমস্যার মোকাবেলা এই কুরআন দ্বারা করা সম্ভব হবে। এই একটি কিতাবের মহব্বতের দ্বারা-ই আল্লাহ বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতকে ঐশ্বর্যময় ও বর্ণিল করে দেবেন। আবারও বলছি, বিশ্বাস জরুরি। আজ সামান্য ও ছোট-ছোট সমস্যায় পড়ে আমরা তার সমাধানের জন্যে দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াই। এর দুয়ারে ওর দুয়ারে ধরনা দিই। অথচ যার ঘরে আল্লাহর কুরআন আছে, তার ঘরে শেফা, সুস্থতা, আসমানি নিরাপত্তা, কামিয়াবি ও কল্যাণের ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান রয়েছে। কারও কাছে ছুটতে হবে না। কারও কাছে ধরনা দিতে হবে না। সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কমপক্ষে এক পারা কুরআন তো অন্তত তেলাওয়াত করতে হবে।

সকল অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূরকারী

কুরআন সম্পর্কে কুরআনেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত বলেছেন–

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

'মুসলমানদের অন্তরগুলোকে সুস্থ করে দেবে এই কুরআন।'[২]

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

'যখন আমি অসুস্থ হই, তখন কুরআন আমাকে শেফা দেয়।'[৩]

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৮৩
২. সূরা তাওবা : আয়াত ১৪
৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ৮০

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

'তোমাদের মাঝে এসেছে আত্মার রোগের শেফা। ঈমানদারদের জন্য তা হেদায়েত ও রহমত।'[১]

আহ! এ-ই তো আমাদের কিতাব! এ-ই তো আমাদের কুরআন।

কুরআন শেফা ও আরোগ্য লাভের উপকরণ। আজ আমরা কুরআনকে ধারণ না করে ছুটছি তাবিজ-কবজের পেছনে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! কুরআনের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করুন। আপনার প্রাণ রক্ষার উপকরণ আর সঞ্জীবনী শক্তি আপনি পেয়ে যাবেন আপনারই ঘরে। প্রত্যেক মুসিবতের চিকিৎসা আপনি কুরআনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। কীসের পেরেশানি আর কীসের হতাশা। সব কেটে যাবে। কুরআনকে শক্তভাবে ধারণ করুন। এই কুরআন অস্থির ও অশান্ত হৃদয়ে শীতলতা ছড়িয়ে দেয়।

কুরআনের প্রভাব ও হৃদয়ের প্রশান্তি

মক্কার কাফেররা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নানা রকম অপবাদ আরোপ করতে লাগল, তখন আল্লাহর প্রিয়তম হাবীবের হৃদয় বড়ই দুঃখিত হলো। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত বলে দিলেন, আমি ধীরে-ধীরে আপনার ওপর কুরআন অবতীর্ণ করছি। কারণ কী?

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ

'এই কুরআন দিয়ে আপনার হৃদয় ও আত্মাকে আমি মজবুত ও শক্তিশালী করতে চাই।'[২]

আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করতেন। এটিই কুরআনে পাকের বরকত। আজও যেকোনো অশান্ত, ব্যথিত ও বেদনাগ্রস্ত প্রাণ এই কুরআন পাঠ করবে, সে-ই এক অনাবিল প্রশান্তি লাভ করবে, আল্লাহর রহমত গভীরভাবে ছুঁয়ে যাবে তার আত্মাকে।

আজ আমরা কি কুরআনের মাঝে শান্তি খুঁজে বেড়াই। আমরা যখন বিপদে-বেদনায় ভেঙে পড়ি, তখন কি আমরা কুরআনের মাঝেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান খুঁজি? আমরা কি কুরআনের মাঝেই আমাদের প্রশান্তিকে আবিষ্কার করতে পারছি? আমরা কি কুরআন দিয়েই সকল দুঃখ-

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ৫৭
২. সূরা হূদ : আয়াত ১২০

বেদনায় সান্ত্বনা লাভ করতে পারি? আমরা তো বরং সমস্যায় পড়লেই কুরআনের দ্বারস্থ না হয়ে উল্টো নানা রকম অভিযোগ-অনুযোগ করতে থাকি। আজ যদি কুরআনের সাথে আমাদের মহব্বত সাহাবায়ে কেরামের মতো হতো, তাহলে কোনো প্রকার উপায়-উপকরণের প্রয়োজনই আমাদের আর হতো না। সকল সমাধান আমরা কুরআনেই খুঁজে পেতাম।

এই কুরআনের প্রভাবে মুক্তি পাই রোগ থেকে

আমাদের জন্য উচিত এই যে, নিজেরই জন্য একা-একা বসে পড়তে থাকব এই পাক কুরআন। একটি সত্য ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে সিন্ধু নামক এলাকায়। সেখানে এমন কিছু এলাকা আছে, যেসব এলাকায় হিন্দুদের আবাস বেশি ছিল মুসলমানদের তুলনায়। একটি হিন্দু লোকের কথা। লোকটি আপন ধর্মের পণ্ডিত ছিল। তার ছোট একটি বাচ্চা স্কুলে পড়ত। এই লোকটির গলিতেই একটি মুসলিম মেয়ে ছিল। মুসলিম মেয়ে ও হিন্দু লোকটির মেয়ে উভয়ে স্কুলে এক সাথে যাতায়াত করত। তাদের মাঝে সখ্য গড়ে উঠল বেশ মধুরভাবে। হিন্দু বাচ্চাটি মাঝে-মাঝে পড়া বুঝে নিতে মুসলমান বাচ্চাটির ঘরে গমন করত। মুসলিম বাচ্চাটির মা ছিল আলেমা। উর্দূ ভাষায় ইসলামি সাহিত্য, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞান ছিল। মা মেয়েদুটিকে পড়িয়ে দিতেন। হিন্দু মেয়েটির মা-বাবা একেবারে নিশ্চিত থাকত। ভাবত, আমার মেয়ে এমন ঘরে যায়, যেখানে গেলে কোনোভাবেই তার সময় নষ্ট হবে না।

তো হিন্দু মেয়েটি রোজ মুসলিম মেয়েটির ঘরে পড়তে আসে। মুসলিম মেয়েটিকে মা মাগরিবের পর কুরআন শিক্ষার কায়দা পড়াতেন। বড় সুন্দর এই পড়া দেখে হিন্দু মেয়েটি বলল, আমিও এসব শিখব, পড়ব। এবার আলেমা মা হিন্দু মেয়েটিকেও কুরআন পড়াতে লাগল এবং কালিমা পড়িয়ে মুসলিম বানিয়ে নিল। হিন্দু মেয়েটি মুসলিম মেয়েটির পরিবারের সদস্য হয়ে গেল। মেয়েটি নামায পড়াও শুরু করে দিল। বাড়িতে গিয়ে চুপচাপ থাকে যেন সকলে তাকে হিন্দুই জ্ঞান করে। বাড়িতে হিন্দুর মতোই কথা বলে। বালিকা বড় হয়ে উঠল। এদিকে কুরআন-কিতাব ও দীনি তা'লীম ইত্যাদি সবকিছু সে শিখে ফেলেছে।

একদিন মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে মুসলিম বান্ধবীর ঘরে এল এবং বলল, মা! আমার মা-বাবা একজন কট্টর ও গোড়া হিন্দুর সাথে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। সে এমন হিন্দু যে, যদি শোনে কেউ মুসলিম হবে, তাহলে

তাকে হত্যা করে ফেলে। এমন কট্টর লোকটির সাথে আমি কী করে সংসার করব? আলেমা মা হিন্দু মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, নির্জনে গিয়ে কুরআন পড়তে শুরু করো। দেখবে, আল্লাহ তোমার জন্য সহজ ও সুন্দর পথ বের করে দেবেন। আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন। মেয়েটি বলল, মা! আমার কাছে তো কুরআন নেই। মা বললেন, তোমাকে কুরআন পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব।

বিয়ের আগের দিন আলেমা মা হিন্দু মেয়েটির মায়ের কাছে সংবাদ পাঠাল, আপনার মেয়েটি আমার মেয়ের বান্ধবী ও ক্লাসমেট। আমি ওর বিয়েতে ওকে কিছু গিফ্‌ট করতে চাচ্ছি। মা একটা পাত্র নিয়ে তাতে কুরআন রাখলেন। সুন্দর এক খণ্ড সাদা কাপড় দিয়ে তা মুড়িয়ে দিলেন। এমন সুন্দর করে তাকে প্যাকিং করা হয়েছে যে, যে-ই দেখবে, সে-ই প্যাকেটটিকে না খুলে ঘরে রেখে দিতে চাইবে। এই প্যাকেটটি উপহারবক্সের মতো করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। হিন্দু মা দেখলেন, বড়ই সুন্দর উপহার। বললেন, এটি মেয়েকেই দিয়ে দেওয়া উচিত। শ্বশুর বাড়িতে গিয়েই সে তা খুলে নেবে। এখন খোলার প্রয়োজন নেই।

হিন্দু মেয়ে বিয়ের দিন শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় উপহারটি নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে কুরআনটি লুকিয়ে ফেলল। দিনে স্বামী অফিসে চলে যেত। সে সবগুলো দরজা বন্ধ করে মনভরে কুরআন পড়ত। ভাবত, এটিই তো আমার শেষ আসা। আমার চাওয়া-পাওয়া সব এর দ্বারাই পূর্ণ হবে। মেয়েটি কুরআন পড়ে-পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে লাগল। তার তো কোনো উপায়ন্তর বুঝে আসছিল না যে, কী করে এই পথ থেকে সে মুক্তি পাবে। কয়েক বছর এভাবে চলে গেল।

একদিন স্বামী বলল, আজ আমার শরীর খারাপ; আমি অফিসে যাব না। এরই মধ্যে তার শরীর আরও খারাপ হয়ে গেল। তাকে দ্রুত ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো। তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল। তার শরীরে মারাত্মক ধরনের ক্যান্সার হয়েছে। ডাক্তার বলল, কয়েক মাসের মধ্যেই তুমি মারা যাবে। লোকটি ভেঙে পড়ল। বাড়ি ফিরে শুধু কেঁদে-কেঁদে দিন কাটায়। স্ত্রীকে ধরে কাঁদে, সন্তানকে ধরে কাঁদে। একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিবারের সকলেই কাঁদতে থাকে। এবার স্ত্রী বলল, আমার কাছে একটা চিকিৎসা আছে। আমি তা তোমার মধ্যে প্রয়োগ করব। তবে শর্ত হলো, যদি তুমি সুস্থ হও, তাহলে আমার একটা দাবি অবশ্যই তুমি মেনে নিতে হবে।

মৃতপ্রায় স্বামী স্ত্রীর কথায় রাজি হয়ে গেল। হিন্দুয়ানা পন্থায় স্বামী থেকে কসম ও অঙ্গীকার নিয়ে স্ত্রী চিকিৎসা শুরু করল। বলল, এই যে পানি নাও। প্রতিদিন এভাবে আমি পানি এনে দেব; তুমি তা পান করবে। ৪১ দিন পর্যন্ত চলবে। স্বামী ঠিকভাবেই স্ত্রীর কথা মতো চলল। ৪১ দিন পর চেক করে ডাক্তার রিপোর্ট দিল, তোমার অবস্থা এখন এমন যে, মনে হচ্ছে কোনো দিন তোমার ক্যান্সারই হয়নি। তুমি তো পূর্ণই সুস্থ আছ। এবার লোকটি সাহসী হলো, প্রাণ ফিরে পেল। তার দেহে সজীবতা এল। বাঁচার আনন্দ বোধ করল। স্ত্রীকে বলল, তোমার চিকিৎসা তো ফল দিয়েছে। ক্যান্সার তো কেটে গেছে। স্ত্রী বলল, এবার অঙ্গীকার পূরণ করুন। রামের নামে যে অঙ্গীকার ও কথা আমাকে দিয়েছেন, তা পূরণ করো।

স্বামী বলল, বলো কী দাবি তোমার? আমি তা পূর্ণ করব। তুমি যা বলবে, যা চাইবে, আজ আমি তোমাকে তা-ই দেব। স্ত্রী এবার তাকে ইসলাম গ্রহণের কথা বলল। বলল, তুমি কালেমা পড়ে নাও। ইসলাম গ্রহণ করো। মুসলমান হও। স্বামী বলল, তুমি কী বলছ এসব। আমি হিন্দু। হিন্দুর ঘরে আমার জন্ম। হিন্দুর ঘরে আমার বেড়ে ওঠা। আমি কী করে এটা করব? এবার স্ত্রী তার পানি পান ও সুস্থ হয়ে ওঠার মূল রহস্য বলল। বলল, এই যে তুমি সুস্থ হয়েছ, এটা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কুরআনের উসিলায়।

স্বামী বলল, কী করে এটি সম্ভব? এবার স্ত্রী সমস্ত কথা বলল। কীভাবে কুরআন পড়ল, কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করল, কীভাবে নামায পড়ল, সবই জানাল। সে বলল, আমি ইসলাম থেকে জেনেছি, কোনো মানুষ অসুস্থ হলে সূরা আলাম নাশরাহ লাকা পড়ে, আয়াতে শেফাগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে যদি তা পান করা হয়, কিছু দিনের মধ্যেই আল্লাহ ওই বান্দাকে সুস্থ করে দেন। মৃত্যু ছাড়া সর্বপ্রকার রোগ থেকে এর মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যাবে। একথা শুনে স্বামীও ইসলাম কবুল করে নিল।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত উভয়কে বাকি জীবন ইসলাম মোতাবেক চলার তাওফীক দিয়ে দিলেন। বাকি জীবনটা মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। মনে বিশ্বাস ছিল, হৃদয়টা দৃঢ় ছিল। আজ যদি সেই বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও মনোবল আমাদের মাঝে থাকত, তাহলে দেখা যেত কী অকল্পনীয় বরকত আমাদের ওপর বর্ষিত হয়।

তাই কুরআনের সাথে মহব্বত প্রগাঢ় করা উচিত। সাহাবায়ে কেরাম সত্যিকার মহব্বত করতেন কুরআনকে। তার বরকতেই তাঁরা জল-স্থল ও সর্বমহলে বিজয়ী হয়েছেন।

دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے
بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے

'কি সাগর, কি পাহাড় কোনো পথই আমরা ছাড়িনি; বরং সাগর-নদী, পাহাড় বা গিরিপথ আলো-আঁধারীর সব ভেদাভেদ ভুলে নিকশ অন্ধকারেও ছুটিয়েছি আমরা অশ্বদল।'

সাহাবায়ে কেরামের গভীর অনুরাগে কুরআন পাঠ

একদিনের ঘটনা। হযরত ইবনে কা'ব (রাযি.) উপবিষ্ট। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। বললেন, ইবনে কা'ব! তুমি কুরআন পড়ো। ইবনে কা'ব তো বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী! কুরআন তো আপনার ওপর নাযিল হয়েছে। আমি কী করে আপনারই সামনে কুরআন তেলাওয়াত করব? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা বাইয়্যিনা তেলাওয়াত করো–

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

'আহলে কিতাবদের কাফের ও মুশরিকরা ফিরে আসবে না তাদের নিকট স্পষ্ট দলিল না আসা পর্যন্ত।'[১]

সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার সামনে তেলাওয়াত করব? নবীজি যে জবাব দিলেন, সেই জবাব শুনে ইবনে কা'ব (রাযি.)-এর বুঝে এসে গেল, হয়তো আল্লাহ নবীজিকে এমন হুকুম দিয়েছেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করে ফেললেন,

اَاللّٰهُ سَمَّانِيْ

'আল্লাহ কি আমার নাম নিয়েছেন?'

আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন যে, ইবনে কা'বকে বলো যেন সে কুরআন পড়ে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ;

---

১. সূরা বায়্যিনাহ : আয়াত ২০, ২১

আল্লাহ তোমার নাম নিয়ে বলেছেন, ইবনে কা'বকে বলুন, যেন সে কুরআন পড়ে। হে আমার হাবীব! আপনি শুনবেন সেই তেলাওয়াত। আমিও শুনব সেই তেলাওয়াত। কত মহব্বতের সাথে তিনি পাঠ করতেন পাক কুরআন, যে পাঠের ফরমায়েশ আসছে খোদ আরশের পক্ষ থেকে। খোদ রব্বে কারীমের পক্ষ থেকে।

একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটির সারমর্ম এই যে, এক সাহাবি ঘরে কুরআন পাঠ করেছিলেন। আসমান থেকে সেই তেলাওয়াত শুনতে ফেরেশতা নেমে এলেন। সাহাবি তাদেরকে তারকারাজির মতো দেখছিলেন। পরে যখন প্রভাত হলো, নবীজি বললেন, যদি তুমি আজ সারা রাত কুরআন পড়তে থাকতে, তাহলে মদীনাবাসী আজ স্বচক্ষে আসমানের ফেরেশতাদের দেখতে পেত।

তাই যে-ঘরে কুরআন তেলাওয়াত চলতে থাকে, ওই ঘর আসমানবাসীর জন্যে এমন চকমক করতে থাকে, যেমনভাবে জমিনবাসীর চোখে আকাশের তারকারা চকমক করে।

তো কুরআন মজীদের সাথে আমরাও সত্যিকার মহব্বত তৈরি করব। তাহলে এই কুরআনই আমাদেরকে আল্লাহর নিকট মাকবুল ও গ্রহণযোগ্য বানিয়ে দেবে।

কুরআনের লক্ষ্য

১. বান্দা যেন হেদায়াতের ভাগিদার হয়ে যেতে পারে। কারণ, কত শতবার যে বলা হয়–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে আল্লাহ! আমাকে সরল ও সঠিক পথের ওপর তুলে দাও।'[১]

২. চিন্তিত ও পেরেশান ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেবে। পতিত ব্যক্তিকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি জোগাবে। ঘুরে দাঁড়াবার সাহস দেবে।

৩. যেব্যক্তি দুনিয়ার বিপদাপদে পড়ে আছে, মুসিবতে পড়ে আছে এই কুরআন তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে, মুসিবত হতে রক্ষা করে। এই কুরআন তো নাযিলই হয়েছে এজন্য যে, এর প্রেম-ভালোবাসা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে, মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে।

---

১. সূরা ফাতেহা : আয়াত ৫

মানবজীবনে কুরআন

শেষ পর্যায়ে একটি ঘটনা বলছি। এরপরই আমার আজকের বক্তব্যের ইতি টানব। এক বালক রাস্তায় একটা গুলি পেল। সে গুলিটা পকেটে পুরে নিল । সে তো এর ক্ষতিকর দিকটি জানে না। একজন বড় মানুষকে জিজ্ঞেস করল। লোকটি বলল, আরে ভাই! এটি বড় ভয়ানক জিনিস। বড়ই বিপদের জিনিস এটি। এটি বাঘের গায়ে লাগলে বাঘ মরে যায়। হাতির গায়ে লাগলে হাতি মরে যায়। এই গুলি মানুষের গায়ে লাগলে মানুষ মরে যায়।

ঘটনাক্রমে চলার মাঝেই একটা কুকুরছানা তার পিছু নিল। সে ধমক দিয়ে কুকুরটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরটা তার পিছু ছাড়ল না। ছেলেটি পকেট থেকে গুলিটা নিয়ে কুকুরটার ওপর মারল। কিন্তু কুকুর মরা তো দূরের কথা, ক্ষেপে গিয়ে তার ওপর উল্টো চড়াও হলো। ছেলেটি কোনো রকম প্রাণে বেঁচে উক্ত লোকটির কাছে ছুটে এল। বলল, চাচা! আপনি আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। আপনি বলেছিলেন, এই গুলি দ্বারা বাঘ, হাতিও মারা যায়। আমি একটা কুকুরের গায়ে ছুড়েছি। কিন্তু কুকুর তো মরল না। বাঘ-হাতি মরবে কী করে?

লোকটি হাসল। বলল, আরে বোকা! এই গুলি পিস্তলের মধ্যে ফিট করতে হয়। তারপর পিস্তলের সুইস চাপ দিলেই অত্যন্ত গতি নিয়ে এই গুলি আঘাত হানবে লক্ষবস্তুতে। তবেই এর দ্বারা বাঘ মারতে চাইলে বাঘ মরবে। হাতি মারতে চাইলে হাতি মরবে। তুমি তো বুলেটটি হাতে নিক্ষেপ করেছ। এতে তো মশাও মরবে না। বন্দুক ছাড়া শুধু বুলেটের কোনো কার্যকারিতা নেই।

তো ভাইয়েরা আমার! কুরআনও ঠিক তেমন। এই কুরআন তো এক-একটা বুলেটের মতো। এই কুরআনকে ব্যবহারের পদ্ধতি জানা থাকতে হবে। সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন ব্যবহার না করতে পারলে কুরআনের শক্তি ও কার্যকারিতা বোঝা যাবে না। আর যদি সঠিক নিয়মে ব্যবহার করা যায়, তবেই দেখা যাবে কী না করা যায় আর কী না সম্পাদিত হয় এই কুরআন দ্বারা। এই যে আমাদের ৫/৬ ফুটের একটা শরীর। এই দেহে যদি কুরআনের সেই শাশ্বত শক্তিকে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহলে এর বরকতে আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরো দেহটিকেই কুরআন বানিয়ে দেবে।

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قران

'আরে! মুমিন বান্দার এই মহা দৌলতের ভান্ডার কেউ তো জানে না! দেখতে দেখা যায় কুরআনের তেলাওয়াতাকারী; কিন্তু বাস্তবে তো এই বান্দা-ই কুরআন।'

তারপর যদি আমরা রাতের আঁধারে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তবেই এই কুরআনের শক্তি প্রকাশ পাবে। এরপরই তো আল্লাহ্ দুনিয়ার নকশা বদলে দেবেন। সাহাবায়ে কেরাম সংখ্যায় তো কম ছিলেন। কিন্তু রব্বে কারীম তাঁদেরকে ইয্যাতের জিন্দেগি দান করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

'বহুবারই ছোট দল বিজয় লাভ করেছে বড় দলের ওপর আল্লাহর হুকুমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[১]

কতবার এমনটি হয়েছে যে, আল্লাহ গুটিকতক জনদলকে বিরাট বাহিনীর ওপর বিজয়ী করেছেন। কতবার এমন হয়েছে যে, আল্লাহ চড়ুই পাখি দিয়ে বাজ-ঈগলকে পরাজিত করেছেন। আবাবিল দিয়ে হস্তিবাহিনীকে পরাস্ত করেছেন।

জীবনে কুরআনের আসক্তি থেকে কুরআনের ক্রিয়া তৈরি হয়

আমাদের জন্য আবশ্যক কুরআনের সাথে ইশক ও মহব্বতের সম্পর্ক স্থাপন করা। আজকের পূর্বে কুরআন তেলাওয়াতে যত কমতি ও গাফলত হয়েছে, তা থেকে তাওবা করে ফিরে আসি। তারপর কুরআন পড়ে দেখি। ভাইয়েরা! কুরআন পড়ুন, বুঝুন এবং জীবনে তা বাস্তবায়ন করুন। দেখবেন, সাফল্য আপনার পদচুম্বন করবে। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত দুনিয়ায় ইজ্জত ও সম্মান দান করবেন। আখেরাতে কামিয়াবি ও কল্যাণ দান করবেন। আল্লাহর নবী কেয়ামতের দিন আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এই কুরআনও আমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে। তেলাওয়াতকারীকে এই কুরআন জান্নাতে নিয়েই তবে ছাড়বে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

আল্লাহ বলবেন, হে আমার তেলাওয়াতকারী বান্দারা! আসো। কুরআন পড়তে থাকো আর জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকো। ফলে একটি আয়াত তেলাওয়াত করবে আর এক দরজা সামনে বাড়বে, এক স্তর অগ্রসর হবে। যেখানে গিয়ে আল্লাহর কুরআন পূর্ণ হবে, সেটিই হবে জান্নাতে ওই বান্দার মাকাম। আল্লাহ আমাদের সত্যিকার কুরআনপ্রেম, কুরআনের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

কেয়ামতের আলামত

'অনেক বর্ণনায় কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কী-কী আলামত সংঘটিত হবে, তার আলোচনা এসেছে। আজ আমরা নিজচোখে সেসব সংঘটিত হতে দেখছি। যেমন দেখুন, একদিন নবীজি বয়ানের মধ্যে বলেছেন, মক্কা মুকাররামার পেট কেটে যখন রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং ইমরাত ও দালান-কোঠাগুলো সেখানকার পাহাড় থেকেও উঁচু হয়ে যাবে, তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা কোরো। আপনারা যারা হজের সফরে গেছেন, নিশ্চয় দেখেছেন কেমন করে পাহাড় চিরে পথ নির্মাণ করা হয়েছে। Tunnels বা সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে। অথচ হাজার বছর আগের মানুষের মাথায় এ-বিষয়টা আসতই না যে, কেমন করে পাহাড়ের বুক চিরে তৈরি করা হবে সড়ক। তৈরি করা হবে পথ। কেয়ামতের আলামতগুলো আজ সর্বত্রই প্রকাশমান।'

কেয়ামতের আলামত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

কেয়ামতের নিদর্শন

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেছেন, একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পর খুতবা প্রদান করলেন। সেই খুতবায় তিনি কেয়ামতের পূর্বে যত ঘটনা ঘটবে, যত নিদর্শন প্রকাশ পাবে, সবই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। একটি বিষয়ের কথাও নবীজি বাদ দেননি। আমাদের মধ্যে যে তা মুখস্থ করেছে সে মুখস্থ করেছে। আর যে তা ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে। সেসব নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন ছিল এই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا

'নিশ্চয় এই দুনিয়া সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল। আর আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন।'

চোখে দেখা কেয়ামতের আলামত

অনেক বর্ণনায় কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কী-কী আলামত সংঘটিত হবে, তার আলোচনা এসেছে। আজ আমরা নিজচোখে সেসব সংঘটিত হতে দেখছি। যেমন দেখুন, একদিন নবীজি বয়ানের মধ্যে বলেছেন, মক্কা মুকাররামার পেট কেটে যখন রাস্তা নির্মাণ করা হবে এবং ইমরাত ও দালান-কোঠাগুলো সেখানকার পাহাড় থেকেও উঁচু হয়ে যাবে, তখন তোমরা

কেয়ামতের অপেক্ষা কোরো। আপনারা যারা হজের সফরে গেছেন, নিশ্চয় দেখেছেন কেমন করে পাহাড় চিরে পথ নির্মাণ করা হয়েছে। Tunnels বা সুড়ঙ্গপথ নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে। অথচ হাজার বছর আগের মানুষের মাথায় এ-বিষয়টা আসতই না যে, কেমন করে পাহাড়ের বুক চিরে তৈরি করা হবে সড়ক। তৈরি করা হবে পথ। কেয়ামতের আলামতগুলো আজ সর্বত্রই প্রকাশমান।

নবীজি ইরশাদ করেছেন, 'যখন মক্কার পেট চিরে রাস্তা তৈরি করা হবে এবং যখন ইমারতগুলো পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে যাবে।'

আল্লাহু আকবার কাবীরা! আপনি সশরীরে গিয়ে দেখুন। হারাম শরীফের পাশেই যে হোটেলটা নির্মিত হয়েছে, সেটা নিকটের পাহাড়টির চেয়ে বেশি উঁচু। সেই যামানায় এক তলা দোতলা ভবনই নির্মাণ করা হতো। বহুতল ভবন নির্মাণের মতো প্রযুক্তি সেযুগে ছিল না। সেযুগে এমন অত্যাধুনিক প্রকৌশল বিদ্যা ও এমন টেকনোলজিও ছিল না। সেই ১৪শত বছর আগে এমন একটি তথ্য উপস্থাপন করা কত বড় বিস্ময়ের ব্যাপার!

এটি নিজে-নিজে চিন্তা বা গবেষণা করে বলার মতো বিষয় নয়। এটি তো আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইল্‌ম ও জ্ঞানের কথা। আজ আমাদের চোখের সামনে নবীজির সেই হাদীছের বাস্তব চিত্র সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে।

নবীজি একবার উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় প্রবল বেগে ধূলিঝড় শুরু হলো। হযরত ওমর (রাযি.) ছুটে এলেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের গৃহে। জিজ্ঞেস করলেন দারুণ উত্তেজনা নিয়ে, হযরত! কেয়ামত এসেই গেল নাকি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সান্ত্বনার সুরে বললেন, ওমর! কী করে ভাবছ কেয়ামত এসে গেছে; অথচ ইরাকবাসীর খাবারদাবার এখনও বন্ধ করে দেওয়া হয়নি? আর এই আরবের বিশুদ্ধ মরুভূমি এখনও সবুজ-শ্যামলিমায় পরিণত হয়নি?

দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে দুটি আলামতের কথা বলেছেন।

১. ইরাকের অধিবাসীদের খাবার বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই চিত্র এই কয়েক বছর আগেই আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন। এমন তুমুল যুদ্ধপরিস্থির সম্মুখীন ইরাক হয়েছে যে, ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো তো দূরের কথা অসুস্থ ও ক্ষতবিক্ষত আহতকে পর্যন্ত চিকিৎসা দেওয়া যায়নি।

২. শুষ্ক মরু আরব সবুজ-শ্যামল হয়ে যাবে। একটি সময় ছিল, আরবের বেশির ভাগ এলাকা-ই ছিল শুধু মরুপ্রান্তর। সবুজ-শ্যামল ভূমি খুব কমই ছিল। কিন্তু আজ তো মাশাআল্লাহ এমন হয়েছে যে, সবুজ শাক জন্ম নেয়। ফসলি ভূমি এখন অনেক সেখানে। তারা এখন শাক-সবজি ও ফলমূল রপ্তানি করে। কয়েক বছর থেকে তো দেখেছি, পাকিস্তানসহ নিকটবর্তী দেশসমূহে তারা ত্রাণও পাঠাচ্ছে এবং তা গম ইত্যাদি দ্রব্য। তো এই আলামতটুকু আজ বাস্তবতার মুখ দেখেছে।

কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে দেখা যাবে যেসব নিদর্শন

এখানে কিছু নিদর্শন সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. খারাপ মানুষগুলো ক্ষমতার অধিকারী হবে : ইরশাদ হয়েছে, যখন খারাপ মানুষ ক্ষমতা ও নেতৃত্বের মালিক হবে, তখন কেয়ামত হবে। দেখুন, আজ আমাদের চারপাশে ক্ষমতার মালিক কারা হয়, কেমন মানুষ হয়। আমাদের চার পাশের মন্দরা আজ কী করে। তাদের অবস্থা আজ কেমন? আজ যে নিজের শক্তি বেশি দেখাতে পারে, সে-ই ক্ষমতার মালিক হয়।

২. গ্রাম্য লোকেরা প্রাসাদ বানাবে : কেয়ামতের নিকটতম সময় হচ্ছে, যখন গ্রাম্য লোকেরা বড় ও উঁচু প্রাসাদ বানাবে শহরে এসে। দেখুন, আজ আমাদের সাধারণ লোকেরাও সামান্য কিছু টাকা-পয়সা হলেই শহরে এসে বাসা-বাড়ি বানায়, দালান-কোঠা বানায়। এভাবে কেয়ামতের আলামতগুলো একটা-একটা করে ফলে যাচ্ছে।

৩. আমানতের মালকে গনিমতের মালের মতো ধারণা করবে : কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের আরেক নিদর্শন হলো, মানুষ আমানতের মালকে গনিমতের মালের মতো ধারণা করবে এবং গনিমতের মালের মতোই ভাগ করবে। আজকের পৃথিবীতে আপনি কাউকে কোনো কিছু আমানত দিলে দেখবেন, সে তা খেয়ানত করবে। আপনার রাখা আমানত সে নিজে ভোগ করবে। বরং উল্টো আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করবে। আমানত আজ রক্ষিত হয় না। আজ অপরকে দুঃখ দিয়ে মানুষ নিজে আনন্দিত হয়।

৪. অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পেতে সম্মান করবে : কেয়ামতের আরেকটা আলামত হলো, অন্যের অনিষ্টতা ও দুশ্চরিত্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাকে সম্মান করা হবে। দেখুন, আজ মানুষ নেতাদের, এলাকার প্রভাবশালীদের সম্মান করে কেন? তার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে।

৫. পূর্ববর্তীদের লানত করা হবে : লোকেরা নিজেরাই নিজেদের পূর্ববর্তীদের লানত করবে, খারাপ বলবে। আজ আপনি দেখবেন, লোকেরা নিজেদের পূর্ববর্তীদের গাল দিচ্ছে, বদনাম করছে এবং লানত দিচ্ছে। আর তাতে সামান্যতম লজ্জাও বোধ করছে না।

৬. স্ত্রীকে মায়ের ওপর প্রধান্য দেওয়া হবে : মায়ের আনুগত্য না করে স্ত্রীর আনুগত্য করা হবে। এটাও কেয়ামতের আলামত। শরীয়ত বলছে, মাকে প্রধান্য দাও, মায়ের আনুগত্য করো। আজ মানুষ এই হুকুম ছেড়ে স্ত্রীদের মায়ের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

৭. বন্ধুকে পিতার ওপর প্রধান্য দেওয়া হবে : কেয়ামতের আরেকটা আলামত হচ্ছে, বন্ধুকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। বন্ধুর কথা শোনা হবে। আজ তো এমন সময় এসেছে যে, সন্তানরা পিতাকে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমনিভাবে মানুষ অশুভ বিষয়কে ঘৃণা করে। আজ বন্ধুকেই মানুষ নিজের পথ চলার সহায়ক মনে করছে। অথচ বয়স ও অভিজ্ঞতায় এই বন্ধু কত ছোট, কত অযোগ্য আর পিতা তো অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ মানুষ। আজ নিজের সকল কাজে বন্ধুকেই অনুসরণীয় মনে করা হয়, বন্ধুর সাথেই পরামর্শ করে আর পিতাকে নিজের শত্রু ভাবে।

৮. কন্যা মাকে পরিচালনা করবে : মা হবে দাসি। কন্যা হবে মালিক। মাকে পরিচালনা করবে কন্যা। আজ এই নিদর্শনটিও আমাদের সামনে স্পষ্ট। একটি ঘটনা এমন আছে যে, এক কন্যা বড় ধনাঢ্য ছিল। সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবানও ছিল। তার মা গরিব ও অসহায় ছিলেন। এই নারী তার মাকে নানা কাজের হুকুম দিত। মাকে চাকরানির মতো পরিচালনা করত। এটা কেয়ামতের বড় একটা আলামত।

৯. ওলামায়ে কেরামের মৃত্যুর সময় তার স্থলাভিষিক্ত থাকবে না : আলেমগণ যখন যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন, কেউই যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যাবেন না। যিনি যাবেন, তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করার মতো কেউ থাকবে না।

১০. যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে : কেয়ামতের পূর্বে ধনাঢ্যরা যাকাত প্রদান করাকে নিজের বোঝা মনে করবে। আজ আমাদের বড় লোকেরা গরিবদের যাকাত দিতে চায় না। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন যাকাতকে গরিবদের হক বলে অভিহিত করেছেন।

১১. নগ্নতা ও বেহায়াপনা বেড়ে যাবে : আজ আমাদের সমাজ নৈতিকভাবে অবক্ষয়ের শিকার। চারদিকে উলঙ্গপনা বেড়ে গেছে। আজ টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের সমাজ কঠিন অধঃপতনের শিকার হয়ে গেছে। চার দিকে নির্লজ্জ উলঙ্গপনা বিরাজ করছে। ৯০ বছরের বুড়োও আজ ইন্টারনেটের সামনে বসে, টেলিভিশনের সামনে বসে বেশরমভাবে খারাপ ছবি দেখছে। আজ এমন হচ্ছে যে, একই রুমে বসে একই টেলিভিশনে মা, মেয়ে, ছেলে, বাবা মিলে খারাপ ছবি দেখছে। ফলে নির্লজ্জতার কঠিন রূপ ধারণ করেছে। দেখা যায়, ইন্টারনেটে চ্যাটের মাধ্যমে দুজনে প্রেমালাপ করছে। পরে দেখা যায়, তারা দুজন ছিল মা-ছেলে, ভাই-বোন, বাবা-মেয়ে! বড়ই বিস্ময়কর অবস্থা। এটা কেয়ামতের আলামত।

১২. সকল কাজে গান-বাজনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে : সকল কাজে সর্বত্রই গান-বাদ্য শোনা যাবে। আজ হাতে-হাতে গুনাহ ও গান-বাজনা চলে এসেছে। প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছে। আপনি আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মোবাইল কিনেছেন। তাতে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে। ফোনে যে-টোন ফিট করা থাকে, এতেই তো গান-বাদ্য হয়ে যায়। মসজিদে গান-বাদ্যবিশিষ্ট রিংটোন বেজে ওঠে। আমি কা'বা তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ একজনের ফোন বেজে উঠল। তার মোবাইলের রিংটোন ইন্ডিয়ান এক বেশ্যা নারীর নির্লজ্জ গান। কী আশ্চর্য ব্যাপার! নিজের চোখে দেখুন কেয়ামতের আলামত।

১৩. কুরআন গলার নিচে নামবে না : কুরআন পাঠকারীদের কুরআন গলার নিচে নামবে না। বড় সুন্দর করে তেলাওয়াত করে ঠিক; কিন্তু হৃদয়ে তার কোনো প্রভাব থাকে না। দেহে কুরআনের শিক্ষা ধারণা করতে পারে না। তারাবীর নামাযে তো কুরআন পড়া হচ্ছে; কিন্তু কুরআনের আদর্শ আমাদের মধ্যে আসছে না। কুরআন পড়ি ঠিক, কিন্তু চোখে আমাদের অশ্রু আসে না।

১৪. মসজিদে হইচই হবে : মসজিদে হইচই করা হবে। ব্যাপকভাবে এই সমস্যা দেখা দেবে। ইসলামি নাম থাকবে। কুরআনের নকশা ও নিশান বিদ্যমান থাকবে। যখন এমন হবে, তখন বেশি-বেশি ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প হবে। কত শত বছর আগে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিদর্শনটা বলে গেছেন। আজ আমরা এই নিদর্শনটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

১৫. সমগ্র জগতে অস্থিরতা বিরাজ করবে : কেয়ামতের পূর্বে সারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। ভালো মানুষগুলোকে দেখে-দেখে মেরে

ফেলা হবে। এ-ব্যাপারটা বহু পূর্বেই পৃথিবীতে ঘটে গেছে। এটা কেয়ামতের অনেক বড় একটা আলামত।

১৬. নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা হবে : যাকে মারা হচ্ছে, তাকে বলাও হবে না কেন তাকে মারা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তি নিজেও জানবে না, কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে। দেখা যাবে, নামায পড়তে মসজিদে এসেছে জিন্দা মানুষ আর বাড়ি ফিরেছে মৃত লাশ হয়ে। এই আলামতটাঁর আজ বাকি নেই।

আমাদের এই বর্তমানকাল

আমাদের এই যামানায় আরও কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে এবং নিত্য প্রকাশ পেয়ে চলছে।

১. আরব রাষ্ট্রের বাদশাহ মারা যাবে আর এর স্থলাভিষিক্তদের মাঝে লড়াই হবে : একটি হাল আমলের নিদর্শন এই যে, আরব বাদশাহর মৃত্যু হবে আর সাথে-সাথেই তার স্থলাভিষিক্তদের মাঝে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। এই তো কিছুকাল পূর্বে আমরা দেখেছি, একটি আরব রাষ্ট্রের বাদশাহ মৃত্যুবরণ করল তো অন্যজন এসে তার রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিল।

২. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগবে : রমজানের পূর্বে বা যখন-তখন সূর্যগ্রহণ শুরু হয়ে যাবে। এই তো গত রমজানের পূর্বেও সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল। এর কিছু দিনের মধ্যেই চন্দ্রগ্রহণ হয়ে গেল। এগুলো কেয়ামতের আলামত।

৩. দুনিয়াকাঁপানো বিকট আওয়াজ : বর্ণিত আছে, কেয়ামতের পূর্বে এমন বিকট শব্দ ধ্বনিত হবে, যা পুরো দুনিয়ায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। এর এক ব্যাখ্যা তো এই যে, বাহ্যিক ধ্বনি হবে। আরেক ব্যাখ্যা এই যে, এমন আওয়াজ হবে যে, সারা দুনিয়ায় খবর হয়ে যাবে।

তো যখন কেয়ামতের আলামতসমূহ প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে, তখন বুঝবে কেয়ামত অতি নিকটে। তাই খুব সতর্ক থাকতে হবে।

দুনিয়ার প্রতি অতি অনুরাগ কেয়ামতের আলামত

দুনিয়ার প্রতি আসক্তি, দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ কেয়ামতের বড় একটা আলামত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ وَخَضِرَةٌ

'দুনিয়া সুমিষ্ট ও শুশোভিত শ্যামল।'

এখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দুটি শব্দ বলেছেন। কিন্তু সব কথা-ই এই দুটি শব্দে চলে এসেছে, যেন সমুদ্রকে কূপে নিয়ে এসেছে। দুনিয়া বড়ই সুমিষ্ট। ফলে বান্দার মন ভরে না। এই দুনিয়ার প্রতি তার লালসা কমে না। বৃদ্ধ হয়ে যায়; তবুও ফের যুবক হতে চায়। মরতে চায় না কারও মন। দুনিয়ার লালসা এমন যে, একটা বিয়ে করার পর বলে, না; হয়নি; আরেকটা করতে হবে।

একবার কোনো এক কথার প্রেক্ষিতে আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে যে, ৯৯% মানুষের হৃদয় চায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে। পরে কিছু মানুষ আমাকে বলল, হযরত! শত ভাগ সত্যি বলেছেন। যারা কুমার/কুমারী, তারা প্রথম বিয়ের চিন্তায় বিভোর থাকে। আর যারা বিবাহিত, তারা আরেকটা বিয়ের চিন্তায় বিভোর থাকে। শতভাগ বাস্তব কথা। সন্তানের বিয়ে হচ্ছে আর বাবা চিন্তা করছে, হায়! আমিও যদি এখন আরেকটা বিয়ে করতে পারতাম। এমন হাজারো আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন-সাধ আমাদের জীবনকে আবিষ্ট করে রেখেছে। এর কোনো পরিসংখ্যান নেই, কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এই তো দুনিয়া। এটিই দুনিয়ার স্বাদ। সবুজ-শ্যামলময় আচ্ছাদিত বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে দৃষ্টি মেলে রাখতে চায় মন অনন্তকাল। ঠিক তেমনি বাইরের পরিবেশের দিকে তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। নানা রূপ, নানা বর্ণ আমাদের বিভোর করে রাখে। সুন্দরের প্রতি আমরা দুর্বল থাকি সবসময়। সুন্দর দেখার ও উপভোগ করার জন্যে থাকি উন্মুখ। এটি আমাদের অভ্যাস। কারণ, দুনিয়া সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল। তবে এটি এককালে আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেবে।

পূর্বের লোকদের স্থলাভিষিক্তি

নবীজি বলেছেন, আল্লাহ এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। তোমার দাদা-পরদাদারা এই দুনিয়ায় জীবন যাপন করে গেছে। আজ তুমি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছ। একদিন তুমি এই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। তোমার স্থলে আসবে তোমারই সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তারপর তারা হারিয়ে যাবে। আসবে তাদের বংশধর। এই ধারায় চলতে থাকবে পৃথিবী। হারিয়ে যেতে থাকবে মানুষের পর মানুষ। আর আগমন করতে থাকবে তাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ।

আল্লাহ এমন ধারাক্রম নিয়মটি করেছেন কেন? এর উত্তরে বলা হয়েছে–

لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ

'তোমরা কেমন আমল কর আমি তা দেখার জন্য।'[১]

আমি তোমাদের এক দলকে অন্য দলের, এক প্রজন্মকে অন্য প্রজন্মের স্থলাভিষিক্ত এজন্য করিনি যে, তোমরা দুনিয়ার মজা উড়াবে। তোমরা দুনিয়ার কাজ-কর্ম আর ব্যস্ততায় ডুবে থাকবে। দুনিয়া-দুনিয়া করে মরবে। এজন্য তোমাদের অন্যের স্থলাভিষিক্ত করা হয়নি; বরং আল্লাহ দেখতে চান, তোমরা আল্লাহর নেয়ামত পেয়ে শুকরিয়া আদায় কর কি-না। দেখতে চান, তোমরা বিপদে পড়ে সবর করো কি-না। তিনি দেখতে চান, তাঁর প্রতি তোমাদের ভক্তি-ভালোবাসা কতটুকু আছে।

হাদীছে একটি দারুন দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, চমৎকার ফসল হচ্ছে, সবুজ তৃণলতায় ভরে গেছে প্রান্তর। দুটা পশু এল সেখানে। একটা সেই কোমল তাজা ঘাস খেতে লাগল। এত বেশি পরিমাণে খেল যে, তার বদহজম হলো এবং অসুস্থ হয়ে গেল। অন্যটা দেখল, চারদিকেই তো ঘাস-আর-ঘাস। কিন্তু সে তার পরিমাণমতো খেল। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। আবার কিছুক্ষণ পর সামান্য খায় আর বিশ্রাম নেয়। আর প্রথমটা একবারেই সব খেয়ে নিতে চায়। এতে প্রথমটা অসুস্থ হয়ে পড়ল আর দ্বিতীয়টা সুস্থ থাকল এবং খেতেও পারল।

দুনিয়ার কামনা-বাসনা

কিছু লোক আছে, যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলছে। দুনিয়া তাদের কখনও তৃপ্ত করতে পারে না। যতই পায় আরও পেতে চায়। আপনি দেখুন, একটি ঘরের যতজন সদস্য আছে সবাই চাকরি করছে। তবুও তাদের দিল ভরছে না। তাদের হৃদয় তৃপ্ত হচ্ছে না। লালসা ও কামনা-বাসনার এমন উন্মাদনা মানুষকে চেপে ধরেছে যে, অল্পেতুষ্টি ও অল্পেতৃপ্তি আজ মানুষ থেকে পালিয়ে গেছে।

হাদীছে এসেছে, আল্লাহ যদি কাউক একটি সোনার প্রান্তর ও মাঠ দিয়ে দেন, তাহলেও সে ভাববে, হায়! আরেকটি সোনার মাঠ ও প্রান্তর যদি আমার থাকত! আরও বর্ণিত আছে, তাকে আরেকটি সোনার মাঠ দেওয়া হলো। সে চিন্তা করবে, হায়! আরেকটি সোনার মাঠ যদি আমাকে দেওয়া হতো! এভাবে

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১২৯

মানুষের লালসার সীমানা শুধু বাড়তেই থাকে। মানুষ দুনিয়ার কোনো জিনিসই পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কবরের মাটিই শুধু মানুষের পেট ভরে দেয়।

যাকেই আপনি দেখবেন, সে-ই নিজের স্বর্গ নির্মাণে মহাব্যস্ত। স্বর্গ নির্মাণ মানে সুন্দর ও সুউচ্চ ঘর-বাড়ি, প্রিয় সঙ্গিনী, সন্তানসন্ততি, গাড়ি-বাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার। মোটকথা, তার রুচিমাফিক পছন্দের সর্বপ্রকার উপকরণ দিয়ে সে সাজিয়ে নিতে চায় নিজের সংসার, নিজের আবাসন এবং জায়েয-নাজায়েয সব পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে নিজের কামনাগুলো পূরণ করতে চায়।

আমাদের আজকের যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে দুনিয়ার পূজা, দুনিয়ার আসক্তি। তাই তো আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, দুনিয়া জাদুঘর। আল্লাহ দুজন ফেরেশতা দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তারা দুনিয়ায় জাদু নিয়ে এসেছেন। তাদেরকে জাদুবিদ্যা দান করা হয়েছিল। লোকেরা তাদের থেকে জাদু শিক্ষা করে সেই জাদু প্রয়োগ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিত। বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ

'ওই জাদুর মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাত।'[১]

তো তারা স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ তৈরি করে অন্যের স্ত্রী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেত। ফলে তারা আল্লাহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এটা-ই তো দুনিয়া।

সম্পদ ও আপদ

তাই বলছি, বেশি-বেশি সম্পদ উপার্জন, সম্পদপ্রাপ্ত হওয়া ভালো নয়। বরং সম্পদ যখন আসে, তখন সে সাথে করে আপদও নিয়ে আসে। ভালো করে মনে রাখুন। সম্পদ বিপদ নিয়ে আসে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের দরিদ্ররা ধনীদের থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে। মাল হালাল হতে পারে আবার সঠিক পথে খরচ করছে এমনও হতে পারে। তবে হিসাব তো দিতে হবে। আজকে সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো মালের মহব্বত।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১০২

বেশিরভাগ মানুষই আক্ষেপ করে বলে–

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ

'হায়! আমরা যদি কারুনের মতো সম্পদ প্রাপ্ত হতাম!'[১]

দেখুন, কারুনের সম্পদের পরিণাম কী হয়েছিল? কারুনের কী পরিণতি হয়েছিল? মালসম্পদ বেশি হয়ে গেলে আমাদেরও তেমন পরিণতি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার পরিচিত এক ব্যক্তির অবস্থা এমন যে, সে তাইওয়ানে চাকরি করে। তার স্ত্রী ইসলামাবাদে চাকরি করে, কন্যা জার্মানে, ছেলে আমেরিকায় পড়াশোনা করে। তারা এই চারজন মাত্র সদস্য। দেখুন, দুনিয়া অর্জনের লালসা তাদের পারিবারিক বন্ধন থেকে কতটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। আজ তাদের অবস্থা এমন যে, বছরে একবার সপ্তাহখানেকের জন্য একত্রিত হয়। অথচ বাবার এ পরিমাণ সম্পদ আছে যে, তা দ্বারা কমপক্ষে ৪০টি পরিবারের লোককে খাওয়ানো যাবে। মায়ের টাকা এ পরিমাণ যে, তাতে ২০টি পরিবারকে লালন করা যাবে। আর ছেলেমেয়ে দুটি তো উন্মাদনার অতলে হারিয়ে আছে।

দুনিয়াপূজার আসল রূপ

এই যে দুনিয়াপূজা– এটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। চোখ দিয়ে দেখবেন; কিন্তু কখনও চোখ ভরবে না। যতই দেখবেন, ততই ভালো লাগবে। তবে অন্তর তৃপ্ত হবে না। দেখে থাকতেই মনে চাইবে।

আমার এক বন্ধু বলল, ওর দাদা ৮৫ বছরের বৃদ্ধ। অথচ নামায পড়ে না। আমাকে নসীহত করতে বলা হলো। আমি তাকে নামাযের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। বললাম, আপনি তো অবসর মানুষ। স্ত্রী-বাচ্চা সবই আপনার আছে। আপনি নামায পড়তে শুরু করুন। সে তার শরীরের একটি অঙ্গ ধরে বলল, এই স্থানটায় অসুস্থতা আছে। যদি তা ভালো হয়ে যায়, তবেই আমি নামায পড়ব। দেখুন, ৮৫ বছর বয়সে এসেও সে এই অপেক্ষায় আছে যে, আগে রোগ ভালো হয়ে যাক, তারপর নামায পড়ব।

---

১. সূরা কাসাস, আয়াত : ৭৯

এই দুনিয়া বান্দা ও আল্লাহর মাঝে প্রভেদ তৈরি করে দিচ্ছে। আজ তো এমন হয়েছে যে, নামায পড়ার সময়ও বান্দা পাচ্ছে না।

হে আমার বন্ধুগণ! দুনিয়ায় প্রত্যেকটা জিনিসেরই বিকল্প পাওয়া যায়। প্রতিটি জিনিসেরই বিকল্প আছে। একটি জিনিস না পেলে তার বিকল্প আরেকটি পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর সাথে যদি আপনার দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়, তবে আল্লাহর পরিবর্তে আপনি আর কাউকে পাবেন না। তাই তো দুনিয়াকে সুন্দর ও সুদর্শন সাপ বলা হয়েছে। খাজা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহ.) বলতেন, এই দুনিয়াটা সাপের মতো নিজের মাঝে বিষ ধারণ করে রাখে। কিন্তু ওপরে-ওপরে সাপের মতোই সে বড় সুন্দর ও সুদর্শন হয়ে থাকে।

কবি বড় চমৎকার বলেছেন–

تو دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا

یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا

দুনিয়ার সাজসজ্জা, দুনিয়ার রং-তামাশা আর দুনিয়ার স্বাদ ও মজার পেছনে পড়ো না তুমি। এটি তো ডোরাকাটা সাপেরই অনুরূপ। তোমায় সে দংশন করবে। তোমায় সে আহত করবে বিষাক্ত আঘাতে।

তাই বলছি, দুনিয়া-দুনিয়া করে এই যে আমাদের এত তোড়জোড়; এর থেকে ফিরে আসা অত্যন্ত আবশ্যক বিষয়।

দুনিয়াপ্রীতি থেকে বাঁচার কৌশল

দেখুন, সাপও দংশন করে, এই দুনিয়াও দংশন করে। সাপের বিষ পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে প্রাণহীন করে দেয়। দুনিয়াপ্রীতিও মানুষের সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে মানুষটিকে রূহানিভাবে মৃত বানিয়ে দেয়। কিছু মানুষ আছে; তারা সাপের মন্ত্র জানে। যারা সাপের খেলা দেখায়, তারা সাপের বিষদাঁতগুলো খুলে নেয়। ফলে সাপ আর মানুষকে দংশন করতে পারে না। তাদেরকে সাপুড়ে বলা হয়। তারা সাপকে নিজের ঝুলিতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, গলায় ঝোলায়, হাতে নেয়; কিন্তু দেখবেন, সাপ তাদের কিছুই করে না, করতে পারে না।

তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাগণ দুনিয়ার মহব্বত নামক এই বিষ অন্তর থেকে বের করে নিয়েছেন। তারা দুনিয়াবিমুখতার গুণ অর্জন করেছেন। তাই দুনিয়া তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম তো নবীজি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে অবস্থান করে এই দুনিয়ার বিষ থেকে আত্মরক্ষার মন্ত্র শিখে নিয়েছেন। ফলে তাদের সামনে সোনা-চাঁদি, হিরা-জহরতের খাযানা পড়ে থাকত আর তারা তাহাজ্জুদ পড়ে বলতেন, হে সোনা! হে রৌপ্য-মানিক্য। হে হিরে-জহরত! অন্যকে ধোঁকা দাও; আমাকে ধোঁকা দিও না।

তো সাধারণ জনতার জন্য সাহাবায়ে কেরামের সবচেয়ে বড় কেরামত ছিল, তারা একস্থানে দরিয়ার ওপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে গেছেন বড়ই নিরাপদে। এই ঘটনা শুনে সাধারণ জনতা খুবই উৎফুল্ল হয়ে যায়। কিন্তু আলেমরা জানেন, সাহাবায়ে কেরামের বড় কারামত হচ্ছে, যখন বিজয়ের সোনালি সময় চলছিল, একে-একে পারস্য, রোম, কেসরা ও কায়সার বিজিত হচ্ছিল, পায়ের নিচে এসে পড়ছিল সম্পদের পাহাড়, তাঁদের সামনে দুনিয়ার সম্পদের জোয়ার এসেছিল। সেই জোয়ার থেকে তাঁরা নিজেদের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে পেরেছেন। তারা দুনিয়ার দংশন থেকে নিজের আত্মাকে রক্ষা করতে পেরেছেন। এটিই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় কারামাত। তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবন অনুসরণ করা হবে আমাদের আরাধ্য।

কামাই-রোজগার ফরজ কখন

আজ অনেকে বলে থাকেন, আরে ভাই! আয় উপার্জন করাও তো ফরজ। বন্ধুগণ! ফরজ তো ঠিক আছে; কিন্তু এর মানে তো এই নয় যে, নিজের রব্বে কারীমকে ছেড়ে, সমস্ত আমলের কথা ভুলে দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। আমি একটি কিতাবে পড়েছি, হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহ.) একবার তাবলীগি এজতেমায় বলেছেন–

'লোকেরা বলে থাকে, কামাই-রোজগার ফরজ। আমি বরং বলব, এই দুনিয়াদারদের জন্য দুনিয়া কামাই করা হারাম। দলিল তিনি এই দিয়েছেন যে, তোমরা তো হালাল-হারাম জান না। তোমরা তো কোনটা জায়েয, কোনটা নাজায়েয তা-ও জান না। এই অজ্ঞতার মুহূর্তে তো দুনিয়া কামাই করা তোমাদের জন্য হারাম। কারণ, তোমরা দুনিয়া কামাইয়ের মাসআলা জান না। প্রথমে দীন ও ঈমান শেখো; তারপর দুনিয়ার কর্ম হাতে নাও।

দুনিয়ার নানা মনযিল ও মানুষ

এই দুনিয়ায় মানুষের অনেকগুলো মনযিল আছে। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

১. প্রথম মনযিল মায়ের পেট : একটি সন্তান জন্ম নেওয়ার আগে ৯/১০ মাস মায়ের পেটে অবস্থান করে। এমন ছোট জায়গাই মানুষ তার জীবন কাটায়। এটি তার জীবনের প্রথম মনযিল। আপনারা সনোগ্রাফির দ্বারা বুঝতে পারেন, আঠারো সপ্তাহ পর বাচ্চার মাঝে একটা যোগ্যতা আসে। পেটের বাচ্চাটি বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। তার ব্রেন প্রভাবিত হতে শুরু করে। লোকেরা বলে, মায়ের কোল বাচ্চার প্রথম বিদ্যালয়। আমি তো বলি, মায়ের পেটই হচ্ছে বাচ্চার প্রথম বিদ্যালয়। তাই তো আমাদের মা-চাচিরা, আমাদের মুরুব্বীরা আমাদের অন্তঃসত্তা স্ত্রীদের বলে থাকেন, গর্ভাবস্থায় কোনো ত্রুটিপূর্ণ খাবার যেন না খাওয়া হয়। কারণ, এর প্রভাব বাচ্চার ওপর পতিত হয়।

মায়ের পেটে বাচ্চার খাবার থাকে রক্ত। আবার দেখেন, পেঠের ভেতরে একটা থলির ভেতর থাকে বাচ্চা, যার চারপাশে থাকে নাপাক আর নাপাক। থলিটির ভেতর থাকে পানি। সেই পানিতে সাঁতরাতে থাকে ছোট সেই শিশু। যদি শিশুটি এমন করে সাঁতরাতে না পারে, তালে এদিকে মা-ও হাঁটাচলা, উঠা-বসা কিছুই করতে পারে না। সন্তান যদি পেটে সাঁতার না কাটে, তা হলে সন্তানেরও ক্ষতি হবে। তাই আল্লাহ পানির ভেতরেই বাচ্চাটিকে এমন করে দিলেন যে, একটি পানির থলির ভেতরে বাচ্চাটি অবিরত সাঁতরে চলছে একটি পানির নদীতে সাঁতরে বেড়ানোর মতো। এবার চিন্তা করুন, নানা রকম নাপাকির ভেতর যে বাচ্চাটি ডুবে আছে, যার খাদ্য হচ্ছে হায়েযের রক্ত, সেই বাচ্চা-ই যখন এই দুনিয়ায় ভূমিষ্ট হয় এবং কাঁদতে শুরু করে– কাঁদে এজন্যে যে, সে মায়ের পেটকে নিজের স্থায়ী ঠিকানা ভাবতে থাকে। ফলে সে দুনিয়ায় আগমন করতে চায় না। চার হাত-পা নাড়িয়ে কাঁদতে থাকে, বিলাপ করতে থাকে যে, আমাকে এখানেই থাকতে দাও, আমাকে এখানেই থাকতে দাও। আমাকে কেন দুনিয়ায় নিয়ে যাচ্ছ? অথচ মায়ের পেটের জায়গাটা কত সংকীর্ণ আর খাদ্য কেমন সেকথা ভাবতেই তো মানুষ বিস্মিত হয়ে যায়।

২. দ্বিতীয় মনযিল জমিন ও আসমানের পেট : এবার দুনিয়ায় আগমনের পর এই জমিন ও আসমানের পেটই হয়ে যায় আমাদের দ্বিতীয় মনযিল। ফলে আমরা ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে থাকি। এটিই আমাদের কাছে ভালো লাগে, এই খাবারই আমাদের কাছে বড় সুস্বাদু লাগে। এই খাবারের পেছনেই আমরা ছুটতে থাকি– আগামীর কথা ভাবি না। সামনের মনযিলের কথা চিন্তা করি না। মায়ের পেটকে যেমন শিশুটি তার আসল ঠিকানা মনে করেছিল, তেমনি দুনিয়াকে মানুষ আসল ঠিকানা মনে করতে থাকে।

সামনের মনযিলে যাওয়ার ক্ষণে সে কাঁদতে থাকে। দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চায় না। মায়ের পেট থেকে শিশুটি যেমন বিদায় নিতে চাচ্ছিল না, তেমনি মানুষও দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চায় না। দুনিয়াতেই থেকে যেতে চায় অনন্তকাল।

এবার যখন বান্দা দুনিয়া থেকে আখেরাতে যাবে, তখন আখেরাতের নেয়ামত দেখে তেমনই লজ্জিত হবে এবং তেমনই বিস্মিত হবে যেমন একটি মানুষ মায়ের পেটের নেয়ামত ও খাবারদাবারের কথা ভেবে বিস্মিত হয়।

তো আমি বোঝাতে চাচ্ছি, আমরা যখন মায়ের পেটে ছিলাম, তখন তাকেই নিজের স্থায়ী ঠিকানা ভেবেছি। এরপর যখন দুনিয়ায় এসেছি, এখন একেই ভাবছি নিজেদের স্থায়ী ঠিকানা। অথচ আমাদের আখেরি মনযিল আখেরাতই হবে আমাদের স্থায়ী ঠিকানা। তাই তার জন্যেই মূলত প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

হাদীছে পাওয়া যায়, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীকে যখন খাবার দেবেন, তখন জান্নাতিগণ দুনিয়ার খাবারের কথা কল্পনা করবে। তখন দুনিয়ার খাবারের কথা চিন্তা করে এত ঘৃণা লাগবে যেমনটা ঘৃণা লাগে নাপাকের ব্যাপারে। যেমন– আজ আমাদের যদি বলা হয়, তুমি তো মায়ের পেটে অজস্র নাপাকি ও পেশাব-পায়খানার ভেতরেই ডুবে ছিলে, তখন একথা শুনে কেমন ঘৃণা লাগে বলুন। আজকে যেমন অতীতের সেকথা শুনে ঘৃণা লাগে, তেমনি, আজকের দুনিয়ার এসব খাবারদাবারের কথা ভেবে আমাদের ঘৃণা লাগবে জান্নাতের খাবার খেয়ে। অথচ আমাদের অবস্থা আজ এমন যে, এই খাবারের পেছনে পড়েই সমস্ত সময় ব্যয় করে দিচ্ছি। দুনিয়া পাওয়ার অনিঃশেষ আশায় আমরা মাওলার বিধান লঙ্ঘন করে চলছি।

৩. তৃতীয় মনযিল কবর : তারপর আসমান ও জমিনের পেট থেকে আমরা একদিন চলে যাব কবরের পেটে। কবরের পেটের চাহিদা কী আমরা তা জানি না। ভাই! সেখানে শুধু তিনটি কথা জিজ্ঞেস করা হবে–

১. مَنْ رَبُّكَ 'তোমার রব কে?'

২. مَا دِيْنُكَ 'তোমার দীন কী?'

৩. مَنْ نَبِيُّكَ 'তোমার নবী কে?'

যে মানুষটি সেদিন জবাব দিতে পারবে, সে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যে জবাব দিতে পারবে না, সে ব্যর্থ হবে। চাই মানুষটি সাদা হোক, চাই

কালো হোক। চাই শিক্ষিত হোক, চাই মূর্খ হোক। চেয়ারম্যান হোক, মেম্বার হোক। সকলকেই এই তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে। তখন যে জবাব দিতে পারবে, সে-ই সফল হবে। আর যে জবাব দিতে পারবে না, সে ব্যর্থ হবে। আজ তো আমাদের দুনিয়ায় বসিয়ে আখেরাতের কথা বোঝানো হচ্ছে। অথচ আমরা বুঝছি না। বুঝতে চেষ্টাও করছি না। কেয়ামতের দিন স্বচক্ষে দেখে সব কিছু সহজেই বুঝে যাবে। কিন্তু তখন তো আর করার কিছু থাকবে না।

উদাহরণ দেখুন, সহজেই বুঝবেন। মুরগির একটা ডিম। ডিমের মধ্যে একটা বাচ্চা। ডিম থেকে বের হওয়ার আগে সেই বাচ্চাটাকে কেউ যদি বলে, তোমার সামনে এমন একটা দুনিয়া রয়েছে যে, দু-এক দিনের মধ্যেই তুমি সেই দুনিয়ায় চলে যাবে, যেখানে ৬ ফুট লম্বা মানুষ রয়েছে, বড়-বড় উঁচু পাহাড়-পর্বত রয়েছে। আসমান রয়েছে, জমিন রয়েছে, ফল-মূল, তৃণলতা আরো কত কী রয়েছে, চাঁদ-সূর্য, সেতারা রয়েছে। এখন ডিমের খোসার ভেতর থেকেই যদি মুরগির ছানাটি বলে যে, আমি এসব কিছু এখান থেকেই দেখে নিতে চাই, তাহলে কি সে তা দেখতে সক্ষম হবে? না। কোনোভাবেই ডিমের ভেতরে অবস্থানকালে সে এই সুবিশাল পৃথিবী প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু যখনই সে ডিম থেকে বের হয়ে আসবে, তখনই সে স্বচক্ষে সব আশ্চর্য বিষয়গুলো দেখতে পাবে। তেমনিভাবে আজ আমরা আখেরাতের কথা শুনি, জান্নাত-জাহান্নাম, মীযান-পোলসেরাতের কথা শুনি, কিন্তু আমরা কোনো কিছুই বুঝতে সক্ষম হচ্ছি না। অথচ কেয়ামতের দিন স্বচক্ষে দেখে তখন বুঝে ফেলতে পারব জান্নাত-দোযখ, মীযান-পোলসেরাত কী বিষয়। আজ না বুঝে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে, সুন্দর ও সুভাষণে অস্বীকার করে দিচ্ছি কেয়ামত নামক চিরন্তন শাশ্বত সত্যকে। আজ আমরা সত্যিই না বুঝেই কেয়ামতকে অস্বীকার করছি।

আমাদের হলো কী? আরে ভাই! আমরা আখেরাতকে দেখে তারপর কি ঈমান আনব? গায়বের ওপর ঈমান তো এই যে, দেখা ছাড়াই বিশ্বাস করা হবে, না দেখেই বিশ্বাস করা হবে। যেদিন এই দুনিয়ার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিনই আপনার প্রকৃত চোখ খুলে যাবে। বাহ্যিক এই চক্ষু বন্ধ হলেই খুলবে আসল চোখ। তখন আর এই দুনিয়ায় ফেরা সম্ভব হবে না। তখন স্বচক্ষে দেখতে পাবে, দুনিয়ায় আলেমগণ সত্যই বলেছেন। তখন বড়ই আফসোস হবে। ভাববে, হায়! যদি দুনিয়াতেই আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া যেত।

একটি উদাহরণ দেখুন। একটা মাছ মনের আনন্দে সাঁতরাচ্ছে। হঠাৎ সে পানির তলদেশে একটি খাবারের টুকরো দেখতে পেল। দারুণ সুবাসিত আর বড়ই লোভনীয় সেই খাবার। সে প্রবল ইচ্ছে নিয়ে এই খাবারের প্রতি মনোনিবেশ করল। এমন সময় আরেকটা মাছ সেখানে উপস্থিত হলো। আগের মাছটাকে এই খাবারের প্রতি উদ্ধত দেখে সে বলল, দেখো ভাই! এই যে খাবার, এটা মূলত খাবার নয়। এটা একটা বড়শি। মানুষেরা মাছ শিকার করার জন্য এতে খাবার লাগিয়ে পানিতে ছেড়ে দিয়েছে। এই খাবারের সাথে একটা সূতা আছে। তুমি খাবারটা মুখে দেবে আর অমনি বড়শি তোমার গলায় বিঁধে যাবে। আর ওপর থেকে মানুষ তা বুঝতে পারবে এবং লাঠিটা টেনে উঠাবে। তুমিও সেই সাথে মানুষটির হাতে চলে যাবে। তারপর কী হবে তা তো তোমাকে আর বলতে হবে না। রান্না করে তোমাকে ভক্ষণ করা ফেলা হবে।

কিন্তু প্রথম মাছটা বলল, আরে ভাই! তুমি কী যে বলছ! আচ্ছা আমি ওই শিকারীটাকে দেখতে চাই। দেখেই তারপর তোমার কথা বিশ্বাস করব। সারা দরিয়া যদি চক্কর লাগিয়ে ঘোরে, তবুও সে শিকারীকে দেখতে পাবে না। দেখতে পাবে না সেই চুলাটাও, যেখানে রান্না করে তাকে খাওয়া হবে।

কিন্তু প্রথম মাছটা যদি দ্বিতীয় মাছটার কথা মেনে নেয়, তাহলে তো সে বেঁচে যাবে। আর যদি মেনে না নেয়, তাহলে তার কী করুণ পরিণতি হবে তা আর আপনাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। খাদ্যটা খাওয়ার সাথে-সাথেই দেখতে পাবে, তার গলায় বড় একটা কাঁটা বিদ্ধ হয়ে গেছে। দুই সেকেন্ডের ভেতর তাকে পানির ওপরে স্থলে তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর তাকে রান্না করে খেয়ে ফেলা হয়েছে।

আজ আমাদের অবস্থাটাও এমনই হয়ে গেছে। আজ কেয়ামতের এত আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও আমরা আখেরাত ও কেয়ামতকে বিশ্বাস করছি না। আজ আহলুল্লাহগণ আমাদেরকে আখেরাত ও কেয়ামতের কথা বোঝাচ্ছেন। তবুও আমরা তাদের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। তাদের কথা শুনছি না এবং আমলে আনছি না। একে ধোঁকা দিচ্ছি, ওকে প্রতারিত করছি। এখানে বদ-আমল করছি, ওখানে অপকর্ম করছি। এভাবে আজ আমরা পাপের সাগরে ডুবে আছি। অথচ এতটুকুও তো জানি না যে, একটু পরে চোখদুটি বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের কী অবস্থা হবে।

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

এই যে ভূমিকম্প-ঘূর্ণিঝড়; আমাদের কি জানা আছে, সামান্য কিছুক্ষণ পর আমাদের কী পরিণতি হবে? কত ঘর এমন আছে, যাদের একজন সদস্যও বেঁচে নেই। কত ঘর এমন আছে, যাদের দু-একজন হয়তো বেঁচে আছে। কিছু দিন পূর্বে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো, আমার এক বন্ধু আছেন, তার আত্মীয়দের মধ্যে তিনশত সদস্য তাতে মারা গেছে। দেখুন, যে-ঘরের একজন লোক মারা যায়, সেই ঘরে কেমন শোকের ছায়া নেমে আসে। চিন্তা করুন, যে-বংশের তিনশত সদস্য একসঙ্গে মারা গেছে, সেই বংশের বেঁচে থাকা লোকটির অবস্থা কেমন হবে?

আমরা নিত্য দিন খবরের কাগজ পড়ছি। নানা রকম ঝড়-তুফান আর ভূমিকম্প বিপদের সংবাদ আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি সতর্ক হচ্ছি? আমাদের অনুভূতিগুলো কি জেগে উঠছে? আমরা কি ওসব থেকে শিক্ষা নিচ্ছি? আমাদের কী যে হয়ে গেল! আমরা যে কেমন অনুভূতিহীন জড়পদার্থ হয়ে গেলাম!

জাদুটোনা যেমন মানুষদের প্রভাবিত করে ফেলে, আজ তেমনিভাবে দুনিয়া আমাদের প্রভাবিত করে ফেলেছে। ফলে আজ আমরা না আল্লাহর কথা স্মরণ করছি, না আখেরাতের কথা স্মরণ করছি। বরং আমরা মৃত প্রাণীর মতো হয়ে গেছি। ভাইয়েরা! কেয়ামতের কঠিন সমস্যা থেকে বাঁচতে হলে মজবুত ঈমান তৈরি করতে হবে। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আজ শপথ নিতে হবে জীবনকে বদলে নেওয়ার। প্রত্যয় গ্রহণ করতে হবে জীবনকে পরিবর্তন করার। তাই ঈমান ও ইয়াকীনকে করতে হবে দৃঢ় ও মজবুত।

পিঠের বোঝা

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

'তোমরা পাথেয় সংগ্রহ করো। আর তাকওয়াই সর্বোত্তম পাথেয়।'[১]

এখানে তাকওয়ার দ্বারা পরহেযগারি উদ্দেশ্য।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৭

অর্থাৎ– আমাদের এই জীবন-সফরের প্রধান পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আমাদের প্রধান পাথেয় হচ্ছে পরহেযগারি। আমাদের বর্তমান অবস্থা তো এমন হয়ে গেছে–

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ

'তারা তাদের বোঝা তাদের পিঠের ওপর উঠাবে।'[১]

একজনের গীবত করে দিলাম মানে নিজের পিঠের বোঝা বাড়িয়ে দিলাম। একজনের সাথে মিথ্যা বললাম তো নিজেই নিজের পিঠের বোঝা বাড়িয়ে নিলাম। আল্লাহর হুকুমের নাফরমানি করলাম, নামায পড়লাম না তো নিজের পিঠের বোঝা বাড়িয়ে নিলাম। এভাবে যদি চিন্তা করি, তাহলে দেখবেন, আমরা সারাটা দিন পিঠের বোঝা বাড়িয়েই চলেছি।

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ

'তারা তাদের বোঝা তাদের পিঠের ওপর উঠাবে।'[২]

কুরআন ঘোষণা করছে–

اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ

'তারা যে-বোঝা বহন করছে, তা কতই-না ভারী বোঝা।'[৩]

আজ লোকদের মাল চাই, তো অন্যের সাথে মিথ্যা বলে মাল হস্তগত করছে, ডাকাতি করছে, চুরি-ছিনতাই করছে। এসব কী? এগুলোই তো বোঝা। আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা মানুষের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছি না। আল্লাহর হুকুমের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করছি না। এসব তো নিজের পিঠের বোঝা। এত বোঝা নিয়ে কাল কেয়ামতের দিন উঠলে পোলসেরাত পার হব কীভাবে? তাই তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছে ইরশাদ করেছেন–

আমার উম্মতের জন্য দুটি বড় ফেতনা রয়েছে।

১. দুনিয়ার মহব্বত।

২. নারীর মহব্বত।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৩১

২. সূরা আন'আম : আয়াত ৩১

৩. সূরা আন'আম : আয়াত ৩১

নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং নারীপ্রেম অনেক বড় ফেতনা পুরুষের জন্য। আর যারা সামান্য দীনদার আছে, তারাও দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে আছে। আপনি কি এমন ব্যক্তিকে দেখে থাকবেন, যে একথা ভেবে-ভেবে কাঁদছে যে, হে আল্লাহ! আমি দুই দুনিয়ার মহব্বতে ডুবে আছি! আমি তো এমন কোনো মানুষ পাইনি।

আল্লাহর সাথে মোলাকাতের প্রস্তুতি

আখেরাতের সাথে মহব্বত তৈরী হওয়া দুনিয়া থেকে অন্তরের বাঁধন ছিন্ন হওয়াই আকলমন্দের নিশান।

اَلدُّنْيَا دَارُ الْغُرُوْرِ

'দুনিয়া ধোঁকার আবাসন।'

নবীজি ইরশাদ করেছেন, হে আবুযর! আমলকে খালেস করে নেয়া উচিত, প্রত্যক্ষকারী তোমার আমলকে বড়ই তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন।'

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন নফস চাই, যে নফস আপনাতেই নিবদ্ধ থাকবে, আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, আপনার ভরসাতেই মগ্ন থাকবে, আপনার হুকুম অনুযায়ী আমলে মশগুল থাকবে।

মোটকথা, আপনার ভয় ও ভালোবাসায় সর্বদা ডুবে থাকার তাওফীক আমাকে দান করুন যেন আপনার মোলাকাতের জন্য আমার ঈমান পাকাপোক্ত হয়ে যায়। যেন সর্বদা আমার ভাবনা থাকে, রব্বে কারীমের সাথে একদিন আমাকে মোলাকাত করতেই হবে।

বন্ধুগণ! আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যদি সংসদ সদস্য হয়, তাহলে সে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে, সংসদে গিয়ে আমি এই বলব, ওই বলব। এটা বলব, ওটা বলব। এভাবে সে প্রস্তুতি নিতে থাকে। হে বন্ধুগণ! আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর সাথে মোলাকাতের প্রস্তুতি নিতে।

ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাও। তারপরই তোমরা তার কাছে সাক্ষাতে এসো।'[১]

---

১. সূরা ইনশিকাক : আয়াত ৬

আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার পদ্ধতি হবে দুটি। হয়তো বন্ধুর মতো সম্মান ও খুশিমনে হাজির হবে, নাহয় অপরাধী ও অপমানিতের মতো হাজির হতে হবে। তাই চিন্তা করুন, আল্লাহর সামনে কোন রূপ নিয়ে কোনভাবে উপস্থিত হবেন। বন্ধুর মতো আসবেন, নাকি দুশমনের মতো আসবেন?

যদি পরিবারের কর্তা দু-চার বছর পর বাড়িতে আসে, তাহলে আমরা কী করি? ছোট-বড় সবাই মিলে বাড়িটাকে কত সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে রাখি। ঘরটাকে সাজাই। নানা আইটেমের সুস্বাদু খাবার তৈরি করে রাখি। সবাই তার সঙ্গে মিলিত হতে উদগ্রীব থাকি। পরিবার ও বংশের লোকেরা তাকে পরম মমতা ও ভালোবাসার সাথে স্বাগত জানায়।

কেয়ামতের দিন একজন মুমিনের অবস্থাও ঠিক এমনই হবে।

আবার দেখুন, দুনিয়াতে এমন মানুষ আছে, যার ব্যাপারে পুলিশ জানিয়ে দেয়, তোমাদের অমুক ধরা পড়েছে। ওই লোকটিকে লাঠি দিয়ে স্বাগতম জানানো হয়। তাকে কঠিনভাবে শাসন করে। কঠিনভাবে শাস্তি দেয়।

স্মরণ রাখুন, যেমনিভাবে দুনিয়ার পুলিশ তার বাহিনী পাঠিয়ে অপরাধীকে গ্রেফতার করে, তেমনিভাবে ওই বান্দাকেও আল্লাহ বাহিনী প্রেরণ করে বড় কঠোরভাবে গ্রেফতার করেন, যে তাঁর অবাধ্য হয়, যে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে। ফলে তার সব আত্মীয় মিলে তাকে কবরে রেখে আসে। সেখানে ফেরেশতারা অপেক্ষমাণ। পাপী বান্দাকে কবরে রাখার সাথে-সাথে শুরু হয়ে যায় শায়েস্তার যিন্দেগি। শুরু হয়ে যায় আযাবের যিন্দেগি। তাই জমিন বান্দাকে বলে দেয়, হে অমুক বান্দা! দুনিয়ার বুকে জমিনের মাঝে তুমিই ছিলে সবচেয়ে বড় অপরাধী। তুমিই ছিলে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু। আজ তুমি আমার পেটে এসেছ- দেখো তোমার অবস্থা কী হয়।

اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے

مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

'এখানে তো এখন ভয়ার্ত হয়ে বলছ, হায়! যদি মরে যেতাম।

মরেও তুমি শান্ত হবে না। সেখানে গিয়ে লুকাবে কোথায়? রক্ষার তরে তখন যাবে কোথায়?'

আল্লাহর সাথে মিলনের আগ্রহ

একটি হাদীছের মর্ম হলো, যেব্যক্তি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহ রাখে, আল্লাহ তার সাথে মোলাকাতের জন্য আরও বেশি আগ্রহী হয়ে যান। যে তাঁর সাথে মোলাকাতের ঈমান রাখে, যে আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নেয়, তার ওপর রব্বে কারীম রাজী ও সন্তুষ্ট হয়ে যান। যে-বান্দা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তার আর কোনো ভয় নেই। এই বান্দাকে সাদরে বরণ করা হবে হাশরে-জমিনে-পোলসেরাতে এবং কেয়ামতের ময়দানে তাকে সুন্দরভাবে স্বাগতম জানানো হবে। তার সাথে ভালো আচরণ করা হবে। তার কবরকে তার দৃষ্টির সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত করে দেওয়া হবে। সে আপন রবের সাথে মোলাকাতের জন্যে অস্থির হয়ে যাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কামিয়াবি নসিব করুন। আমাদেরকে আপন মাহবুব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এই রমজান মাসটির কদর করার তাওফীক দান করুন। দিন চলে যাচ্ছে। সময় আপন গতিতে বয়ে চলছে। রমজান তো মধু আহরণ করার মতো। হাত থেকে পড়ে গেলে নষ্ট হয়ে যায়। দেখুন, এক সময় আমরা অপেক্ষায় ছিলাম রমজান আসবে, রমজান আসবে। আজ রমজানের তৃতীয়াংশও চলে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদেরকে এর মূল্যায়ন করার তাওফীক দান করুন। রমজানের অবারিত বরকত আমাদের দান করুন। মাগফেরাতের চাদরে আমাদের আবৃত করুন। আর রহমতের বারি দ্বারা আমাদের স্নাত করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

শাহাদাতের তামান্না

'দুনিয়ায় কারও যখন মৃত্যু আসে, মৃত্যুর প্রহর ঘনিয়ে আসে, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ফেরেশতা পাঠিয়ে বলেন, যাও; আমার অমুক বান্দার রূহ কবজ করে নাও। সেই বান্দা যে-ই হোক– অলি-বুযুর্গ, মুত্তাকী-ফরহেযগার, কুতুব-আবদাল, যেই হোক। সকলের ব্যাপারে একই কথা। শুধু মালাকুল মাওতকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি আম্বিয়া কেরামের রূহ কবজের জন্যও পাঠানো হতো শুধু মালাকুল মাওতকে। বলা হতো, যাও; আমার নবীকে বলো, রব্বে কারীম আপনাকে স্মরণ করেছেন।

কিন্তু যখন শহীদের মৃত্যুর ক্ষণ নিকটবর্তী হয়, তখন রব্বে কারীম মালাকুল মাওতকে বলেন, আহ! আমার বান্দা আমারই জন্য জীবন কোরবান করছে! আরে মালাকুল মাওত! তুমি সরে যাও। আমার বান্দার রূহ আমিই গ্রহণ করে নিচ্ছি।

অত্যন্ত আদর-সোহাগ ও মমতায় খোদ রব্বে কারীম শাহাদাতের দুয়ারে দাঁড়ানো বান্দাটির রূহ গ্রহণ করে নেন। এ হলো শহীদ। এরা-ই হলো শুহাদা।'

শাহাদাতের তামান্না

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۔

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

শাহাদাতের স্বপ্ন

প্রতিটি মুমিনের হৃদয়ে শাহাদাতের সুমহান জযবা ও অনুপ্রেরণা থাকা চাই। শাহাদাতের স্বপ্নে প্রতিটি মুমিন বিভোর থাকা চাই।

একটি হাদীছের মর্ম হলো, যে-বান্দার হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না না থাকবে, আল্লাহর পথে যার সামান্য জখম বা কষ্ট হয়নি, যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে যেন এক প্রকার মুনাফিকির মাঝেই মৃত্যুবরণ করল।

ওই ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না, যার হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না থাকবে না। তাই তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন, যেন দীনের তরে নিজের সর্বস্ব কোরবান করে দেন।

কবির ভাষায়–

میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی

'আমার হায়াতের, আমার জীবনের আরাধ্যই হলো তোমার দীনের বুলন্দি।

তাই তো আমি মুসলিম আর তাই তো আমি নামাযী।'

এই দীনের জন্য যদি মালের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা-ই নিয়ে হাজির হব আমরা। যদি সময়ের প্রয়োজন পড়ে, তবে সময় দেব আমরা। আর জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হলেও এই দীনের তরে জান কুরআন করব আমরা। আমরা রবের শোকর আদায় করব যদি আমরা তা করতে পারি। এই সবকই তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেছেন সাহাবায়ে কেরামকে। তাই তো অতি সামান্য কটা দিনের মধ্যেই এমন একটি বাহিনী তৈরি হয়ে গেল, যাদের আরাধনা, চাওয়া-পাওয়া এবং স্বপ্ন ও তামান্না ছিল দীনের পথে শহীদ হওয়া, শাহাদাতের অমীয় সুধা পানা করা। তাদেরই জন্য নাযিল হয়েছে কুরআনের আয়াত–

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

'তারা এমন পুরুষ, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছে।'[১]

তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছেন, যারা নিজের জীবনের কতাওবানি পেশ করেছেন। আর অনেকে এমনও আছেন, যারা অপেক্ষমাণ আছেন। এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধনও আসবে না। তারা আপন কথায় প্রত্যয় ও অঙ্গীকারের ওপর অটল ও অবিচল।

শিশুদের শাহাদাতের তামান্না

কুফরি শক্তির সামনে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো বুক টান করে দাঁড়ানোর দৃশ্য রব্বে কারীমের নিকট বড়ই প্রিয়। কুরআনই এ-বিষয়ে ঘোষণা করছে–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সকল লোকদের, যারা তাঁর পথে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে জিহাদে মশগুল থাকে।'[২]

আল্লাহর পথে জান কোরবান করার এই সবক নবীজি পড়িয়েছেন সাহাবায়ে কেরামকে। যুবক ও তেজী জওয়ান যাদের সামনে জিহাদের আলোচনা, জিহাদের ফজিলত উপস্থাপনা, তাঁদের শিশু-কিশোরদের মাঝে জিহাদের দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দিত। ছোট-ছোট শিশুরাও শাহাদাতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠত। শাহাদাতের উদ্দীপনায় তাঁরা কম্পিত হতেন।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ২৩

২. সূরা ছফ : আয়াত ৪

আপনারা একটি ঘটনা নিশ্চয় শুনেছেন। ময়দানে জিহাদের প্রস্তুতি চলছে। নবীজির প্রিয় সাহাবায়েদের মাঝে রণপ্রস্তুতি চলছে। কে-কে জিহাদে যাবে, তার কাতার তৈরি করা হয়েছে। জিহাদি কাতারে দাঁড়িয়ে আছেন বীর সাহাবায়েগণ। এমনই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, একটি কিশোর মুজাহিদদের কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। সেও চায় যুদ্ধে যেতে। তারই একটু দূরে দেখলেন একই বয়সের আরেকটি কিশোর। চোখে-মুখে যুদ্ধে যাওয়ার ঈমানদীনপ্ত প্রেরণার ছাপ।

নবীজি তাদের একজনকে অনুমতি প্রদান করলেন, যে কিনা অপরজন থেকে বড়। আর দ্বিতীয়জনকে বারণ করলেন। এবার ওই কিশোর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হুজুর! আপনি যাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি ওর সাথে পাঞ্জা লড়ব। ওর সাথে কুস্তি পরীক্ষা দেব। আমি যদি জিতে যাই, তবে আমি যুদ্ধে যাব। আমিও অধিকার পাব।

নবীজি শক্তি পরীক্ষার জন্য উভয়কে পাঞ্জা লড়ার অনুমতি দিলেন। উভয়ের মাঝে শুরু হলো মল্লযুদ্ধ। শুরু হলো কুস্তি। অনেক কিতাবে এভাবে লেখা হয়েছে যে, ছোটজন বড়জনকে ইশারা করল, ভাই! তুমি তো অনুমতি পেয়েই গেছ। তুমি যদি আমার সাথে হেরে যাও, তবে তোমার কোনো লোকসান হবে না। এতে আমিও জিহাদে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাব।

ছোট এই শিশু-কিশোরদের উদ্দীপনা দেখুন। এটি যে জিহাদি কাফেলা। এই কাফেলা তো কোথাও পিকনিকে যাচ্ছে না। কোথাও দাওয়াত বা ভোজনে যাচ্ছে না। যাচ্ছে ইসলাম ও কুফরি শক্তির জীবন-মরণ লড়াইয়ে। যাচ্ছে দীনকে সমুন্নত করার সশস্ত্র সংগ্রামে। এই সংগ্রামের দীপ্ত প্রেরণায় আজ এই বালকরাও উদ্দীপ্ত। যেকোনো মূল্যেই আজ তারা যুদ্ধে যেতে চায়। তাদের একজনের নাম মু'আয। অন্যজনের নাম মু'আওয়ায। শেষ পর্যন্ত এই অদম্য স্পৃহা ও দৃঢ় মনোবল দেখে নবীজি তাদের জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তাদের লক্ষ্য দেখুন ভাইয়েরা! দেহে ও বয়সে ছোট। কিন্তু চেতনা ও বিশ্বাসে কতখানি বলীয়ান তারা।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বলেছেন, আমি দেখলাম, আমার দুপাশে ছোট দুটি বালক। তাদের একজন আমার কাছে এল। বলল, চাচাজান! আবুজাহলটা কে বলুন তো। সাহাবি আবদুর রহমান বলেন, আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম। দুশমন বাহিনীর নেতাকে খুঁজে ফিরছে ছোট দুটি

বালক! আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, কী করবে তাকে চিনে? বালক বলল, চাচাজান! শুনলাম, সে নাকি নবীজির সাথে বেয়াদবি করেছে, খারাপ আচরণ করেছে। আজকের এই আগুনের ময়দান থেকে হয় আমরা জীবিত ফিরব, নাহয় ওই জাহেলটা জীবিত ফিরবে। হয় আমরা মরব, নাহয় তাকে মারব। সাহাবি বলেন, আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। বাচ্চাদুটা বলেটা কী? আমি আঙুল উঁচিয়ে বললাম, ওই যে ওই লোকটা আবুজাহল।

আবুজাহল শরীরে লৌহবর্ম পরিধান করে রেখেছিল। তার চার পাশে পাহারায় ছিল অসংখ্যা সৈনিক। বালকদুটি বজ্রের বেগে ছুটে গেল সেদিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল সিংহশাবকের মতো। হত্যা করে ফেলল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাফের আবুজাহলকে। নবীজির শ্রেষ্ঠ দুশমন আবুজাহলকে।

এই তো আমাদের অতীত। এই তো আমাদের বালক-কিশোর-শিশুদের সোনালি ইতিহাস।

ল্যাংড়া সাহাবির জিহাদের উদ্দীপনা

আপনি সুস্থ মানুষের কথা বলবেন। তাদের গল্প তো বহু ঊর্ধ্বের। একজন প্রতিবন্ধী সাহাবি এলেন নবীজির খেদমতে। পা নেই তাঁর। আরজ করলেন, আমি জিহাদে যাব ওগো প্রিয়নবী! যেলোকটি লাঠি ছাড়া চলতে পারে না, পা নেই যার, নিজের ভার নিজে বহন করা যাঁর জন্য কষ্টকর, তিনি আল্লাহর মাহবুবের খেদমতে এসে বলেন, হে আল্লাহর নবী! আমার চারটা ছেলে জিহাদে শরীক হয়েছে। আমারও তো অন্তর চায় আমি জিহাদে শরীক হই। আমাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন ওগো আল্লাহর রাসূল রাসূল! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরে! তোমার তো ওজর আছে, সমস্যা আছে।

কিন্তু তাঁর এই জযবা ও অনুপ্রেরণা দেখে নবীজি অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী মনে ঘরে চলে গেলেন। স্ত্রীকে বললেন, প্রিয়তমা! আমিও তো যাচ্ছি জিহাদের ময়দানে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। স্ত্রী বললেন, কিন্তু তুমি তো লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়ে চলে আসবে। তিনি স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার লাশটিও আর ফিরিয়ে দিয়ো না আমার স্বজনদের সামনে। ওই সাহাবি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের হক পূর্ণভাবে আদায় করলেন। পরে দেখা গেল বাস্তবেই তাঁর এই মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে আর বাড়িতে আনা হলো না। আল্লাহু আকবার!

جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں

'রণপ্রান্তরে গিয়েছে যেখান থেকে কোনো রণযোদ্ধা। বড় নিরাপদে রয়েছে সে।

এই যে জীবন, এ তো আসবে আর যাবে শুধু। এই জীবনের কোনো শঙ্কা নেই।'

যে-জাতির পঙ্গুদের অবস্থা এই, সেই জাতির যুবকদের অবস্থা কেমন হবে? একজন প্রতিবন্ধীর অবস্থা যদি এমন হয়, একজন প্রতিবন্ধী যদি জিহাদে যাওয়ার জন্যে এমন ব্যাকুল হয়ে যেতে পারে, তাহলে যারা সুস্থ-সবল যুবক আছে, তাদের অবস্থাটা কেমন হবে? আবার যে-জাতি ছোট শিশুদের মাঝে এমন জিহাদি প্রেরণা বিদ্যমান থাকে, সেই জাতির জোয়ানদের অবস্থা কেমন হবে? জিহাদ এ তো একটি জযবার নাম। এ তো একটি সংগ্রামের নাম। এ তো হাসি মুখে জীবন কোরবান করার নাম। নব-নব আনন্দে লড়াইয়ের ময়দানে দীপ্ত পদে ছুটে বেড়ানোর নাম। যুবক-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, সবল-দুর্বল সবারই রক্ত কনিকায় প্রজ্বলিত ছিল তখন জিহাদের দীপ্ত অনল।

এ তো পুরুষদের কথা। শুনুন নারীদের কথাও। রণপ্রান্তরের বিজয়ী বীরাঙ্গনা নারী সেনা ও মুজাহিদদের রূপটা একটু দেখুন না।

একজন মহীয়সী নারীর শাহাদাতের তামান্না

তখন নববী যুগ। জিহাদের তুর্যবাদক রণদামামা উন্মাতালভাবে বেজে উঠল। অবিরত সেই রণভেরির পাগলকরা ধ্বনি মুজাহিদদের রক্তে জোয়ার তুলে মৃত্যু প্রস্তুত করে দিচ্ছে। নবীজির পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে লড়াইয়ের দিনক্ষণ। সিদ্ধান্ত হয়েছে, জিহাদের সময় মদীনার ঘরে-ঘরে চলছে রণপ্রস্তুতি। নারীরা নিজেদের পুরুষদের সাজিয়ে দিচ্ছে, রণপোশাক পরিয়ে দিচ্ছে। সকল রমণী সরব। কিন্তু একটি ঘরের এক রমণী নিশ্চুপ বসে আছে। তার কোলে একটা অবুঝ শিশু। তার চেহারায় বিকেলের নরম আলোর ছায়া। তার চোখে বেদনার অশ্রু টলমল। স্বামী জিহাদে শহীদ হয়েছেন আগেই। ঘরে আর এমন একজন পুরুষ মানুষও নেই, যাকে নিজহাতে সাজিয়ে দেবেন তিনি লড়াইয়ের জন্যে। একটি শিশু সন্তান তার

কোলে। নীরবে তাকিয়ে আছেন মা অবোধ বাচ্চাটির দিকে। টপটপ করে ঝরছে অশ্রুধারা। বেদনায় নীল হয়ে আসে তার চেহারা। চিন্তার দোলায় বারবার ধাক্কা খাচ্ছেন বীরাঙ্গনা রমণী। হায়! একটি বুঝমান ছেলে থাকলে তো আমি তাকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে পারতাম। আল্লাহর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাকে যুদ্ধে পাঠাতাম। কাঁদতে থাকলেন তিনি। শ্রাবণের বর্ষার মতো ঝরছে তাঁর অশ্রুধারা। ঝরছে অবিরত। ধীরে-ধীরে বেদনার অশ্রু যখন ঝরে গেছে, তখন তার হৃদয়-মন সামান্য হালকা হয়েছে বোধ হলো। তিনি উপস্থিত হলেন মসজিদে নববীতে নবীজির দরবারে বাচ্চাটিকে বুকে নিয়ে। আরজ করলেন, হে আল্লাহর মাহবুব! আমার এই বাচ্চাটিকে জিহাদের জন্যে কবুল করুন।

নবীজি দেখলেন, একজন আবেগী রমণী দুধের শিশুকে নিয়ে আদর করছে। দুধের শিশু তো দূরের কথা। শৈশব-উত্তীর্ণ শিশুও তো জিহাদে যেতে পারে না। রমণী বলতে শুরু করলেন, ওগো আল্লাহর হাবীব! যে সাহাবির হাতে ঢাল থাকবে না, তার হাতে আমার বাচ্চাটা দিয়ে দেবেন। তিনি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন আমার বাচ্চাকে। দুশমনের তির-তাওবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন। এতেও তো কাজে আসবে আমার শিশুটি।

দেখুন, যে-নারীরা জিহাদে সন্তান পাঠাতে এত ব্যাকুল, যাদের মাঝে শাহাদাতের তামান্না এত নিবিড়ভাবে তরঙ্গায়িত, যাদের মাঝে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এমন আকুতি, তাদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা ও তরবিয়াত কেমনভাবে দিয়েছেন চিন্তা করুন। শাহাদাতের এমন হাজারো ঘটনা কিতাবের পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই অল্প সময়ে সেসব বর্ণনা করা মোটেও সম্ভব নয়।

এক নারীর রাসূলপ্রেম

উহুদের ময়দানে খবর ছড়িয়ে পড়ল, নবীজি শহীদ হয়েছেন। এক নারী বললেন, যতক্ষণ সশরীরে গিয়ে সংবাদের সত্যতা যাচাই না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই সংবাদ মেনে নেব না। বাহনে আরোহণ করে ছুটলেন উহুদের পথে। রাস্তায় এক সাহাবির সাথে দেখা। রমণী জিজ্ঞেস করলেন–

مَا بَالُ مُحَمَّدٍ

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবর কী?'

সাহাবি বললেন, নবীজির বর্তমানের খবর তো আমার জানা নেই; তবে তোমার স্বামীকে আমি অমুক স্থানে শহীদ হয়ে পড়ে আছে দেখেছি।

কোনো কথা না বলে রমণী সামনে বাড়লেন। দেখে বোঝা গেল, অন্য কিছু চাইছে। সামনে আরেক সাহাবিকে দেখে প্রশ্ন করলেন–

مَا بَالُ مُحَمَّدٍ

'বলো মুহাম্মদের অবস্থা কী?'

সাহাবি বললেন, নবীজির বর্তমান অবস্থা আমার জানা নেই; তবে অমুক স্থানে তোমার সন্তানের শহীদী লাশ পড়ে আছে দেখেছি।

নারীর মুখে কোনো শব্দ নেই। চেহারায় ছেলে হারানোর বেদনা নেই। সামনে বাড়লেন তিনি। আরেকজন তার ভাই শাহাদাত লাভ করেছেন বলে সংবাদ দিল। আরেকজন তার পিতা শহীদ হয়েছে বলে সংবাদ দিল। কিন্তু তাঁর সেসব সংবাদের প্রতি কোনোই আকর্ষণ নেই। সেসব সংবাদে তিনি বিচলিতও নন। এ সেই নারী, যার স্বামী, ছেলে, ভাই ও পিতা শাহাদাত লাভ করেছিলেন উহুদের প্রান্তরে।

সামনে বাড়লেন তিনি এবং সংবাদ জিজ্ঞেস করতে-করতে ছুটতে লাগলেন। কেউ কি আছ আমাকে নবীজির সংবাদ সঠিকভাবে দিতে পারবে? একথা বলে-বলে তিনি ছুটতে লাগলেন বড় অস্থিরভাবে। একজন সংবাদ দিল, নবীজি অমুক স্থানে আছেন। মহিলা দ্রুতপদে চলে গেলেন সেখানে। দাঁড়ালেন নবীজির সম্মুখে। নবীজির চাদরের একটি কোণ শক্তভাবে ধারণ করলেন এবং একটি ঐতিহাসিক বাক্য উচ্চারণ করলেন। ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে লেখা রয়েছে সেই বাক্যটি–

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ سَهْلٌ

'নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারাতের পর সকল মুসিবতই আমার কাছে সহজ ও হালকা লাগছে।'

যে-বীরাঙ্গনা মহীয়সী নারীদের হৃদয়ে প্রেরণা ও উদ্দীপনা এমন তীব্র, তাদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে, তাদের ঈমানি জোশ নিয়ে আমি আর কী আলোচনা করব?

এক নারীর ধৈর্য ও সহনশীলতা

হযরত হামযা (রাযি.) শহীদ হয়েছেন। তাঁর বোন হযরত সাফিয়্যা তাশরীফ আনছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেয়ে এক সাহাবিকে পাঠালেন, তাকে গিয়ে বারণ করো। ভাইয়ের লাশের নিকট যেন না আসে। কারণ, লাশ দেখে মেয়েটি বড় ব্যথিত হয়ে যাবে। দুশমনরা হযরত হামযার চোখ বের করে ফেলেছিল। তাঁর বক্ষ ছিঁড়ে কলিজা বের করে ফেলা হয়েছিল। তাঁর নাক-কান কেটে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। ভাইয়ের এই করুণ রূপ দেখে অবশ্যই বোন ব্যথিত হয়ে যাবে।

সাহাবি গিয়ে সাফিয়্যাকে বারণ করলেন। বললেন, নবীজি আপনাকে লড়াইয়ের প্রান্তরে হামযার লাশের কাছে গমন করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেন নিষেধ করেছেন? বললেন, যেন আপনি ব্যথিত না হন। যেন আপনি ভেঙে না পড়েন। সাফিয়্যা বললেন, আপনি গিয়ে নবীজিকে বলুন, সাফিয়্যা শোক, দুঃখ ও কান্না করতে আসছে না। ভাইকে শাহাদাতের কারণে মোবারকবাদ ও অভিনন্দন জানাতে আসছে।

দেখুন, যে-জাতির নারীদের জিহাদি প্রেরণা এমন সতেজ, যে-জাতির নারীদের হিম্মত ও মনোবল এমন দৃঢ়, শাহাদাতের জযবা যে-জাতির নারীদের হৃদয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে, সেই জাতির পুরুষদের জিহাদি উদ্দীপনার মরুঝড় কেমন তীব্র ও বেগবান থাকবে, তা নিজেই চিন্তা করুন।

মুমিন কিংবা মুনাফিক

শাহাদাত জিনিসিটি আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। শাহাদাত বিষয়টি বিরাট এক সৌভাগ্য। এক মহাপ্রাপ্তি। যার হৃদয়ে ঈমান আছে, সে রাত-দিন শাহাদাতের কল্পনায় বিভোর থাকবে। সে সর্বদা শাহাদাত প্রাপ্তির জন্যে দু'আ করবে। কোনো মুসলমান নামধারী যদি শাহাদাতের দু'আ না করে, তাহলে বোঝা যাবে তার ঈমানে সমস্যা আছে। এ তো বরং মুনাফিক। একজন মুমিন শাহাদাতকে ভয় করবে– এটা মুনাফেকি। মানুষ শাহাদাত থেকে পিছু হটবে এ হতেই পারে না। শাহাদাতের সুতীব্র নেশায় বিভোর থাকতে হবে। শাহাদাতের প্রত্যাশী হতে হবে। শাহাদাতের জন্য ব্যাকুল থাকতে হবে। তবেই তো মানুষটি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবে।

شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن

نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

জিহাদ দ্বারা মুমিনের চাওয়া-পাওয়া তো শুধুই শাহাদাত। মালে গনীমত পাওয়ার আশা আর পাঞ্জা লড়া তো মুমিনের আরাধ্য নয়।

শাহাদাতই মুমিনের চাওয়া-পাওয়া, পরম লক্ষ্য। এই শাহাদাতের তরে মুমিন নিজের দেহ-মন, প্রাণ ও সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকা চাই। নিজেকে কোরবান করে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত থাকা চাই।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর শাহাদাতের তামান্না

প্রিয় বন্ধুগণ! এই শাহাদাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে চাইলে হযরত ওমর (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করুন। মক্কায় একবার হাজীরা জামরার পর মদীনায় যাচ্ছিলেন। একটি বড় কাফেলা সঙ্গে আছে। হযরত ওমর ওমরায় বড় ব্যথিত হৃদয়ে আকুল হয়ে দু'আ করেছেন আল্লাহর দরবারে। সময়টা ছিল তাহাজ্জুদের। তিনি আসমানের দিকে চোখ তুললেন। তাঁর চোখের তারায় জ্বলজ্বল করে উঠল পূর্ণিমার জোছনাময় চাঁদ। থরে-থরে জোছনা চাঁদ থেকে ঝরে পড়ছে চারপাশে। শীতল হাওয়া মধুময় হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশের তারকারা মিটমিট করছে। হৃদয়-মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি বুঝলেন, এটি দু'আ কবুলের এক মোক্ষম সময়।

এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যস্নাত ক্ষণে হযরত ওমর তাঁর হৃদয়ের সেই তামান্নাটি প্রকাশ করলেন, যেটি পূর্ণ হওয়ার জন্য তিনি দু'আ করে চলছেন বহু বছর। দু'আ করে চলছেন সেজদায়, রুকুতে। কখনও নামাযান্তে ব্যাকুল ও অশ্রুবিগলিত মুনাজাতে। কখনও নির্জনে, কখনও জামাতবদ্ধ দু'আয়। আজ এমন চাঁদনি রাতে প্রকৃতি যখন সমস্ত সৌন্দর্য উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে জমিনের বুকে, ঠিক এ-সময়ে, এই মুহূর্তে হযরত ওমরের হৃদয়-প্রাণ উজাড় করে তামান্নাটি তীব্রভাবে নড়ে উঠল, জেগে উঠল। চট করে হযরত ওমর উঠে বসলেন। আঁচল পাতলেন। আল্লাহর মাহবুবের প্রিয় সাহাবি ওমর আল্লাহর দরবারে তাঁর হৃদয়ের আকুতি ও প্রাণের তামান্না পেশ করলেন। তিনি দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِيْ فِيْ بَلَدِ حَبِيْبِكَ

'হে আল্লাহ! তুমি তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার নেয়ামত আমাকে দান করো। হে আল্লাহ! তুমি তোমার হাবীবের শহরে আমার করব রচনা করো।'

এ হলো সেই মহান বীর সাহাবিগণের হৃদয়ের বাসনা, দিলের তামান্না। আত্মার স্বপ্ন-আকুতি। কত সুন্দর ও প্রিয় এই তামান্না, এই স্বপ্ন, এই আকুতি!

বীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদের শাহাদাতের তামান্না

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)। শাহাদাতের মূল্য ও মর্যাদা জানতে হলে ইতিহাসের মহান বীর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.) কে জিজ্ঞেস করুন। হযরত খালেদ শুয়ে আছেন। জীবনের অন্তিম প্রহর। চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বয়ে চলছে তাঁর। আশপাশের লোকেরা বড় পেরেশান হয়ে গেল। ভাবল, আপনি তো অমিততেজা এক বীর। কখনও তো কোনো কিছুতে ঘাবড়াতে দেখিনি আপনাকে। কত লড়াইয়ের প্রান্তর কেঁপে-কেঁপে উঠেছে আপনার তাওবারির তীব্র সঞ্চালনায়। কখনও পিছপা হননি আপনি শত্রুর মোকাবেলা থেকে। কী ক্ষীপ্রতা ছিল, কী উত্তেজনা ছিল আপনার জিহাদি সেই উদ্দমে। আজ কেন এভাবে শেষ বেলায় এসে কাঁদছেন খালিদ? আমরা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

শুনে খালিদের রোদন বেড়ে গেল। চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল। উঠে বসে গেলেন খালেদ। বলতে লাগলেন, আমার দিলে একটি তামান্না ছিল। হৃদয়ে একটি স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন, সেই তামান্না পূর্ণ করার জন্যে সারাটা জীবন কাটিয়েছি ধুলায় ধূসরিত লড়াইয়ের প্রান্তরে। সারাটা জীবন কাটিয়েছি আমি দুশমনের চোখে চোখ রেখে। সারাটা জীবন কাটিয়েছি দুশমনের সাথে পাঞ্জা লড়ে। আমি প্রত্যাশী ছিলাম শাহাদাতের। প্রত্যাশী ছিলাম লড়াইয়ের ময়দানে, যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাতের। যেখানেই তুমুল লড়াই বেঁধে যেত, আমি সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতাম। এমন দিনও অতীত হয়েছে যে, আমার হাতে কয়েকটা তাওবারি ভেঙে গিয়েছিল।

অথচ লড়াইয়ের ময়দানে আমার শাহাদাত নসিব হয়নি! আজ আমি এখানে এই বিছানায় পড়ে আছি! দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি! আমি আমার রব্বে কারীমের নিকট পৌঁছে যাচ্ছি। অথচ শাহাদাত আমার নসিবে জুটল না! সেকথা ভেবেই আমার চোখে পানি চলে এসেছে।

লোকেরা বলল, আল্লাহ আপনাকে নিশ্চয় শাহাদাতের সেই প্রত্যাশিত মর্যাদা প্রদান করবেন। কারণ, আপনার হৃদয়ে জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। কোনো কাফের আপনাকে শহীদ করার মতো স্পর্ধা দেখাতে পারেনি এজন্যে যে, আল্লাহর মাহবুব আপনার জন্যে দু'আ করেছেন এবং আপনাকে

'সাইফুল্লাহ' নামে ভূষিত করেছেন। তো আপনাকেই যদি কোনো কাফের শহীদ করে দেয়, তাহলে তো আল্লাহর তাওবারিকেই ভেঙে দিল। তাই দুনিয়ায় কোনো মানুষের হাতে আপনার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হয়নি। আর আপনার হৃদয় যেহেতু শাহাদাতের অস্থির স্বপ্নে বিক্ষত হয়ে গেছে, তাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ আপনাকে শহীদি দরজা দান করবেন। আল্লাহ আপনাকে শহীদের কাতারে দাঁড় করাবেন; বরং রব্বে কারীম তো আপনাকে জান্নাতের সরদার বানাবেন। তো হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযি.)-এর হৃদয় শাহাদাতের জন্য এমন ব্যাকুল ছিল, অস্থির ছিল।

শিশুদের শাহাদাতের তামান্না

মদীনার শিশুরা, মদীনার কিশোররা অনুপ্রাণিত ছিল শাহাদাতের তামান্নায়। পরস্পরে কথা বলত জিহাদ নিয়ে, শাহাদাত নিয়ে। তারা বলত, অমুকের বাবা শহীদ হয়েছেন আর অমুকের বাবার মৃত্যু হয়েছে ঘরের বিছানায় শুয়ে। যে-শিশুটির বাবা শহীদ হয়েছেন জিহাদের ময়দানে, সে নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করত, গর্বিত বোধ করত। আর যার বাবা ঘরের বিছানায় মারা গেছেন, সে নিজেকে লজ্জিত বোধ করত, নিজেকে হীন জ্ঞান করত। আল্লাহর নবীর সংস্পর্শ পেয়ে তাদের চিন্তা-চেতনায় এমন পরিবর্তন এসেছিল। শাহাদাতের তামান্না শিশুদের রক্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

শাহাদাতের তামান্নায় মুজাহিদের ঘোড়া

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী-সাথীরা আল্লাহর নামে নিজেদের জীবন কোরবান করে নিতেন। সে-বিষয়ে তো আমরা আলোচনা করলামই। আসুন সেখান থেকে একটু দূরে এসে মুজাহিদের ঘোড়া নিয়ে একটু আলোচনা করি। কোনো মুজাহিদ যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে কোনো ঘোড়া পালন করতেন, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করবেন বলে যদি কোনো ঘোড়াকে আদর-যত্নে লালনপালন করতেন, তাহলে এই ভাষা ও বাকশক্তিহীন জন্তুটা এই অবুঝ প্রাণীটাও জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের সুধা পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাহাদাতের স্বপ্নে সেও বিভোর হয়ে ওঠে। ওই ঘোড়া বুঝে নেয়, এই যে আমাকে খাওয়ানো হয়েছে, পান করানো হয়েছে, তা জিহাদ করার জন্যে, যুদ্ধ করার জন্যে।

এখন ওই ঘোড়ার মালিক তাকে রণসাজে সজ্জিত করে। নিজে যুদ্ধের পোশাক পরে হাতে তাওবারি তুলে নেয়। সেই ঘোড়ায় ছাওয়ার হয়ে নিজেও

দুশমনের সামনে দাঁড়ায় আর ঘোড়াকেও দুশমনের সামনে দাঁড় করায়। ঘোড়াও তার দুশমনকে ভালো করে চিনে নেয়। যদিও এটা একটা জন্তু। তার হয়তোবা সে রকম ভাববার ও বুঝবার ক্ষমতা নেই, তবু সে ভালো করেই জানে, এখনই কাজের সময়। এটিই আমার সার্থকতা। আমাকে লালনপালন ও খাওয়ানোর উদ্দেশ্য পূরণ করে দেখাতে হবে। আমার প্রতি মালিকের যে বিশ্বাস তা আজ কাজে প্রমাণ করে দেখাতে হবে।

তো অবোলা ও অবোধ এই ঘোড়াটা নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নিজের সামনেই সে ঝকঝকে তাওবারি দেখতে পায়। তীরের বৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে। মারণাস্ত্র ও সমরাস্ত্র সে চোখের সামনে প্রকম্পিত হতে, ঝনঝন করতে দেখে। সামান্য ভয় তবুও সে করে না। কারণ, তার খবর আছে, আজ আমার দায়িত্ব পালনের দিন। আজ আমার কর্ম প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ দিন।

মালিক তাকে সামান্য ইঙ্গিত করে বোঝায়, এখন তোমাকে ছুটতে হবে। তো সাথে-সাথে ঘোড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুশমনের কাতারে ঢুকে পড়ে। দুশমনের সারি ভেদ করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করে দশমন। তবুও অটল-অবিচল থাকে রণাঙ্গনের সাহসী ঘোড়া, দায়িত্বশীল আস্থাভাজন ঘোড়া।

শহীদের মর্যাদা

প্রিয় দীনি ভাইয়েরা! আপনাদের খেদমতে শহীদের কিছু ফজিলত বর্ণনা করব। আমার কোনো ঘমুন্ত যুবক, সিংহশাবক ভাই অলস নিদ্রা ছেড়ে জেগে উঠতে পারে। জিহাদি প্রেরণায় হয়তো সে উদ্দীপ্ত হবে। শাহাদাতের এই ঘুমন্ত চেতনা হয়তো জেগেও উঠতে পারে। কারও ভেতরের বীর সত্তা পরিবর্তন করে দিতে পারে এই সমাজের ধ্যানধারণা ও চিন্তাচেতনা। তাই বলছি শুনুন– কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের দরবারে শহীদগণ দণ্ডায়মান হবেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত শুহাদাকে আপন সান্নিধ্যে ডাকবেন, হে শহীদগণ! তোমরা আমার এই সিংহাসনের কাছাকাছি এসো।

বর্ণিত হাদীছ দ্বারা বোঝা যায়, শুহাদায়ে কেরাম আল্লাহর আসনের কাছাকাছি স্থানে উপবিষ্ট থাকবেন। এমনকি কোনো শহিদের পথে যদি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.)ও দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে শহীদের যে মর্যাদা তার খাতিরে হযরত ইবরাহীম (আ.)ও রাস্তা ছেড়ে সেই শহীদকে চলার পথ উন্মুক্ত করে দেবেন। আর সোজা চলে যাবেন দীনের পথের বীর

শহীদ। চলে যাবেন আল্লাহর একেবারে কাছিকাছি। একেবারে সন্নিকটে। একবারে তখতের কাছে।

শহীদের আকাঙ্ক্ষা

জান্নাতিরা যখন জান্নাতে চলে যাবে, তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে, এই জান্নাতেও যার কোনোরূপ চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে? সেখানেও শহীদ বলে উঠবেন, হে আমার পরোয়ারদেগার! আমার অন্তর চায়, আপনি আমাকে আবার দুনিয়ায় পাঠান, আমি দুনিয়ায় গিয়ে আপনার পথে শহীদ হই। আবার আমাকে দুনিয়াতে পাঠান এবং আমি আবার আপনার পথে শহীদ হই। এভাবে দুনিয়ায় আমাকে পাঠাতেই থাকবেন আর আমি শহীদ হতেই থাকব। কারণ, শাহাদাতের যে-স্বাদ আমি পেয়েছি, তো আপনার এই ফুল-ফলশোভিত জান্নাতে পাচ্ছি না।

শাহাদাত একটি সৌভাগ্য। শাহাদাতের তাওফীক সে-ই প্রাপ্ত হতে পারে, যে উন্মুক্ত হৃদয়ে সত্য অন্বেষণের নেশায় আল্লাহর দরবারে শহীদি মৃত্যু প্রার্থনা করে। কবির ভাষায়–

طلب صادق نہ ہو تو پھر کیا شکوہ ساقی

'তুমি সত্যভাবে চাওনি, তুমি সঠিকভাবে কামনা করনি। এখন তুমি কী অভিযোগ তুলবে? বলো তুমি কি অনুযোগ তুলবে?'

শহীদের ঘোড়ার মর্যাদা

শহীদকে আল্লাহ কী মরতবা দান করেছেন? যদি মুজাহিদ ঘোড়া পালন করে, তাহলে ঘোড়ার মল-মূত্র পর্যন্ত নেকির পাল্লায় ওজন করা হবে। হাদীছের মর্ম তো এইও যে, শহীদের দেহ থেকে রক্তের যে-ফোঁটা ঝরে পড়ে, সেই রক্ত পড়ার আগেই আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

শহীদের মর্যাদা

প্রিয় দীনি বন্ধুগণ! খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, পূর্ণ সতর্কভাবে শ্রবণ করুন, অন্তরের কান দ্বারা শ্রবণ করুন। দেখুন, যদি কোনো আল্লাহর অলি মৃত্যুবরণ করেন, কোনো আবদাল-কুতুব বা কোনো সাহাবি এমনকি নবীও যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন, তাহলে মৃত্যুর পর তাকে গোসল দেওয়া হয়, তাকে কাফন পরানো হয়। আল্লাহ যেন বলে দিলেন, যত বড়

বুযুর্গই হোক আমার সামনে আসতে হলে গোসল করে, আতর মেখে কাফন পরে আসতে হবে।

আর শহীদের ব্যাপারটি কেমন? আল্লাহ বলে দিয়েছেন, আমার শহীদ বান্দা আমার পথে রক্ত ঝরিয়ে খুনের নহরে গোসল করে নিয়েছে। সুতরাং তাকে আর গোসল দিতে হবে না। তার কাপড় ও পোশাক বদলে দিতে হবে না। আমি চাই, কেয়ামতের দিন আমার পথে জীবন কোরবানকারী এই বীর বান্দা তার রক্তমাখা শরীর নিয়ে উঠুক, তার রক্তমাখা পোশাক নিয়ে উঠুক। কেয়ামতের দিন এই রক্তাক্ত শহীদ বান্দা তার খুনভেজা দেহ নিয়ে উঠে আসবে। সে আমাকে দেখে মিটিমিটি হাসতে থাকবে।

দেখুন বন্ধুগণ, শহীদের ব্যাপারটিকে অন্যদের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার যত বড় অলি-বুযুর্গই মৃত্যুবরণ করুন, তাকে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের পদ্ধতিতে গোসল করাতে হয়, কাফন পরাতে হয়। আর আল্লাহর প্রিয়তম শহীদ বান্দাকে আল্লাহ তাঁর রক্তমাখা শরীরে ও পোশাকেই দেখতে চান। প্রিয়তমের সাথে আচরণটাও তো প্রেমময় হয়ে থাকে। এই শহীদ আল্লাহর ভালোবাসায় নিজের জীবনের নজরানা পেশ করেছেন, সেই রব্বে কারীম এতটাই মূল্য দানকারী যে, সমগ্র মুসলিম জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আমার পথে শহীদ বান্দাকে আমার কাছে সে যে হালতে শহীদ হয়েছে, সে হালতেই পাঠিয়ে দাও।

শহীদ বান্দা জীবন্ত থাকে

যখন কোনো মানুষের মৃত্যু হয়, চাই তিনি যত বড় আল্লাহর অলি-বুযুর্গই হোন না কেন তিনি আর জীবিত হন না। মানুষ তাকে জীবন্ত বলে জ্ঞান করে না; বরং বলে, অমুক বুযুর্গ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু শহীদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত খোদ বলে দিয়েছেন–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

'যারা আল্লাহর পথে উৎসর্গিত হয়েছে, তোমরা তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবত। অথচ তোমরা বুঝতে পার না।'[২]

কুরআনে বরং মৃত বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। যে নিজের জান আমার রাস্তায় দান করে দিল, সে মৃত্যুবরণ করেনি; বরং একটি নবজীবন লাভ করেছে।

---

২. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৪

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

'যে কেউ আপন ঘর থেকে হিজরতের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশে বের হয়। তারপর সেখানেই তার মৃত্যু হয়, তাহলে তার বিনিময় আল্লাহর যিম্মাদারিতে।'[১]

শহীদের রূহ বের হওয়ার দৃশ্য

ইমাম কুরতুবি (রহ.) তার লিখিত সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে একটি আশ্চর্য কথা লিখেছেন–

দুনিয়ায় যখনই কারও মৃত্যুর সময় হয়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাকে বলে দেন, যাও অমুকের রূহ কবজ করে নিয়ে এসো। এমনকি লোকটি যদি অলি হয়, মুত্তাকী হয়, পরহেযগারও হয়, সকলের রূহ নেয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। এমনকি আম্বিয়া কেরামের রূহ নিতেও মালাকুল মাওতকে পাঠানো হয়, ফেরেশতা আম্বিয়া কেরামের খেদমতে হাজির হয়ে বলবে, যে হে নবী! রব্বে কারীম আপনাকে স্মরণ করেছেন। তো যখন শহীদের মৃত্যুর সময় হয়, তখন রব্বে কারীম মালাকুল মওতকে বলেন, আমার এই বান্দা তো আমারই তরে তার জীবন কোরবান করে দিচ্ছে। মালাকুল মওত তুমি পেছনে সরো। আমার বান্দার রূহ আমি নিজেই কবজ করে নেব। ফলে শহীদের রূহ আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নিজেই গ্রহণ করে নেন।

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

'আল্লাহর তরে বিলীন হওয়ার এই যে মহান উপত্যকা, এই উপত্যকায় অন্তরীণ হওয়ার রহস্য একেবারেই গোপন।

যে মরতে জানে না, সে বাঁচতেও জানে না।'

শাহাদাতের দু'আ

আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শাহাদাত নসিব করুন। আমাদের ভাই-বন্ধুগণ কাশ্মির ইত্যাদি দেশে দীনকে বুলন্দ করার

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১০০

জন্যে জান কোরবান করছেন, শহীদ হচ্ছেন, আপনি তাদের মর্যাদা ও মরতবা বুলন্দ করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরও এমন সুযোগ দান করে দিন। আমরাও যেন ইসলামের জন্য আমাদের জীবন কোরবান করতে পারি। হে মুসলিম জাতি! আমাদের তামান্না, আমাদের আরজু, আমাদের স্বপ্ন ও চাহিদা বদলে যাক। আমরা ফের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

تیرے دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری

میرے دعا ہے کہ تیری ارزو بدل جائے

'তোমার দু'আ হলো, তোমার স্বপ্ন ও ইচ্ছেগুলো পূরণ হোক।

আর আমার দু'আ হলো, তোমার আগ্রহ, তোমার আকাঙ্ক্ষা এবং তোমার ইচ্ছে ও স্বপ্নগুলো বদলে যাক।'

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাওবার উপকরণ

'প্রকৃত সাফল্য ও কামিয়াবি এমন হয় যে, তারপর আর ব্যর্থতা ও দুঃখ আসে না। এমন আনন্দ ও সুখ, যারপর আর দুঃখ নেই, বেদনা নেই। আল্লাহর এমন নৈকট্যশীল হওয়া, যার পর আল্লাহ থেকে দূরত্ব তৈরি হবে না। এই সাফল্য, এই কামিয়াবি বান্দা অর্জন করতে পারে তাওবার মাধ্যমে। আমাদের উচিত, আমরা প্রত্যহ দিন-রাত তাওবা করব। সম্ভবত অনেকের মাথায় এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আরে ভাই! আমরা কেন তাওবা করব? আমরা ইচ্ছে করে গুনাহ করছি নাকি? ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বহু গুনাহ আমাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে চলছে। শয়তান আমাদের সামনে সে সব গুনাহকে এমন হালকা করে পেশ করে যে, আমরা গুনাহটাকে অনুভবও করতে পারি না। উপলব্ধিও করতে পারি না।'

তাওবার উপকরণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اخر يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

তাওবা কাকে বলে?

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকেই ভালো ও খারাপে মিশ্রিত করে তৈরি করেছেন। জন্মগতভাবেই একটি মানুষের মাঝে ভালো গুণাবলিও রাখা হয়েছে আবার খারাপ গুণাবলিও রাখা হয়েছে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨

'...আর জীবনের কসম এবং ওই সত্তার কসম, যিনি তাকে দুরস্ত করেছেন। তারপর তাকে তার নেক ও বদের কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন।'[১]

কিন্তু ভালো মানুষ তো সে-ই হয় যে, ভালো কাজকেই প্রাধান্য দিতে পারবে। নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি, যে খারাপকে প্রাধান্য দিয়ে চলে।

আপাদমস্তক খারাপ সে তো শয়তান। আর ভালো ও খারাপ মিলে যে, সে হচ্ছে মানুষ। গাফলতের কারণে মানুষ থেকে মাঝে-মাঝে ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পায়, গুনাহ সংঘটিত হয়। ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, তাতে গুনাহকে মুছে ফেলার পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতিকেই 'তাওবা' বলা হয়।

---

৩. সূরা শামস, আয়াত : ৭-৮

আল্লাহর মহান শান

তাওবা এমন একটি আমল, যার মাধ্যমে মানুষের কৃত গোনাহকে মাফ করে দেওয়া হয়। বরং–

فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

'আল্লাহ তাদের গুনাহগুলো নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।'[১]

যদি মানুষ খালেস দিলে সত্যভাবে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে, আল্লাহ তার গুনাহগুলোকে নেকি দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। লোমনাশক ক্রিম যেমন মালিশ করার সাথে-সাথেই লোম নাশ করে দেয়, তেমনি তাওবার ফলেও মানুষের গুনাহগুলো ঝরে যায়, পরিষ্কার হয়ে যায়। গুনাহগুলোকে একেবারে মিটিয়ে দেয় তাওবা।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَذَنْبَ لَهُ

'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি গুনাহহীন ব্যক্তির মতো।'

উভয় জাহানের সাফল্য কী?

এই তাওবা করার দ্বারা সাফল্য ও কামিয়াবি আসবে বলে কুরআনুল কারীমে ওয়াদা করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই তাওবা করো যেন তোমরা সফলতা পেতে পার।'[২]

প্রকৃত সাফল্য ও কামিয়াবি এমন হয় যে, তারপর আর ব্যর্থতা ও দুঃখ আসে না। এমন আনন্দ ও সুখ, যারপর আর দুঃখ নেই, বেদনা নেই। আল্লাহর এমন নৈকট্যশীল হওয়া, যার পর আল্লাহ থেকে দূরত্ব তৈরি হবে না। এই সাফল্য, এই কামিয়াবি বান্দা অর্জন করতে পারে তাওবার মাধ্যমে। আমাদের উচিত, আমরা প্রত্যহ দিন-রাত তাওবা করব। সম্ভবত অনেকের মাথায় এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আরে ভাই! আমরা কেন তাওবা করব?

---

৪. সূরা ফোরকান, আয়াত : ৭০
২. সূরা নূর : আয়াত ৩১

আমরা ইচ্ছে করে গুনাহ করছি নাকি? ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বহু গুনাহ আমাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে চলছে। শয়তান আমাদের সামনে সে সব গুনাহকে এমন হালকা করে পেশ করে যে, আমরা গুনাহটাকে অনুভবও করতে পারি না। উপলব্ধিও করতে পারি না।

আমাদের সামনে আজ গীবতের ভয়াবহতার কথা নেই। আমাদের সামনে পরনিন্দার খারাপি নেই। আমরা গীবত করছি আর শয়তান তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে। শয়তান গুনাহগুলোকে বড় সুন্দর ও শোভিত করে উপস্থাপন করে।

তাওবার দশ উপকরণ

তাওবা কাকে বলে? এরই উত্তরে বর্ণিত হয়েছে–

تَنْزِيْهُ الْقَلْبِ مِنَ الذَّنْبِ

'আত্মাকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া।'

এরই নাম তাওবা। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) 'আল-ঈমানুল আওসাত' নামক কিতাবে দশটি উপাদান ও উপকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ের দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বিষয়গুলো বড়ই গুরুত্ববহ। আপনারা অন্তরের কান দিয়ে কথাগুলো শ্রবণ করুন। বিষয়গুলো মনে রাখবেন। সেগুলোর মাধ্যমে আপন গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নেওয়া উচিত। গুনাহকে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেই দশটি বিষয় এই–

প্রথম বিষয় তাওবা : তাওবার শাব্দিক অর্থ অন্তরকে গুনাহের ইচ্ছা থেকে খালি করা। জবানে তাওবার শব্দ আর হৃদয়ে গুনাহের ইচ্ছে এর নাম কোনোভাবেই তাওবা নয়। হৃদয়ে গুনাহের স্বাদ বিদ্যমান থাকার সাথে তাওবা হতে পারে না। বিষয়টি কবি এভাবেই বলেছেন–

توبہ بر لب و درد دل گاوں خر

'মুখে তাওবা আর হৃদয়ে গরু-গাধার ভাবনা।'

হাতে তসবিহ আর হৃদয়ে গুনাহের ইচ্ছা। গুনাহের স্বাদ, গুনাহের আকর্ষণ। এমন তাওবার কোনো মূল্য নেই। বরং এমন তাওবাকারীকে দেখে পাপেরাও খিলখিলিয়ে হাসে।

প্রকৃত তাওবা হচ্ছে–

تَنْزِيْهُ الْقَلْبِ مِنَ الذَّنْبِ

'দিলকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে নেওয়া।'

কথাটার অর্থ কী? এর উদ্দেশ্য কী? যে সময়টায় বান্দা তাওবা করে নিচ্ছে, তখন তার দিলের এই অবস্থা হবে যে, আজকের পর আর আমি তোমার কোনো হুকুম অমান্য করব না। তোমার কোনো হুকুমের নাফরমানি করব না। যদি তাওবার সময় এমন অবস্থা বিরাজমান থাকে, তাহলেই বুঝবে, আপনার তাওবা কবুল হয়েছে।

অবশ্য যদি পরে আবার কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে আবারও তাওবা করে নেবে। গুনাহের দৃষ্টান্ত এমন যে, কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। তাওবা হচ্ছে, ময়লা কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা। যখনই কাপড় ময়লা হয়ে যায়, আপনারা সেই কাপড় সাথে-সাথেই ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলেন। কখনও কোনো মানুষ কি চিন্তা করেছে, আমি কাপড় ধোব না। কারণ, কাপড় ধুলে আবারও তো তা অপরিষ্কার হয়ে যাবে। বরং প্রত্যেকেই বলবে, এখন জামাটা পরিষ্কার করে নাও। তারপর যদি ময়লা হয়ে যায়, তাহলে আবার পরিষ্কার করে নেয়। এভাবে পরিষ্কার করতেই থাকে। যতবার অপরিষ্কার হয়, ততবারই পরিষ্কার করে।

তো তাওবা বলা হয়, গুনাহের ইচ্ছাকে অন্তর থেকে দূর করে দেওয়া। অন্তরকে গুনাহের সংকল্প থেকে খালি করা। যখনই বান্দা তাওবা করবে, তখন পাক্কা নিয়তে তাওবা করবে, পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তাওবা করবে যে, আজকের পর আর গুনাহ করব না। একেই বলা হয় তাওবা।

অনেকে চিন্তা করে, গুনাহ থেকে বাঁচা তো বড় কঠিন বিষয়। আজকের যুগে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। না ভাই! বিষয়টি এমন নয়। নেক রূহ আজও বিদ্যমান আছে, যারা তাকওয়া ও পবিত্রতার জীবন যাপন করে।

মানুষ গুনাহ থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করে? হ্যাঁ; এর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। যদি একজন মানুষের কাছে একটি প্লেটে কিছু মিষ্টি জিনিস রাখা হয়, তারপর লোকটিকে বলা হয়, এই প্লেটটিতে কিছু মিষ্টান্ন জিনিস আছে। কিন্তু তার মধ্যে সামান্য একটু বিষ আছে আর পুরোটাই বিশুদ্ধ খাবার। বলুন, একথা শোনার পর লোকটি জিনিসটা খাবে, নাকি রেখে দেবে বা ফেলে দেবে? লোকটি ওই খাবারে হাতই দেবে না। অথচ সে জানে, শুধু এক পাশে

সামান্য একটু বিষ আছে। বাকি খাবারগুলো একেবারেই বিশুদ্ধ। কিন্তু এই আশঙ্কা কাজ করে যে, যদি আমি তা খাই, তাহলে হতে পারে, আমি মৃত্যুবরণ করব। বিষ হয়তো আমার পেটে চলে যাবে।

তো দেখুন, এই মিষ্টান্নের মাঝে স্বাদও আছে। অন্তরও চায় তা খেতে। কিন্তু বিষের ভয় তাকে তার কাছেও যেতে দিচ্ছে না। তো যেমনিভাবে শারীরিক মৃত্যুর ভয়ে মানুষ ওই মিষ্টান্নের কাছেও যায় না, তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাগণ রূহানি মৃত্যুর ভয়ে গুনাহের কাছেও যান না। তাঁরা ভয় করেন, সামান্য গুনাহের ফলে আমার সারাটা জীবন বরবাদ হয়ে যেতে পারে। আর কোনো মানুষ তার মেহনতকে বিনষ্ট হতে দেয় না।

মোটকথা, তাওবা গোনাহের ইচ্ছাকে দিল থেকে খালি করার নাম। অর্থাৎ– গুনাহের ইচ্ছাকে মন থেকে খতম করে দেওয়ার নামই তাওবা। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্রত্যেক বান্দার জন্য তাওবা জরুরি। চাই সে নেককার হোক অথবা বদকার। তাওবা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি। যদি কোনো ব্যক্তি কাফের হয়, তাহলে সে তার কুফরি থেকে তাওবা করা জরুরি। আর যদি কোনো ব্যক্তি মুমিন হয়, তাহলে তার জন্য কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা করা জরুরি। যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যায়, তাহলে গাফলতে কেটে যাওয়া সময়গুলোর জন্য তাওবা করা জরুরি। যে-সময়টা যিকিরে কেটেছে, তাতেও শয়তান কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল। নফস ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল। তাহলে তো এর থেকেও তাওবা করা জরুরি এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা ওয়াসওয়াসা থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, সে তার এখলাছে দুর্বলতা থেকে তাওবা করবে। মিনতির সাথে বলবে, হে আল্লাহ! যেমন এখলাছের সাথে আমার ইবাদত করা উচিত ছিল, তেমন করে আমি ইবাদত করতে পারিনি। আমাকে মাফ করে দিন।

বোঝা গেল, প্রত্যেক বান্দা-ই আল্লাহর কাছে তাওবা করা জরুরি। কারণ, তাওবার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়।

দ্বিতীয় উপাদান এস্‌তেগফার : এস্‌তেগফারের মর্ম হলো, অতীতের গুনাহের ব্যাপারে লজ্জিত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া, আফসোস করা এবং আত্মিক অবস্থা এমন হওয়া যে, আমার এমনটা করা উচিত হয়নি। আমার এমন না করা উচিত ছিল। আমি ভুল করেছি। এদিক থেকে তাওবা ও এস্‌তেগফার কাছাকাছি অর্থের শব্দ হলেও উভয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এস্‌তেগফার হচ্ছে অতীতের গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

আর তাওবা হচ্ছে আগামীতে কোনো গুনাহ্ করবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করা। তাই আমাদের উচিত সর্বদা এস্তেগফারও করতে থাকা এবং তাওবাও করতে থাকা আর বলতে থাকব, হে আমার মাওলা! আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত।

এস্তেগফারের ব্যাপারে কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

'তোমরা আপন রব্বে কারীমের কাছে ক্ষমা চাও।'[১].

এই এস্তেগফারের বিনিময়ে মানুষ অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন যেব্যক্তির আমলনামায় এস্তেগফার বেশি পাওয়া যাবে, সে মুবারকবাদ প্রাপ্ত হবে, সে সৌভাগ্যবান হবে, সে কেয়ামতের দিন বড়ই আনন্দিত হবে। তাই আমাদের উচিত বেশি-বেশি এস্তেগফার করা। সকালে একশতবার এবং সন্ধ্যায় একশতবার এস্তেগফার করবে। আরও বেশি করতে পারলেও করবে। আমরা এস্তেগফার যত সুন্দর ও উত্তম পদ্ধতিতে আদায় করতে পারব, আল্লাহও আমাদের যাবতীয় সমস্যাবলি সহজে সমাধান করে দেবেন। কারও থেকে কোনো তাবিজ-কবচ তখন নিতে হবে না।

একবারের ঘটনা। হযরত হাসান বছরি (রহ.) বসে আছেন। একব্যক্তি এসে বলল, আমি বড় গুনাহগার; আমাকে কোনো আমল বলে দিন, যার মাধ্যমে আমি ক্ষমা পেতে পারি। তারপর এক বান্দা এল। বলল, হযরত! অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না। কোনো আমল বলে দিন। তো হাসান বছরি (রহ.) উভয়কেই বলে দিলেন, এস্তেগফার করো। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আবার এক লোক এল। বলল, হযরত! আমি বড় অসহায় ও দরিদ্র। আমি ঋণগ্রস্ত। কোনো আমল বলে দিন, যেন আমি মুক্তি পেতে পারি। হযরত বললেন, এস্তেগফার করো।

আরেক ব্যক্তি এল। বলল, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন; যেন আমার একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হযরত হাসান বছরি (রহ.) বললেন, এস্তেগফার করো। তারপর আরেক ব্যক্তি এল, বলল, হযরত! আমার একটা বাগান আছে। দু'আ করবেন যেন বাগানে ভালো ফলন হয়। উদাহরণস্বরূপ আজকের যুগে আমার বিজনেসটা যেন ভালো চলে। হযরত

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ১০

বললেন, এস্‌তেগফার করো। আরেক ব্যক্তি এল। বলল, হযরত! দু'আ করুন যেন আমার ঘরে মিষ্টি পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়। হযরত বললেন, এস্‌তেগফার করো।

একব্যক্তি ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করছিল এবং এসব কথাবার্তা শুনছিল। লোকটি বলল, হযরত! আপনার হাতে বড়ই আশ্চর্য জিনিস এসে গেছে। যে-ই আসছে, তাকেই আপনি এস্‌তেগফারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত বললেন, দেখো, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝

'তোমরা আল্লাহর নিকট এস্‌তেগফার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী।'[১]

يُّرْسِلِ السَّمَاۗءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝

'আল্লাহ তোমাদের বৃষ্টি দান করবেন।'[২]

وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ

'আল্লাহ তোমাদের মালসম্পদ বাড়িয়ে দেবেন।'[৩]

এস্‌তেগফারের কারণে আল্লাহ বান্দাকে সম্পদ দ্বারা মদদ করেন।

وَبَنِيْنَ

'এবং সন্তানসন্ততি দ্বারা মদদ করেন।'[৪]

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ

'এবং তাদের জন্য বানান জান্নাত।'[৫]

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا

'এস্‌তেগফারের কারণে পান করার জন্য দান করবেন মিষ্টি পানীয়।'[৬]

তো একটিমাত্র এস্‌তেগফারের কারণে এত সব নেয়ামত আপনি লাভ করবেন। আপনি যদি চিন্তা করেন, দেখবেন, আমাদের যতসব সমস্যা আছে

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ১০
২. সূরা নূহ : আয়াত ১১
৩. সূরা নূহ : আয়াত ১২
৪. সূরা নূহ : আয়াত ১২
৫. সূরা নূহ : আয়াত ১২
৬. সূরা নূহ : আয়াত ১২

সবগুলো সমস্যা-ই উল্লিখিত কোনো একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বোঝা গেল, আমাদের জন্য একটিই পথ আছে। তাহলো, আমরা এস্‌তেগফার করতে থাকব। তার ফলে আল্লাহ আখেরাতে আমাদের উচ্চ মর্যাদাও দান করবেন আর দুনিয়ার পেরেশানি থেকেও নিরাপদ রাখবেন। তাই আমাদের জন্য সর্বদা এস্‌তেগফার করতে থাকা একান্ত অপরিহার্য।

উদাহরণস্বরূপ এভাবে বলতে থাকবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! হে রব! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আমার সকল গুনাহ থেকে। আর তোমার কাছে আমি তাওবা করছি।'

এতটুকু পড়ার চেষ্টা করবে। আর যদি এতটুকুও বলতে না পারেন, তাহলে অন্তত সারা দিন اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ এই অংশটুকুই পড়তে থাকবে। এই ছোট শব্দ দ্বারাও এস্‌তেগফার হবে। তবে এই আস্‌তাগফিরুল্লাহ পড়ার সময় মনে-মনে খুব লজ্জিত বোধ করবে। লজ্জা-লজ্জা ভাব অন্তরে স্থাপন করবে। গুনাহের ওপর লজ্জিত হয়ে এস্‌তেগফার করবে।

এক নওজোয়ান হযরত রাবেয়া বছরি (রহ.)-এর সামনে এস্‌তেগফার পড়ছিল। তবে তার দিল এস্‌তেগফারের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ ছিল না। শুনে রাবেয়া বছরি বললেন, তুমি এমন এস্‌তেগফার করছ, যার ওপর আবার তোমার এস্‌তেগফার করা অবশ্যক। যদি আত্মাকে নিবিষ্ট রেখে তারপর এস্‌তেগফারের আমল করতে পারি, তাহলেই তার দ্বারা আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত আমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

তাই প্রত্যেক বান্দারই এস্‌তেগফার করা আবশ্যক। বিশেষভাবে নেক কাজ সম্পাদনকারীরা বেশি-বেশি এস্‌তেগফার করতে হবে। কারণ কী? সে গুনাহ তো করল না; করল তো নেক কাজ। কিন্তু রহস্যটা এই যে, আমরা যে ইবাদত করি, তা কিন্তু আল্লাহর শান মোতাবেক সম্পাদন করতে পারছি না।

আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব এত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

'হে আল্লাহ! আপনার ইবাদত যেভাবে করা দরকার আমরা সেভাবে করতে পারিনি।

আমাদের নবীজিই যদি এমন বলেন, তাহলে আমরা আর কোন বাহাদুর! আমাদের তো কোনো ভ্যালু-ই নেই। প্রশ্ন হতে পারে, আমাদের ইবাদাত যদি আল্লাহর শান মোতাবেক না-ই হয়, তাহলে আর আমরা এই ইবাদতের বিনিময় পাব কী করে? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের বিনিময় দানের দৃষ্টান্ত এমন যে, মনে করুন, আপনার ছোট বাচ্চাটি প্রথম দিন মাদ্‌রাসা বা স্কুলে গেল। প্রথম দিন এসেই সে আপনাকে তার খাতা দেখাল। বলল, আব্বু! আমি এই-এই লিখেছি। হিজিবিজি লেখা। কিছুই বোঝা যায় না। পড়াও যায় না। তবুও আপনি আপনার এই সন্তানের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। তার জন্য নানা রকম জিনিস কিনে আনবেন বাজার থেকে। তাকে কোলে তুলে আদর করবেন, চুমু দেবেন। কেন? তার উত্তর আপনি নিজেই বের করুন।

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তেমনিভাবে আমাদের হিজিবিজি ইবাদত, আমাদের মূল্যহীন ইবাদত, আমাদের অযোগ্য ইবাদত দেখেও আমাদের রব্বে কারীম খুশি হয়ে যাবেন। আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। আমাদেরকে বিনিময় দেবেন। তিনি তো আমাদের রব, আমাদের মালিক, আমাদের খালেক। আল্লাহর সাথে বান্দার যে-মহব্বত, তার কারণেই আল্লাহ আমাদের বিনিময় প্রদান করবেন। তাই তো ইসলামে ইবাদাতের পরপরই আবার এস্‌তেগফারের কথা বলা হয়েছে।

তো যে-বান্দা উজু করল, সেই উজু দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, চোখ-মুখ ধৌত করার দ্বারা চোখের গুনাহ দূর হয়ে যায়। কুলি করার দ্বারা জবানের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। হাত ধৌত করার দ্বারা হাতের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তো উজু এমন ইবাদাত, যার দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়, গুনাহ ধৌত হয়ে যায়। কিন্তু এই ইবাদাতের পরও কিন্তু এস্‌তেগফার করতে হয়। তাই তো উজুর দু'আ শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। উজুর পরে যে দু'আটি পড়তে হয়, তার শেষাংশ এই–

اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি মাফ চাচ্ছি এবং তাওবা করছি।'

অর্থাৎ– উজুর পরও এস্‌তেগফার। তার থেকে আরও উঁচু মর্যাদার ইবাদত হচ্ছে নামায। আবার এই নামাযের পরও এস্‌তেগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, নামাযের সালাম ফেরানোর পর নবীজি اللهُ اكبر তিনবার পাঠ করলেন। তারপর তিনবার বললেন–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ اَسْتَغْفِرُ اللهَ

তো নবীজি কেন নামাযের পরেই এস্‌তেগফার পাঠ করলেন? এই এস্‌তেগফার তো এজন্যই যে, হে আল্লাহ! যে-মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা দরকার ছিল, যেভাবে ইবাদত আদায় করার কথা ছিল, সেভাবে ইবাদাত আদায় করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। হে মাওলা! তুমি আমার এই ইবাদতটুকু কবুল করে নাও।

তো আমাদের আস্‌তাগফিরুল্লাহ, আস্‌তাগফিরুল্লাহ বলাটা প্লিজ-প্লিজ বলার মতো। কেমন যেন আমরা আল্লাহকে বলি, প্লিজ আল্লাহ! মেনে নিন। প্লিজ আল্লাহ! মেনে নিন। আমার এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করে নিন। দেখুন, নামাযসমূহের মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায একটি উঁচু ইবাদত। এই নামায পড়ার পরও কিন্তু এস্‌তেগফার পাঠের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অথচ তাহাজ্জুদ নামাযের সময়টা এমন যখন আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোয়ার থাকে। কুরআনে আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত ইরশাদ করেন–

كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

'তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমায় আর শেষ রাতে মাগফেরাত চায় এবং ক্ষমার জন্য দু'আ করে।'[১]

তারা সারাটা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দিত। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কাছে এস্‌তেগফার করত।

আমাদের আরেকটি বড় ইবাদত হচ্ছে হজ। হজ্জে মাররূরের বিনিময়ের কথা হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে যে,

لَيْسَ لَهُمْ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ

'তাদের জন্য জান্নাত ছাড়া আর কোনো বিনিময় নেই।'

যেব্যক্তির হজ্জে মাবরূর নসিব হয়ে গেল, সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে দেশে ফিরে এল, যেন আজই সে দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করেছে। জন্মের প্রথম দিনটায় মানুষ যেমন গুনাহমুক্ত থাকে, তেমনি এখনও সে গুনাহমুক্ত। তো বলুন হজের মতো এত বড় ইবাদাতের পরও এস্‌তেগফার করতে বলা হয়েছে।

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৭, ১৮

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

'ইসলাম গ্রহণ এমন আমল, যা পূর্ববর্তী সব গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'

দীনের জন্য হিজরত করা এমন ইবাদাত, যা পূর্ববর্তী সব গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। হজকারীর হজ যদি কুবল হয়, তাহলে তারও পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়। চিন্তা করে দেখুন হজ কত বড় আমল। তবুও হজকারীর ব্যাপারেও আল্লাহ বলেছেন, তোমরা এস্তেগফার করো। তাই তো কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'অতঃপর তোমরা প্রব্যাবর্তন করো সেখান থেকে, যেখান থেকে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে এস্তেগফার করো। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়ালু।'[১]

এখানে মাকামে ইবরাহীম ও মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা মিনায় এসেছ; এখন তোমরা এস্তেগফার করো। তো দেখা গেল, হজ করলেও এস্তেগফার করতে হয়। আরও দেখুন, নবীজির সারাটা জীবনই ছিল ইবাদাতপূর্ণ। তাঁর ইবাদাত সম্পর্কে বলা হয়েছে–

حَتّٰى يَتَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ

'এমনকি (নামায পড়তে পড়তে) তাঁর পাদুটো ফুলে যেত।'

আমাদের নবীজি সত্যের বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। বিদায় হজের সময় তিনি বলে দিয়েছেন, আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বলেছেন, আপনি আপনার আমানত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। উম্মাহকে সঠিক পথে তুলে দিয়েছেন। আপনি হক আদায় করেছেন। নবীজি আসমানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

দেখুন, এতটা পূর্ণাঙ্গ যে জীবন, যে জীবনে কোনো দাগ নেই, যে জীবনে নবীজি পূর্ণ হক ও দায়িত্ব আদায় করে গেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৯৯

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

'যখন আল্লাহর অবারিত সাহায্য এবং বিজয় আসবে এবং আপনি লোকদের দেখবেন, তারা দলে-দলে আল্লাহর দীনের আওতায় শামিল হচ্ছে। তখন আপনি আপনার রবের হাম্‌দ ও প্রশংসার সাথে এস্‌তেগফার করুন। তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি বড় তাওবা কবুলকারী।'[১]

বড়ই আশ্চর্যের কথা! এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নবীজির মর্যাদা বাড়ানো। পাশাপাশি একথাও বোঝা যায় যে, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই, যে বলতে পারবে আমার জন্য এস্‌তেগফারের প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, এস্‌তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা পাওয়া যায়।

যাহোক, দশটি উপকরণের প্রথমটি হলো তাওবা আর দ্বিতীয়টি এস্‌তেগফার।

তৃতীয় উপকরণ নেক আমল : তৃতীয় যে-উপাদানটির মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়, সেটি হচ্ছে

اَلْحَسَنَاتُ الْمَأْجِيَة

'গুনাহ মোচনকারী নেক আমল।'

আমরা যে নেক আমল করি, তার দ্বারা আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেন।

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'নিশ্চয় নেক আমল বদ আমলকে মিটিয়ে দেয়।'[২]

যে-বান্দা গুনাহ বেশি করে ফেলেছে, তার উচিত এত বেশি নেক আমল করা, যেন নেকি গুনাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ- যদি কোনো বান্দার গীবতের রোগ থাকে, গীবত করে-করে সে আল্লাহর বান্দাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, এখন যদি সে তাওবা করে নেয়, তো এখন তার উচিত, ওই জবানের দ্বারা দীনের কথা বেশি-বেশি বলা এবং বেশি-বেশি দীনের দাওয়াত দেওয়া। আল্লাহর বান্দাদের সত্য ও ন্যায়ের পথে এবং কল্যাণ ও কামিয়াবির পথে আহ্বান করা।

---

১. সূরা নাসর : আয়াত ১-৩
২. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

কোনো বান্দা মদ পান করত, নেশা করত। কিন্তু এখন তাওবা করে নিয়েছে। তো তার উচিত এখন বেশি-বেশি নেক আমল করা। বিশেষ করে আল্লাহর বান্দাদের পানি পান করানো। যে-প্রকারের গুনাহ সে করেছে, সেই প্রকারের নেক করে নেওয়া উচিত। এতে আল্লাহ দ্রুত ওই বান্দার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন।

জানা গেল, আমরা যদি নেক কাজ বেশি-বেশি করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেবেন এবং দ্রুত মাফ করে দেবেন। এক বান্দার রোগ ছিল কুদৃষ্টির। মনে করুন, সে সত্য তাওবা করে নিয়েছে। এখন তার উচিত হবে আল্লাহর কুরআন বেশি-বেশি তেলাওয়াত করা। যে-চোখ দিয়ে গুনাহের বিষয় দেখেছে, বেগানার দিকে দেখেছে, সেই চোখ দ্বারা আল্লাহর কালাম এখন বেশি-বেশি পাঠ করবে। এতে আল্লাহ তার কুদৃষ্টির গুনাহ দ্রুত মাফ করে দেবেন। তারপর ওই চোখ দ্বারা আল্লাহর ঘর বেশি-বেশি দেখবে। আল্লাহওয়ালাগণের চেহারা বেশি-বেশি দেখবে।

মোটকথা, গুনাহ থেকে ফিরে এসে এমন নেক আমল করা উচিত, যার দ্বারা উক্ত গুনাহের বদলা হয়ে যায়। এই তাওবার ওপর অটল থাকবে। গুনাহটা আর করবে না। অবিরত নেক কাজ করে যাবে। এতে বান্দা মাফ পেয়ে যাবে সহজে।

আমাদের এই দেহ, এই শরীর, এই চোখ সবই আল্লাহর। এসবের মালিক আমরা নই– আমাদের রব্বে কারীম। এ-জীবনের কয়েকটি দিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব আমাদের দান করেছেন। একটা ভাড়া গাড়ি চালাচ্ছি যেন আমরা। দেহ নামক এই খাঁচাটা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। এটি আল্লাহর। আমরা আমাদের কর্মের সুবিধার্থে একে ব্যবহার করছি। এই গাড়ি আমরা চালাব, আমাদের কাজ নেব। আবার সাথে-সাথে নেকিও কামাই করব। এই ভাড়া দেহ দিয়ে যা অর্জন করা যায়, অর্জন করে নেওয়া উচিত। যত বেশি নেকি অর্জন করা যায় অর্জন করে নেওয়া উচিত। এতে উপকার আমাদেরই হবে।

তাই তো আল্লাহওয়ালাগণ আরাম করেন না। তাঁরা আরাম করেন মৃত্যুর পর। তাঁদের জীবনে কোনো আরাম থাকে না। তাঁদের দিন-রাত নেক আর নেকে পূর্ণ থাকে। তাঁদের রাত ও দিন একই রকম। রাতেও যেমন নেক কাজ করেন, দিনেও তেমনই নেক কাজ করেন। তাঁদের ও আমাদের মাঝে ব্যবধানটা এই জায়গায়। আমাদের রাত দিনের পার্থক্য আছে আর তাঁদের

নেই। তাঁরা রাতেও ইবাদত করেন আবার দিনেও ইবাদত করেন। রাত আসে তো আমরা ঘুমিয়ে যাই। দিন আসে তো আমরা দুনিয়ার কর্মে মশগুল হয়ে যাই। আর বুযুর্গগণ রাত হলে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যান। দিনের বিশাল একটা সময়ও তাঁরা ইবাদতে কাটান। তাঁরা দুনিয়াবি কাজ করে ঠিক; কিন্তু জবানে যিকির জারি রাখেন। তাঁরা ভাবেন, আমি হাতের কাজ হাতে করলাম, কিন্তু মুখে তো যিকির করতে পারি। সাহাবায়ে কেরামও এমনই করতেন। তো আমরা আমাদের দেহ ও প্রাণকে দীনের কাজে যতটা নিবেদিত রাখতে পারব, আমাদের জন্য তা তত বেশি উপকারী হবে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নেককার মানুষ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলেন, যাও; আমার অমুক বান্দাকে বলে দাও, তুমি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এসেছ; এখন তুমি দুলার মতো ঘুমিয়ে থাকো। মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা মধুর মতো ঘুমাও বা অন্য কিছুর মতো ঘুমাও বলতে পারতেন। কিন্তু তা না বলে দুলার মতো ঘুমুতে বলেছেন। হাদীছ শরীফে দুলা শব্দ এসেছে। দুলার মতো ঘুমিয়ে যাও। এর কারণ, সাধারণ নিয়ম হলো, দুলাকে কোনো কাজে না রেখে মুক্ত রাখা হয়। তারপর রাতের শুরুতেই দুলা শয্যায় চলে যায়। আবার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করতে হলেও তাকে অন্য কেউ জাগায় না। তার প্রিয়তমা-ই তাকে জাগ্রত করে। দুলা চোখ খুললেই তার প্রিয়তমার চেহারায় তার দৃষ্টি পতিত হয়। তেমনি মুমিন বান্দা কবরে ঘুমুতে থাকবে। কেয়ামতের দিন তাকে সে জাগ্রত করবে, যে তার প্রিয়তম। মুমিন বান্দা কেয়ামতের দিন চোখ খুললেই তার সাথে আল্লাহর দিদার হবে। আল্লাহর দিদার তার নসিব হয়ে যাবে। তাই তো বলা হয়েছে, মুমিন বান্দা দুলার মতো ঘুমুবে। বোঝা গেল, নেক কাজ অধিক পরিমাণে করার দ্বারা মানুষের গুনাহ মাফ হয়।

চতুর্থ উপাদান দু'আ : গুনাহ মাফ হওয়ার চতুর্থ উপাদান হচ্ছে–

دُعَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِلْمُؤْمِنِ

'মুমিনের জন্য মুমিনের দু'আ।'

মুমিন বান্দা যখন কারও জন্য দু'আ করে, তখনও ওই মুমিন বান্দার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

মুসলিম শরীফে হাদীছ বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মুসলমান বান্দার মৃত্যু হয় এবং অন্তত ৪০ জন মুসলমান জমা হয়ে তার জানাযার নামায আদায় করে,

তাওহীদওয়ালা এই চল্লিশজন মুমিনের জানাযার উসিলায় আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন।

মুমিনদের দু'আর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এটি আল্লাহর অনেক বড় শান, অনেক বড় দান। তাই আমাদের উচিত, আমরা আমাদের ঘরওয়ালাদের জন্য, মুসলিম ভাইদের জন্য, বন্ধুদের জন্য, দেশবাসীর জন্য সর্বোপরি সকলের জন্য দু'আ করা। এটি আমাদের একটি কর্তব্যও বটে। জানা তো নেই, আমাদের এই দু'আ দ্বারা-ই আল্লাহ অনেক মানুষের গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন।

হাদীছে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বন্ধু যদি বন্ধুর অনুপস্থিতিতে কোনো দু'আ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করে নেন। মুসাফিরের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন একথা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের মাঝে কত মানুষই তো সফর করে। আমরা কি আমাদের সফরগুলোতে কেঁদে-কেঁদে দু'আ করি? আমরা কি আমাদের নিজের জন্য, নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য সফররত অবস্থায় দু'আ করি? আমাদের বোধ এখনও কেন উদয় হচ্ছে না? আমাদের অন্তরে এখনও আগুন লাগেনি। যখন লাগবে, তখন অনুভব করতে পারব এবং পথ ও পন্থা খুঁজতে থাকব। বান্দা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবে, কীভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে আমার গুনাহ মাফ করানো যায়।

মোটকথা, দু'আয় অলসতা না করা চাই। দু'আর ক্ষেত্রে অলসতা না করা চাই। সমগ্র উম্মতের জন্য দু'আ করা চাই। সবার জন্য দু'আ করা চাই। কুরআনুল কারীমে দু'আ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে–

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

'হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন এবং আমাদের যে-ভাইয়েরা ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাদেরও মাফ করে দিন।'[১]

আমাদের আগে যে-সকল ঈমানদার ভাইয়েরা চলে গেছে, কুরআনুল কারীম তাদের জন্য মাগফেরাত করতে শিখিয়েছে। তো বোঝা গেল, আল্লাহ এক মুমিনের দু'আর দ্বারা অন্য মুমিনকে মাফ করে দেন। এটি মাগফেরাতের চতুর্থ উপাদান।

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ১০

একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ওমর (রাযি.) ওমরার জন্য যাচ্ছেন। নবীজি তাঁকে বিদায় দিলেন এবং বললেন, তোমার দু'আয় আমাদের ভুলো না। নবীজি নিজেও উম্মতকে তা'লীম দিয়ে গেছেন। মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হযরত ওমরকে দু'আর জন্য বলতে পারেন, তাহলে আমাদেরও তো উচিত হবে- আমরা আমাদের ভাইদের কাছে দু'আ চাইব। নিজেরাও ভাইদের জন্য দু'আ করব।

দু'আর মাধ্যমে মুমিন বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আবার আল্লাহ দু'আ করার পদ্ধতিও বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের কাজ হলো বেশি-বেশি দু'আ করতে থাকা।

পঞ্চম উপাদান সদকা করা : গুনাহ মাফ হওয়ার পঞ্চম উপাদান হচ্ছে দান করা। সদকায়ে জারিয়া করা। মাইয়েতের পক্ষ থেকে দান করা । সেই নেক কাজটির উসিলায় আল্লাহ ওই বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন। যেমনিভাবে দু'আর দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, নেক কাজ দ্বারা গুনাহ মাফ হয়, তেমনিভাবে দান ও সদকার দ্বারাও গুনাহ মাফ হয়।

মনে করুন, কারও মাতাপিতার ইন্তেকাল হলো। তাদের পক্ষ থেকে সে একটি মসজিদ বানিয়ে দিল, একটি মাদরাসা বানিয়ে দিল। কোনো গরিব বান্দাকে দান করল। নিজের পিতামাতাকে ছাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে যেকোনো উত্তম দান ও খয়রাত প্রদান করল। এর দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওই বান্দার গুনাহ মাফ করে দেন।

যেকোনো নফল ইবাদাত অন্যজনের পক্ষ থেকে করা যায়। এই নফলের দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ করে দেবেন। ফাযায়েলে সাদাকাত কিতাবে হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া (রহ.) বলেছেন, কোনো এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তি একটি কবরস্তানের কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি কিছু দু'আ পড়ে কবরবাসীর জন্য বখশিশ করলেন। রাতে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, কবরস্তানের মুর্দারা সবাই একটি স্থানে সমবেত। হঠাৎ এক ব্যক্তি একটি বড় বোঝা নিয়ে আগমন করল। বোঝাটি রেখে দিল আর সকল মুর্দা তার দিকে ছুটল। কিন্তু একজন পেছনে বসে থাকল। বুযুর্গ ওই বান্দাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? লোকটি বুযুর্গকে বলল, যখন দুনিয়ার কোনো মানুষ আমাদের জন্য নেক কাজ করে, ভালো আমল করে তার নেকি আমাদের জন্য হাদিয়ারূপে পাঠায়, তখন আমাদের সবার মাঝেই আনন্দের ধুম পড়ে যায়। সকলেই খুশি হয়ে যায়। একজন বণ্টনকারী সব বণ্টন করে দেয়। তো

এখন ওই বন্টনকারী নেক আমলের হাদিয়াগুলো সবার মাঝে বন্টন করে দেবেন। সকলে তাদের অংশ বুঝে নিতে ছুটে গেছে।

বুযুর্গ বললেন, আপনি যাচ্ছেন না কেন? লোকটি বলল, আমি পরে নিয়ে নেব। বুযুর্গ বললেন, আপনার কি নেক আমলের জরুরত নেই? লোকটি বলল, থাকবে না কেন। তবে আমার একটি সন্তান আছে। আমি তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি। সে কুরআনের হাফেয। প্রতিদিন সে কুরআন পাঠ করে। আমি প্রতিদিনই কিছু নেকি প্রাপ্ত হই। আমার ওপর আল্লাহর দয়া আছে। বুযুর্গ বললেন, আপনার ছেলেটা কে? লোকটি স্বপ্নের মাঝে বলে দিল, অমুক স্থানে তার দোকান আছে। বুযুর্গ পরের দিন বাজারে গমন করলেন এবং ওই দোকানে গিয়ে একজন নওজোয়ানকে দেখলেন। ছেলেটি কাস্টমার এলে তাকে সদায় দেয়। আর কাস্টমার চলে গেলে কুরআন পড়তে থাকে। বুযুর্গ চিনে ফেললেন, এটিই সেই ছেলে, যার তেলাওয়াতের কারণে তার বাবার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আল্লাহর কী শান! কিছু দিন পর বুযুর্গ আবার উক্ত স্থান হয়ে পথ অতিক্রম করলেন। এবারও কিছু দু'আ পড়ে কবরবাসীর জন্য বখশিশ করলেন। রাতে ফের স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন আগের মতোই। সকলেই ওই বোঝা বহনকারীর দিকে ছুটল। এবার আগে যেব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখেছিলেন, সেও নেকির ভাগ নিতে ছুটে গেল। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, কী হলো ভাই? লোকটি বলল, ভাই! আমার ছেলেটির মৃত্যু হয়ে গেছে। এখন আর আমাকে নেকি পাঠানোর কেউ নেই। এখন এখানে কোনো নেকির বোঝা এলে আমিও আমার অংশ নিতে সেদিকে ছুটে যাই।

এবার দেখুন ভাইয়েরা! নিজের সন্তানকে আলেম বানানো, হাফেয বানানো, নেককার বানানো কতটা জরুরি। আলেম, হাফেয ও নেককার সন্তানের আমলের ছাওয়াব পরকালের জীবনে বাবা-মায়ের কাজে আসবে।

ষষ্ঠ উপাদান বিপদে ধৈর্য ধরা : গুনাহ মাফের ষষ্ঠ উপাদান হচ্ছে বিপদ ও মুসিবতে সবর করা। বর্ণিত আছে, এই দুনিয়ায় মুমিন বান্দা যে-মুসিবতেই পতিত হয়, তার মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। পেরেশানি ছোট হোক বা বড় প্রত্যেক পেরেশানির বিনিময়ে মুমিন বান্দার ছাওয়াব হয় এবং গুনাহ মাফ হয়।

একবার নবীজি ঘরে তাশরীফ আনলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল। এমন সময় বাতাসের ঝাপটা এল এবং প্রদীপটি নিভে গেল।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো মানুষের মৃত্যু হলে পাঠ করা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক মুসিবতেই এটি পাঠ করা হয়। বাক্যটি পাঠ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দাকে মুসিবতের বিনিময়ে ছাওয়াব ও নেকি দিয়ে দেন। চিন্তার বিষয় হলো, যদি প্রদীপ নিভে যাওয়াই মুমিনের জন্য মুসিবতের বিষয় হয় এবং এর দ্বারা মুমিন বান্দার গুনাহ মাফ হয়, তাহলে যদি কোনো বান্দার জীবনপ্রদীপ নিভে যায় এবং তার পরিবার এর ওপর সবর করে এর দ্বারা কত বড় প্রতিদানই-না আল্লাহ তা'আলা এই পরিবারকে দান করবেন। তো যে মুসিবতই আসুক, তার দ্বারা মানুষের গুনাহ মাফ হয়।

এমনকি ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, অবস্থাটা যদি এমন হয় যে, এক বান্দার দুটি পকেট আছে। সে কোনো একটি পকেটে সব সময় টাকা রাখত। কিন্তু একদিন হঠাৎ অন্য পকেটে টাকা রাখল। টাকা বের করার জন্য লোকটি অভ্যাসমতো আগের পকেটেই হাত দিল। কিন্তু হঠাৎ সেই পকেটে টাকাটা না দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে ২য় পকেটে হাত দিয়ে টাকাটা পেয়েও গেল। তো এক লমহার জন্য তার ভেতর পেরেশানি সৃষ্টি হয়েছে। এতেও বান্দার গুনাহ মাফ হয়।

মুমিনদের জন্য এ এক মহা সৌভাগ্য। প্রত্যেক ছোট-বড় পেরেশানির কারণেই মুমিন বান্দার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই পেরেশানির ওপর সবর করবে। অধৈর্য হয়ে গেলে গুনাহ মাফ হবে না।

এখানে একটি কথা বুঝে নেওয়া আবশ্যক। এই যে মুসিবত; এ কিন্তু কখনও কামনা করা যাবে না। এটা অনুচিত। কারণ, কোনো মুসিবত চেয়ে নিয়ে তার ওপর সবর করতে পারার মতো শক্তি আমাদের নেই। আমরা দুর্বল বান্দা। মুসিবত আমরা সহ্য করতে পারব না। তাই কখনও মুসিবত কামনা করব না। তবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় যদি কখনও মুসিবত এসে যায়, তাহলে সবর করব। ধৈর্য ধারণ করব। এতেই আমাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মুসিবত দু'ভাবে আসে। কখনও বান্দার গুনাহকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য মুসিবত আসে। আবার কখনও বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করবার জন্য মুসিবত আসে। মনে করুন, কোনো বান্দা দু'আ করল যে, হে আল্লাহ!

তুমি আমাকে তোমার নৈকট্য দান করো। আমাকে তোমার প্রিয় বানাও। আমাকে তোমার কাছে টেনে নাও। আবার তার আমল এমন নয়, যে আল্লাহ তাকে নৈকট্য দান করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার দু'আটা কবুল করে নেন এবং ছোট-খাটো কোনো মুসিবত দিয়ে তাকে নিজের আপন বানিয়ে নেন। পেরেশানি দিয়ে ওই বান্দাকে নৈকট্য দান করে দেন। পেরেশানি বা দুঃখ-যাতনায় বান্দা যখন সবর করে তখন ওই বান্দাকে রব্বে কারীম নিজের প্রিয় করে নেন। বান্দার সবরকে আল্লাহ তা'আলা নৈকট্য দানের বাহানা ও উসিলা বানান। বুঝতে পারলাম মুসিবত দু'ভাবে আসতে পারে। কখনও গুনাহের শাস্তি দানের জন্যে। কখনও বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে। তো আমরা তো জানি না কোন দিক থেকে মুসিবতটা এল, কোন প্রকারের জন্য মুসিবত এল। কি গুনাহ মাফের জন্য এল, না মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এল। আমরা তা জানি না।

প্রিয় বন্ধুগণ! শুনে রাখুন, আপনি বুঝতে পারবেন কোন প্রকারের জন্য আপনার ওপর মুসিবতটি এল। যখন কোনো মুসিবত আসে এবং সে মুসিবতের কারণে বান্দার মাঝে অভিযোগ-অনুযোগ সৃষ্টি হয়, মনে ভাবনা উদয় হয় যে, আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না, আমি তো অনেক দু'আ করি। আরে আমি তো বড় দুরাবস্থায় জীবন যাপন করছি। লোকদের মাঝে এভাবে অভিযোগ করে বেড়ায়। যে-বান্দা মুসিবত এলে অন্যদের মাঝে অভিযোগ করে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ ওই বান্দাকে তার গুনাহের কারণে মুসিবত দিয়েছেন। গুনাহকে মিটিয়ে নেয়ার জন্য তার ওপর মুসিবত দিয়েছেন। গুনাহকে মাফ করার জন্য আল্লাহ তাকে মুসিবত দিয়েছেন।

আপনি নিশ্চয় এমন কিছু লোককে দেখে থাকবেন। সামান্য মুসিবত এলেই সে মসজিদে আসা বন্ধ করে দেয়। নামায পড়া বন্ধ করে দেয়। আমল করা বন্ধ করে দেয়। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেই বলবে, ভাই! বহুত পেরেশানিতে আছি। সামান্য ঘুছিয়ে নিয়েই তারপর মসজিদে আসা শুরু করব। আমলে জোড়া শুরু করব। দেখুন সামান্য কারবারের কারণে এখন খোদার আমল ছুটে গেল। তেলাওয়াত ছুটে গেল। আমল ছুটে গেল। যখন আমল থেকে বান্দা মাহরুম হয়ে যায়, তখনই সে লোকদের সামনে অভিযোগ শুরু করে। তার মধ্যে হতাশা কাজ করে। এর দ্বারাই বোঝা যায় মুসিবতটা বান্দার ওপর তার গুনাহের কারণে এসেছে। এর দ্বারা তার গুনাহকে মাফ করা হবে। এবার মুসিবতের কারণে তার গুনাহ মাফ হয়ে গেল। যদি সে সবর করতে পারে।

আর যদি বান্দা ওই মুসিবত আসার কারণে আমল আরো বাড়িয়ে দেয়, আগে শুধু ফরজ পড়ত এখন নফলও পড়া শুরু করে। আগে ফজর নামায জামাতে পড়ত এখন ইশরাক পড়া শুরু করে। তাহাজ্জুদ শুরু করে, সালাতুল হাজাত পড়ে। আগে অর্ধ পারা কুরআন পড়ত, এখন এক পারা পড়ে, আগে আমলে কম জুড়তো, এখন মুসিবত আসার পর বেশি জোড়ে।

মোটকথা, মুসিবত আসার পর আমলের মাত্রা যদি আরো বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে এই মুসিবত বান্দার মর্যাদা বুলন্দীর জন্য এসেছে। এই মুসিবতের কারণে বান্দার মর্যাদা আল্লাহর কাছে বেড়ে যায়। বান্দা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয়। বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। বান্দার অন্তর তখন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। বান্দার অন্তর তখন আল্লাহ নির্ভরশীল হয়ে যায়। বান্দা আশায় বুক বাঁধে যে আমার আল্লাহ আমার এই মুসিবতকে হটিয়ে দেবেন। তো এভাবে বোঝা যাবে মুসিবতটি বান্দার দরজা বুলন্দীর জন্য এবং বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আগমন করেছে। আমাদের বুযুর্গানে দীনের জীবন পড়লে দেখা যায় তারা মুসিবত আসার কারণে খুশি হয়ে যেতেন। মুসিবত এলে তারা আনন্দ মনে তা বরণ করে নিতেন।

سکھ دکھاں توں دیواں وار * دکھاں آں ملایوں یار

আমি সূর্যকে দুঃখের ওপর কোরবান করে দিয়েছি। এই যে দুঃখ, এই যে বেদনা তা আমাকে আমার প্রিয়তম মাহবুবের সাথে মিলন করিয়ে দিয়েছে।

এই মুসিবতই অনেক সময় রহমত হয়ে দেখা দেয়। তো আমরা দু'আ করব- হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন। আল্লাহ হয়তো দু'আ কবুল করে নেবেন। গুনাহ মাফ করার জন্য এবার আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর ছোট-খাটো কোনো পেরেশানি পাঠিয়ে দেবেন। এই পেরেশানির ওপর অভিযোগ না তোলা চাই।

আরে ভাই! আমরা তো আল্লাহর বান্দা। আল্লাহরই গোলাম। আমরা তো আল্লাহর কাছে দু'আ করব। পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন কী? অভিযোগ তোলার কারণটা কী? তাই খুব সতর্ক থাকবে। মুসিবত এলে কখনও মাখলুকের সামনে শেকায়েত করব না। কখনও অভিযোগ তুলব না; বরং সবর করবে। সবরের মেওয়া এই হবে যে, এই মুসিবতকেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম বানাবেন। এই উসিলায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দার সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। পেরেশানিতে ধৈর্যহারা

হয়ে যাওয়া, হতাশ হয়ে যাওয়া ভালো কাজ নয়। আমরা তো এই দুনিয়ায় পরীক্ষার হলে আছি। আমরা সবর করব। এই দুনিয়ায় কোন বান্দা আছে, যার ওপর কোনো-না-কোনো মুসিবত ও পেরেশানি আপতিত হয় না? এই দুনিয়ায় কোনো বান্দা-ই পূর্ণ সুখে নেই। কোনো-না-কোনো মুসিবত ও পেরেশানি বান্দার আছেই।

তবে পার্থক্য এই যে, কেউ পেরেশানিতে আল্লাহর ওপর ভরসা করে সবর করতে পারে আবার কেউ ধৈর্যহারা হয়ে যায়। কেউ দীনের তরে পেরেশান হয় আর কেউ দুনিয়ার তরে পেরেশান হয়ে যায়। আল্লাহওয়ালাগণ দীনের তরে পেরেশান থাকেন সবসময়। মনে রাখুন, কম-বেশি সবাই পেরেশানিতে থাকেন। রাত কাটিয়ে দেন কেঁদে-কেঁদে নিদ্রাহীনভাবে। কেউ কাঁদে আল্লাহর তরে। আর কেউ কাঁদেন দুনিয়ার তরে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো উম্মতের জন্য দু'আ-মুনাজাত করতে-করতে রাত কাটিয়ে দিতেন। উম্মতের জন্য কাঁদতে-কাঁদতে রাতকে প্রভাত করে দিতেন।

তো দুনিয়ায় তো পেরেশানি আসবেই। ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের স্বল্পতা এবং তোমাদের জীবন ও ফলনের মাধ্যমে পরীক্ষা করব।'[১]

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর আপনি সবরকারীদেরকে সুসংবাদ দান করুন।'[২]

তাই সামান্য একটু পেরেশানি এলেই তা লোকদের বলে বেড়ানো, মানুষের মাঝে হাহুতাশ করা আল্লাহর ওপর অভিযোগ তোলার শামিল। তাই তো এক বুযুর্গ বলেছেন, আমার দিলে আল্লাহ তা'আলা ইলহাম করেছেন যে, হে আমার বান্দা! তুমি লোকদের বলে দাও, তারা তো আমার ওপর অবিরত অভিযোগ তুলছে। সামান্য দুঃখ-কষ্ট বা মুসিবত এলেই তারা আমার শেকায়েত করে, আমার নামে তারা নানা কথা বলে। অথচ, তারা যে গুনাহপূর্ণ আমলনামা নিয়ে আমার কাছে আসে, তারা যে পাপভর্তি আমলনামা নিয়ে আমার কাছে আসে, আমি তো তাদের শেকায়েত করি না।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

ফেরেশতাদের সামনে তো আমি তাদের মন্দ বলি না। মানুষ একথা বলে যে, আরে! কাজটা এভাবে চেয়েছিলাম; কিন্তু হলো না; ওভাবে চেয়েছিলাম; কিন্তু হলো না। এগুলোও আল্লাহর শেকায়েত। তবে কাউকে যদি দু'আর আবেদন করতে হয়, তাহলে তার কাছে নিজের হালহাকিকত বলা যাবে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করে তার পর দু'আ করা যাবে। বিষয়টি ডাক্তারের কাছে রুগীর অবস্থা বর্ণনার মতো। কিন্তু যেখানে-সেখানে বলে বেড়ানো, হাহুতাশ করা একদম নিষেধ।

আমাদের নারীদের অবস্থা এমন যে, একটু যদি বেশকম হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে থাকে, আমার স্বামীটা ভালো না, ওর মতো খারাপ মানুষ আর নেই। এটা আনে না, ওটা আনে না। আমার চাহিদাগুলো পূরণ করে না। আমাকে আমার পছন্দমতো জিনিস এনে দেয় না। তো এভাবে অভিযোগের-পর-অভিযোগ তুলতে থাকে আমাদের নারীরা।

সামান্য একটু এদিক-ওদিক হলেই আমাদের নরীরা বলা শুরু করে, দেখো, আমার শাশুড়ি কত খারাপ। একটু এরকম সেরকম হলেই এমন হাজারো অভিযোগ তুলতে শুরু করে আমাদের নারীরা। অথচ নিজের অবস্থা একটুও চিন্তা করে দেখে না। দুটা মিনিট ধৈর্য ধরে থাকতে পারে না। এমন করা ঠিক নয়। এতে অশান্তি আসে। এমন করে কথা না বলা উচিত। এভাবে মানুষের সামনে বলে বেড়ানোর মাঝে তো কোনো কল্যাণ নেই। এতে তো কোনো সমাধান বের হবে না। বরং এর কারণে নিজেরও সম্মান নষ্ট হয়, আপনজন ও পরিবার-পরিজনেরও সম্মান নষ্ট হয়।

তাই এখনই ফয়সালা করে নেবে যে, আমার রব্বে কারীম আমাকে যে-অবস্থায়ই রাখেন আমি সেই অবস্থাতেই খুশী। আমি আমার মাওলার ওপর রাজী ও সন্তুষ্ট। আমি আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। যখন আপনি আপনার আপন রবের ওপর রাজি ও খুশি হয়ে যাবেন, তখন দেখবেন আল্লাহর অবারিত রহমত ও বরকত কীভাবে বর্ষিত হয়।

মনে করুন, এক ব্যক্তি মিষ্টি ক্রয় করল। ঘরের বাচ্চার ভাগে সামান্য কম পড়ল। বাচ্চাটা ওই কমটুকুই যদি খুশী মনে নিয়ে নেয়, কোনো মান-অভিমান না করে, তাহলে বাবা তার ওপর খুশি হয়ে যায়। বাবা তাকে মনে রাখে এবং অন্য সময় সবার আগে সবার চেয়ে বেশি তাঁকে দেয়। কারণ, বাবার মনে বাচ্চার ওই আচরণটি দাগ কাটে। তিনি ভাবেন, বাচ্চাটি ভালো-সবর করে।

এমনিভাবে বান্দার যখন পেরেশানি আসে, সামান্য দুঃখ-কষ্ট আসে, তখন আল্লাহর এই ফয়সালাকে যে-মানুষটি হাসিমুখে বরণ করে নেবে, বিপদে সবর করবে, তখন আল্লাহ নিজেই বলেন, আমার বান্দা আমার দেওয়া মুসিবতের ওপর সবর করেছে। আমি এখনই তার আরামের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সুখের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূরে সরিয়ে দিচ্ছি। ফলে আল্লাহ তার সব সমস্যা আসানির সাথে দূর করে দেন। এই মুসিবতই মুমিনের গুনাহ মাফের উসিলা হয়ে যায়। ব্যবসার পেরেশানি, কারবারের পেরেশানি, ঘরের পেরেশানি, অসুস্থতা, হিংসাকারীর হিংসার লক্ষবস্তুতে পরিণত হওয়া ইত্যাদি সকল কিছুর বিনিময়েই বান্দার গুনাহ মাফ করা হয়। তাই সব মুআমালায় ও সকল কর্মে পেরেশান না হয়ে একথা বলবেন যে, হে আল্লাহ! আমি তো উপযুক্ত নই। যোগ্য নই। আমার তো সহ্য করার ক্ষমতা নেই, আমাকে আপনি উপযুক্ত ও হিম্মতওয়ালা বানিয়ে দিন, যেন সব বিপদাপদে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি। আমাদের কল্পনা থেকেও বেশি বিনিময় প্রদান করুন। এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ মাফ করে দেবেন, আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। দুনিয়ার এই পেরেশানি আর কীইবা পেরেশানি। আখেরাতের পেরেশানি তো বড়ই কঠিন।

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যে-বান্দা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পেরেশানির শিকার হয়, যে-বান্দা বেশি মুসিবতে থাকে, এমন হয় যে, সামান্য আনন্দও সে দেখে না, সেই বান্দাকে কেয়ামতের দিন দাঁড় করানো হবে। জান্নাতের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে তাকে জান্নাতের বাতাসের ঝাপটা দেওয়া হবে। এবার রব্বে কারীম জিজ্ঞেস করবেন, ও আমার বান্দা! তুমি কি কখনো দুঃখ পেরেশানি দেখেছ? সে সমস্ত কষ্ট ভুলে যাবে। কসম করে বলবে, আমার তো কোনোদিনও কোনো দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানি আসেনি। জান্নাতি হাওয়ার একটিমাত্র ঝাপটা সারা জীবনের সমস্ত কষ্টকে লীন করে দেবে। সমস্ত কষ্টকে দূর করে দেবে।

এবার দুনিয়াতে যে-বান্দা আরামের জীবন যাপন করেছে, তাকে ডাকবেন। তাকে জাহান্নামের সামনে দাঁড় করিয়ে জাহান্নামের এক ঝাপটা বাতাস তার গায়ের ওপর প্রবাহিত করা হবে। এবার আল্লাহ বলবেন, ও আমার বান্দা! তুমি কি কখনও আনন্দ দেখেছ? কখনও কি সুখে থেকেছ? লোকটি কসম করে বলবে, আমি কখনও সুখ দেখিনি। কখনও সুখ ভোগ করিনি। আরামে থাকিনি।

দেখুন, জাহান্নামের এক ঝাপটা বাতাস তার সারাজীবনের সুখের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। এদিকে জান্নাতের এক ঝাপটা বাতাস দুনিয়াবি সকল দুঃখ-বেদনাকে মুছে দিয়েছে। বোঝা গেল, দুনিয়ার এই সুখ দুনিয়ার এই দুঃখ কিছুই নয়। একটু ধৈর্যের সাথে সামনের জিন্দেগিতে আখেরাতে গিয়ে দেখুন কী প্রাপ্ত হন। তাই এই জীবনটায় ধৈর্য ধারণ করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

نور میں ہو یا نار میں رہنا * ہر جگہ یاد یار میں رہنا

'আলোতে থাক কিংবা আগুনে থাক; সর্বাবস্থায় এবং সবজাগায় আসল বন্ধুকে স্মরণ রাখো।'

چند جھونکے خزاں کے بس سہہ لو * پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

'সামান্য কটা দিন সহ্য করে ধৈর্য ধরে থাকো। তারপরই তো বাগবাগিচায় সর্বদার জন্যই থাকতে পারবে।'

এ-ই তো দুনিয়া। তাই এখানে কটা দিন কষ্ট বরদাশত করে থাকুন। আল্লাহ তারপরই জান্নাতের অনন্ত সুখে আমাদের জীবন রঙিন করে দেবেন।

৭ম উপাদান কবরের কষ্ট : যেসব কারণে গুনাহ মাফ হয়ে থাকে, তার একটি হলো এই সপ্তম উপাদান। আর তা হচ্ছে কবরের কষ্ট, কবরের ভয়। কবরে গেলে চারপাশ থেকে কবর সংকীর্ণ হয়ে যাবে, চাপ দেবে। তো কবরের এই চাপ দেওয়া এবং কবরের আযাবের ভয়ে শঙ্কিত থাকার দ্বারাও গুনাহ মাফ হয়।

দেখুন, কবরের এই চাপ, কবর সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া এটা সবার জীবনেই আসবে। বদকারদের ওপর চাপ বেশি আসবে। তাদের কবর বেশি সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আর নেককারদের চাপ কম আসবে। তাদের কবর কম সংকীর্ণ হবে। কবরের চাপে এ পাশের হাড় ওপাশে চলে যাবে। আর ওপাশের হাড় এপাশে চলে আসবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, বন্ধুগণ! মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। হযরত সা'দ (রাযি.) একজন সাহাবি। তাঁর ওফাত হলো। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন। যখন দাফনের জন্য যেতে লাগলেন, তখন নবীজি পায়ের আঙুলগুলোর আগায় ভর দিয়ে-দিয়ে হাঁটছিলেন। সাহাবায়েগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনাকে তো কোনোদিন এমন করে চলতে দেখিনি। নবীজি বললেন, সা'দের জানাযায় এত পরিমাণ ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করেছে যে, আমার পা ফেলার জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই।

এত ফেরেশতা যাঁর জানাযার নামাযের জন্য এসেছে, নবীজি তাঁর দাফনের পর বললেন, সা'আদের ওপরও কবরের চাপ এসেছে। বন্ধুগণ! বলুন, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

তো কবরে এই চাপ সবার ওপরই আসবে। এটা কীভাবে আসবে? ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, আপনারা দুনিয়ার মধ্যে যখন আইসক্রিম খান, তার মূল্য পরিশোধ করেন। এয়ারকন্ডিশনে থাকেন, তার মূল্য পরিশোধ করেন। তো প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা মূল্য আছে। এই যে কবরের চাপ; এর মাধ্যমে দুনিয়ার মজা ও স্বাদের মূল্য আদায় করে নেওয়া হবে। যেব্যক্তি দুনিয়ার স্বাদ যত বেশি নেবে, তাকে কবর তত বেশি জোরে চাপ দেবে। তাই তো আমাদের ওলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দীন যখন তরকারি খেতেন এবং দেখতেন তাতে স্বাদ বেশি, তখন তাতে পানি ঢেলে দিতেন। তাঁরা ভাবতেন, এখন নফসকে মজা দান করলে কবরের চাপ বেশি গ্রহণ করতে হবে। আমাদের আকাবিরীনে কেরাম দুনিয়ার মজা থেকে এত সতর্ক থাকতেন। আমরা আজ মজা ও স্বাদের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোথায় আরেকটু স্বাদও আরেকটু মজা আছে, সেদিকে ছুটে বেড়াচ্ছি।

ভাইয়েরা! আজ থেকে অঙ্গীকার করুন, এই হারাম স্বাদ, হারাম মজা আমরা কোনোদিন গ্রহণ করব না। এর থেকে আমরা দূরে থাকব। অবশ্যই হালাল মজাকে আল্লাহ তা'আলা হালাল করেছেন। হারামকে তো পরিত্যাগ করা আবশ্যক। আজ আমরা হারাম মজা ও স্বাদের পেছনে ছুটে ফিরছি। এদিকে বেগানা নারী-পুরুষের দিকে তাকাচ্ছি। মোবাইলে ভিডিও দেখছি। বেগানা মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলছি। মোবাইলে কথা বলছি। এসবের খেসারত দিতে হবে না? এসবের দাম আদায় করতে হবে না? হবে। কবরে গেলেই বোঝা যাবে কী অবস্থা হয়।

তাই বলছি, স্মরণ রাখুন। কবরের চাপ বেশি হবে ওই ব্যক্তির, যে দুনিয়ার মজা বেশি নেবে। যে দুনিয়ার মধ্যে সাদাসিধা জীবন যাপন করবে, তার ওপর কবরের চাপ কম আসবে। আল্লাহ তা'আলা যে-বান্দাকে মাফ করতে চান, তাকে মাফ করে দিতে পারেন। তার ওপর কবরের চাপ আসবে না। কিন্তু এমন হতে হলে তো আল্লাহর প্রিয় হতে হবে। আর যার ওপর কবরের চাপ আসবে, কবরের আযাব আসবে, তার দ্বারা লোকটির গুনাহ মাফ করা হবে। কেয়ামতের দিন তার গুনাহ কম দেখানো হবে।

অষ্টম উপাদান কেয়ামতের উত্তপ্ততা : গুনাহ মাফের অষ্টম উপাদান হচ্ছে কেয়ামত দিনের কষ্ট। মনোযোগ দিয়ে শুনুন। যেদিন সকল মানুষকে

একত্রিত করা হবে, লোকদের মাঝে তখন একটা ভয় কাজ করবে। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন লোকেরা উপস্থিত হবে। জাহান্নামকে পেশ করা হবে। জাহান্নামের মাঝে সেদিন উত্তেজনা বিরাজ করবে। তার মাঝে মহা বিপদ টগবগ করতে থাকবে। গর্জন করতে থাকবে জাহান্নাম। আযাবের মহল জাহান্নাম, গজবের মহল জাহান্নাম বারবার হুঙ্কার ছুড়ে হালুম-হালুম করতে থাকবে। আল্লাহকে বলতে থাকবে, ওগো আল্লাহ! তুমি আমাকে ওদের কাছে যেতে দাও। তোমার বিধান যারা লঙ্ঘন করেছে, তোমার আইনকে যারা অমান্য করেছে, আমাকে তুমি সেই লোকদের কাছে যেতে দাও। জাহান্নামের তর্জন-গর্জন আর রাগ দেখে লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে যাবে। সবার মাঝে একটা ভয় বিরাজ করবে।

হাদীছের মর্মার্থ এই যে, জাহান্নামের আগুনের শিখাগুলো ওপরের দিকে উত্থিত হতে থাকবে। তখন অগণিত নবীর মধ্য থেকে এমন কেউ থাকবে না, যিনি আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। প্রত্যেকে মনে-মনে কামনা করতে থাকবে, এই আগুন আমার ওপর এসে না পড়ুক। সকলেই সেদিন ভয়ার্ত থাকবে। ভাবতে থাকবে, হায়! এই আগুন আজকে কী যে করে ফেলবে জানা যাচ্ছে না। নবীরাও থরথর করে কাঁপতে থাকবেন। চারপাশ উত্তপ্ত থাকবে। উত্তাপে মানুষের ঘাম ঝরতে থাকবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি ও উত্তাপের কারণে এর দ্বারা মহান আল্লাহ বান্দার গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন। কেয়ামতের দিনের কষ্টের কারণে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

নবম উপাদান নবীজির শাফাআত : গুনাহ মাফের নবম উপাদান হচ্ছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত। কেয়ামতের দিন নবীজি উম্মতের জন্য শাফাআত করবেন। এই শাফাআতের দ্বারা বান্দার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ! হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার শাফাআত কি আপনার নেককার উম্মতের জন্যই হবে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমার উম্মতের যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত, তাদের জন্য হবে আমার শাফাআত। তারা গুনাহ করে বসেছে। আবার তার কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। আবার দীনের পথে চলার জন্য চেষ্টাও করেছে। তাহলে তাদের এই অতীত গুনাহের কারণে তাদের জন্য শাফাআত করা হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন।

অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ করে শুনুন। একটি হাদীছে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তো আমাকে

অধিকার দিয়েছেন যে, হে আমার মাহবুব! আপনি কী পছন্দ করেন? আপনি এই দুটির একটি গ্রহণ করুন যে, আমি আমার পক্ষ থেকে আপনার অর্ধেক উম্মতকে মাফ করে দেব, নাকি আপনি সুপারিশ করে-করে জাহান্নামি উম্মতকে জান্নাতে নেবেন। আপনি কোনটি করতে চান। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি শাফাআত করে-করে উম্মতকে জান্নাতে নেওয়ার এই পথটিই গ্রহণ করে নিলাম। শাফাআতের কারণে অর্ধেকেরও বেশি উম্মতকে আমি জান্নাতে নিতে পারব। আর আল্লাহ যদি অর্ধেককে জান্নাতে দিয়ে দেন, তাহলে তো শুধু অর্ধেকই জান্নাতে যেতে পারবে। বাকিরা জাহান্নামি-ই রয়ে যাবে।

আল্লাহু আকবার কাবীরা!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই একটি করে দু'আ করার অধিকার দিয়েছেন। দু'আটি চাওয়ার সাথে-সাথেই তা কবুল করে নেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আম্বিয়া কেরাম কি পরে দু'আ করে নিয়েছেন? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সকল নবী-ই দু'আ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনিও কি দু'আটি নিয়ে নিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দু'আ করিনি। আমি দু'আটি সঞ্চিত রেখে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন যখন আমার উম্মতের লোকেরা দণ্ডায়মান হবে, তখন আমি আল্লাহর সামনে সেই দু'আটি করব। সুযোগটি আমি তখন কাজে লাগাব। আমার শেষ উম্মতটিও জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না।

যারা নবীজির শাফাআত পেতে চায়, যারা নবীজির সুপারিশ পেতে চায়, তাদের জন্য দুটি কাজ করা আবশ্যক। একটি হলো, দীনের প্রতিটি কাজ সুন্নত মোতাবেক করবে। নবীজি যা নিয়ে পেরেশান ছিলেন, নিজেও তাতে পেরেশান হবে। নবীজি যা পেয়ে আনন্দিত হতেন, নিজেও তা-ই নিয়ে আনন্দিত হবেন। নিজেকে নবীজির সুন্নতের রঙে রঙিন করবেন। দীনের কাজকে নিজের কাজ বানাবেন। আরেকটি হলো, তাহাজ্জুদের পাবন্দি করবে। মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ কুরআন মাজীদে প্রিয় হাবীবকে লক্ষ করে ইরশাদ করেছেন—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

'হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন।'[১]

তো এই তাহাজ্জুদ দ্বারা কী পাওয়া যাবে? সে-ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে–

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

'আপনার রব্বে কারীম আপনাকে মাকামে মাহমূদ উন্নত সুপ্রসংসিত আসন দান করবেন।'[২]

এস্থানে এসে মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন–

'যেমনিভাবে তাহাজ্জুদ আদায়ের কারণে মাকামে মাহমুদ দান করবেন বলে আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওয়াদা দিয়েছেন, তেমনিভাবে উম্মতের মধ্যে যেসকল লোক তাহাজ্জুদের নামায আদায় করবে, তাদেরকে সেই মাকামে মাহমূদে দাঁড়িয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত দান করবেন।

আল্লাহু আকবার! চিন্তা করুন তাহাজ্জুদ কত বড় বিষয়!

দশম উপাদান আল্লাহর রহমত : যেসব কারণে বান্দার গুনাহ মাফ হয়, তার দশম উপাদান হচ্ছে আল্লাহর রহমত। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত প্রকাশ পাবে। এমন রহমত ও মাগফেরাত সেদিন প্রকাশিত হবে যে, তার কল্পনাও কোনোদিন কোনো মানুষ করতে পারবে না। এমন মাগফেরাত ও রহমত প্রকাশ পাবে যে, এক বান্দা একটিবারও যদি আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় ক্রন্দন করে থাকে এবং ছোট একটি অশ্রুবিন্দুও ঝরায়, অশ্রুতে তার চোখের একটিমাত্র পলকও যদি ভিজে থাকে, তাহলে সেই পলক-পশমটিও সাক্ষ্য দান করে বলবে, হে আল্লাহ! এই বান্দা সারাটা জীবনে একটিবার আপনার ভয়ে, আপনার ভলোবাসায় ক্রন্দন করেছে। আমি তার কারণে সিক্ত হয়ে গেছি। হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দান করছি, হাদীছে এসেছে, সেই পলকের সাক্ষ্য গ্রহণ করে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতই জাহান্নামি বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। কিতাবে লিখিত আছে, পুরো জীবনে একটিবার যে-বান্দা মহব্বতের সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবেন, সেই বান্দার এই একবার আল্লাহর নাম উচ্চারণ করাটাই নাজাতের উসিলা হয়ে

---

১. সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ৭৯

২. সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ৭৯

যাবে। বান্দাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাত দিয়ে দেওয়া হবে। তো কেয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত আপনার বিস্ময় সৃষ্টি করবে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈমানওয়ালাদের ওপর অনেক বেশি মেহেরবান হবেন।'[১]

হযরত কারী মুহাম্মাদ তায়্যেব (রহ.) লিখেছেন–

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এত মেহেরবান হবেন যে, শয়তান এত বিপুল মানুষকে মাগফেরাত দেওয়া হয়েছে দেখে নিজেও মাথা তুলে করুণাতরে রব্বে কারীমের দিকে তাকাবে আর ভাববে, হতে পারে আজ রব্বুল ইয্যাত আমাকেও মাফ করে দেবেন। এত বেশি রহমত ও মাগফেরাত সেদিন প্রকাশিত হবে। আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দাদের ওপর বড় দয়াবান! বড়ই মেহেরবান! কেয়ামতের দিন নিজের ফজল ও করমে, নিজের ক্ষমাগুণ দিয়ে ঈমানওয়ালা বান্দাদের, মুমিন বান্দাদের মাফ করে দেবেন। আল্লাহু আকবার কাবীরা! এটি হবে আল্লাহর রহমত। আল্লাহর মাগফেরাত।

আমাদের রব যেহেতু আমাদের ওপর এমন দয়াশীল, এমন ক্ষমাশীল, এমন মেহেরবান, তাই আমাদের উচিত আমরা এখনই, আজ থেকেই আমাদের অতীত ভুলগুলোর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, সত্যিকার তাওবা করা, অতীতের গুনাহ থেকে মাগফেরাত চেয়ে নেওয়া, বাকি জীবনটা নেক কাজে, নেক পথে, সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করব বলে অঙ্গীকার করা। কেয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত কেমন হবে সেকথা কবি এভাবে বলেছেন–

بے گناہوں میں چلا زاہد بھی اس کو دیکھنے
مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں
وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر
چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪৩

'কেয়ামতের দিন আল্লাহর মাগফেরাত এত বেশি হবে যে, বেগুনা মানুষগুলো সেদিন কামনা করবে, আমিও যদি গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম, তাহলে তো আজ আমিও মাগফেরাতের ছায়ায় স্থান পেতাম, আজ আমিও রহমতের ভাগিদার হতাম।'

রোজ হাশরে রাব্বে কারীম এমন কারিশমা এবং এমন শান প্রদর্শন করবেন। প্রত্যেক নিষ্পাপ মানুষ সেদিন বলে উঠবে, আমি যদি গুনাহগার হতাম, তাহলে তো এই রহমতের ভাগিদার আজ আমিও হতাম।

আল্লাহ তা'আলা বড়ই মেহেরবান। বড়ই দয়াবান। আল্লাহ তো চাচ্ছেনই যে, আমার বান্দা আমার কাছে তাওবা করুক। আমার কাছে ক্ষমা চাক; তাহলে তো আমাদের উচিত আজকেই, এই মাহফিলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নেওয়া, আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেওয়া এবং তাওবা করে নেওয়া। আমাদের কর্তব্য হলো পেছনের জীবনের গুনাহ থেকে আমাদের তাওবা করা, সামনের জীবনটা নেক পথে, ভালো পথে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করব বলে অঙ্গীকার গ্রহণ করা।

আমি আগেও বহুবার আপনাদের নিকট এই নিবেদন পেশ করেছি। আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আদর্শচ্যুত সন্তানের জন্যও বাবা-মা ততটা পেরেশান হয় না, যতটা আকুল হন আমাদের রব্বে কারীম তাঁর গোমরাহ বান্দাকে পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। দূরে সফররত বাবা-মা যতটা ব্যাকুল থাকেন, আমাদের রব্বে কারীম তার ওই বান্দাদের জন্য, যে-বান্দা আল্লাহর পথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলে গেছে, তার জন্য আরও বেশি আকুল হন। আরে ভাই! উচিত বিচার তো এই হতো যে, বান্দা যখন রব্বে কারীমের দরবার ফেলে, রব্বে কারীমকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়, তখন তার পিঠে পদাঘাত করে তাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া এবং আযাবে নিপতিত করা। এটি উচিত কাজ ছিল। এমন বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারের দরজা বন্ধ করে দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু আমাদের মেহরবান আল্লাহ তো তেমন নন। ইরশাদ হচ্ছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦

'হে মানবজাতি! কোন জিনিস তোমার দয়াময় পরোয়ারদেগার থেকে তোমাকে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার বানিয়েছে?'[১]

---

১. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

রবের সাথে বিরোধ করে চলছ কেন? রবের দরবার ছেড়ে কোন ধোঁকার পেছনে ছুটছ। আসো; রব্বে কারীমের দরজায়ই আসো। আল্লাহ বলেন, আমি তোমার সকল সমস্যার সমাধান করে দেব। তোমার দুনিয়া ও আখেরাত সব সুন্দর করে দেব।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সত্য তাওবা করার তাওফীক দান করুন। সামনের জীবনটাকে নেক পথে, ভালো ও কল্যাণকর পথে পরিচালিত করার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

খতমে বোখারি শরীফ

'দীনি মাদরাসার শিক্ষা সমাপণকারী, দাওরায়ে হাদীছ সমাপণকারী সকল ছাত্রীর প্রতি উপদেশ এই যে, আপনারা দীনি শিক্ষার উচ্চস্তর দাওরায়ে হাদীছের ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে ঘরে ফিরতে যাচ্ছেন। সেখানে আপনাদের জন্য নতুন-নতুন আরও পরীক্ষা অপেক্ষা করছে। কোথাও দেখা যায়, ঘরের পরিবেশ-পরিস্থিতি দীনের অনুকূল নয়। মাদরাসার মতো দীনি পরিবেশ বাড়িতে নেই। কোথাও ঘরের লোকই দীনের বিরোধী। কোথাও কারও পরিবারে বেদআত, রুসূমাত, কুসংস্কার ও বদ-আখলাকি ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে দীনের জন্য মাদরাসার জীবন যতটুকু শান্ত ও সুখসমৃদ্ধ ছিল, সামনের জীবনটা বড়ই নাজুক এবং কঠিনই হবে বটে।

মনে রাখবেন, সুন্নাহর অনুসরণেই রয়েছে উম্মাহর কল্যাণ ও শান্তি। সুন্নাহর ওপর আমলকারীদের চেহারা কেয়ামতের দিন নূরে ঝলমল করবে। আকাশের চাঁদ-তারা যেভাবে ঝলমল করে, সেভাবে সুন্নাহর অনুসারীদের চেহারাও ঝলমল করবে। তাই আপনারা আপনাদের ঘরকে, ঘরের মানুষগুলোকে, আপনার আত্মীয় ও প্রিয়জনকে সুন্নাহমতো পরিচালনা করার জন্য আপন-আপন প্রচেষ্টা চালাবেন। আলোকিত পরিবার গঠনের চেষ্টা করবেন।'

খতমে বোখারি শরীফ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আনন্দঘন মুহূর্ত

মানুষ নেক কাজ করার যে-তাওফীক প্রাপ্ত হয়, তা আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের রহমতেই প্রাপ্ত হয়। তাই প্রত্যেক নেক কাজ সম্পাদন করেই রব্বে কারীমের শুকরিয়া আদায় করবে। আজ এখানে এক ঝাঁক তরুণী দীনি শিক্ষার উচ্চস্তর দাওরা হাদীছের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষা সমাপণ করতে যাচ্ছে। এটি অনেক বড় একটি নেক আমল। তাই এর জন্য দরদভরা হৃদয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। আজ যারা আলেমা হচ্ছে, তাদের কিতাবগুলোর মধ্যে একটি কিতাব হচ্ছে এই বোখারি শরীফ। বোখারি শরীফের শেষ হাদীছটি হচ্ছে–

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

'দুটি কালেমা এমন রয়েছে, যা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়, উচ্চারণে হালকা আর নেকির পরিমাপে অত্যন্ত ভারী। তা হচ্ছে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

প্রিয় মুমিন ভাইও বোনেরা! আমাদের এই নারী-শিক্ষার্থীরা দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছেন' যে, আমরা দীনি তালিম হাসিল করব, দীনি ইল্‌ম অর্জন

করব। জীবনের কয়েকটি অমূল্য বছর তারা দীন শিক্ষার কাজে ব্যয় করেছে। আজ তারা তাদের শিক্ষা সমাপণ করতে যাচ্ছে। আজ তারা দাওরা হাদীছের কিতাব খতম করতে যাচ্ছে। আজ তাদের মাথায়, তাদের চোখে নূর পূর্ণতা পাওয়ার দিন। আজ তাদের পূর্ণিমার দিন। আজ বিদায়ের বেদনায় অন্তরটাও ব্যথিত। আবার প্রাপ্তির আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল। আজ শুকরিয়া ও আনন্দ প্রকাশের দিন।

মানুষ যখন নিজের দিকে তাকায়, তখন বলে, হায়! আমার যা হওয়ার কথা ছিল তা তো হতে পারিনি। আর যখন সে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের রহমত দেখে, তখন বড় হয়রান হয়ে যায়, বিস্মিত হয়ে তাকায়। ভাবে, আমি তো বাস্তবেই বোখারি শরীফের শেষ হাদীছটিও আজ খতম করে ফেলছি। আমি তো দীনি শিক্ষার এক সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলে এসেছি।

কিছু জরুরি কথা

একজন মানুষ পথ চলতে-চলতে হঠাৎ পেছনে তাকিয়ে যখন দেখে, তখন নিজেই অবাক হয়ে যায়, বিস্মিত হয়ে যায়, আরে! আমি এই পথ অতিক্রম করে এসেছি! এই যে মেয়েগুলো, এরা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে-করে তাদের ছাত্রী জীবনের পথটা অতিক্রম করে এসেছে। এমনকি আজ বোখারি শরীফের সর্বশেষ সবক নিচ্ছে। তবে আমাদের এই ছাত্রীদের কিছুতেই একথা ভাবা উচিত হবে না যে, আমরা তো আলেমা হয়ে গেছি। আমাদের আর কোনো পড়াশোনা নেই। বরং একথা ভাববে যে, আমরা সবে যোগ্য ছাত্রী হলাম। এখনই নিত্যনতুন সকল শিক্ষাকে গ্রহণ করার মোক্ষম সময়। আজই বরং পূর্ণ পিপাসা নিয়ে ইল্‌ম অন্বেষণের নতুন দিগন্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এখন কাজ হচ্ছে পেছনে পড়ে আসা কুরআন ও হাদীছকে বারংবার পড়তে থাকা। নতুন করে সেগুলো পুনঃপুন পড়তে থাকা। নিজের জীবনটাকে কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী পরিচালনা করা। তাকওয়াবান হওয়া, সত্যও ন্যায়ের পথে অগ্রসর হওয়া। তাকওয়া, তাহারাত ও আমলের ময়দানে এগিয়ে চলা। মানুষের ইল্‌ম যত বৃদ্ধি পায়, তার মাঝে আল্লাহভীতি ও তাকওয়া-তাহারাতের মাহাত্ম্য তত বেশি অর্জিত হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আলেমরা-ই তাঁকে বেশি ভয় করে।'[১]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ২৮

কুরআনের এই ঘোষণা আমাদের সামনে বিদ্যমান। যে যত বড় আলেম, তার মাঝে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রেম এবং তাকওয়া ও খোদাভীতি তত বেশি থাকে। যদি কারও ইল্‌ম বাড়ে, কিন্তু তাকওয়া না বাড়ে, তাহলে বুঝতে হবে, তার মাঝে সমস্যা আছে।

رَبٌّ শব্দের মর্মকথা

কুরআনের একটি ছোট আয়াত আছে, যাতে কয়েকটি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। কেমন যেন আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির শব্দগুচ্ছও বড়ই আশ্চর্যজনক। অর্থও বড় বিস্ময়কর। সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলবার আছে। কথাগুলো বিশেষত ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। খুব মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন।

আয়াতটি এই—

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا

'হে আল্লাহ! হে রব! যেমনিভাবে আমার মা-বাবা শিশুকালে আমাকে লালনপালন করেছেন, তেমনিভাবে আমার পিতামাতাকে রহমত দান করুন।'[১]

দেখুন। আল্লাহ তা'আলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলে দিচ্ছেন—

وَقُلْ

'হে নবী! আপনি বলুন।'

رَبِّ

'হে আমার রব!'

রব কাকে বলে? রব ওই সত্তাকে বলে, যিনি ধীরে-ধীরে আপন বান্দাকে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছিয়ে দেন, উদ্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যান। যেমন দেখুন, মা-বাবা আপন সন্তানের লালনপালন করেন। বাচ্চাটি ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠে যৌবনে পদার্পণ করে। মাবাবা তার মুরুব্বী। সেদিক থেকেই কুরআন উক্ত

---

১. সূরা বানী ইসরাইল : আয়াত ২৪

ঘোষণা দিয়েছে যে, মা-বাবাও তো এক প্রকারের লালনপালনকারী। তাই তাদের জন্য দু'আ করো। কুরআনের ভাষায় দু'আটিকে শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে رَبِّ শব্দে যার অর্থ লালনপালনকারী।

জেলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যে-দুজন ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছে এবং কথোপকথন হয়েছে, তাদের সাথে হযরত ইউসুফ (আ.)ও দুনিয়াবি মালিক বোঝানোর জন্য رَبِّ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বাক্যটি এই—

اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ

'তোমরা তোমাদের রবের (মালিকের) কাছে আমার কথা বলো।'[১]

বোঝা গেল, মা'বুদ ও গায়রে মা'বুদ এবং খালেক ও মাখলুক মোটামুটি সবার জন্যই ক্ষেত্রবিশেষে শব্দটি ব্যবহার হয়। যেমন سميع এবং بصير ইত্যাদি শব্দও খালেক-মাখলুক সবার ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। তবে ব্যবহারের এসব ক্ষেত্রের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। অর্থগত পার্থক্য আছে অনেক। রব্বে কারীমের লালনপালনের ধারা এক রকম আর দুনিয়াবি মালিকদের লালনপালনের ধারা ভিন্ন রকম।

আল্লাহর লালনপালন

মুফাসসিরীনে কেরাম লিখেছেন, রব্বে কারীমের লালনপালন করা এবং সাধারণ বান্দাদের বা দুনিয়াবি মালিকের লালনপালনের মাঝে তিনটি বুনিয়াদি পার্থক্য আছে।

এক. মা-বাবা তাদের কয়েকটি সন্তানের লালনপালন করে। কয়েকজন সদস্যের লালনপালন করে। অথচ আমাদের রব্বে কারীম তো সকল মা-বাবা, সকল সন্তানসন্ততি এবং সকল সৃষ্টিজীবকে প্রতিপালন করেন।

তিনি মানব-দানব সকলের রব। পাখপাখালি, তরুলতা, গরু-ছাগল মোটকথা, সকল প্রাণীর তিনি রব। তিনি পালনকারী। এটি বড় একটি পার্থক্য।

দুই. মানুষ তাদের সন্তানদের লালনপালন সামান্য সময় ধরে করে, অল্প সময়ব্যাপী করে। উদাহরণস্বরূপ, মা-বাবা সর্বোচ্চ ২০/২৫ বছর পর্যন্ত

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৪২

সন্তানকে লালনপালন করেন। পরে এমন একটি সময় আসে, যখন সন্তানরা নিজেরাই কামাই-উপার্জন করে বাবা-মাকে লালনপালন করেন। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাবাবা সন্তানদের লালনপালন করেন। অথচ অনন্তকাল থেকে, সেই শুরু থেকে, হাজারো, লাখো, কোটি বছর ধরে সমগ্র বিশ্বজাহানকে, সমগ্র সৃষ্টিকে লালনপালন করে আসছেন রব্বে কারীম। আল্লাহর লালনপালন, প্রতিপালনের তো কোনো পরিসীমা নেই।

তিন. মাখলুক যে লালনপালনটা করে, তা কারও-না-কারও সাহায্যে হয়ে থাকে। কারও-না-কারও সাহায্য-সহায়তা নিয়েই কিন্তু এক মাখলুক আরেক মাখলুকের প্রতিপালন করে থাকে। আমাদের রব্বে কারীম এমন প্রতিপালক যে, তাঁর কারও সাহায্য নিতে হয় না। তিনি অমুখাপেক্ষী রব। তিনি সবাইকে সাহায্য করেন। তাঁকে কেউ সাহায্য করবে এমন অবস্থা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি এমন খালেক, যিনি একা-ই সকল মাখলুকের লালনপালন করেন।

আরও কত পার্থক্য যে আছে বান্দার লালনপালন এবং আল্লাহর লালনপালনের মধ্যে। সেসব শুধু নিজে উপলব্ধি করার মতো বিষয়– বলে বোঝানোর মতো বিষয় নয়। তো আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো গুণ আছে। সেসবের মাঝে 'রব' গুণটি বড়ই শানদার এবং বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আপনি যদি চিন্তা করেন, তাহলে দেখবেন, رَبٌّ শব্দটি কুরআনুল কারীমের মধ্যে বেশি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে।

কে প্রথম শিক্ষক?

মুহতারাম হাজিরীন! মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। যখন মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি। মানবের রূহ আলমে আরওয়াহে ছিল, সে সময় আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত হযরত আদম (আ.)কে দাঁড় করালেন। আপন কুদরতি ডান হাত আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর পিঠে বুলিয়ে দিলেন। এমন সময় একটি মাখলুক বের হলো। দেহের তুলনায় সেটি ছোট একটি পীপিলিকার সমান। আর আকৃতি ও রূপগতভাবে মানবের মতো। এবার একের-পর-এক সকল মানব তার পৃষ্ঠদেশ থেকে বেরিয়ে পড়ল। এবার আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতি বাম হাত হযরত আদমের পিঠে বুলিয়ে দিলেন। এবারও তেমনি কিছু বের হলো। হযরত আদম (আ.) সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা হে আল্লাহ?

আল্লাহ ইরশাদ করলেন, এরা আপনার তোমার সন্তান। তো আবার দেখুন, সন্তানের প্রতি বাবা-মার তো সেই আজন্ম ভালোবাসা ও মহব্বত থাকেই। তাই আদম (আ.) যখন শুনলেন, এরা তাঁর সন্তান, এবার তিনি তাদের সবার ওপর মহব্বতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মহব্বতের দৃষ্টি নিক্ষেপের পর তিনি দেখলেন, কিছু সন্তানের চেহারা দারুণ সুন্দর ও উজ্জ্বল। আর কিছু সন্তানের চেহারা বড় বিশ্রী ও কৃষ্ণ। মা-বাবা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে থাকেন, তার সন্তান যেন ভালো হয়, সভ্য হয়, সৎ ও আদর্শবান হয়। তাই হযরত আদম (আ.) আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, হে রব্বে কারীম। আপনি আপনার সকল বান্দার চেহারা একই রকম উজ্জ্বল ও আলোকময় করে দিলেন। তাদের মধ্যে যাদের চেহারা নূরে ঝলমল দেখাচ্ছে, তারা হচ্ছে, আসহাবুল ইয়ামীন তথা সৎপথ প্রাপ্ত ও ডান পথের পথিক। আর যাদের চেহারা কালো, তারা আসহাবুশ শিমাল তথা অসৎপথের পথিক, বাম পথের পথিক। প্রথম দল আসহাবুল জান্নাহ। আর দ্বিতীয় দল আসহাবু জাহান্নাম। এবার রব্বে কারীম সকল বান্দার সাথে কথোপকথন করলেন–

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

'আমি কি তোমাদের রব নই?'

প্রশ্ন শুনে সবাই হতবাক। কারণ, এই প্রশ্ন তো শোনেনি কেউ। সে-সময় সর্বপ্রথম আমাদের নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন–

بَلٰى

'হ্যাঁ; অবশ্যই আপনি আমাদের রব।'

আমাদের নবীজির জবাব শুনে বাকিরাও বলে উঠল–

بَلٰى

'হ্যাঁ; আপনি আমাদের রব।'

দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তারপর অন্যরা জবাব দিল। নবীজির জবাব শুনে অন্যরা জবাব দিতে সক্ষম হলো। নবীজিকে দেখে অন্যরা জবাব শিখল। এদিক থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানবের শিক্ষক হয়ে গেলেন। বোঝা গেল, প্রথম শিক্ষক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

রিযিক দেবেন কে?

যখন সকল মাখলুক ওয়াদা করল, যে হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের রব, এবার আল্লাহ তা'আলা মানবের পরীক্ষা নিতে তাদের দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। মানবের পরীক্ষা হবে, তারা যে বলেছে, আল্লাহ তাদের রব, তাদের এই দাবিতে তারা কতটুকু সত্যবাদী। তারা তাদের এই দাবিতে কতটুকু অটল ও অবিচল।

তো, এই দুনিয়া নামক বিশাল পরীক্ষাকেন্দ্রে আমরা সকলেই পরীক্ষার্থী। দুনিয়ায় এসে আজ আমরা আমাদের লালনকারী কাকে ভাবছি। আমাদের চাকরি, আমাদের কৃষি, আমাদের ব্যবসা ইত্যাদিকেই আমাদের প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করেছি। যেখান তোকে মানুষ সামান্য টাকা-পয়সা উপার্জন করতে পারে, তাকেই মানুষ নিজের রিযিকদাতা ভেবে বসেছে। তাকেই পালনকারীরূপে গ্রহণ করেছে। আর আজকাল এই অবস্থাটা এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, নাউজুবিল্লাহ! মানুষ তো আজ আল্লাহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। মানুষের দৃষ্টি এখন শুধুই দুনিয়ার প্রতি, দুনিয়ার উপায়-উপকরণের প্রতি।

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امید

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

'আজ মূর্তি-প্রতিমায় বিশ্বাসী তুমি, খোদার প্রতি অবিশ্বাসী।
বলো তাহলে, কাফেরি ও কুফরি বলবে কাকে তুমি?

প্রকৃত রিযিকদাতা কে? এর সমাধান বের করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ বিষয়। আজ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য ছেলেমেয়েরা মাদরাসায় এলে, ইল্‌ম শিক্ষা করতে এলে এই তালেবে ইল্‌মদের হতাশ করা হয়, তাদের প্রশ্ন করা হয়। তুমি খাবে কোথা থেকে? কেন মানুষ এই প্রশ্ন করে? কারণ, ঈমান মানুষের কমজোর, বিশ্বাস মানুষের নড়বড়ে। আল্লাহর ওপর আজ মানুষের একিন নেই। আজ মানুষের একিন পকেটের ওপর। খুব খেয়াল করে শুনুন। বড়ই জরুরি কথা।

আল্লাহ তা'আলা যেখান থেকে তাঁর নবীদের খাবার খাইয়েছেন, অবশ্যই তিনি তাঁর ওয়ারিশদেরও তাঁর স্থলাভিষিক্তও, প্রতিনিধিত্বকারীদেরও সেখান থেকেই খাওয়াবেন। সেখান থেকেই তাদের লালনপালনের ব্যবস্থা করবেন।

লালনপালন করেন কে?

আল্লাহ আমাদের পালনকারী। তিনি আমাদের রব। তিনি শিশুদের পালন করেন। দেখুন, বাচ্চাটি কত ছোট ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তার মা-বাবার হৃদয়ে ভালোবাসা ও মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। এই মহব্বত ও ভালোবাসার টানে বাধ্য হয়ে পিতামাতা সন্তানকে লালনপালন করেছেন। শীতের রাতে একমাত্র বাচ্চাটার কারণেই মা কয়েকবার জাগ্রত হন, বিছানা ছেড়ে ওঠেন, সন্তানের সেবা করেন।

সন্তানের কারণেই সম্পদ উপার্জনে বাবাকে বাইরে যেতে হয়, কাজকর্ম করতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চাটা যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে সারাটা রাত বাবা জাগ্রত থাকেন। মানুষ যদি চিন্তা করে, মা-বাবার জন্য কি বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, বাচ্চার জন্য, সন্তানের জন্য তারা এত কষ্ট করেন? মা-বাবা তো উভয়েই নওজোয়ান ছিলেন। তারা মজা উড়াতেন। আনন্দ-আহ্লাদে জীবন যাপন করতেন। এটি তো তাদের জন্য সুখের ছিল। কিন্তু এই ছোট একটি বাচ্চার মহব্বতই তাদের মাঝে এতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল যে, মা-বাবা আত্মভোলো হয়ে যান। নিজেদের আরামের কথা ভুলে যান। সন্তানের আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তিকেই তারা এখন অগ্রাধিকার দেন।

আগে বাবা বাজারে গেলে নিজেদের পছন্দসই জিনিস কিনে আনতেন। বাচ্চা জন্মের পর বাবা-মা বাজারে গেলে বাচ্চার পছন্দের জিনিস খোঁজেন, ছোট ছোট জিনিস খোঁজেন। বাজারে গেলেই আগে ভাবেন বাচ্চার কথা, সন্তানের কথা। সন্তানের জন্য বাবা-মা নিঃস্বার্থ খাদেম হয়ে যান। নিজেদের হাসি-আনন্দ এবং আরাম-আয়েশের কোনো ফিকিরই নেই তাদের। নিজ বাচ্চাকে ঘিরেই ঘুরপাক খায় তাদের সকল স্বপ্ন, সকল চিন্তা, সকল ভাবনা। এমনটা কেন হয়? কারণ, আল্লাহ সবার হৃদয় বাচ্চার প্রেম ও ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন। তারা বলেন, বাচ্চা খুশী তো আমরাও খুশী। বাচ্চার সুখই আমাদের সুখ। বাচ্চার আনন্দই আমাদের আনন্দ। বাচ্চা কোনো কারণে ব্যথা পেয়ে কান্নাকাটি করলে মা-বাবাও কেঁদে ফেলেন। বাচ্চার মুখে হাসি ফুটলে মা-বাবার মুখেও হাসি ফোটে।

তো এসব কিছুই মা-বাবা বাচ্চার ভালোবাসার কারণে করেন। এই ভালোবাসাটা আল্লাহ মা-বাবাকে দিয়ে দিয়েছেন। তার কারণে ছোট একটি বাচ্চাকে মা-বাবা লালনপালন করে আদরে যত্নে বড় করেন। বাচ্চার কোনো

কিছুর প্রয়োজন হলে যে কান্না করতে থাকে, কান্নাই তার ভাষা। কান্নার মাধ্যমে সে সব সমস্যা সমাধান করে। কান্না শুনে বাবা-মা তার কাছে ছুটে আসে, তার প্রয়োজন দেখে। এর থেকেই কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন– হে মানুষ। যখন তুমি কাঁদতে পারতে তখন আল্লাহই সব জরুরত পুরা করে দিতেন। সকল বিষয়ের সমাধান করে দিতেন। আজ তুমি বড় হয়ে কান্না ছেড়ে দিয়েছ। তাই আজ তোমাকে আল্লাহ সাহায্য করছেন না। আজও যদি তুমি তাহাজ্জুদের সময় উঠে কাঁদতে পার, কান্না কাটি করে চাইতে পার তাহলে আজও তোমাকে আল্লাহ তা'আলা সকল পেরেশানিতে, সকল সমস্যাও সকল বিপদে সাহায্য করবেন। আল্লাহই পরোয়ারদেগার। তিনিই লালনপালনকারী। তিনি বান্দাকে তাঁর মুনাসিবমতো তার সময়মতো নেয়ামত দান করে থাকেন।

যথাসময়ে নেয়ামত দেন কে?

বান্দার যখন যা দরকার, তখন তাকে তা কে দান করেন? আল্লাহ দান করেন। দেখুন, শুরুতে একটা বাচ্চা কত ছোট থাকে। তার মুখে দাঁত থাকে না। শুরুতেই যদি আল্লাহ তার মুখে দাঁত দিয়ে দিতেন, তাহলে বাচ্চাটা মায়ের স্তনকে ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত করে ফেলত। মা অসহনীয় যন্ত্রণায় ভুগতেন।যখন বাচ্চা দাঁতবিহীন অবস্থায় দুধ পান করতে-করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন ধীরে-ধীরে দাঁতও উঠতে থাকে এবং বাচ্চার দুধপানের নির্ধারিত সময়সীমাও শেষ হতে থাকে। দাঁত উঠে যাওয়ার আগে-আগেই বাচ্চার দুধ খাওয়ার সময় শেষ হয়ে যাব। ফলে মায়ের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। এবার বাচ্চা ভাত, রুটি বিস্কুট ইত্যাদি খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। তখন দাঁতও পুরোপুরি উঠে যায়। আল্লাহ তখন তার দাঁতকে মজবুত করেন।

তারপর দেখুন, বাচ্চাটার আকল ও জ্ঞান পূর্বে পরিপূর্ণ ছিল না। এবার বাচ্চা যখন ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকে, তখন তার জ্ঞানও শক্তিশালী হতে থাকে। যুবক হয়ে যায় সেদিনের ছোট্ট বাচ্চাটি। যুবক হওয়ার পর বিবাহবন্ধনের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ তা'আলা। তারপর আবার এর ঘরে সন্তান আসে। তারপর তাকে আল্লাহ তা'আলা সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

তো দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কত দয়ালু! কত মেহেরবান! প্রত্যেক বান্দাকে তিনি তার প্রয়োজন অনুপাতে সময়মতো সব নেয়ামতের ব্যবস্থা করে দেন। তো আমরা আমাদের এই জীবনটায় যত নেয়ামতই প্রাপ্ত হচ্ছি, সব আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ এবং তাঁর দানেই প্রাপ্ত হচ্ছি।

মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ

আর আমাদের মানুষের অবস্থা কী? দেখুন, এত সব নেয়ামত ভোগ করার পরও যখন আমাদের মাঝে যৌবন আসে, আমরা যৌবনে প্রবেশ করি, তখনই বিশেষ করে আল্লাহর ওপর নানা রকম অভিযোগ করতে থাকি। আল্লাহর দরবার ছেড়ে ভিন্ন পথে পা বাড়াই। আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾

'ধ্বংস হোক মানুষ। কত অকৃতজ্ঞ সে! তিনি তাকে কী বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?'[১]

মানুষকে তার রূপ ও স্বরূপের বাস্তবতা শুনিয়ে দিলেন। বোঝাতে চাইলেন, দেখো, তোমার পরোয়ারদেগার কে এবং কেমন? তিনি তোমাদের পানির ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছেন। আবার দেখুন, কখনও-কখনও আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত মহব্বতের সাথে বান্দাকে আহ্বান করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾

'হে মানব! কীসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?'[২]

কেন এমন দয়াময় রবের দরবার ছেড়ে দিয়ে ছুট দিয়েছ দিকদিগন্তে? কেন চলে গেছ অন্যের দুয়ারে?

রব কে?

আল্লাহ তা'আলার সিফাতে রুবুবিয়াত তথা পালনকর্তাস্বরূপ গুণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে কদমে-কদমে প্রত্যক্ষ করছে। তাই ওই গুণটির আলোচনা কুরআনের সূচনাতেও উপস্থাপন করা হয়েছে এবং কুরআনের সমাপণী অংশেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

---

১. সূরা আবাসা : আয়াত ১৭, ১৮

২. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

শুরুতে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের জন্য।'[১]

দেখুন, এখানে কুরআনের শুরু অংশেই আল্লাহ তা'আলা যে রব্বুল আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা, সে কথা উল্লখ করা হয়েছে।

আবার কুরআনের সর্বশেষ সূরা সূরা নাস-এর মধ্যেও সেই রব শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

'বলুন, আমি মানবের রব তথা পালনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করছি।'[২]

অর্থাৎ– এখানকার মানবের পালনকর্তার আলোচনা রয়েছে। তো কুরআনের প্রারম্ভেও বুঝিয়েছেন যে, তুমি তোমার রবের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরি করে নাও। এই দুনিয়ায় থেকেই রব্বে কারীমকে সন্তুষ্ট করে নাও। তাই তো গোটা জীবনটা পার করার পর যখন কোনো বান্দা কবরে গমন করে, তখন তাকে প্রথম প্রশ্নটি করা হয় রব সম্পর্কে। ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করে–

مَنْ رَبُّكَ

'তোমার রব কে?'

যদি দুনিয়ার মধ্যে এসব আদায় করতে পার, এই পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পার, তাহলে সে সঠিক জবাব দিতে পারবে। যদি দুনিয়ায় দীন অনুযায়ী না চলে থাকে, তাহলে কবরে গিয়ে সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন সকল মানুষ আল্লাহ তা'আলার সামনে সমবেত হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলের হিসাব নেবেন। জান্নাতিদের জান্নাতের দিকে পাঠাবেন। জান্নাতে পাঠানোর বিষয়েও রবের আলোচনা রয়েছে–

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا

---

১. সূরা ফাতেহা : আয়াত ১

২. সূরা নাস : আয়াত ১

'আর ওই সকল লোক, যারা আপন রবকে ভয় করে, তাদের দলে-দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।'[১]

তো দেখুন, আল্লাহ যে রব স্থানে-স্থানে তার আলোচনা এসেছে। মানুষ তো রব-রব যিকির করেই; ফেরেশতারাও আল্লাহর এই সিফাতের যিকিরে মশগুল থাকে—

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ

'আপনি আরশের আশপাশে ফেরেশতাদের দেখতে পাবেন, তারা দল বেঁধে রব্বে কারীমের হামদ ও তাসবীহ আদায় করছে। তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে।'[২]

দেখুন, ফেরেশতারাও রব হিসেবে আল্লাহর তাসবীহ আদায় করছে।

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'আর বলা হবে, সকল প্রশংসা ওই রবের জন্য, যিনি তামাম জাহানের মালিক।'[৩]

রবের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নিন

আল্লাহর প্রভূত্বের ঘোষণা দুনিয়ায়, আসমানে, জমিনে, জান্নাতে সর্বত্রই। সব জায়গায় শুধু রব আর রব। তাই তো আমাদের জন্যও আবশ্যক হলো সেই ঘোষণা প্রদান করা। আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কটা সুদৃঢ় করে নেওয়া। মানবের জীবনে কিছু সম্পর্ক থাকে। যেমন– একজন নারীকে মানুষ 'মা' ডাকে। তো পৃথিবীর সকল মা-ই বাচ্চার প্রতি মমতাময়ী হয়ে থাকেন, মেহেরবান হয়ে থাকেন। তবে একজন মানুষ যে-নারীকে মা ডাকে, সেই নারী সবার তুলনায় এই মানুষটিকে বেশি মায়া করে, ভালোবাসে। একজন পুরুষকে মানুষ বাবা ডাকে। এই বাবা তার বাচ্চার প্রতি এক অনাবিল ভালোবাসা থাকে। তো এই 'মা' শব্দটি 'বাবা' শব্দটি এসবের মাঝে একটা সম্পর্কের আকর্ষণ আছে। এসব শব্দ বলার সাথে-সাথে যাকে বলা হচ্ছে,

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৭৩
২. সূরা যুমার : আয়াত ৭৫
৩. সূরা যুমার : আয়াত ৭৫

তার মনে মাতৃ বা পিতৃপ্রেম সবেগে তরঙ্গ খেলে যায়। তাই তো আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপন বান্দাকে যত দু'আ শিখিয়েছেন, আম্বিয়া কেরাম যত দু'আ চেয়েছেন, তার অধিকাংশ দু'আই এমন, যেগুলোতে 'রব' শব্দটি আছে, রব গুণটি আছে। হযরত আদম (আ.) দু'আ করেছেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا

'হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নফসের প্রতি জুলুম করেছি।'[১]

তো رَبَّنَا رَبَّنَا নাম নিয়েই প্রায় সব দু'আ বর্ণিত। দু'আগুলো তো আল্লাহই শিখিয়েছেন। যেমন–

قُلْ

'হে নবী! আপনি বলে দিন।'

رَبِّ اغْفِرْ

'হে আমার রব! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।'

যদি সন্তান তার মাকে ডাকে, মা! আমাকে অমুক জিনিসটা দাও, তাহলে সে তার সন্তানের দিকে নিবিষ্ট হয়ে যায়। আর যদি মা উচ্চারণ না করে বলে, তাহলে ততটা মনোযোগ সন্তানের প্রতি মায়ের হয় না।

তো দেখুন, 'মা' শব্দে কী আকর্ষণ লুকিয়ে রেখেছেন আমাদের রব। তেমনি কোনো সন্তান যদি তার পিতার কাছাকাছি গিয়ে শুধু বলে, আব্বু! আমাকে ওই জিনিসটা দাও, তাহলে হৃদয়ে এক অকৃত্রিম ভালোবাসার ঢেউ খেলে যায়। সাথে-সাথে তিনি বাচ্চাকে জিনিসটা নিয়ে দেন।

তো দু'আ শেখানোর সময়ও তেমনি করে শেখানো হয়েছে। যেন বলা হলো, হে বান্দারা! তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে আব্বু-আম্মু বলে ডাক দিয়ে যেমনিভাবে তোমার প্রয়োজনের জিনিসটি চাও, তেমনিভাবে আমাকে রব বলে ডাক দিয়ে আমার কাছে তোমার প্রয়োজনের জিনিসটি প্রার্থনা করো। বলো–

رَبِّ اغْفِرْ

'হে আমার রব! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।'

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার জীবনের সব প্রয়োজন পূরণকারী! হে ওই মহান সত্তা, যিনি আমাকে হাসি-আনন্দ ও দুঃখ-বেদনায় আশ্রয় দিয়ে রাখেন! আপনার রহমত ও বরকতেই তো আমি বেঁচে আছি। আপনি আপনার গোপন খাযানা দিয়ে আমাকে লালনপালন করেন। হে আমার রব! আমাকে মাফ করুন।

তো যখন বান্দা 'রব' শব্দ বলে আল্লাহকে ডাকে, তখন আল্লাহর রহমতের সাগরে জোয়ার এসে যায়। আল্লাহর রহমত বান্দার প্রতি আকর্ষিত হয়। তাই তো রব শব্দে ব্যবহার করে দু'আ শেখানো হয়েছে। মা যদি ঘরে বসা থাকেন আর বাচ্চা আঙিনা থেকে মা বলে ডাক দেয়, তা হলে শোনার সাথে-সাথে মা ছুটে আসেন।

এসময়টাতে মাকে যদি বলা হয়, আরে! আপনি বসুন; একটু চা পানি নিয়ে তারপর আপনার ছেলের ডাকে সাড়া দিন, সাথে-সাথে মা বলবেন, কক্ষনোই নয়। যদি কেউ বলে, আপনি তো খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারটা শেষ করে তারপর আপনার ছেলের ডাকে সাড়া দেবেন, তাহলে মা বলবেন, কক্ষনোই নয়। ছেলে আঙিনা থেকে মা ডাক দেওয়ার পর যদি কেউ মাকে ধরে রাখে আর বলে, আমি আপনাকে যেতে দেব না, তাহলে তো মায়ের চোখে পানি চলে আসে। বলে, আরে! আমার বাচ্চাটা আমাকে ডাকছে। জানি না কী যেন হয়েছে তার। আমি ওর ডাকে সাড়া না দেই কী করে।

তো যেমনিভাবে মা ডাক শুনে মায়ের হৃদয়ে ঝড় ওঠে, তেমনিভাবে মানুষের পক্ষ থেকে রব ডাক শুনে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তীব্রভাবে জোয়ার ওঠে। আল্লাহ বলতে থাকেন, আমার বান্দা আমাকে ডাকছে। আমি বান্দার ডাকে সাড়া না দেই কেমন করে! ফেরেশতাদের বলেন, দেখো, আমার বান্দা জানে, তার একজন পালনকারী রব আছে।

রবের সাথে সম্পর্ক গড়া সবচেয়ে সহজ কাজ

কোনো এক জামেয়ায় বোখারি শরীফের দরস দিচ্ছিলাম। আমি ছাত্রীদের প্রশ্ন করলাম, বলো তো কাকে সবচেয়ে সহজে খুশি করা যায়? কার কাছে চাইলে সহজে পাওয়া যায়? এক ছাত্রী জবাব দিল, মাকে। মায়ের কাছে চাইলেই সহজে একটা জিনিস পাওয়া যায়। আমি বললাম, কীভাবে? সে বলল, আমি রোজ আমার ভাইদের দেখি, তারা কোনো-না-কোনো উল্টাপাল্টা কাজ করে ফেলে। আম্মু কিছু বললে রাগ হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আমি দেখি, কিছুক্ষণ পর মা উজু করে নামায পড়েন, দু'আ

করতে শুরু করেন, হে আল্লাহ! আমার বাচ্চাটা কোনো অঘটনা ঘটিয়ে না ফেলে যেন। আপনি হেফাযত করুন হে মাওলা! কোনো খারাপ বন্ধুর সাথে চলে না যায় যেন। তাকে নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে দাও। খাওয়ার সময় খাবার খান না। মা বড় দুশ্চিন্তায় ভোগেন তখন, খুব অস্থির হয়ে যান। পরে ভাই ফিরে এলে একটি কথাও তাকে বলেন না। সুন্দর করে খাবার খাইয়ে দেন। তো কত সহজে আমার মাকে কাবু করে ফেলে আমার ভাই।

সন্তানকে সতর্ক করার জন্য অনেক সময় মা রাগ করেন। আবার পরে মা মাফও করে দেন। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহের জন্য নারাজ হন, অসন্তুষ্ট হন। কারণ, তিনি তো রব। তার রবসুলভ শান আমার বান্দাসুলভ সিফাতের আলোচনা দাবি করে। আবার শেষেও সেই পালনকর্তাসুলভ আলোচনা। আর কুরআনের স্থানে-স্থানে তো সেই একই বিষয়ের আলোচনা আছেই। এর মাধ্যমে রব্বে কারীম তো এই ঘোষণা-ই দিয়ে দিয়েছেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! এসো; আমার দরবারে এসো। আমার দুয়ারে এসো। আমি রব্বে কারীম তোমাদের গুনাহগুলো, তোমাদের ভুলগুলো তোমাদের অন্যায়গুলো মাফ করে দেব।

সেজন্যই তো আল্লাহ তা'আলা বড় মহব্বতের সাথে বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

'হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?'[১]

তুমি তোমার রবের দরবার ছেড়ে কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছ? কোথায় ঘুরছ দিকভ্রান্তের মতো। তো দেখুন, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে আপন রহমতের দিকে ডাকছেন, নিজের দিকে তাকে আকৃষ্ট করছেন।

আপনারা নিশ্চয় দেখেছেন, সন্তানের ওপর মা যদি রেগে যান, তখন যদি সন্তান মাফ চায়, তাহলে মা তাকে মাফ করে দেন। আর যদি এমন হয় যে, মা মাফ করতে চাচ্ছেন না; কিন্তু সন্তান মায়ের পা জড়িয়ে ধরে, তারপরও যদি মা তাকে মাফ না করেন, এবার সন্তান মায়ের পা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। এবার মায়ের দিল গলে যায়। মায়ের হৃদয় নরম হয়ে যায়। দারুণ মমতায় মা তার আঁচল দিয়ে ছেলের অশ্রু মুছে দেন। বলেন, বাবা! আর কাঁদিস না।

---

১. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

তেমনি যদি আল্লাহর দরবারে এসে, তাঁর দুয়ারে এসে কোনো বান্দা কেঁদে-কেঁদে মাফ চায়, তখন আল্লাহও তাঁর কুদরতি হাত বান্দার পিঠে বুলিয়ে দেন। বান্দাকে আদর দেন, মমতা দেন। কুদরতি আঁচলে বান্দার অশ্রু মুছে দেন আর বান্দাকে মাফ করে দেন। আল্লাহর রহমত, আল্লাহর দয়া, আল্লাহর করুণা এবং আল্লাহর মমতা তো মায়ের দয়া, অনুগ্রহ, করুণা ও মমতা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। আল্লাহর দরবারে এসে কোনো বান্দা মাহরুম হয় না। কোনো বান্দা খালি হাতে ফিরে যায় না। আল্লাহর দরবারে যেকোনো পাপী বান্দা-ই ফিরে আসে, অনতি বিলম্বে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন।

সব বয়সেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া যায়

একজন বৃদ্ধ মানুষ, যার বয়স ১০০ বছর। সে তার যৌবনকে অবৈধ পথে ব্যয় করেছে, পাপাচারে মগ্ন থেকেছে সারা জীবন। এখন এই বুড়ো বয়সে সন্তানরা তার পাশে নেই। একাকী ও নিঃসঙ্গ জীবন তার। অসুস্থ ও অসাড় দেহ, কম্পিত শরীর। ঘন-ঘন ওঠানামা করে শ্বাস-প্রশ্বাস। কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার মুখে খাবার দেওয়ারও কেউ নেই। এই বুড়ো যদি এখন ভাবে, হায়রে সারাটা জীবন যাদের পেছনে আমার সময়, শ্রম ও অথ্য ব্যয় করলাম, আজ তারা আমার পাশে নেই। সবাই প্রতারক। সবাই ধোঁকাবাজ। চলো; আজ থেকে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ব। আমি আজ থেকে আল্লাহকেই সঙ্গীরূপে গ্রহণ করব।

এই প্রত্যয় নিয়ে এবার বুড়ো ছুটল মসজিদের দিকে। তার শরীরটা কাঁপছে। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে। পড়ো-পড়ো অবস্থা তার। কিন্তু সে যাচ্ছে আল্লাহর দিকে। দয়ালু মাওলা এই স্বার্থপর, এই গুনাহগার, এই হতভাগা বুড়োকেও ফিরিয়ে দেবেন না। তাকে ভর্ৎসনা করবেন না। বলবেন না, ভাগ তুই। সারাটা জনম ব্যয় করলি অবৈধ কাজে; দূরে সর। এমন কথা কিন্তু রব্বে কারীম বলবেন না।

বরং তাকে নিজের দরবারের দিকে আসতে দেখে তখন আল্লাহর রহমত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। বান্দা যদি এক পা অগ্রসর হয়, তাহলে আল্লাহর রহমত বান্দার দিকে অগ্রসর হয় দুই পা। বান্দা যদি হেঁটে আল্লাহর দিকে আসে, তাহলে আল্লাহর রহমত তার দিকে দৌড়ে আসে। ১০০ বছর যে-মানুষটি গুনাহে কাটাল, ওই বৃদ্ধ ব্যক্তিকেও আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত কবুল করে নেবেন। তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

দু'আ কবুলের দিন

এই যে মাদরাসার বাচ্চাগুলো দিন-রাত কুরআন ও হাদীছ অধ্যয়নে কাটায়। অতি সাধারণ খাবার তারা ভক্ষণ করে। ফ্লোরে বা ছেঁড়া চাটাইয়েও ওপর ঘুমায়। সমস্ত আরাম-আয়েশকে তারা কোরবান করে দিয়েছে। মা-বাবাকে ছেড়ে দূরে– বহু দূরে পড়ে আছে। আল্লাহকে হাজির রেখে আজ এরা তাদের শেষ সবক পড়তে যাচ্ছে। আজ তারা তাদের এই সবক পাঠ করে যদি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের কাছে দু'আ করে, অবশ্যই-অবশ্যই রব্বে কারীম তাদের দু'আর মূল্যায়ন করবেন, তাদের দু'আ কবুল করবেন। জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি মালিক! তুমি আমাদের যেমন করে পড়তে বলেছ, তেমন করে আমরা পড়তে পারিনি। যেমনটি তুমি চেয়েছ, আমরা তেমন হতে পারিনি। যেমন করে ইল্‌ম হাসিল করতে বলেছ, আমরা তেমন করে হাসিল করতে পারিনি।

হে আল্লাহ! আমাদের নবীজিকে যেমন করে মহব্বত করা দরকার ছিল, আমরা তেমন করে মহব্বত করিনি। কিন্তু ওগো মাওলা! আজ আমাদের অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে। আজ আমরা অনুতপ্ত। আজ আমরা লজ্জিত। হে মালিক! আমরা তো শুনেছি, আপনিই আমাদের মালিক। আপনিই আমাদের রব। আপনিই আমাদের প্রতিপালক। আপনিই আমাদের সব। তো ওগো রব্বে কারীম! আমাদের আজ মাফ করে দিন। আমাদের আজ কবুল করে নিন।

رَبِّ اغْفِرْ

'হে আমাদের রব! আপনি আমাদের মাফ করে দিন।'

আপনি আমাদের পেরেশানি দূর করে দিন। আপনিই তো আমাদের আনন্দ ও বেদনায় আশ্রয়দানকারী। আপনিই তো আমাদের সেই ছোট থেকে এতটুকু পর্যন্ত বড় করেছেন। আমাদের নওজোয়ান বানিয়েছেন। এখন আমাদের সকল ভুলত্রুটি মাফ করে দিন।

বান্দা যদি এমন অনুভূতি নিয়ে কাকুতিমিনতির সাথে দু'আ করতে পারে, তাহলে আবশ্যই আল্লাহ সেই দু'আ কবুল করবেন। বোনেরা! তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। আল্লাহর নিকট মাগফেরাত চাও। কাকে বলে মাগফেরাত? কী তার পরিচয়? মাগফেরাত অর্থ ক্ষমা, মাফ। দেখুন, মা-বাবা যখন সন্তানের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, তখন সন্তানের ভুলত্রুটিগুলো মাফ করে দেন। সন্তানের অন্যায়গুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।

আর আল্লাহ যখন বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন বান্দার গুনাহগুলো বান্দার ভুলগুলো মাফ করে দেন। এটি আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের রহমত। আবার বান্দার গুনাহ যখন আল্লাহ মাফ করেন, তখন শুধু গুনাহই মাফ করেন না; বরং তিনি যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তার রহমতের শান তো এই যে, তিনি গুনাহগুলোকে নেকি দ্বারা বদলে দেন।

কোনো ব্যক্তি বা কোনো সত্তাকে আমরা দেখতে পাই না। তোমার দরবার একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দরবার। আমরা কসম করে বলতে পারি, তোমার দরবার থেকেই আমাদের সব জুটবে। তোমার দরবার থেকেই আমরা আমাদের সব সমস্যার সমাধান করিয়ে নিতে পারব।

ওহে রব! তোমারই দরবারে আজ আঁচল পেতেছি। তোমারই দুয়ারে আজ আঁজলা তুলেছি। তোমারই সামনে আজ হাত পেতেছি।

رَبِّ اغْفِرْ

'ওগো রব! আমাকে তুমি মাফ করে দাও।'

আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। দেখুন, আল্লাহ তো মাফ করে দেবেন। এই দু'আটির সাথে আরেকটি শব্দ সংযুক্ত আছে—

وَارْحَمْ

'আমাদের ওপর রহমত নাযিল করুন।'

এখানে রহমত শব্দটি কেন যুক্ত করা হয়েছে? একটু চিন্তা করে দেখুন। যখন কোনো ব্যক্তির ওপর কোনো ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তো নারাজ ব্যক্তিটির কাছে ১ম ব্যক্তি গিয়ে ক্ষমা চায়। যদিও বড়জন বলে দেয়, যাও; আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি, তবুও মাফ চেয়ে নেয়। অপরাধী ব্যক্তি তবুও শান্ত হয় না। মনে করে, মুখে তো মাফের কথা বলেছেন। অন্তরে হয়তো রাগ রয়ে গেছে। তাই সে আরও মাফ চায়। আরও ক্ষমা চায়। যতক্ষণ ওই ব্যক্তি হেসে বুকে টেনে না নেয়, মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে না দেয়, যাও ভাই! তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম, ততক্ষণ এই ব্যক্তিটি মাফ চাইতেই থাকে। তো তেমনিভাবে আমাদের দু'আ ইত্যাদির হালও সেরকম হবে।

رَبِّ اغْفِرْ

'হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন।'

وَارْحَمْ

'এবং আমাদের ওপর রহমত নাযিল করুন।'

তো এভাবে বারবার আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে। আল্লাহর একটি দৃষ্টিই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট।

تیری ایک نگاہ کی بات ہے * میری زندگی کا سوال ہے

'আমাদের জীবনের যত চাওয়া পাওয়া আছে, তার সমাধান আপনার একটি মাত্র রহমতের দৃষ্টিই যথেষ্ট হে রব্বে কারীম! আপনি একটি মাত্র রহমতের দৃষ্টি আমাদের প্রতি দান করলেই আমাদের সারাটা জীবন প্রাচুর্যময় হয়ে যাবে। আমাদের জীবনের মাঝে জোয়ার চলে আসবে।'

কবি বড় সুন্দর বলেছেন—

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی

وہ اگر نگاہ کردیں تو ابھی بہار اے

'আরে! আমাদের এই প্রাচুর্য তো তাঁর দৃষ্টির সংবরণ।

যদি আমাদের প্রতি একটুখানি দৃষ্টি দেন, তবে তো আমাদের জীবন প্রাপ্তির জোয়ারে ভরে যাবে।'

আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি

আল্লাহর দৃষ্টি যদি বান্দার জীবনের ওপর পতিত হতে পারে, তবে বান্দার জীবন বদলে যাবে। তার জীবনে জোয়ার আসবে। وَارْحَمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হে আল্লাহ! এখন আপনি আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তো আমাদেরকে আপনার মহব্বতের নজরে ঢেকে দিন। তাকেই وَارْحَمْ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে রহমত ও মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখবেন, তার সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদিত হয়ে যাবে গায়েবেরই ইশারায়। হযরত থানবি (রহ.) একস্থানে লিখেছেন, আল্লাহর রহমত যখন বান্দার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হয়, তখন তার চারটি কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়—

১. আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহরাশিকে ক্ষমা করে দেন। চাই সেই গুনাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী জায়গা পরিমাণও হোক না কেন। সমস্ত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন।

২. আল্লাহ ওই বান্দাকে এমন রিযিক দান করেন যে, সে অন্যের কাছে মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে হেফাযতে থাকে। সম্মানের সাথে রুজি দান করেন। রিযিকের মধ্যে বরকত দান করেন। তাই সে কারও কাছে হাত পাততে হয় না। কারও কাছে চাইতে হয় না।

৩. আল্লাহ ওই বান্দাকে নতুন-নতুনভাবে নেক কাজ করার তাওফীক দান করেন। তাহাজ্জুদের তাওফীক দেন। কুরআন তেলাওয়াতের তাওফীক দেন। আল্লাহর যিকির করার তাওফীক দেন। মা-বাবার খেদমত করার তাওফীক দেন। দীনের কাজ করার তাওফীক দেন।

৪. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশের তাওফীক দিয়ে দেবেন।

আমাদের উচিত এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে সর্বদা দু'আ করতে থাকা যে,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

'হে আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দিন, আমাদের রহমত দান করুন।'

ছাত্রীরা ঘরে কীভাবে দীনের কাজ করবে?

আমি ছাত্রীদের বিশেষভাবে এই নসীহত করব যে, এখন আপনারা আপনাদের ঘরে ফিরে যাবেন। আপনারা আপনাদের পরিবারের কাছে যাবেন। সেখানে এক নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন আপনারা। কোথাও দেখবেন, ঘরের পরিবেশ অনুকূলে নয়। কোথাও দেখবেন, পরিবারের লোকেরা আপনার বিপরীত। ওরা আপনার দীনি কাজের বিরোধী এবং ওদের মাঝে বদদীনের অন্ধকার বিদ্যমান। সেসব পরিবেশ ও পরিবারে ঈমান ও সত্যের মশাল জ্বালাতে হবে আপনাকেই। তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে দীন ও ইল্‌মের আলো।

সুন্নতের ওপর আমলকারীদের চেহারা কেয়ামতের দিন নূরে ঝলমল করতে থাকবে। দুনিয়াবাসীদের চোখে আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজি যেমন ঝলমল করে, তেমনই দেখা যাবে সেদিন সুন্নাহর অনুসারীদের। তাই নিজের ঘর, নিজের জীবন প্রিয়তম হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারা সুসজ্জিত করবে। নিজের পরিবার ও পরিবেশকে সুন্নাহর আদলে ঢেলে সাজাবে।

হযরতজির উপদেশ ও দু'আ

আপনারা বিভিন্ন জামেয়ায় গমন করবেন। এত দিন আপনারা ইল্‌ম শিখেছেন। এখন বিভিন্ন মাদরাসায় সেই ইল্‌ম শিক্ষা দেবেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইল্‌ম শেখাবেন। নিজেকে রবের হাওয়ালা করে দেবেন। ভালো করে মনে রাখুন, নিজেকে রবের হাওয়ালা করে দেবেন। তাহলে আল্লাহ কখনও আপনার জীবনকে নীচু হতে দেবেন না, অধঃপতিত হতে দেবেন না। সর্বদা আপনার বাহু আল্লাহ তা'আলা কুদরতি হাতে ধরে রাখবেন। আপনাকে পাহারা দিয়ে রাখবেন। রব্বে কারীম আপনাকে হেফাযতে রাখবেন। তাই আপনাদের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন এই ইল্‌মের নূরের নেসবত আপনাদের সিনায় অনবদ্য ও নিরবচ্ছিন্ন রাখেন। কদমে-কদমে আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করেন। সর্বপ্রকার বৈরিতা, বিরোধিতা ও অবমূল্যায়নের হাত হতে আল্লাহ আপনাদের রক্ষা করেন। আল্লাহ আপনাদের দীনের খেদমতের জন্য কবুল করেন। তাই নিজেরা নামায পড়ে তাহাজ্জুদ পড়ে এই দু'আটি অবশ্যই করবেন–

رَبِّ اغْفِرْ

'হে আল্লাহ! আমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন।'

আমি গুনাহগার হে আল্লাহ! আমার থেকে বড়-বড় ভুল হয়ে গেছে মাওলা! কিন্তু ও গো রব! আপনিই তো ক্ষমাকারী। আপনার প্রিয় হাবীব তো বলে দিয়েছেন, কোনো বান্দা যদি জমিনের ধূলিকণা পরিমাণ আসমান-জমিনের মধ্যখানে যে খালি জায়গা আছে সে পরিমাণ গুনাহও করে ফেলে, গাছের পত্র-পল্লবের চেয়েও বেশি যদি হয় সেই গুনাহ, আকাশের তারকারাজি থেকেও যদি বেশি হয় সেই গুনাহ, অথৈ সাগরের পানির চেয়েও যদি বেশি হয় সেই গুনাহ, আর ওই গুনাহগার বান্দা কায়মনোবাক্যে সত্য তাওবা করে, সত্যভাবে মাফ চায় রবের কাছে, যদি সে তাওবা করে উজাড় প্রাণে, তাহলে দয়াময় আল্লাহ পরম করুণাময় মাওলা তাকে মাফ করে দেবেন অবশ্যই-অবশ্যই। বলতে হবে, ওগো আমার রব! ওগো আমার পালনকারী! আমার গুনাহ অধিক। কিন্তু তুমি তো গাফফার। আমাকে তুমি মাফ করে দাও মাওলা! তুমি তো বান্দাকে মাফ করেই খুশি হও।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ

'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাকারী।'

تُحِبُّ الْعَفْوَ

'তুমি ক্ষমা করতে ভালোবাসো।'

فَاعْفُ عَنِّيْ

'কাজেই আমাকে তুমি মাফ করে দাও।'

وَارْحَمْ

'আমাকে রহমত দান করো।'

আমাকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখো। আমার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজ সহজ করে দাও, সম্পাদন করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের দু'আ কবুল করে নাও। হে আল্লাহ! আমি অধম। দয়া করে এই ছাত্রীদের তুমি কবুল করে নাও। তাদের সকল কামিয়াবির যিম্মাদার তুমি হয়ে যাও। এই জামেয়াহ থেকে ফারেগ হয়ে অন্য জামেয়ায় দীনের কাজ করার তাওফীক দান করো। নিজেদের ঘরকে দীনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার তাওফীক দিয়ে দাও। তাদের দ্বারা ছোট-বড় সব রকম দীনের কাজ নাও। এতেই আল্লাহর হাবীবের রূহ শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে। রাসূলে আরাবী আমাদের প্রতি রাজি ও খুশি হবেন। আল্লাহও আমাদের প্রতি রাজি ও খুশি হবেন। নবীজি বলবেন, আমার উম্মতের একটি মেয়ে দীনের ইল্‌ম অর্জন করেছে। তার পরিবারকে দীনদার বানাবার চেষ্টা করেছে। কেয়ামতের দিন যখন হাউজে কাওছারের কাছে যাবে দীনদার এই নারী—এই মেয়ে, আল্লাহর হাবীব তাকে হাউজে কাওছার থেকে পানি পান করাবেন নিজের হাতে।

আমরা চেষ্টা করব; ফল দেবেন আল্লাহ

স্মরণ রাখবেন, আজ আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেও অন্যায় ও পাপাচারের এই স্রোত বন্ধ করতে পারব না। তবে আমরা চেষ্টা তো করতে পারি। আমাদের দায়িত্ব চেষ্টা করা। তাই প্রত্যেকে নিজ-নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা করে যাব। হতে তো পারে, এই দুর্বলের চেষ্টা-ই আল্লাহ কবুল করে নেবেন। হেদায়েতের বাতাস প্রবাহিত করে দেবেন। বর্ণিত আছে, যখন ইবরাহীম (আ.)কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, দাউদাউ করে আগুন জলছিল। আগুন গমগম করছিল। তখন একটা চড়ুই ঠোঁটে করে পানি নিয়ে তাতে নিক্ষেপ করছিল। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, তোমার এই এটুকু

পানিতে তো আগুন সামান্যও নিভবে না। কেন এমন করছ? চড়ুই উত্তর দিল, এটা তো আমার ভালো করেই জানা আছে। তবুও ইবরাহীমের সাথে আমার যে মহব্বত আছে, আমি তা প্রকাশ করলাম।

আরে ভাই! চড়ুইটা সেদিন আগুন নেভাতে সামান্য পানির ফোঁটা ঢেলেছে। আজ আমাদের তো উচিত, আমাদের গুনাহের আগুন নেভাতে ইল্‌মের নূর ঢেলে-ঢেলে, চোখের পানি ছেড়ে-ছেড়ে দু'আ করা। কেয়ামতের দিন এর কারণে আমরা বিনিময় প্রাপ্ত হব ইনশাআল্লাহ। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইয্‌যাতের যিন্দেগি দান করবেন। কেয়ামতের দিন আমাদেরকে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে উত্থিত করবেন। যেমন– হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় সাহাবি তালহা (রাযি.) এর জন্য দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি কেয়ামতের দিন তার সাথে এমন মুআমালা করবেন, যেন সে আপনাকে দেখে মুচকি হাসে।

আমরাও আজ আমাদের শেষ কামনা এই করব যে, হে আল্লাহ! কেয়ামতের দিন আমাদেরও দেখে আপনি মুচকি হাসবেন, আমরাও আপনাকে দেখে মুচকি হাসব। এমন লোকদের লক্ষ করেই ঘোষণা হচ্ছে–

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

'হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।'[১]

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

---

১. সূরা ফাজর : আয়াত ২৮-৩০

কতগুলো ক্রিয়াশীল দু'আ

'আজ আমরা দু'আ করছি এমনভাবে যে, মনে হবে, আমরা কোনো কর্মচারীকে কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজ আমরা দু'আ করি, হে আল্লাহ! আমার কন্যার ভালো জায়গায় বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। হে আল্লাহ! আমার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। আমার স্বামীকে আমার বশীভূত বানিয়ে দাও যেন সে আমার আঙুলের ঈশারায় নাচে। হে আল্লাহ! অমুক আমার প্রতি হিংসা করে; তাদের ঘরবাড়ি উজাড় করে দাও।

মোটকথা আমরা এমনভাবে দু'আ করছি, যেন কোনো অধীন কর্মচারীকে কাজের হুকুম প্রদান করছি। দেখুন, দু'আ চাওয়া আর অধীনকে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই এক নয়। আল্লাহ তো আল্লাহই। তিনি রব্বে কারীম। তাঁর বিশেষ আযমত ও বড়ত্ব আছে। তাঁর শান ও সম্মান আছে। তাঁর মর্যাদা ও মরতবা আছে। এর খেয়াল রাখা আবশ্যক। এর প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরি।

আমরা যেভাবে দু'আ করছি, এসব তো কোনো দু'আ-ই নয়। এগুলো দু'আর সম্পূর্ণ ভুল পদ্ধতি। দু'আ তো বরং এমনভাবে চাইবে যে, আল্লাহর সামনে নিজেকে ছোট করে নেবে। অত্যন্ত কাকুতিমিনতির সাথে প্রতিটি জিনিস চাইবে। আল্লাহর আযমত, মহব্বত, বড়ত্ব ও ভালোবাসাকে অন্তরে ধারণ করবে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার সাথে দু'আ করবে। প্রতিটি বিষয় আল্লাহ দান করবেন বলে বিশ্বাসের সাথে বারবার চাইবে। তাহলেই দ্রুত দু'আ কবুল হবে।'

কতগুলো ক্রিয়াশীল দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আল্লাহর পরিপূর্ণ গুণাবলি

আল্লাহ তাঁর গুণাবলিতে কামেল ও পরিপূর্ণ। তাঁর সিফাত একেবারে নিখাঁদ ও নিখুঁত। কোনো অপূর্ণাঙ্গতা নেই তাতে। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস দানকারী। আর বান্দা প্রত্যেক বিষয়েই তাঁর মুখাপেক্ষী। আর বান্দার সমস্ত কিছুই অপূর্ণাঙ্গ। সমস্ত কিছুই তাঁর দূষিত ও ত্রুটিযুক্ত। বান্দার অবস্থা তো এমন যে, পেছনের দিকে তাকালে সামনের দিকটা দেখতে পায় না। ডানে তাকালে বামে কী হচ্ছে দেখতে পায় না। বামে তাকালে ডানে কী চলছে দেখতে পায় না। সামনে তাকালে পেছনে কী হচ্ছে দেখতে পায় না। আর আমাদের আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের দেখা ও প্রত্যক্ষ করার অবস্থা এমন যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘোর অমানিশায় কালো একটা পাথরের ওপর কালো একটা পীপিলিকা হেঁটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ তার চলাচলটাও পূর্ণভাবে দেখতে পান।

মানবের শ্রবণশক্তি এত অপূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ যে, একজনের সাথে কথা বলা অবস্থায় আরেকজন যদি কিছু বলতে চায়, তাহলে তার কথা শোনাও আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। একই সাথে দু-তিনজন মানুষের সাথে কথাবার্তা ও আলাপচারিতা তো বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একজনের কথা ভালো করে শুনতে ও বুঝতে গেলে আকেরজন কী বলছে তা আমরা ঠাহর করতে পারি না। বোঝা ও জবাব দেওয়া তো দূরের কথা। আমাদের

সামানেই তো এর বাস্তব দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। মনে করুন, একই রুমে একজন ফোনে কথা বলছে। আরো কয়েকজন যদি ওই রুমে বড় আওয়াজে কথা বলতে থাকে, তাহলে তাদের ধমক দিয়ে আমরা থামিয়ে দেই। বলি, তোমাদের কথার কারণে তো আমি ফোনের কথা বুঝতে পারছি না। তোমরা চুপ করো। অথচ আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের শ্রবণ এতটা কামেল ও পূর্ণাঙ্গ যে, আদম (আ.) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত যত নারী, যত পুরুষ, যত বাচ্চা-বুড়ো আসছে ও আসবে, সবাইকে একটি ময়দানে যদি জমা করা হয়, প্রত্যেকেই যদি পৃথক-পৃথকভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকে তাদের যার-যার মাতৃভাষায়, তাহলেও আল্লাহ তা'আলা সকলের ডাক শুনতে পান। সকলের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার, ভিন্ন-ভিন্ন বক্তব্যের ওই দু'আ আল্লাহ শুনতে পান এবং কবুলও করেন। তিনি এ-ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

তো মানুষের শক্তি বড়ই দুর্বল। আল্লাহ হলেন পূর্ণ সবল। মানুষের গুণ অপূর্ণাঙ্গ আর আল্লাহর গুণ পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ প্রত্যেকটা জিনিস দানকারী। আর মানুষ হচ্ছে গ্রহণকারী। আল্লাহ মহাদাতা। বান্দা মুখাপেক্ষী।

আমাদের যেটুকু ক্ষমতা ও সামর্থ্য আছে, তা আমাদের সত্তাগত নয়। আমাদের আমলের কোনো দখল নেই তাতে। তাই আপনারা চিন্তা করুন, আল্লাহ যদি আমাদের সুস্থতা দান না করতেন, আমাদের যদি তিনি অসুস্থ রাখতেন, যদি আমাদেরকে সম্পদ না দিতেন, যদি দরিদ্র বানাতেন, যদি দৃষ্টিশক্তি না দিতেন, যদি বোবা বানাতেন, যদি শ্রবণশক্তি না দিতেন, যদি বধির বানাতেন, যদি হাত-পা না দিতেন, যদি পঙ্গু বানাতেন, যদি খাবার না দিতেন; আমরা ক্ষুধার্ত থাকতাম, যদি পানি না দিতেন, যদি পিপাসিত রাখতেন, যদি বাসস্থান না দিতেন; আমরা গৃহহীন থাকতাম, যদি সন্তান না দিতেন; আমরা নিঃসন্তান থাকতাম, যদি ইয্যাত না দিতেন; আমরা অসম্মানিত থাকতাম, দুনিয়ায় লাঞ্ছিত হাতাম, যদি আকল না দিতেন; আমরা উন্মাদ ও পাগল থাকতাম, তো কোনো ক্ষমতা যদি আল্লাহ আমাদের দান না করতেন; আমরা তা প্রাপ্ত হতে পারতাম না কোনোভাবেই। এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের ওপর। সবই তার অনুগ্রহ আমাদের ওপর।

আল্লাহর নেয়ামতরাজির মূল্যায়ন

একবারের ঘটনা। বাদশাহ হারুনুর রশীদ ভীষণ পিপাসিত। তাকে পানি দেওয়া হলো। এক বুযুর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বললেন, বাদশাহ! আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। পানি পান করার আগে আমার

একটি কথা শুনুন। মনে করুন, আপনার পিপাসা লেগেছে আর সারাটা দুনিয়ায় কোনো পানি নেই। এই যে এই পেয়ালাটা, শুধু এতেই পানি আছে। তবে পাত্রটার মালিক আরেকজন। এখন ওই ব্যক্তির কাছে আপনি পানি চাচ্ছেন। লোকটি পানির মূল্য চাইল। বলুন, বিনিময় হিসেবে আপনি তাকে কী দেবেন?

বাদশাহ বললেন, আমি আমার সমগ্র রাজ্যের অর্ধাংশ দিয়ে সেই পানিটুকু ক্রয় করে নেব এবং পিপাসা নিবারণ করব। এবার বুযুর্গ বললেন, বাদশাহ! আপনার ওপর শান্তি নাযিল হোক। শুনুন, আপনি পানিটুকু পান করলেন। পানি আপনার শরীরে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখলেন, আপনার পেশাব হচ্ছে না। আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে। যাদের পেশাব বন্ধ হয়ে যায়, প্রস্রাবের রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, তারা জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে পড়ে যায়। গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করতে শুরু করে। তো আপনার এমন করুণ পরিস্থিতি হয়েছে। এমন সময় সংবাদ পেলেন, সমগ্র বিশ্বে একজন মাত্র ডাক্তার আছেন, যিনি আপনার এই রোগের চিকিৎসা করতে পারেন। তার কাছেই শুধু রোগটার ওষুধ আছে। তো বলুন, কীসের বিনিময়ে আপনি ওই চিকিৎসক থেকে আপনার এ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করবেন?

বাদশাহ বললেন, আমি প্রয়োজনে আমার রাজত্বের অর্ধাংশ দান করে দেব। তবুও আমি এই চিকিৎসা নিয়েই ছাড়ব। বুযুর্গ বললেন, বাদশাহ! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এখন তো বোঝা গেল, আপনার ওই সমগ্র রাজত্ব এক পেয়ালা পানি ক্রয় করে পান করা এবং সে পানি আবার শরীর থেকে বের করে ফেলার সমান। এর মূল্য আর কতটুকু? তো একটু চিন্তা করুন, সারাটা জীবনে আপনি কত পেয়ালা পানি পান করেছেন আর কত শরবত গলাধঃকরণ করেছেন। আপনি যে আল্লাহর এত সব নেয়ামত ভোগ করছেন, আপনি কি বলতে পারবেন, আল্লাহর কটি নেয়ামতের শুকরিয়া আপনি আদায় করেছেন?

দেখুন, বাস্তবতা তো এই যে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত (আপাদমস্তক) আমরা আল্লাহর কোটি-কোটি নেয়ামতের মধ্যে ডুবে আছি। বরং আমরা তো জানতেই সক্ষম নই যে, আমাদের ওপর আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের সংখ্যা কত। আমরা তো জানিই না, আমাদের ওপর আল্লাহর কত শত কোটি নেয়ামত প্রতিক্ষণে, প্রতি মুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছে। তাই আমাদের উচিত, আল্লাহর নেয়ামত নিয়ে ভাবতে থাকা, গবেষণা করতে থাকা এবং শোকর আদায় করা।

শুয়ে ঘুমুতে পারা অনেক বড় নেয়ামত

দেখুন, মানুষ খাবার খায়। খাবার যে পাইপ দিয়ে পেটে যায়, তাকে খাদ্যনালী বলে। খাদ্যনালী আল্লাহর এক আশ্চর্য কুদরতি সৃষ্টি। যখন মানুষ খাবার গ্রহণ করে, তখন এই নালী দিয়ে অতি সহজে খাবার পেটে চলে যায়। নালীটা এমনভাবে তৈরী যে, এটা খাদ্য পেটে যেতে সাহায্য করে। আবার যখন মানুষ শয়ন করে, ওই খাবার বের হয়ে যেতে চাইলে এই নালী খাবারকে আটকে রাখে। তাই তো যদি একজন মানুষ মাত্র খাবার খেল। তারপরই সে উল্টো হয়ে গেল। তবুও সেই খাবার তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়ে না। তো এ নালী খাবারটা আবার মুখ দিয়ে বের হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। অথচ আমাদের উপলব্ধিতেও নেই এটি আল্লাহর কত বড় নেয়ামত।

আমার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন এক বন্ধু আমেরিকায় থাকেন। একবার সে আমাদের ঘরে মেহমান হলো এবং খেল । তারপর যখন শোওয়ার সময় হলো, আমি তার জন্যে উন্নত ও নরম শয্যা বিছিয়ে দিলাম। সে আমাকে বলল, আমার খাদ্যনালীতে একটা রোগ হয়েছে। আমি এখন আর শুয়ে ঘুমাতে পারি না। খাবার গ্রহণ করে শয়ন করলে সেই খাবার বের হয়ে পড়ে। আমি দেখলাম, সে সারাটা রাত বসে-বসে ঘুমাল। একটা মুহূর্তের জন্যও সে নরম বিছানায় পিঠ ঠেকাতে পারল না। একটুও শুতে পারল না। সেদিন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম, হে আল্লাহ! শুয়ে ঘুমুতে পারাও তো তোমার অনেক বড় নেয়ামত।

পলক পড়াও একটি নেয়ামত

একটি ঘটনা। এক যুবক একসিডেন্ট করল। তাতে তার চোখের ওপরের পাতাটা কেটে গেল। আর সেজন্য তার একটি চোখ একবারে খোলা। মাছের চোখের মতো হয়ে গেল। ডাক্তার বলল, শোনো। তোমার এই চোখ এখন মাঝে-মাঝেই ধৌত করতে হবে। যুবক জিজ্ঞেস করল, কেন? ডাক্তার বলল, আগে তো তোমার চোখে পর্দা ছিল। এখন এতে সেই পর্দা তথা পাতাটা নেই। তাই কতক্ষণ পরপরই ধুতে হবে। তো ডাক্তারের কথামতো যুবক চোখ ধুতে থাকল। প্রতি এক ঘণ্টা পরপর ধৌত করত। এক মাস পর্যন্ত এ-কাজটা সে করল। এতে বারবার পানি লাগার কারণে তার গালের গোশতে ক্ষত হতে লাগল। সে ডাক্তারকে জানল, ডাক্তার সাহেব! সমস্যা তো আরও বেড়ে গেছে। এখন তো আমার মরণের দশা।

আমাদের চোখের পাতায় আল্লাহ তা'আলা পলক দিয়েছেন। এই পলক অটোমেটিক কাজ করছে। চক্ষুদ্বয়ে কোনো ময়লা পড়তে দেয় না। যদি পড়েও এই পলক সেই ময়লা পরিষ্কারে সহায়তা করে। কেমন যেন চোখের পলকগুলো আমাদের চোখের জন্য মোছনি। এই মোছনি অবিরত মুছে চলছে, পরিচ্ছন্ন করছে চোখ। কোনোরূপ কষ্টই অনুভূত হয় না আমাদের। আমাদের এই পলকের নড়চড় আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত। আমরা কত মোহতাজ, কত মুখাপেক্ষী আল্লাহর! সামান্য-সামান্য বিষয়েও আমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আমাদের উচিত প্রত্যেকটা বিষয় আল্লাহ থেকে চেয়ে নেওয়া। আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যেকটা বিষয়কে প্রার্থনা করে নেওয়া।

দু'আর গুরুত্ব

বড়ই সৌভাগ্যের কথা। রমজান মাস অশ্রুবিগলিত দু'আর মাস। আপনারা আমাকে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে ডেকেছেন। তাই অন্তরে ভাবনা উদয় হলো, দু'আ সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলি। যদি সালেকীন ও আল্লাহ-অন্বেষীরা বুঝে নিতে পারে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিখে নিতে পারে, তাহলেই আমার আজকের বয়ান উপকারী ও সার্থক হবে।

নবীজি বলেছেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

'দু'আ ইবাদতের মগজ।'

যেমন– মনে করুন, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা সারাংশ থাকে, মূল বিষয় থাকে। ইবাদতেরও একটা মূল বিষয় ও মগজ আছে। সেই মগজই হচ্ছে দু'আ। ইবাদতের সেই সারবস্তুই হচ্ছে দু'আ। আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

'দু'আই ইবাদত।'

আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর খুশি হন, যে দু'আ করে। যে আল্লাহর কাছে চায় না, প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন। যেমন– হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যে-বান্দা আল্লাহর নিকট দু'আ করে না, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির কাছে প্রার্থনার পার্থক্য

আজ আমরা মাখলুকের কাছে চেয়ে বেড়াই। মাখলুকের কাছে প্রার্থনা করি। চাওয়ার এবং অর্জন ও প্রার্থনার কত-কত পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করি। অথচ আল্লাহর কাছে চাই না। আল্লাহর কাছ থেকে নেওয়ার জন্য পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করি না। আল্লাহর কাছ থেকে প্রার্থনা করার নিয়মও আমরা শিখতে পারি না। সৃষ্টির কাছে চাওয়ার মাঝে এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

১. প্রথম কথা হলো, আপনি মাখলুকের কাছে একটা জিনিস বারবার চাইলে মাখলুক তা দেবে না। আপনি আপনার বন্ধু থেকে একটা জিনিস আজ চাইবেন; সে দেবে। কাল চাইবেন; হয়তোবা দেবে। এরপর চাইবেন; আর দেবে না। চতুর্থ বার চাইবেন; মন খারাপ করবে। পঞ্চমবার চইবেন; তো আপনার সাথে বন্ধুত্বই ছেড়ে দেবে। বলবে, লোকটা কেমন যে, সারাটা দিনই এটা- ওটা চাইতেই থাকে।

তো দেখুন, মাখলুকের কাছে বারবার চাইলে সে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, দুঃখিত হয়ে পড়ে এবং কষ্ট পায়। আর আল্লাহর কাছে চাইলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। বরং যে-মানুষ প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ থেকে চায়, সব সময় আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দাকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন। তিনি তখন বলে দেন, এ আমার এমন বান্দা যে, আমার কাছে ছাড়া কারও কাছে কিছুই চায় না।

২. দ্বিতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, মাখলুক থেকে কোনো জিনিস চাওয়া হলে সে প্রথমত দেয়; তবে কখনও সে রাগও প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ আপনি ড্রাইভিং করছেন। মা পাশে বসে আছেন। লাল বাতির সিগন্যালে আপনি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। এমন সময় এক ফকির এসে গাড়ির দরজায় নক করল। আপনি হাতের ইঙ্গিতে বলে দিলেন, ভাই! মাফ করো। কিন্তু ভিক্ষুকটাও অন্যরকম। সে আপনার কাছে আবার চাইল। আবার চাইল এবং আবারও চাইল। আপনার রাগ উঠে গেল। ভাবলেন, লোকটা চলে যায় না কেন? এমন সময় আপনার মা বলে দিলেন, আরে বেটা! কিছু দিয়ে দাও। মায়ের বলে দেওয়ার কারণে আপনি পকেটে হাত দিলেন। কয়েকটা পয়সা দিয়ে দিলেন। কিন্তু বলুন তো কতটা রাগের সাথে আপনি তার দিকে তাকাবেন? পয়সাটা দিতে-দিতে আপনি বলে দেন, নাও-নাও, দ্রুত ভাগো।

তো আপনি দান করলেন ঠিক সাথে-সাথে রাগও হলেন। আপনি কেমন করলেন, অথচ আল্লাহ এমন করেন না। আল্লাহ করেন ভিন্ন রকম। আল্লাহর কাছে যখনই চাওয়া হয়। আপনি যখনই আল্লাহর কাছে চাইবেন এবং প্রার্থনা করবেন আল্লাহ তখনই খুশি হয়ে যান। খুশি হয়ে প্রার্থিত জিনিসটি আল্লাহ বান্দাকে দান করেন। এটিই আল্লাহর নিয়ম।

৩. মাখলুকের কাছে চাওয়া আর আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাঝে আরেকটি পার্থক্য হলো– আপনি যদি কোনো আমীর নেতা বা বড়লোকের কাছে যান এবং বলেন, ভাই! আমাকে একটু চুন দাও, কিংবা বলেন, ভাই আমাকে একটু সুপারী দাও। তাহলে এই বড়লোকটি ক্ষেপে যাবে আপনার ওপর। বলবে কি, তুমি কি আমাকে গরিব ও ছোট লোক মনে করো? আবার আপনি যদি একজন নিতান্তই গরিব লোকের কাছে গিয়ে বলেন আমার দশ লক্ষ টাকা দরকার বলবে কি, এই মিয়া! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? দশ টাকার দেখা নেই দশ লক্ষ টাকা। খুবই মজার ব্যাপার! বড় লোকের কাছে ক্ষুদ্র ও ছোট জিনিস চাইলে সে রাগ করে আর গরিবের কাছে বড় ও দামী কিছু চাইলে সে রাগ করে। আর আমার আল্লাহ কী করেন? আপনি আল্লাহর কাছে যা-ই চাইবেন তিনি খুশি হবেন। ছোট, সামান্য, হীন এবং একেবারে ক্ষুদ্র জিনিস চাইলেও আল্লাহ খুশি হন আবার বড় এবং দামী ও মূল্যবান জিনিস চাইলেও আল্লাহ খুশি হন।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, কোনো বান্দা যদি তার জুতার ফিতাটাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তাহলেও আল্লাহ তা দান করে খুশি হন।

৪. আরেকটি পার্থক্য হলো, মাখলুকের কাছে, কোনো বান্দার কাছে আপনি যদি কোনো জিনিস চাইতে যান, প্রার্থনা করতে যান, তাহলে দিনে যেতে হবে। বান্দার দরজা দিনে খোলা থাকে। রাতে যদি বান্দার দুয়ারে গিয়ে হাজির হন, তাহলে দেখবেন, দুয়ার বন্ধ। রাতের গভীরে গেলে তো একেবারেই রুদ্ধ থাকে বান্দার দুয়ার। কিন্তু খালিক ও মালিক আল্লাহর অবস্থা কেমন? রব্বে কারীম আল্লাহর দুয়ার রাতে-দিনে সব সময় খোলা, সব সময় উন্মুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে–

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

'না তন্দ্রা তাঁকে আক্রমণ করে, না ঘুম।'[১]

---

১. সূরা বাকরা : আয়াত ২৫৫

আল্লাহ তো জানেন, আমার কোনো বান্দা রাতের কোনো এক অংশে এসে আমার দুয়ারে হাজির হতে পারে। আমার বান্দাকে আমি দেব। দাতার দুয়ার যেন বন্ধ না পায় আমার গোলাম। আল্লাহর শান কত উঁচু! কত দয়াবান এবং মেহেরবান আমার রব্বে কারীম। তাঁর দয়ার দুয়ার, দানের দুয়ার একটা মুহূর্তের জন্যও বন্ধ নেই।

৫. আরেকটি পার্থক্য হলো, আপনি কোনো মাখলুকের নিকট, কোনো বান্দার নিকট একটা জিনিস চাইলেন। সে বলবে, ভাই! আমার কাছে নেই; আমার নিজেরই জিনিসটা দরকার। আমার ঋণ আছে। নিজের ঋণই তো আমি পরিশোধ করতে পারছি না। আমার অবস্থা একটু খারাপ যাচ্ছে। আমার পেমেন্ট আটকে গেছে। এমন হাজারো জরুরতের কথা বলে সে আপনাকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু আল্লাহর আচরণ কী? সুবহানাল্লাহ! আপনি আল্লাহর কাছে চাইবেন। দুনিয়ার সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

'আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।'

৬. মাখলুক তথা বান্দার কাছে চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার মধ্যে আরেকটি পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে, আপনি বান্দার কাছে চাইবেন, তো সে আপন-পর ভেদাভেদ করবে। কোনো একজন যদি কোনো একটি পার্টি থেকে নির্বাচিত হয়, তাহলে সে তার পার্টির এবং তার সমর্থক লোকজনকেই শুধু সাহায্য দেবে। সে দেখবে, আপনি তার পার্টির লোক কিনা। পার্টির লোক হলে আপনাকে সে দেবে। পার্টির লোক না হলে সে দেবে না। আর আল্লাহর আচরণ কী? হ্যাঁ আল্লাহর কাছে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাঁর কাছে সব বান্দা সমান। তাঁর দৃষ্টিতে কোনো পার্টির দাম নেই। দাম দু'আ আর আরাধনার। দাম প্রার্থনার।

তিনি তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছে, তাঁদেরও খাওয়ান, তাদেরও দান করেন। আবার যারা তাঁর অস্বীকারকারী, তাদেরও খাওয়ান, পরান এবং দান করেন। যে তাঁকে মান্য করে, তাকেও তিনি ধনসম্পদ দান করেন, সুস্থ-সবল রাখেন এবং যারা তাঁকে অমান্য করে, তাদেরও তিনি ধনসম্পদ দেন, সুস্থ-সবল রাখেন। এটি আল্লাহর করুণা। এটি আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানি। তাঁর কাছে সবাই সমান।

আল্লাহর বক্তব্য তো এমন যে, যদি ঈমানদারদের ঈমানের ওপর আমার কোনো আশঙ্কা না হতো, তাহলে আমি কাফেরদের ঘরবাড়ি প্রয়োজনীয় সামগ্রী সবই স্বর্ণের করে দিতাম। গোটা দুনিয়াকে তাদের পায়ের তলে এনে দিতাম। দুনিয়ার দাম আমার কাছে মাছির একটা পাখার সমানও নয়।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۝ وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۝ وَزُخْرُفًا

'যদি ব্যাপারটা এই না হতো যে, সব মানুষই একই রকম তথা কাফের হয়ে যাবে, তাহলে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদের ঘর, তাদের ছাদ, ছাদে ওঠার সিঁড়ি সবই আমি সোনায় রূপান্তরিত করে দিতাম। তাদের ঘরের দরজা ও পালঙ্কও আমি স্বর্ণ বানিয়ে দিতাম, যেগুলোর ওপর তারা হেলান দেয় এবং শয়ন করে।'[১]

৭. বান্দার কাছে চাওয়া এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার মাঝে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, যার কাছে আপনি এখন গিয়ে কিছু চাইবেন, তার সাথে আগে থেকেই সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আগে থেকেই উপহার দিয়ে তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট রাখতে হয়। তবেই প্রয়োজনের সময় কিছু চাইলে সে দেবে। অন্যথায় ধিক্কার দেবে। তাই তো দুনিয়ার কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যেতে হলে বলে, অমুকের বাড়ি যাচ্ছি; কী নিয়ে যাব? অথচ আমার আল্লাহর দরবারে কিছু নিয়ে যেতে হয় না। আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেন, হে বান্দা! এসো; কী লাগবে তোমার নিয়ে যাও।

৮. মাখলুকের কাছে, বান্দার কাছে চাওয়ার মাঝে এবং রব্বে কারীমের কাছে চাওয়ার মাঝে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, কোনো বান্দা আপনার নিকটতম লোকও যদি হয়, এমনও যদি হয় যে, আপনি তাঁর ওপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন, এখন আপনি তার কাছে কোনোভাবে কোনো বিষয়ে সাহায্য চেয়েছেন। আর এদিকে হয়েছে কী; আপনি যার কাছে সাহায্য চেয়েছেন, উড়ো-উড়ো খবরে সে জানতে পারল, আপনি তার বিরোধী লোক, আপনি তার বিরুদ্ধে উল্টাপাল্টা কথা বলেন। এমন একটা সংবাদ সে শুধু শুনলেই চলবে। সে আপনাকে কোনো প্রকার সাহায্যই করবে না। সে আপনাকে তাড়িয়ে দেবে। অথচ খবরটা ছিল গুজব। সত্যাসত্য যাচাই করা ছাড়াই সে আপনাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়।

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩৩-৩৫

কিন্তু রব্বে কারীম কী করেন? যদি আল্লাহর এই বান্দা মানবসুলভ কোনো গুনাহ করে ফেলে, অন্যায় করে ফেলে, তবুও আল্লাহর রহমত তাকে মাহরুম করে না। বান্দা কবীরা গুনাহ করে আসে। ঘরে এসে পালঙ্কে শুয়ে সুখের ঘুম ঘুমায়। ঘুম থেকে আল্লাহ তাকে মাহরূম করে দেন না। এমন তো হচ্ছে না যে, আপনি আজ নামায পড়েননি। তাই আজ আপনার পেটের খাবার হজম হচ্ছে না। আল্লাহ এমন দয়াময় সত্তা, যিনি গুনাহ সত্ত্বেও বান্দাকে তার রহমত থেকে, নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন না। বরং বান্দাকে সর্বদা সুযোগ দেওয়া হয়।

এতে জানা গেল, যদি বান্দার কোনো কিছু চাইতে হয়, কোনো কিছু প্রার্থনা করতে হয়, তবে তা চাইতে হবে আল্লাহর কাছেই। আল্লাহর কাছে চাওয়া এটিও একটি আমল। আর এই আমল শিক্ষা করতে হয়।

চাওয়ার পন্থা ও পদ্ধতি

আপনি দেখে থাকবেন যে, দুনিয়ার আদালতে যদি আপনার কোনো আবেদনপত্র জমা দিতে হয়, তাহলে একটা ফরম পূরণ করতে হয়। আবার সেই ফরম কিন্তু সকলেই পূরণ করতে পারে না। কোর্টে কয়েকজন লোক বসে থাকে, তারা ডাকতে থাকে, এসো; আমাদের কাছে এসো। তারা লোকদের সঠিকভাবে ফরমটা পূরণ করে দেয়।

আপনি পাসপোর্ট করার জন্য এপ্লাই করবেন। তাতে আপনি অবশ্যই অন্যদের সহযোগিতা নেবেন, যেন ভুল না হয়ে যায়। ওমরা বা হজের ভিসা নিতে যদি চান, তাহলেও অভিজ্ঞদের কাছে গিয়ে থাকেন এবং তার থেকে সহায়তা নেন। বলেন, বলো তো ভাই! এই-এই কাজগুলো কীভাবে করতে হবে? কীভাবে দরখাস্তটা দিতে হবে?

তো দু'আও একটি ইবাদত। এই ইবাদাত আল্লাহওয়ালাদের জানা আছে। আল্লাহওয়ালাগণ এই দু'আনামক আমলটির ব্যাপারে অভিজ্ঞ। তাই আল্লাহওয়ালাগণের কাছে গিয়ে এই আমলটি শিক্ষা করা উচিত। এটিও তো একটি দরখাস্ত। একটি আবেদন। এটিও তো একটি ফরম। এই ফরম পূরণ করতে হবে। আল্লাহর কাছে দরখাস্তটা এমনভাবে দিতে হবে, যেন তা কবুল হয়। আমরা দুনিয়াতে দেখি, যদি দরখাস্তে ভুল হয়, তাহলে সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না। তেমনি দু'আও যেন বিশুদ্ধভাবে হয়, যেন সুন্নত তরিকায় হয়। দু'আ যদি পূর্ণ আদবের সঙ্গে না করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের দু'আ

নামঞ্জুর করে দেবেন। আমাদের দু'আ ফিরিয়ে দেবেন। আমরা পেরেশান হই যে, আহা রে! আমার দু'আ কবুল হচ্ছে না। কেন যে আমার দু'আ কবুল হয় না? আল্লাহ মাফ করুন। আমরা তো এভাবে বলে বসি যে, আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না।

নাউজুবিল্লাহ!

আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন–

إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'আমার রব অবশ্যই দু'আ শ্রবণ করেন।'[১]

আমরা কেন বলি যে, শোনেন না। আমরা তো এভাবে বলা উচিত যে, আমাদের দু'আ করার তরিকা ভুল হচ্ছে। আমার চাওয়া, আমার দরখাস্ত ভুল হচ্ছে। এভাবে আমরা বলি না। অথচ এভাবেই বলা উচিত ছিল।

দু'আ করানো এবং দু'আ নেওয়ার মাঝে পার্থক্য

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করা উচিত। এক হচ্ছে দু'আ করানো। আরেক হচ্ছে দু'আ নেওয়া। দু'আ করানোও একটি আমল। তবে দু'আ নেওয়া তার চেয়েও বড় আমল। দু'আ করানো হচ্ছে– মা! আমার জন্য দু'আ করুন। বাবা! আমার জন্য দু'আ করুন। অথবা বড় কারও কাছে গিয়ে বলেন, হযরত! আমার জন্য দু'আ করুন। এটি হচ্ছে দু'আ করানো। এটিও বড় একটি ইবাদত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটি করতে উৎসাহিত করেছেন। হযরত ওমর (রাযি.) একবার ওমরায় গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, ওমর! দু'আর মধ্যে আমাদের স্মরণ করো। এটি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবীজি করেছেন।

তো এক হচ্ছে দু'আ করতে আবেদন জানানো। দু'আ করতে বলা। আরেকটি হচ্ছে দু'আ নেওয়া। দু'আ নেওয়া মানে এমনভাবে মায়ের সেবা করো যে, তার মন থেকে এমনিতেই দু'আ বের হয়। বাবার সেবা এমনভাবে করা যে, বাবার মন থেকে দু'আ বের হয়ে আসে। ওস্তাদের সাথে এমন আচরণ করা যে, তাদের মন থেকে এমনিতেই দু'আ বেরিয়ে আসে।

আজ তো দু'আ করানোর লোক আছে অনেক। তবে দু'আ নেওয়ার, দু'আ প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য লোক কমই আছে।

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৯

চেষ্টা তো এই করা উচিত যে, যেন আল্লাহ আমাদের দু'আপ্রাপ্ত বানিয়ে দেন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনজন শিষ্য ছিলেন, যাদের সব কজনের নামই আবদুল্লাহ। তাঁরা নবীজির খেদমতে সর্বদা আগে-আগে থাকতেন। হাদীছ শরীফে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের সব কজনের নাম নিয়ে-নিয়ে দু'আ করতেন। এর ফল এই দাঁড়াল যে, তাঁরা তিনজনই দুনিয়ায় অনেক বড়-বড় জ্ঞানী, গুণী ও সম্মানিত হয়েছেন।

তাঁদের একজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। ইনি ছিলেন ইমামুল মুফাসসিরীন। তথা তাফসীরবিদগণের ইমাম। আরেকজন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। ইনি ছিলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন। তথা হাদীছবিশারদগণের ইমাম। আরেকজন হচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। ইনি হচ্ছে ইমামুল ফুকাহা। তথা ফেকাহবিদগণের ইমাম। তাঁরা এতখানি বড়, নবীজির দু'আর কারণে হয়েছেন। আল্লাহ তাদের ওপর মেহেরবানি করেন, যারা বড়দের দু'আ নিতে পারে।

দু'আ প্রার্থনায় আমাদের ভুলসমূহ

আজ যে দু'আ প্রার্থনার ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হয়ে যাচ্ছে এর কারণ হলো, আমরা কামনা করি, সন্ধ্যার আগেই আমার দু'আটা কবুল হয়ে যাক। আমরা তাড়াহুড়া করতে থাকি। দ্রুত প্রাপ্তির কামনা করতে থাকি। আজকাল মহিলারা কামনা করে, সকালে স্বামীকে একটা কথা বলেছি; সন্ধ্যায়ই যেন কাজটা সম্পাদিত হয়ে যায়।

আমরাও আল্লাহর সাথে তেমনই করছি। ফজরের নামায পড়লাম, দু'আ করলাম আর চাই মাগরিবের আগেই সেই দু'আ কবুল হয়ে যাক। এদিকে অভিযোগ করতেও বসে যাই। আরে ভাই! এভাবে অভিযোগ করলে তো দু'আ মোটেই কবুল হয় না– হবে না। আল্লাহ তো আল্লাহই। তাঁর কাছে চাওয়ার জন্যও তো একটা পদ্ধতি আছে। আল্লাহর দরবারে মান-অভিমান চলে না। তাঁর সামনে নিজের অক্ষমতা, নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিতে হয়। তাঁর সামনে নত হতে হয়।

অনেক সময় নারীরা চিঠিতে লেখে, আমরা দু'আ করছি; কিন্তু দু'আ কবুল হচ্ছে না। আমি দু'আ করেছি; কিন্তু আমার দু'আ কবুল হতে দেখিনি। এতে আমরা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিয়েছি। নিজেদের অজ্ঞতা ও অদূরর্শিতার

দরুন স্বামীর সাথে যেমন অভিমান করে বিমুখ হয়, তেমনি আল্লাহর সাথেও অভিমান করে আল্লাহ থেকেও বিমুখ হয়ে গেল। অথচ কেউই ভাবে না, দু'আ করার মধ্যেও তো কোনো ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, যার কারণে দু'আ কবুল হচ্ছে না। কেন খামোখা বলা হয় যে, আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না? আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেন না?

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– দু'আ কবুলের তিনটি স্তর আছে।

১. দু'আ যা করা হয়, যেভাবে করা হয়, হুবুহু সেভাবে কবুল হয়ে যায়।

২. দু'আ করা হয়; তবে দু'আর বিনিময়ে বড় কোনো মুসিবত দূর করে দেওয়া হয়।

৩. দু'আগুলোকে একে-একে সব জমা করে রাখা হয়। কেয়ামতের দিন এই দু'আর বিনিময় এত বেশি দান করা হবে যে, বান্দা বলতে শুরু করবে, হায়! আমার কোনো দু'আর বিনিময়ই যদি দুনিয়ায় না দেওয়া হতো। দু'আর সব ফলাফল যদি আমাকে এখানেই দান করা হতো। তাহলে তো দুনিয়ার সামান্য প্রাপ্তির তুলনায় এখানে অমূল্য দান ও অনুদান আমি পেয়ে যেতাম। এখানকার প্রাপ্তিই তো শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। এখানকার প্রাপ্তির তুলনায় দুনিয়ার প্রাপ্তির তো কোনোই দাম নেই। বোঝা গেল, দু'আ করলে দু'আ অবশ্যই কবুল হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা দু'আর বিনিময় উল্লিখিত তিন পদ্ধতির কোনো একটি পদ্ধতিতে দান করেন। বান্দাকে কোন বিষয়টি দান করলে ভালো হবে সেই দিকটি বিবেচনা করেই আল্লাহ বান্দার দু'আ কবুল করেন।

যেমন– কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে টাকা-পয়সা চাইল। আল্লাহ তাকে তা দিলেন না। আল্লাহ তো জানেন, যদি আমি তাকে ধনসম্পদ দেই, তাহলে সে দীন থেকে দূরে সরে যাবে। তাই আল্লাহ তার দু'আটি ভিন্নভাবে কবুল করেন। যেমন– ছোট বাচ্চা যদি আগুন হাতে নিতে চায়, মা আগুন তার হাতে দেয় না। কাঁদলেও দেয় না। কারণ, শিশু বাচ্চা তো জানে না, এটা তার জন্য ক্ষতিকর। মা জানে, বিষয়টা ক্ষতিকর। তেমনিভাবে বান্দার জন্য কোনটি উত্তম, কোনটি কল্যাণকর ও উপকারী, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তাই তিনিও বান্দার দু'আ সেই হিসেবেই কবুল করেন। আমরা তো আর জানি না কোন বিষয় আমাদের জন্য উপকারী হবে আর কোন বিষয় হবে ক্ষতিকর?

আল্লাহই উত্তম ফয়সালা করেন

আল্লাহ যেহেতু রাহীম ও কারীম, আল্লাহ যেহেতু দয়াবান ও মেহেরবান, তাই তিনি উত্তমভাবেই ফয়সালা প্রদান করেন। অনেকে নিজের পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করে রাখে। অনেক মেয়ে ছেলে পছন্দ করে রাখে। ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে রাখে। আর চেষ্টা করতে থাকে, এখানেই যেন তার বিয়ে হয়। এই মেয়েকেই যেন সে বিয়ে করতে পারে। এই ছেলের সাথেই যেন তার বিয়ে হয়। কিন্তু সে তো জানে না, যে ছেলেটা আজ তাকে ভালোবাসে, দুদিন পরেই সে আরেকজনকে ভালোবাসতে শুরু করবে। আল্লাহ তো জানেন। মেয়েটা কত দু'আ করে। কত মান্নত করে। কিন্তু আল্লাহ তার জন্য ভিন্ন ফয়সালা করে রাখেন। কারণ, আল্লাই তো ওই ছেলের বা ওই মেয়ের প্রকৃত অবস্থা জানেন। তাই আল্লাহ ইনসাফ মতোই ফয়সালা করেন, যেন মেয়েটা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, যেন ছেলেটা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। কিন্তু বান্দা তো বোঝে না। মানুষ আল্লাহর ফয়সালার বিরুদ্ধাচরণ করে। মানুষ ভালোবাসার পরিণামে আত্মহত্যা করে। আল্লাহর ফয়সালার তুলনায় সে আত্মহত্যাকেই উত্তম মনে করে। অথচ সে তো জানল না, আল্লাহর ফয়সালা-ই ছিল কল্যাণকর।

শোনো হে বান্দা! আল্লাহ বিষয়টা ভলো করেই জানেন। সেজন্য তিনি তোমার খেয়াল-খুশি, তোমার অবুঝ ইচ্ছে আর তোমার চেষ্টা-তদবিরকে বাস্তবায়ন করেননি। তোমার জন্য কল্যাণকর হলে তো তিনি সাথে-সাথেই তোমার চাওয়া, তোমার ইচ্ছা তোমার প্রার্থনা কবুল করে নিতেন। তুমি দু'আ করতে থাকো। তোমার জন্য কল্যাণকর বিষয়ের ফয়সালা যেন আল্লাহ তা'আলা করেন সেই দু'আ করতে থাকো। ইনশা আল্লাহ তোমার জন্য যা উত্তম আল্লাহ তার ব্যবস্থা তোমাকে করে দেবেন। এই বিশ্বাস তোমার হৃদয়ে ধারণ করো।

যেমন– কেউ দু'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ধনী বানিয়ে দাও। তো অনেক সময় আল্লাহ তাকে সরাসরি ধনী বানিয়ে দেন। কারণ, আল্লাহ জানেন, লোকটাকে যদি ধনী বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে তার সন্তানকে মানুষ বানাতে পারবে না। তার ছেলে-সন্তানরা বখাটে হয়ে যাবে। তার সন্তানরা নাফরমানি করতে-করতে ঈমানহারা হয়ে যাবে। তো আমরা জানি না, আমাদের দু'আ কী কারণে কবুল হয়নি। আল্লাহর ওপর ভরসা ও আস্থা রাখা চাই। আল্লাহ তো বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও ৭০ গুণ বেশি

ভালোবাসেন। দু'আ হুবুহু কবুল না করার পেছনে কোনো রহস্য লুকায়িত রয়েছে। তবে আমার এই দু'আর বিনিময়ে অবশ্যই-অবশ্যই সেই তিন রকম প্রতিদানের কোনো এক রকম প্রতিদান প্রদান করা হবেই। তা আজ হোক বা কাল হোক বা কেয়ামতের দিন হোক। হয়তো বড় কোনো মুসিবত থেকে আল্লাহ বান্দাকে বাঁচিয়ে দেবেন তাঁর দু'আর কারণে।

একটু চিন্তা করুন। কতবার আপনি গাড়িতে যাতায়াত করছেন। একসিডেন্ট হতে গিয়েও বেঁচে গেছেন কতবার। এটা তো আপনার সেই দু'আর কারণেই হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হয়ে চলছে। কতবার ভূমিকম্প এসেছে। কত ক্ষতি কতজনের হয়েছে। কত মানুষ মরেছে, কত মানুষ বেঁচেছে। বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো তো তাদের দু'আর প্রতিদান হিসেবেই বেঁচেছে। তাই এভাবে বলা যে, আমাদের দু'আ কবুল হয় না বা হচ্ছে না, এটা একান্তই বোকামি এবং আল্লাহর ওপর কুধারণা। এভাবে অভিযোগ তোলা ঠিক নয়।

দু'আ করতেই থাকবে

দু'আ করা উচিত এবং দু'আ করতে থাকা উচিত। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, ছোট শিশু তার মায়ের কাছে কোনো জিনিস চাইলে মা হয়তো সাথে-সাথে দিয়ে দেন। আবার কখনও সাথে-সাথে দেন না। তখন কিন্তু বাচ্চাটা মায়ের কাছে জিনিসটা চাইতেই থাকে— আম্মু! দাও, দাও। আম্মু! দাও, দাও। কিছুক্ষণ পর বাচ্চা জিনিসটার জন্য কান্নাকাটি করতে শুরু করে। এবার মা জিনিসটাও দিয়ে দেন আবার বাচ্চাটাকে বুকেও টেনে নেন। এমনিভাবে বান্দার দু'আও বিরতিহীনভাবে চেয়ে যেতে হয়। প্রার্থনা করতে থাকতে হয়। আল্লাহর কাছে চাইলে আমরা কিন্তু মাহরূম থাকব না। হয়তো সাথে-সাথে হুবহু যা চেয়েছি, তা-ই কবুল হয়ে যাবে অথবা তার বিনিময় পাওয়া যাবে। কোনো বিপদ আসার কথা ছিল; আল্লাহ তা'আলা দু'আর বিনিময়ে ওই বিপদটা দূর করে দেবেন। এমনও তো হতে পারত যে, আপনার মুখে বা ত্বকে কোনো রোগ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যার কারণে আপনি আপনার স্ত্রীর অপছন্দনীয় হয়ে যেতেন, আপনার স্বামীর অপছন্দনীয় হয়ে যেতেন। আপনি কি জানেন, আপনার সেই দু'আর কারণেই আল্লাহ আপনাকে রোগবালাই থেকে হেফাযত করছেন। আপনার সুস্থতা বহাল রেখেছেন। ঘরে-সংসারে আপনি প্রেম-ভালোবাসা ও মহব্বতের জীবন গুজরান করছেন। খবর তো নেই কোন-কোন দু'আর ফল এটা। সম্মান ও ইয্যাতের এই জীবন আপনার কোনো-না-কোনো দু'আরই ফসল।

তাই বলি, দু'আ করতে থাকুন। দু'আ চাইতে থাকুন। আল্লাহর কাছে দু'আ করার পর সাথে-সাথে কবুল হয়ে যাক এমন ইচ্ছে পোষণ করে বসে থাকা ইবাদতের আদবের খেলাফ। এত দ্রুত হতাশ না হওয়া চাই।

দু'আ চাইতে থাকলেই কবুল হয়

উক্ত কথাগুলোর সাথে একথাও স্মরণ রাখবে যে, কিছু মানুষ প্রার্থনা করে আর কিছু মানুষ প্রার্থনাবাণী তথা দু'আ পাঠ করে। এভাবে দু'আ শুধু পাঠ করে গেলে তো কবুল হয় না। দু'আ প্রার্থনা করার দ্বারাই সেই দু'আ কবুল হয়। অর্থাৎ-- দু'আ পড়া মানে হলো আপনি পড়ে নিলেন–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا ـ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا

তোতা পাখির মতো এভাবে দু'আ পাঠ করলেন। জানলেনও না, বুঝলেনও না কী চাইলেন, কী দু'আ করলেন।

একবার এক মসজিদে নামায পড়লাম। আমার পাশেই একব্যক্তি নামায পড়ছিল। নামাযের পর তিনি দু'আ করলেন এবং হাত চেহারায় মুছে নিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আজকে আপনি দু'আর মধ্যে কী চেয়েছেন? তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হযরত! কী যে বলব? আমার তো জানা নেই আমি কী চেয়েছি। এইমাত্র চেহারায় হাত মুছল দু'আ করে আর এখনই তার জানা নেই কী দু'আ করেছে। এমন উদাসীন দু'আ কী করে কবুল হবে? এমন ভাবলেশহীন দু'আ কীভাবে কবুল হবে? একেই বলা হয় দু'আ পড়া। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য মন-প্রাণ উজাড় করে দু'আর বিষয়গুলো পাওয়ার জন্য আল্লাহর সামনে কাকুতিমিনতি করতে হয়। আল্লাহর কাছে দু'আর বিষয়টি চাইতে হয়।

যে ফকির আপনার দুয়ারে ভিক্ষার জন্য আসে, সে তো এক দিকে ফাটা ও পুরানো কাপড় পরিধান করে আসে, আবার আপনার কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে বুঝেশুনে চায়। এমন কাতরভাবে চায় যে, আপনার মন নরম হয়ে যায়, হৃদয় গলে যায়। কাঁদ-কাঁদ স্বরে, কাঁপা-কাঁপা গলায় আপনার কাছে এক ভিক্ষা চায়। আপনার কাছে দুটা পয়সা চায়। কত বিনীত হয় সে বান্দার সামনে।

তাহলে ভেবে দেখুন, আল্লাহর কাছে বান্দা কোনো কিছু চাইতে হলে কত বেশি বিনয়াবনত হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহর সামনে বান্দা কত বেশি ছোট হওয়া প্রয়োজন।

দু'আ প্রার্থনার ভুল তরিকা

আজ আমরা দু'আ প্রার্থনা করি এমনভাবে যেন কোনো চাকরকে আমরা কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। যেমন এভাবে দু'আ করা হয় যে, আল্লাহ! আমার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে দাও। ভালো জায়গার ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ! আমার ছেলের চাকরির ব্যবস্থা করে দাও। আমার স্বামীকে আমার মেজাজ ও আমার ইচ্ছার অধীন বানিয়ে দাও। আমার স্বামী যেন আমার সামনে এমন হয় যে, আমার হাতের ইশারায় চলে। হে আল্লাহ! আমার সাথে ওই লোকেরা হিংসা করে; তাদের ঘরবাড়ি উজাড় করে দাও।

অর্থাৎ– এমনভাবে দু'আ করা হয়, যেন নিজের অধীন কোনো চাকরকে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আরে ভাই! দু'আ প্রার্থনা করা ভিন্ন ব্যাপার। অত সহজ ব্যাপার নয়। অধীনের ওপর কাজ চাঁপিয়ে দেওয়া তো কোনোভাবেই দু'আ হতে পারে না। তিনি তো আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর আযমত ও শান তাঁরই মতো মহান। এদিকে অবশ্যই খেয়াল রেখে দু'আ করতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দু'আ করা উচিত, যেন আমি একজন দাস, মনিবের সামনে যেন কোনো একটি বিষয় প্রার্থনা করছি। একেবারে বিনয়ের সঙ্গে, একেবারে বিনম্রভাবে নিজেকে ছোট করে কাতরতার সাথে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে নিজের প্রার্থিত বিষয়টি। তাহলেই তো দু'আ অতি দ্রুত কবুল হবে।

কবির ভাষায়–

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

'আমরা অভিযোগ তুলি আল্লাহর ওপর; অথচ দোষ আমাদের নিজেদেরই মাঝে।'

আমরা আল্লাহর ওপর অভিযোগ তুলি, আল্লাহ আমার দু'আ শোনেন না; অথচ দু'আ করার ক্ষেত্রে এমন ভুল করি নিজেরাই, যার হিসাবও আমরা জানি না।

মন দিয়ে দু'আ করলেই কবুল হয়

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি তাওয়াফ করছিলেন, এক অন্ধ বুড়ো আল্লাহর কাছে দু'আ করছিলেন। বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এটা শুনে

তাকে বাধা দিলেন। লোকটির মাথায় আঘাত করে বললেন, তোমার কি জানা আছে, আমি কে?

বৃদ্ধ বললেন, আমি জানি না আপনি কে। হাজ্জাজ বললেন, আমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। হাজ্জাজের ব্যাপারে তো প্রসিদ্ধ যে, তিনি বড় কঠোর ছিলেন। যা বলতেন, তা করেই ছাড়তেন। বললেন, আমি তাওয়াফের চক্করটা শেষ করে আসছি। এসে যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে না দেখি, তবে তোমাকে হত্যার নির্দেশ দেব। হাজ্জাজ একজন সিপাহী দাঁড় করে দিলেন বৃদ্ধর পাশে যেন পালাতে না পারে।

এবার এই অন্ধ বৃদ্ধের অবস্থা বড়ই করুণ রূপ ধারণ করল। চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু পড়তে লাগল, ভয়ে কাঁপতে লাগল। বড় কাতর স্বরে আল্লাহর কাছে চাইতে লাগল, ওগো আল্লাহ! তুমি দয়া করে আমার দৃষ্টিশক্তির ব্যবস্থা করে দাও। আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও। আল্লাহ! দয়া করে তোমার এই গোলামকে তুমি রক্ষা করো। তুমি ছাড়া তো কেউ নেই আমার। হে আল্লাহ! হে মেহেরবান!

এভাবে বড়ই কাতর স্বরে অন্ধ বৃদ্ধ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। এবার লোকটা এত কম্পিতভাবে, এমন কাতরভাবে দু'আ করল যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন তাওয়াফ শেষ করে এলেন, তখন দেখা গেল, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বললেন, তুমি যে মুড নিয়ে আগে দু'আ করছিলে, সেভাবে যদি সারা জীবনও দু'আ করতে, তোমার দু'আ কোনোদিনই কবুল হতো না। আগে তুমি শুধু মুখের বুলি আওড়িয়ে দু'আ করছিলে। এখন তোমার যখন জানের ভয় চলে এল, জান বাঁচানোর তাগিদে বড় তড়পের সাথে দু'আ করেছ, কাতর কণ্ঠে নিজেকে বিনয়াবনত করে প্রাণ খুলে দু'আ করেছ, এবার দু'আ কবুল হয়ে গেছে। কবির ভাষায়–

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

'হৃদয় থেকে যে-কথাটা বের হয়, তার বড় প্রভাব থাকে। শক্তি না থাকলেও সেই দু'আর গ্রহণযোগ্যতা থাকে।'

তাই সর্বদা দু'আ করে যাবে। হৃদয় দিয়ে, প্রাণ খুলে করতে হবে দু'আ। তড়পের সাথে, কেঁদে-কেঁদে নিজেকে নরম করে দু'আ করতে হবে। তখনই দেখবে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত কীভাবে নাযিল হয়।

প্রাণ উজাড় করে প্রার্থনা করবে

একটি কথা মাথায় ধারণ করুন। যারা ভদ্র ও দানশীল, তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে তারা একটু বেশি দান করেন। কেউ আমার কাছে ভিক্ষা চাইলে আমি হয়তো তাকে দশ টাকা দেব। কারণ, আমার সামর্থ্য এমনই। আবার যদি কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের কাছে সে ভিক্ষা চায়, তাহলে সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হাজার টাকা দেবে। বাদশাহর কাছে চাইলে বাদশাহ তাকে লাখ টাকা দেবে।

তো দেখুন, দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ তার সামর্থ্য ও অবস্থান অনুযায়ী দান করে। তো ভালো করে মনে রাখুন, যখন আল্লাহ কবুল করে নেন, তখন তিনি তার শান ও মান অনুযায়ী বান্দাকে দান করবেন। আল্লাহ তো বড়ই দয়ালু পরোয়ারদেগার। প্রার্থনাকারীর পাত্র ছোট হতে পারে, মহাদানশীল রবের দান তো আরও বড়, আরও বিশাল। তিনি বঞ্চিত করেন না কাউকেই। কিন্তু চাওয়ার মতো চাইতে হবে।

আমার শৈশবের একটি ঘটনা

আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। মহল্লায় এক দোকানদার ছিল। আমার বাবার সাথে তার মধুর সম্পর্ক ছিল। আমি তার কাছে সদাই নিতে গেলে ওজন করে যা প্রাপ্য তা দিতেন এবং পরে আরেকটু বাড়তি দিয়ে দিতেন। আমি তা বুঝতাম না। একবার বিষয়টা আমি আমার বাবার কাছে বললাম। বাবা বললেন, আরে বেটা! দোকানদার যে বাড়তি একটু দিয়ে দেয়, সেটুকু সে মহব্বতের কারণে দেয়। সে আমার সাথে যে-মহব্বত রাখে, তার হক আদায় করে। শৈশবের সেই কথাটা আজ বড় বেশি মনে পড়ছে। যদি মহব্বতের সম্পর্ক আছে এমন একজন বান্দা নিজের সামর্থ্য থেকে অতিরিক্ত দিতে পারে, বান্দা যদি আল্লাহর সাথে ওই রকম সম্পর্ক গড়তে পারে, তাহলে আল্লাহও তো বান্দাকে তাঁর শান ও মান মোতাবেক অধিক দান করবেন। দু-চারটা দৃষ্টান্ত শুনুন।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ফল প্রার্থনার ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী হযরত হাজেরা এবং পুত্র হযরত ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন শাম থেকে মক্কা মুকাররামায়। একটা ঊষর ও বিশুষ্ক মরুপ্রান্তরকে তিনি আবাদ করলেন।

কুরআনের ভাষায়–

بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ

'ফসল শস্যহীন উপত্যকা।'[১]

তিনি এই মরু উপত্যকায় এসে দু'আ করলেন–

وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ

'হে আল্লাহ! আপনি তাদের ফল ও ফসল দান করুন।'[২]

আর ভাই! আমরা হলে তো খাওয়ার জন্য রুটি-পানি চাইতাম। আম্বিয়া কেরামের শান ও মেজাজ তো অনেক উঁচু ও আলিশান। তাঁদের সতর্কতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি বেশি। তিনি খাবার হিসেবে চাইলেন ফল। এ বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে আমার প্রিয় ইবরাহীম! আমি এই স্থানটায় সর্বপ্রকার ফল পৌঁছিয়ে দেব। তবে ثمرات তথা ফলের স্থলে اشجار তথা বৃক্ষরাজি বলে দেওয়া হতো যদি, তাহলেও তো ঠিক হতো। গাছ হবে আর গাছ থেকে ফল হবে। কারণ, প্রার্থনাকারী গাছের ফলই প্রার্থনা করেছেন। কারণ, তিনি তো ثمرات বলেছেন اشجار বলেননি। ثمرات كل شيئ প্রত্যেক জিনিসের ফল।

আপনারা দেখবেন, ক্ষেতের ফল হচ্ছে শস্য। আর গাছের ফল হচ্ছে ফল। কারখানার ফল তার প্রোডাক্ট। কোনো-কোনো কারখানার ফল হচ্ছে কাপড়। কোনো-কোনো কারখানার ফল প্লাস্টিক। দম্পতির ফল তার সন্তানসন্ততি। তাই তো পিতামাতাকে দেখা যায় তারা নিজ সন্তানকে এই মক্কায় পাঠাতে ব্যাকুল থাকে। আমরা আমাদের হৃদয়ের ফলও এখানে পাঠাতে প্রস্তুত। তো হযরত ইবরাহীম প্রার্থনা করেছেন 'ফল'। আল্লাহও তাঁর দু'আ কবুল করে সেই এলাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন সর্বপ্রকার জিনিসের ফল।

স্ত্রী আছিয়ার দু'আর ঘটনা

অভিশপ্ত ফেরাউন যখন তার স্ত্রী আছিয়ার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হলো, তখন সে তাকে অনেক অপমান ও কষ্ট দিল। ফেরাউন স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে আমার ঘর থেকে বের করে দেব। আর নারীকে ঘর

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৭

থেকে বের করে দেওয়াই সবচেয়ে বড় শাস্তি তার জন্য। এতে নারী বড় কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন হয়ে যায়। সুতরাং ফেরাউন তার কথামতো স্ত্রী আছিয়াকে ঘর থেকে বের করে দিল। আছিয়া বের হতে-হতে বড় কাতর ও করুণ স্বরে দু'আ করলেন–

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দিন।'[১]

হে আল্লাহ! এই জালেম তো আমাকে দুনিয়ার ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। এই ঘরের বিনিময়ে আপনি জান্নাতে আপনার কাছেই আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করুন। আল্লাহ তার দু'আ অত্যন্ত পছন্দ করলেন। এমন পছন্দ করলেন যে, তার আলোচনা তিনি কুরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন। প্রার্থনাকারী স্ত্রী আছিয়া তো শুধু ঘর প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু মহাদানশীল আল্লাহ শুধু ঘরই দেননি। ঘরের সাথে ঘরওয়ালাও দিয়ে দিয়েছেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে আছে, যখন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর ইন্তিকাল হতে লাগল, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে খাদীজা! তুমি যখন জান্নাতে পৌঁছবে, তখন আমার স্ত্রীগণকে সালাম বলবে। খাদীজা! অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! দুনিয়াতে আমিই তো আপনার একমাত্র স্ত্রী। জান্নাতে আবার কে বা কারা আছে আপনার স্ত্রী? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে আছিয়া ও মারয়ামকে আমার স্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুবহানাল্লাহ!

প্রার্থনাকারী তো শুধু ঘর চেয়েছিল। কিন্তু দাতা ঘরওয়ালাও দিয়ে দিলেন। আল্লাহর শান কত বড় দেখুন। আল্লাহ নিজের মাহবুবকে আছিয়ার স্বামী বানিয়ে দিলেন!

হযরত ওমর (রাযি.)-এ শাহাদাত প্রার্থনার ঘটনা

সাইয়্যেদুনা হযরত ওমর (রাযি.) মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করছিলেন। একস্থানে রাত নেমে এল। তিনি শুয়ে পড়লেন। তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হলেন। রাত গভীর। একটি চাঁদ দারুণভাবে আলো বিকিরণ

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ১১

করছে। শেষ রাত তো রহমত নাযিলের সময়। এ সময়টাতে উঠে তো প্রার্থনা করতেই মন চায়। হৃদয় চায় আল্লাহর কাছে দু'আ করতে। হযরত ওমর এই নিশুতি রাতে জাগ্রত হলেন, তাহাজ্জুদ পড়লেন এবং দু'আয় মশগুল হলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুটি দু'আ করলেন। আসমানের চাঁদ দেখে তিনি মদীনার চাঁদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং দু'আ করলেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ قَبْرِىْ فِىْ بَلَدِ حَبِيْبِكَ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার রাহে শাহাদাত নসিব করুন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার হাবীবের শহরে আমার কবর বানিয়ে দিন।'

নিজের দুটি দু'আ, দুটি প্রার্থনা, দুটি কাম্য বিষয় আল্লাহর সামনে পেশ করলেন। আল্লাহও কবুল করে নিলেন। শাহাদাত তো তার পাহাড়ে, সাগরে, মরুপ্রান্তরে ও হতে পারত। কিন্তু না; বরং তিনি ছিলেন উজু অবস্থায়, নামায আদায়রত। নবীজির মসজিদে রিয়াজুল জান্নাহর মোসল্লায়। সেখানেই তাঁকে আঘাত করা হয়েছে। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি তো দু'আয় বলেননি, মাহবুবে খোদার মোসল্লায় শাহাদাত হোক। তিনি শুধু প্রার্থনা করেছেন মাহবুবে খোদার শহরে যেন দাফন হয়। তো এখানে আবার জান্নাতুল বাকীতেও দাফন হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রার্থনার চেয়ে বেশি দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে নিজ মাহবুবের হুজরায় ও কামরায় মাহবুবের কদমে স্থান করে দিলেন।

আল্লাহ কামনার চেয়েও বেশি দেন

উক্ত কথাগুলো দ্বারা বুঝে এল, প্রার্থনাকারী যা-ই প্রার্থনা করুক দানকারী রব্বে কারীম নিজের শান মোতাবেক প্রার্থনার চেয়েও অনেক বেশি দান করেন। তিনি তো বড়ই দয়াবান ও মেহেরবান।

কবি বলেন–

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال
کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے
ہم کو شکوہ ہے کہ مدعا ملتا نہیں
دینے والے کو شکوہ ہے کہ گدا ملتا نہیں

غفلت شعاری دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم
دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں

'আল্লাহর দীনের হালত জিজ্ঞেস করো হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে।

আগুন আনতে তূর পাহাড়ে গিয়ে পেয়ে গেলেন নবুওত।

আমরা অভিযোগ তুলি, আমার দু'আ, আমার কামনা দান করা হয়নি।

কিন্তু দাতা অভিযোগ করেন, দেওয়ার জায়গা পাই না আমি। পাত্র পাই না আমি।

বান্দার এই গাফলত দেখে দয়াময় আল্লাহ বলেন, দানকারী দেবেন কাকে; দু'আর হাত তো পাওয়াই যায় না।'

আল্লাহ তো দিয়েই খুশি হবেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর সমীপে অনেক বেশি দু'আ করা। আমাদের চাওয়ার মধ্যে দেরি হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর দানের মধ্যে সামান্যও দেরি হয় না। কবির ভাষায়—

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے راہ رہرو منزل ہی نہیں
تربیت تو عام ہے جوہر قابل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں

আমি তো দয়া ও দানের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু প্রার্থনাকারী কেউ নেই।

পথ দেখাবে কী করে, পথের মনযিল যে নেই।

আল্লাহর দান তো ব্যাপক, তার পালন-প্রতিপালন বিস্তৃত; কিন্তু কে আছে যোগ্য পাওয়ার যোগ্য?

আদমের দেহ তৈরি হয়েছে যে বাগানের মাটি দ্বারা, সেই বাগানই তো আজ নেই।

যখন রাতে আল্লাহর কাছে চাওয়ার সময় হয়, তখন আমাদের চোখ খোলে না। তাহাজ্জুদের সময় আমরা জাগ্রতই হই না।

کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے
ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے

কতবারই তো জেগেছ তুমি। সকালবেলা কতই তো হয়েছ জাগ্রত।

আমার সাথে প্রেমনিবেদন কখন করবে; ঘুমই যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়?

তাই বলছি ভাই! দু'আ কবুল হওয়ার সময়ই আমরা আল্লাহর কাছে চাইব। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করব। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তাহাজ্জুদের সময় ফেরেশতা আহ্বান করতে থাকে, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি? এসো; আমি তোমার প্রার্থনা পূরণ করব।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে কোনো প্রার্থনাকারী আছে কিনা। হে প্রার্থনাকারীগণ! তোমরা প্রার্থনা করে নাও। আহ! এমন সময়টাতেও আমরা গভীর ঘুমে বিভোর থাকি। আমাদের খবরই থাকে না আমাদের তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, ফজর পড়তে হবে। কত মানুষ আছে, রমজানে সাহরির জন্য ওঠাও তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। আমাদের অবস্থা বড়ই করুণ। নারীরা বলে, আরে রাতের বেলায়ই একটু বেশি করে খেয়ে নিতে হবে। ভোর রাতে উঠতে পারব না।

আল্লাহর রহমত খুবই বিস্তৃত

রমজানের কিছুদিন এখনও বাকি রয়ে গেছে। এই দিনগুলোতে আল্লাহ থেকে চেয়ে নিন। কিতাবে আছে, এক বৃদ্ধ ছিল। দুনিয়ায় তার কেউ নেই। স্ত্রী নেই, সন্তান নেই। কোনো একটা পরিবারের লোকেরা তাকে নিজেদের কাছে রেখেছিল। কিন্তু লোকটার তীব্র কাশির কারণে তারাও তাকে বের করে দিল। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল বুড়ো। সারা দুনিয়ায় কেউ নেই এখন তার। হৃদয়টা বড় ব্যাথিত। রাজ্যের টেনশন। কোথায় যাব এখন। মনে-মনে চিন্তা করল, আল্লাহর ঘরেই চলে যাই। বুড়ো ধীরে-ধীরে পা বাড়াল মসজিদের দিকে। আল্লাহ কিন্তু বললেন না, তুমি তোমার যৌবন কোথায় ব্যয় করেছ? তোমার সৌন্দর্য কোথায় শেষ করে দিয়েছ? তোমার সম্পদ কোথায় খুইয়েছ। আল্লাহ বুড়োকে ফিরিয়ে দিলেন না। যদি এই বুড়ো তাওবা করে নেয়, তাহলে রব্বে কারীম বলেন, বান্দা! তুমি যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হও, আমি তোমার দিকে দুই বিঘত অগ্রসর হব। তুমি যদি আমার দিকে হেঁটে আস, আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাব। আমার রহমত এমন সুপ্রশস্ত ও সুবিস্তৃত।

এমন দয়ালু ও মেহেরবান যে-রব, যে-আল্লাহ, সেই আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করব না তো কার কাছে প্রার্থনা করব?

হে প্রার্থনাকারী! তুমি ক্ষান্ত হয়ো না। তুমি প্রার্থনা করে যাও।

চিন্তা করুন, আমাদের মতো দুর্বল লোকদের ব্যাপারে যখন রব্বে কারীম এমন নির্দেশনা দান করেন, তাহলে বলুন এই মহা দরবার ছেড়ে আমরা কোথায় যাব! কোনো বান্দা যদি তাঁর দরবারে ভিক্ষুকের মতো হাজির হয়, আল্লাহ ওই বান্দাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে চায় ও প্রার্থনা করে এমন মানব কমই আছে। মহাদানশীল আল্লাহর ভান্ডারে কোনো অভাব নেই। তাঁর সম্পদের কোনো অভাব নেই। তিনি তো দিয়েই খুশী হন এমনকি বলেনও—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'আমাকে ডাকো, আমার কাছে দু'আ করো। তোমাদের ডাকে আমি সাড়া দেব।'[১]

আল্লাহ যেমন মহাসত্য, তাঁর কথাও তেমনই মহাসত্য। তাই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহর কাছে দু'আ প্রার্থনা করব। আল্লাহ আমাদের পেরেশানিকে দূর করে দেবেন। দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে বেড়ানো এবং মানুষের দ্বারে ধরনা দেওয়া থেকে রক্ষা করবেন। আমার প্রিয় বন্ধু, ভাই ও বোনেরা!

আজ মুসলিম উম্মাহ এতটা পেরেশান যে, ছিঁড়ে যাওয়া তাসবীহর ছড়া থেকে যেমন তাসবীহর দানাগুলো ঝড়ে পড়ে, তেমনি মুসলমানের ওপর যেন পেরেশানি আসছেই আসছে।

ঘরে আছি, তো অবমাননাকর পরিবেশে আছি।

اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے

امت پہ آکے تیری عجب وقت پڑا ہے

'এখনই দু'আর মোক্ষম সময় হে মানব! তোমার সব দ্বিধা, সব অভিমান ছাড়ো। দু'আর সময় এসেছে; দু'আ করো।'

এখন নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে দু'আ করার সময়। সম্মিলিতভাবেও দু'আ করবে আবার ঘরে-ঘরে একাকীও দু'আ করবে। তাহাজ্জুদের সময়ও দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা যেন মুসিবতের পাহাড় মাথার ওপর থেকে হটিয়ে দেন। উম্মতে মুসলিমার এই কঠিন সময়টা দূর করে দেন। মানুষের দুয়ারে গিয়ে ধোঁকা খাওয়ার হাত থেকে আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন।

---

১. সূরা মু'মিন : আয়াত ৬০

আরে ভাই! দুনিয়াতে এই দুয়ার বন্ধ করে দেয় তো আরেক দুয়ারে যান। ওই দুয়ার বন্ধ করে দেয়, তো আরেক দুয়ারে যান। কিন্তু আল্লাহর দুয়ার তো একটা-ই। এই একটা দুয়ার যেন আমাদের নাফরমানির কারণে বন্ধ না হয়ে যায়। এই দুয়ারটা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের আর বাঁচার পথ থাকবে না।

ভাই! দুনিয়াতে একজনের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হলে আপনি আরেকজনের সাথে বন্ধুত্ব করেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গেলে তো আর বন্ধু থাকবে না। তাই খুব সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়ার নিয়ম শিখে নিন। কবি বড়ই সত্য বলেছেন—

تنگ دستی کے عالم میں جو گھبراتا ہوں
پر در غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں
ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی
شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں

সংকট ও অনটনের অবস্থায় যে ভীত হয়ে যায়, সে অন্যের দুয়ারে গিয়ে কাতরাতে থাকবে।

আরে ভাই! মুখাপেক্ষী ব্যক্তির হাত প্রসারিত করতে এত মান-অভিমান কেন?

তোমার এই অবস্থা দেখে তোমাকে 'বান্দা' বলতেই তো বড় লজ্জা হয়।'

এখন এমন একটা সময় চলছে, যখন কাফেররা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য, অপমানিত ও লজ্জিত করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।

দু'আ করুন, হে আল্লাহ! সকলেই তো সঙ্গ ত্যাগ করেছে। আমাদের বদ-আমলের কারণে আপনি আমাদের পরিত্যাগ করবেন না। আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবেন না। আমরা আপনার থেকে দূরে সরতে চাই না। আপনার সাথে আমরা জুড়ে থাকতে চাই।

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

'আমরা গাছের শেকড়ের সাথে, মূলের সাথে জুড়ে থাকতে চাই।'

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হৃদয়ের ওপর মেহনত করুন

'...এই আখলাকে হামীদা, এই প্রশংসিত চরিত্র এবং এই বরণীয় স্বভাব আসবে নববী শিক্ষার মাধ্যমেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন—

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'নিশ্চয় আপনি সর্বোচ্চ সুন্দর চরিত্র দ্বারা মণ্ডিত।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই আখলাক ও চরিত্র শিখিয়েছেন তাঁর উম্মতকে। তাই আমরা যদি আমাদের সর্বপ্রকার অস্থিরতা ও পেরেশানি দূর করতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলিকে নিজেদের মাঝে ধারণ করা, নববী আখলাকের চর্চা করা।

তবেই মানবতার বৃক্ষ-গুল্ম সবুজ ও শ্যামলিমায় উজ্জ্বল হবে, জীবন্ত হবে। প্রাণ পাবে আমাদের সামাজিক জীবনধারা। আমাদের জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গ হবে বর্ণময় ও মহিমান্বিত। নববী আদর্শকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে হবে। হৃদয় উজাড় করে সব সঙ্কীর্ণতা দূর করে ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলিকেই। তাহলেই সজ্জিত হবে আমাদের হৃদয়। সুশোভিত হবে আমাদের জীবন।'

হৃদয়ের ওপর মেহনত করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

শান্তির অন্বেষায় প্রতিটি মানুষ

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিপূর্ণ কুদরত ও ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন মানবকূল। এই সৃষ্টিশৈলী আল্লাহর এক শাহী কর্ম। মানবকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানের আলো, বোধ ও বুদ্ধির দীপ্তি এবং আকলের নূর দান করেছেন। এর মাধ্যমেই অন্যসব সৃষ্টজীব থেকে মানবকে করেছেন শ্রেষ্ঠ ও অনন্য। প্রতিটি মানুষ নিজের অনুভূতির মাধ্যমেই এ সত্য অনুধাবন করতে পারে। একই বিষয় ও জিনিসকে কয়েকবার, কয়েকভাবে, কয়েক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তার সিদ্ধান্তও হয় কয়েক প্রকার। এই ভিন্নতা বড় ব্যাপক। প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি জনপদে এবং প্রতিটি মানব বসতির মাঝেই দেখা যায় এই ভিন্নতা। এমনকি একই ঘরের বাসিন্দাদের একেকজনের দৃষ্টিভঙ্গি হয় একেক রকম।

একটি ধর্মের মানুষ যদি একটি বিষয়ের ওপর একমত হয়, তবে অন্য ধর্মের মানুষ সে বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ করবে। তাদের বিরোধ ও মতভিন্নতা থাকবে। যদি এক দেশের মানব একটা বিষয়ে একমত হয়, তবে অন্য দেশের মানুষের ভিন্নমত থাকবে সে বিষয়টি নিয়ে। এক গোত্রের মানুষ যদি একটি বিষয় নিয়ে সকলে একমত হয়ে যায়, অন্য গোত্রের লোকদের মাঝে বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মত থাকবে। সর্বত্রই, সর্বস্থানেই আপনি এই মতভিন্নতার রূপ দেখতে পাবেন। প্রত্যেকটি জিনিস নিয়েই আপনি কোনো-

না-কোনো মানুষের মাঝে মতভিন্নতা দেখতে পাবেন। তবে একটি বিষয় এমন আছে, যাকে নিয়ে কোনো বিরোধ নেই, মতভিন্নতা নেই। কোনো প্রকার বিরোধ নেই। সমগ্র দুনিয়ার মানব এ বিষয়টিতে একমত। চাই সে যে ধর্মের, যে দেশের বা যে গোত্রের ও জনগোষ্ঠীর সদস্যই হোক না কেন। সকলেই এ বিষয়ে একমত, এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ।

সেই বিষয়টি কী? হ্যাঁ; সেই বিষয়টি হচ্ছে অস্থিরতা ও পেরেশানি। এই যে আমরা জীবন যাপন করছি, তামাম পৃথিবীতে আমাদের এই জীবনধারায় একটা বড় বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা ও পেরেশানি বিরাজ করছে। সর্বত্রই এই বেদনাবোধ ছড়িয়ে আছে। হাহাকার ছড়িয়ে আছে। আপনি যাকেই জিজ্ঞেস করবেন, হালত কী? সবাই বলবে, প্রত্যেকটি মানুষ জবাব দেবে, ভাই! বড় সমস্যায় আছি, অস্থিরতায় আছি, পেরেশানিতে আছি, অশান্তিতে আছি।

আপনি পৃথিবীর যেকোনো জাগতিক উন্নয়নশীল দেশের সদস্যকে জিজ্ঞেস করবেন, যেকোনো developed nation এর নিকট জিজ্ঞেস করবেন, সকলেই, সকল সদস্যই আপনাকে জবাব দেবে– Life is very difficult অনেক মুশকিলে জীবন কাটছে। অনেক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবন যাচ্ছে। সমগ্র দুনিয়ার সহজলভ্যতা, মনচাহি জীবন, যা ইচ্ছে তা-ই করবার পরিবেশ-পরিস্থিতি, বাঁধনহারা পশুর মতো কুপ্রবৃত্তিকে পূর্ণ করার অবারিত সুযোগ সুবিধা সবই আছে। সব ব্যবস্থা আছে। কোনো কিছুর অভাব নেই, তবুও। তবুও বলে কী– Life is difficult 'জীবন বড় সঙ্কটাপন্ন'।

তো বোঝা গেল, সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষ একটি বিষয়ে একমত যে, বিস্তৃত এই পৃথিবীময় একটা কঠিন দুর্যোগ, কঠিন সঙ্কট ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। ব্যাপারটা এমন যেন মানবতা তার মৃত লাশ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। এই পেরেশানি, অস্থিরতা এবং সঙ্কটের কোনো বিহিত ও সমাধান কেউ খুঁজে পাই না। তবে একটা সমাধান তো অবশ্যই আছে। সকলেই নিজ-নিজ পেরেশানি, অশান্তি ও অস্থিরতা দূরীকরণের চেষ্টায় নিয়োজিত। সবাই চায় আমার আত্মপ্রশান্তি এসে যাক। পূর্ণ সম্মানের জীবন আমার নসিব হোক। কিন্তু সমস্যাটা এমন যে, এর কোনো সমাধান দেখা যাচ্ছে না।

এর কারণটা কী? কারণ এই যে, মানুষ তাদের হাত থেকে ছুটে যাওয়া একটি রশি এখনও ধারণ করতে ব্যর্থ। একটি বাঁধন ও রশি আমাদের হাত হতে ছুটে গেছে, যে রশি ধারণের প্রচেষ্টায় মত্ত আছে সকলে। কিন্তু সেই রশির মাথা কারও হাতে আসছে না। তাতে দুনিয়ার দার্শনিকরা বসে আছে,

বুদ্ধিজীবীরা অস্থির সময় পার করছে। সকলে এই সমস্যা, এই সঙ্কট এবং এই পেরেশানি থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছে। কিন্তু কোনো কিনারা পাচ্ছে না কেউ।

فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں

ڈور کو سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں

'দার্শনিক তার পর্যালোচনায় খোদার সন্ধান পাচ্ছে না।
ছুটে যাওয়া রশি খুঁজে ফিরছে; কিন্তু রশির মাথা পাচ্ছে না।'

কেন এই সঙ্কট উত্তরণের পথ পাওয়া যাচ্ছে না?

কেন আজ আমরা বর্তমানের সঙ্কট উত্তরণের পথ পাচ্ছি না? বড়রা এর একটি কারণ বলেছেন। ব্যাপারটা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝুন। একলোক একবার ঘরের বাইরে জ্বলজ্বলে আলোর মধ্যে হারানো টাকা খুঁজছে। অন্য কিছুলোকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কী খুঁজছ। বলল, টাকা। সবাই মিলে এখানে টাকাটা খুঁজতে লাগল এবং এক পর্যায়ে ক্লান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, এই ভাই! তুমি কি নিশ্চিত যে, টাকাটা এখানেই হারিয়েছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ; টাকা হারিয়েছে এটা তো নিশ্চিত। তবে ঘরের ভেতরে হারিয়েছে। সকলে বলল, আরে মিয়া! তুমি টাকা ঘরে হারিয়ে বাইরে খোঁজাখুঁজি করছ কেন? লোকটি বলল, আরে ভাই! ঘরে খুব অন্ধকার। টাকা খুঁজে পাই না। সেজন্য আলোতে এসে খুঁজছি।

দেখুন, এ লোকগুলো যদি ঘরে হারানো টাকা বাইরে সারা জীবনও খুঁজে ফিরত তবুও তা পেত না। ঠিক তেমন আজকের মানবসমাজ। মানবসমাজের হারিয়ে যাওয়া সেই ধন তার হৃদয়। তারা হৃদয়ের ধন হৃদয়ে না খুঁজে বাইরে সমগ্র পৃথিবীতে খুঁজে ফিরছে। কিন্তু এখানে তো এই ধন পাওয়া যাবে না। আর সে কারণেই কেউ সঙ্কট উত্তরণের পথ পাচ্ছে না।

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

'তারকার বিচরণস্থল ও কক্ষপথ অন্বেষণকারী নিজের চিন্তাচেতনার দুনিয়ায় সফর করতে পারে না, যে কিনা সূর্যের আলোকধারা ছিনিয়ে নিয়েছে।

জীবনের আঁধার রাতকে সে দূরে ঠেলে প্রভাত আনতে পারবে না।'

সারা দুনিয়াকে উন্নয়নের উজ্জ্বল রশ্মিতে আলোকিত করার দাবিদার যে মানব, সেই মানব আজ তাদের হৃদয়জগতে অন্ধকার নিয়ে ঘুরে ফিরছে। তাই তাদের আজ সঙ্কট উত্তরণের কোনো পথ উন্মুক্ত হচ্ছে না। শান্তির ঠিকানা ও আবাসন যেটি, সেখানেই খুঁজতে হবে শান্তিময় জীবনকে। তা না হলে ব্যর্থ হবে সব চেষ্টা।

অস্থিরতা ও পেরেশানির সমাধান কি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি?

আজ দুনিয়ার দার্শনিকগণ সমাধান পেশ করেন যে, অর্থনীতি যদি এতটা সমৃদ্ধ হয়ে যায় যে, প্রতিটি মানুষের খাবার জুটে যায়, তাহলে সমস্ত সমস্যা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, যেখানে জীবন যাপনকারীদের খাবারের সর্বপ্রকার উপকরণ জুটেছে, সেখানে উদরপূর্তি করে মানব মাস্তিতে মেতে আছে, উন্মাদনায় বিভোর হয়ে আছে। খাও দাও, মাস্তি করো। মজা উড়াও। বেশ, এ-ই তো জীবন তাদের। আয়েশি জীবনে সে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা শুরু করেছে। তবুও জীবনে অশান্তি, অস্থিরতা। এক সময় ক্ষুধার্ত ছিল। তখনও ছিল অশান্তিতে। এখন উদর পূর্ণ আছে। এখন আগের চেয়েও বেশি অস্থির ও অসুখী। কোনো সমাধান নেই। কেউই পথ পাচ্ছে না।

উচ্চশিক্ষা কি এই অস্থিরতার সমাধান?

কেউ বলে, এই পেরেশানি ও অস্থিরতার সমাধান হচ্ছে উচ্চশিক্ষা। সকলকে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে দাও। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, যে জীবনধারার সকল মানুষ শিক্ষাপ্রাপ্ত, সনদ ও সার্টিফিকেটের অভাব নেই যাদের, তাদের দেখেছি নিজের জ্ঞানকে তারা এমন সব কাজে ও ব্যবসায় ব্যয় করেছে যে, সর্বসাধারণের অর্থ দেদারছে তাদের একাউন্টে জমা হচ্ছে। তবুও শান্তি নেই। তবুও সুখ নেই।

উন্নত রাজনীতি কি এর সমাধান?

কেউ বললেন, না; এগুলো নয়। এই সঙ্কট সমাধানের পথ হলো উন্নত রাষ্ট্রনীতি ও আইন শৃঙ্খলা। কিন্তু দেখি কী? যেসব রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা উঁচু

স্তরের, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যারা, নীতি মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে যারা, তারা আজ উদরপূর্তি করে নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের লক্ষ্যে।

পেরেশানির উত্তম ব্যবস্থাপত্র

ভাইয়েরা! আমরা যত কথা-ই বলি, আমাদের বর্তমান পেরেশানি ও অস্থিরতার একটা সমাধান তো বের করতে হবেই। এই সমাধান দুনিয়ার কোনো জ্ঞান প্রদান করতে সক্ষম হবে না। কারণ, এটি জাগতিক বুদ্ধি-বিবেকের চেয়ে বহু ঊর্ধের কথা। আমাদের মূল সমস্যা আমাদের দিলে। আমাদের হৃদয়ে সকল অস্থিরতার উৎস হচ্ছে এই হৃদয়। এই অন্তর। তাই মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে শান্ত ও স্থির চিত্তে জীবন যাপন করতে হলে প্রয়োজন এ হৃদয়টাকে পরিশুদ্ধ করা। অন্তরকে সুস্থ রাখা। কলব ও দিলকে পরিচ্ছন্ন রাখা। আর আত্মার পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের এই পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করেছেন অগণিত রাসূল।

পৃথিবীতে যত আম্বিয়া কেরাম এসেছেন, সকলে এই একটি কথাই শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে লোকসকল! আমি যে-জীবনরীতি ও আদর্শিক নিয়মাবলি নিয়ে আগমন করেছি, যে-শিক্ষা ও সভ্যতা নিয়ে আমি এ ধরায় এসেছি, তোমরাও সেই নীতি-আদর্শ এবং শিক্ষা-সভ্যতাকে অর্জন করো। তবেই তোমাদের মন ও দিল শান্তিতে ভরে যাবে। তোমাদের হৃদয় ও আত্মা শান্ত ও প্রশান্ত হবে। তোমরা পবিত্র হবে। তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি এসব বিষয় গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে শোনো, তোমরা শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্যে দিকদিগন্তে ছুটে বেড়াবে, দুয়ারে-দুয়ারে ঘুরে ফিরবে, তবু তোমরা সামান্য শান্তিও পাবে না। তোমরা কখনও তোমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে না।

অশান্তির মূল কী?

যুগে-যুগে আম্বিয়া কেরাম এসেই সত্য ও সুন্দরের বাস্তব পথ ও পদ্ধতি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। বলেছেন, সর্বত্রই অশান্তির মূল হচ্ছে মানুষ। যেদিকেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে, তারই মূলে রয়েছে এই মানুষ। কোনো চতুস্পদ জন্তুর কারণে কিন্তু কোনো অনিষ্টতা দেখা যাচ্ছে না। আপনি চিন্তা করুন, পক্ষিকুল মানুষকে এত ক্ষতি করেনি, উশৃঙ্খল মানব সম্প্রদায় একে অন্যের যত ক্ষতি করেছে। আপনি শুনবেন না যে, ভেড়ার দল মিলে মানববসতিতে হামলা করেছে। বাঘেরা মিলে মানব সম্প্রদায়ের

ওপর হামলা করেছে। হ্যাঁ; এক-দুটা ঘটনা হয়তো ঘটে থাকবে যে কোনো একটা বাঘ কোনো একটি মানুষের ওপর হামলা করেছে। কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে জীবজন্তুরা খুব কমই আক্রমণ করে মানবসম্প্রদায়ের ওপর। বন্য হাতি বা পাগলা হাতির ঘটনাও খুবই কম ঘটে।

কিন্তু মানুষ তো ওই সকল জন্তুর চেয়েও হীন। মানুষ দল বেঁধে, সংঘবদ্ধ হয়ে এক জাতি অন্য জাতিকে নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠে। একদল মানব নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষা করতে গিয়ে অন্যসব মানবের হত্যাকাণ্ডে মত্ত হয়। অন্য মানুষের বাঁচার অধিকার নষ্ট করে দেয়। সব দিকে তাকালে দেখবে, বিশৃঙ্খলাকারী, শান্তি বিনষ্টকারী এবং দুনিয়ায় অনর্থ সৃষ্টিকারী এই মানুষই।

কোনো পক্ষিদল কখনও পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়নি যে, আমরা সকলে মিলে মানবের ওপর আক্রমণ করব। কিন্তু মানুষরা পরস্পরে মিলে চুক্তিবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হয় যে, আমরা সকলে অমুক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, অমুক দলের নিদ্রাকে হারাম করে দেব, তাদের বাঁচার অধিকার শেষ করে দেব।

আম্বিয়া কেরাম এসে এই বাস্তবতাকে খুলে দিয়েছেন। হে লোক সকল! তোমাদের বলে দিচ্ছি বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূল কী। শুনে রাখো, অন্তরের কান দিয়ে শুনে রাখো। আল্লাহ বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

'স্থলে ও সমুদ্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তা মানবেরই হাতের কামাই।'[১]

বোঝা গেল, ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির মূলে রয়েছে মানুষের হাত। আবার মানুষের এই যে অধপতিত হয়ে যাওয়া, আদর্শহীন হয়ে যাওয়া এবং মানবতা বিগড়ে যাওয়া ও বিনষ্ট হয়ে যাওয়া এসব কিছুরই সূচনা হয়ে থাকে মানুষের অন্তর থেকে। মানবাত্মা যখন বিনষ্ট ও কলুষিত হয়ে পড়ে, তখনই এক মানুষ অন্য মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে পড়ে। আম্বিয়া কেরাম বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানবের মাঝে যে অঙ্গটিতে সর্বপ্রথম পচন ধরে, তার নাম কলব তথা হৃদয়। মানুষের কলব বা হৃদয় যদি সুন্দর, পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও সুশোভিত হয়, তাহলে তার দ্বারা অন্য সকল মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা পায়। আর মানবাত্মা যদি কলুষিত হয়ে পড়ে, নষ্ট, ধ্বংস ও অধপতিত হয়ে পড়ে, তবে এই কলুষিত নষ্ট আত্মার মানুষটির কারণেই

---

১. সূরা রূম : আয়াত ৪১

পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ে, পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে যায়, চরম অনিরাপদ হয়ে পড়ে মানবের জীবন। কবির ভাষায়–

دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے ادمی

جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا

'মানবাত্মা বিগড়ে গেলে বিগড়ে যায় মানুষটি নিজেই।
যে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে, সে সফল হয়ে গেছে।'

রোগ নিরূপণ

রোগ নিরূপণের বিশেষ এক ক্ষমতা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের নবীজিকে দান করেছেন। নবিজীকে আল্লাহ নববি জ্যের্তিময়তায় সমুজ্জ্বল জ্ঞান দিয়েছেন, গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, সম্মানবোধ, শক্তি এবং সুগভীর অনুভব ও উপলব্ধির পরিচ্ছন্ন জ্ঞান দান করেছেন। ফলে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবেই মানবাত্মার সকল ব্যাধি ধরতে পেরেছেন, অনুভব ও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন সর্বযুগেই তাঁর আম্বিয়া কেরামকে সত্য ও সুন্দরের তরে সর্ববিষয়ের মূল তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞাত করে দিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

'এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও জমিনের ফেরেশতাদের পরিদর্শন করিয়েছি।'[১]

এই মহাদৌলত আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবীজি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও দান করেছেন। হাদীছে বিষয়টি এভাবে এসেছে যে, নবীজি দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ

'হে আল্লাহ! প্রতিটি বস্তুর মূল মর্ম ও রহস্য এবং প্রতিটি বস্তুর মূল তত্ত্ব ও তথ্য আমার সামনে স্পষ্ট করে দিন, আমাকে অবগত করিয়ে দিন।'

তো দেখুন, প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক জ্ঞান আম্বিয়া কেরামের অর্জিত ছিল। আল্লাহ তাঁদেরকে সুস্থ, সুন্দর ও সবল বুদ্ধি ও আকল-বিবেক দান

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৫

করেছেন। এমন স্বভাবজাত অনুভব-ক্ষমতা আল্লাহ তাঁদের দিয়েছেন যে, তাঁরা অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাদের আত্মার ব্যাধির মূল মর্ম ও আসল কারণ উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং এই রোগ নিরূপণ করেছেন।

এক হাদীছে এসেছে–

إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

'নিশ্চয় আদম জাতির দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। যখন সেটি ঠিক হয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহই ঠিক হয়ে যায়। আর যখন সেটি নষ্ট হয়ে যায়, তখন সমস্ত শরীরটা-ই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটি হলো কলব।'

এটি অসুস্থ হলে সারা শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। আর এই মাংসপিণ্ড সুস্থ থাকলে সারা শরীর সুস্থ থাকে। শোনো, সেই মাংসপিণ্ডটি হচ্ছে কলব তথা হৃদয় বা হৃৎপিণ্ড।

দেখুন, নববী ভাষা-ব্যঞ্জনায় কতটা নিরেটভাবে নিরূপণ করা হচ্ছে মূল ব্যাধি। বনী আদমের দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। সেই মাংসপিণ্ডটা দূষিত হয়ে গেলে, অসুস্থ হয়ে গেলে গোটা দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার সেই মাংসপিণ্ডটা বিশুদ্ধ থাকলে সারা দেহ সবল থাকে, সুস্থ থাকে।

বোঝা গেল, সমগ্র মানবতার অধঃপতনের মূল কারণই হচ্ছে মানবের আত্মা। সমস্ত অশান্তির মূলেই রয়েছে মানুষ। আর এই যে হৃৎপিণ্ড এটা অত্যন্ত ছোট; কিন্তু অত্যন্ত পাওয়ারফুল ও শক্তিধর জিনিস। অত্যন্ত গভীর এর গভীরতা। এটা অত্যন্ত সাধারণ আবার এটি অসাধারণ অঙ্গ। এটি অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী আবার এটিই অত্যন্ত নগণ্য। এটি সুস্থ আবার এটিই অসুস্থ। এটিই ভালো এবং এটিই মন্দ। এটিই মুত্তাকী এটিই গুনাহগার। এটি নিষ্কর্ম আবার এটিই কর্মঠ। এটিই শক্তিধর আবার এটিই দুর্বল। এটি স্বয়ংক্রিয় আবার এটিই বাধিত। এটি হন্তারক আবার এটি মৃত। এটি বাগিচা আবার এটি উজাড়। এটি ইশক ও প্রেমের মাহফিলে বড় বেহুশ আবার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রান্তরে বড় তেজি। এই হৃদয় যদি বিগড়ে যায়, তবে সব নষ্ট ও নাশ হয়ে যায়।

এই হৃদয় যদি সুন্দর, সুশোভিত ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়, তবে সবই সুন্দর ও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই এখনই পরখ করে নিন– আপনার আত্মা কোন দিকে, কার অভিমুখে আছে। আল্লাহর অভিমুখী আছে, নাকি শুধু দুনিয়ার

খাহেশাত ও কামনার দিকে। আজকের এ মাহফিলে নিজ-নিজ হৃদয়কে যাচাই করে দেখুন, আমাদের হৃদয়রাজ্যের এই গাড়িটি কোন পথে চলছে, কোন দিকে যাচ্ছে। দুনিয়ার মহব্বত, দুনিয়ার কামনা-বাসনা পূর্ণ করতেই কি এটি মগ্ন ও ব্যস্ত, না আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের মহব্বতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জনেই কি এ হৃদয় সর্বদা সচেষ্ট থাকে? আম্বিয়া কেরামের নির্দেশিত পথে চললেই হৃদয়ের প্রশান্তি অর্জিত হবে।

تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر
دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

মানবের জন্য তার হৃদয় চাই আলোকমিনার। কিন্তু আজ মানবতা এতটাই বিগড়ে গেছে এবং এতটাই কপটতায় ছেয়ে গেছে যে, আমাদের আত্মায় এখন আর ইনসানিয়ত ও মানবতার জন্য দরদ-ব্যথা, মহব্বত ও ভালোবাসা ধ্বংস হয়ে গেছে। আজকে সমগ্র পৃথিবীতেই চলছে স্বার্থ-স্বার্থ মহাকাণ্ড। প্রত্যেকেই তার নিজ স্বার্থের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিচ্ছে। ঈছার তথা অন্যের জন্য নিজের প্রাপ্তিকে বিসর্জন করা যাকে বলে, অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দান করা যে একটা ব্যাপার আছে এসব যেন আজকের মানবজাতি ভুলেই গেছে। আমাদের জীবন থেকে আজ অন্যের স্বার্থ রক্ষার অনুভূতিটুকু হারিয়ে গেছে।

যখন মানুষের হৃদয়ে অন্যের তরে সামান্য দরদ, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ থাকে না, তখনই মানুষ আর কারও পরোয়া করে না, কারও দিকে ফিরে তাকায় না। কখনও খবরের পাতায় পাই না যে, অমুক স্থানে পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণে এত লক্ষ মশা বা এত হাজার মাছি মৃত্যুবরণ করেছে। কারণ, এসবের খবর রাখাকে আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি না। আজ মানবের ব্যাপারেও আমাদের মানসিকতা তেমন হয়ে গেছে মশা-মাছির ব্যাপারে আমাদের মন-মানসিকতা যেরকম। মানবের ঘরবাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের নিষ্পাপ শিশু আজ চোখের সামনে বোমা-বারুদের আঘাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে। মানবের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। নিপীড়িত করা হচ্ছে। হন্তারকদের মনে সামান্যও মমতাবোধ জাগরিত হচ্ছে না। মানবিক আচরণটুকু তারা দেখায় না। কোনো পরোয়াই যেন নেই তাদের। সাম্রাজ্যবাদীরা, হন্তারকরা, সন্ত্রাসীরা হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে আর মানবের ওপর দণ্ড ঘোরাচ্ছে। ঘোষণা দিচ্ছে, আমাদের মতাদর্শ মেনে নাও, আমাদের মতাদর্শ মেনে নাও।

তাই বলছি, মানবতার নিরাপত্তা ও মানুষের জীবনের নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন আত্মার পরিশুদ্ধি। আত্মা সংশোধিত হবে না তো মনচাহি যিন্দেগি কাটাবে মানুষ। নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকেই মানুষ আদর্শ বলে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করবে।

হিন্দিতে একটি কবিতা এমন–

رام رام جپد دیاں میری جبیا گھس گئی

رام نہ دل وچ وسیا اے کی دھاڑ پئی

'রাম-রাম করতে-করতে আমার জিহ্বা শুকিয়ে গেছে। এ রাম তো আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল না। আমার মুসিবত আর কী দূর হবে?'

رام رام جپد دیاں میری جبیا گھس گئی

رام نہ دل وچ وسیا اے کی دھاڑ پئی

گل وچ مالا کاٹھ دی تے منکے لئے پرو

دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیاں کی ہو

'তোমার হৃদয়ে পাপের লাগাম বেঁধে রেখেছ, তাহলে বলো রাম-রাম জপ আর যা-ই জপ লাভ হবে কী?'

আমাদের অবস্থা আজ বড়ই করুণ। বক্তৃতার সভায় তো মানবতা-মানবাধিকারের লম্বা-লম্বা বয়ান ছুড়ছি। কিন্তু বাস্তব ময়দানে তো কাজে প্রমাণ করতে পারছি না। আমরা মানবতার পক্ষে, মানবাধিকারের পক্ষে। বাস্তবে তো মানবতার কফিনে শেষ পেরেকটি টুকে দিতেই আজ সমগ্র বিশ্ব ব্যস্ত। কারণ, আমাদের মানসিকতা হলো, আমাদের আত্মার লাগাম খুলে নিতে পারি না আমরা। আমাদের চিন্তাচেতনাকে পরিবর্তিত করতে পারিনি আমরা। তাই তো আজ মানবতার করুণ আর্তনাদ শুনি। তাই তো আজ মানবাধিকারগুলো ধুকে-ধুকে মরছে মরু মরীচিকায়, অরণ্যে, সরোবরে। আমাদের গাফলত আর উদাসীনতার কারণেই এমনটা হচ্ছে। আমরা আমাদের আত্মার ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা-ই যদি করতে পারতাম, তাহলে আজ আমাদের এমন করুণ পরিণতি হতো না। এই পেরেশানি আজ আমরা দেখতে হতো না।

اب خوف ہے مدت سے دلوں میں نہ رجاء ہے
جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہیں کرتوت
شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے
دیکھ ہیں یہ دن اپن ہی غفلت کی بدولت

'যতই দিন যাচ্ছে, ততই ভয় ও আতঙ্ক বাড়ছে। নেই, হৃদয়ে আশার আলো নেই। আজ হৃদয়ে যা আছে, সবই নিজ স্বার্থ ও নিজ প্রাপ্তির নেশ। আজ আমরা যামানা ও সময়ের অভিযোগ তুলছি। নিয়তিকেই আজ ভাগ্য বরণ করে নিয়েছি। আরে ভাই! এই দুর্দিন, এই দুঃসহ অবস্থা আমাদেরই উদাসীনতার পরিণাম।'

সত্য কথা হচ্ছে, খারাপ কর্মের শেষ পরিণাম খারাপই হয়। তবে একটা সময় পর্যন্ত আমরা গাফলতের চাদর মুড়িয়ে পড়ে থাকি এবং যখন আমাদের কর্মের পরিণাম আমাদের পাকড়াও করে, তখন টের পাই। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকে না। আজ নিজের আত্মা, নিজের হৃদয়ের ব্যাপারেই আমরা বড় বেখবর হয়ে আছি। নিজেদের জীবন ও পৃথিবীর ব্যাপারে বড় উদাসীন হয়ে আছি। গোটা পৃথিবীর সব কিছুই জানি, নিজের স্বার্থটা ভালোই বুঝি, কিন্তু অন্যের অধিকার, অন্যের স্বার্থ আর অন্যের জীবনের প্রাপ্তির কথা আমরা ভুলে যাই। এ-কারণেই তো সমগ্র দুনিয়ায় ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা পৃথিবীতে অনর্থ ও অনিষ্ট ছড়িয়ে পড়েছে। এই অনিষ্টের মূলে রয়েছে আমাদের দিল, আমাদের হৃদয়, আমাদের আত্মা। হৃদয়ের মাঝে, আত্মার মাঝে যে স্বেচ্ছাচারিতা লুকিয়ে আছে, স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে, সেটাই আমাদের অধঃপতন, অশান্তি ও পেরেশানির মূল কারণ।

براھیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے
ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں

'প্রেম-ভালোবাসা ও মমতার দৃষ্টি তো তৈরি হয় অনেক কঠিনভাবে।
তবে প্রিয় চুপিচুপি বক্ষে তার এঁকে নেয় প্রিয়ের ছবি।'

এ ফাসাদের চিকিৎসা

তাই বলছি ভাই! এই ফাসাদের চিকিৎসা হচ্ছে, মানুষ তাঁর হৃদয়কে, তাঁর আত্মাকে ঈমানের নূরে আলোকিত করবে। আল্লাহর মহব্বতে হৃদয়টা তার পূর্ণ করে নেবে। তাহলেই মানবের হৃদয়ে মানবতার প্রতি মমতা সৃষ্টি হবে। আর মানবতার প্রতি মানবের যখন মমতা সৃষ্টি হবে, তখনই মানুষ সকলের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। দেখুন, আজ আমরা মানুষকে মানবতার বাণী শোনাচ্ছি। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে মমতায় সিক্ত করে নিজেরাই গ্রহণ করছি না সেই বাণীর মর্ম ও অর্থ আবেদন। ভাই! আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের মহব্বত যখন হৃদয়ে অর্জিত হবে, তখনই এই মানবতার দুঃখ, বেদনা ও দুর্দশার কথা শুনে আমাদের হৃদয় কাঁদবে, প্রাণ সিক্ত হবে, আত্মা ব্যথিত হবে, চোখ অশ্রু টলমল হবে।

সাহাবায়ে কেরামের হামদরদী ও ভাতৃপ্রেম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়কে শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ করে দিলেন, তখন তাদের পাষাণ হৃদয়গুলো কত কোমল হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। হৃদয় তাদের মমতায়-ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ইনসানিয়ত ও মানবতার প্রতি। তাঁদের যারা পরস্পর আগে শত্রু ছিলেন, তাঁরা পরস্পরে পরিণত হলেন পরম বন্ধুতে। এমন দৃষ্টান্ত তাঁরা উপস্থাপন করেছেন, এ পৃথিবীতে সমগ্র মানবতার ইতিহাস এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে অক্ষম।

কোনো-কোনো সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে এমন কথাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। সেই সাহাবি চাইলেন তাঁরই গরিব ভাইকে সহায়তা করতে। আবার চাইলেন কেউ যেন জেনে না যায় সে বিষয়টি। তাই রাতের গভীরে এসে পাত্র ভরে-ভরে খাদ্য ও সহায় মালসম্পদ এনে রেখে যেতেন গরিব সেই ভাইটির ঘরের দুয়ারে এবং সংবাদ দিয়ে যেতেন, আপনার জন্য এসব হাদিয়া। দয়া করে কবুল করুন। তাঁকে জিনিসগুলো সামনাসামনি দিতেন না এজন্য যে, যেন ভাইটি তাঁর এ দানের কারণে শুকরিয়া আদায়ে মশগুল না হয়ে যায়। এমন নিঃস্বার্থ দান ও অনুদানের সুগর্বিত ইতিহাস নির্মাণ করে গেছেন আমাদের প্রিয়নবীর সাহাবিগণ। নির্মাণ করেছেন নীরবে।

ইমাম যাইনুল আবিদীন (রহ.)-এর আমল

ইমাম যাইনুল আবিদীনের জীবনচরিতে আছে, তাঁর যখন ইন্তেকাল হলো, তখন লোকেরা তাঁকে গোসল দেওয়ার জন্য নিলেন। গোসলদানকারী লোকেরা তখন দেখলেন, তাঁর ডান কাঁধের ওপর কালো দাগ পড়ে আছে। ইমাম সাহেব বড় সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন। দেহাবয়ব বড় কোমল ছিল। লোকেরা বিস্মিত হলো, আরে! এই দাগ কীসের! এই নিদর্শন কীসের? গোসলদানকারী লোকেরা পরিবারের লোকদের এই দাগের কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু আত্মীয়স্বজন সকলেই বললেন, আমাদের তো এর রহস্য জানা নেই। কিন্তু যখন ইমাম সাহেবকে দাফন করা হলো, তখন সপ্তাহ দশ দিন পরে আশপাশের অসুস্থ ও অক্ষম মানুষদের ঘর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, কোথায় সেই ব্যক্তি, যিনি আমার ঘরে রাতের আঁধারে পানি পৌঁছিয়ে দিতেন!

এই ঘটনার পরই হযরত ইমাম যাইনুল আবিদীনের কাঁধের দাগের রহস্য প্রকাশিত হয়ে গেল। বোঝা গেল, তিনি রাতের আঁধারে পানির ভারী মশক কাঁধে নিয়ে বৃদ্ধ, অক্ষম এবং অসুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন। এই কাজ তিনি এত নীরবে, নিশ্চুপে সম্পন্ন করতেন যে, সারাটা জীবন এই আমল সম্পর্কে কেউই অবগত হতে পারল না। এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও না।

আজকে তো বিশ্ববরেণ্য লোকেরা ঘোষণা দেয়, আমরা বড় মানবতাবাদী, আমরা মানবের প্রতি বড়ই দয়াবান। আমরা মানবের প্রতি নিবেদিত। এমন আরো কত কথা। আর আমরা শুনে বড়ই আনন্দিত হই, পুলকিত হই। এমন দাবিদারদের কর্মে এগিয়ে আসি। এই মানবতাবাদীরা কী করে? মানুষকে সুদের ওপর ঋণ দেয়। আর বলে, আমরা মানুষের সহায়তা করছি, সাহায্য করছি। একে বলে মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। অথচ এর ফলে এভাবে সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়ার ফলে মানুষের অবস্থা এমন হয় যে, সারাটা জনম পরিশ্রম করে-করে যা উপার্জন করে, সব সুদ পরিশোধে নিঃশেষ হয়ে যায়। সারা জীবনও আর তা শোধ করা যায় না।

আজকালকের আধুনিক শিক্ষিতদের সাহায্য-সহায়তা এটাই। আর আগেকার যুগে আমাদের সাহাবায়ে কেরামের কথা একটু ভাবুন। তাঁদের সাহায্য ও দান-অনুদানের ইতিহাস পড়ে দেখুন, কেমন ছিল তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ আর আমাদের বর্তমান যুগের ভ্রাতৃত্ববোধ কেমন? তাঁরা প্রত্যেকেই অন্য ভাইকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

যেমন– এক সাহাবির ঘরে বকরি জবাই করা হয়েছে। তো ওই বকরির একটি অংশ অপর ভাইয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। অংশটি পেয়ে এই ভাই ভাবতেন, আরে, আমাদের ঘরে তো আজ খাবার আছে। আমার আজকের দিনটা তো সুন্দরভাবে কেটে যাবে। তো একথা ভেবে এ ভাই অংশটি অন্য ভাইয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিত। এভাবে দ্বিতীয় ভাই তৃতীয় ভাইয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিত। তৃতীয় ভাই চতুর্থ ভাইয়ের ঘরে পাঠিয়ে দিত। এভাবে পাঁচ-সাত ঘর অতিক্রম করে সেই বকরির অনুদানের অংশটি আসতে-আসতে আবার চলে আসত ওই ভাইটির ঘরে, যে বকরি জবাই করে প্রথমে অন্য ভাইকে দান করেছিল।

আরও শুনুন। সাহাবায়ে কেরাম একস্থানে উপনীত হয়েছেন। হঠাৎ সবাই অনুভব করলেন, আমাদের কোনো একজনের মনে হয় উজু ভেঙে গেছে। গন্ধ ছড়াচ্ছে। সবাই ভাবল, যার উজু গেছে, সে উঠে যাবে এবং উজু করবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সামনে অগ্রসর হলেন এবং নবীজিকে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা সকলেই উজু করে আসব। নবীজি অনুমতি দিলেন। সকলেই গিয়ে উজু করে এলেন। সকলেই সেই একটি ভাইকে যার উজু ভেঙে গিয়েছিল, তাকে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। কী সুন্দর চরিত্র ছিল তাঁদের!

এ কথাটিই কুরআন নিজের ভাষায় বলছে–

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

'তাঁরা পরস্পর ছিল রহমদিল।'

মানবতার প্রতি মমতার সুশিক্ষা এটি। হৃদয়ে মানুষের জন্য মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা উচিত। মানবতার প্রতি দরদ সৃষ্টি করা উচিত। একজন যদি দুঃখে-কষ্টে পতিত হয়, তাহলে অন্যজনের চোখ থেকেও তার ব্যথার অশ্রু ঝরে। এই আমাদের মানবজীবনের পরম সভ্যতা ও আরাধ্য বিষয়।

সাহাবায়েজীবনে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আপনি বড়ই আশ্চর্য হয়ে যাবেন তাঁদের জীবনের ইতিহাস পাঠ করলে।

নবীজির কাছে একজন মেহমান এল। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি আছে, যে একে মেহমানদারি করাবে?

হযরত আবু তালহা দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এই খেদমতটুকুর সুযোগ দিন। মেহমানসহ ঘরে গিয়ে সাহাবি আবু

তালহা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘরে মেহমানকে খাওয়ানোর মতো কিছু আছে কি? স্ত্রী বললেন, বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে এ পরিমাণ খাবার আছে। তোমার আর আমার জন্য তো কোনো খাবার নেই। আবু তালহা বললেন, নিয়ে এসো সেই খাবার, দস্তরখানে পরিবেশন করো। আমি মেহমানকে খাবারের জন্য ডাকলে তুমি চেরাগ ঠিক করার ভান করে তা নিভিয়ে দেবে। আমরা খাওয়ার ভান করে হাত নাড়াতে থাকব। এদিকে মেহমান খেয়ে নেবে। মেহমানদারিও হয়ে যাবে, আমরাও বেঁচে যাব। আবু তালহা তাঁর পরিকল্পনা মতো কাজ করলেন। মেহমান বুঝতেই পারলেন না ত্যাগের ও কতাওবানির কী এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে গেছে।

আবু তালহার ঘর থেকে মেহমান উদরপূর্ণ অবস্থায় চলে গেলেন। পরদিন আবু তালহা গিয়ে হাজির হলেন দরবারে রেসালতে। এদিকে রাসূলকে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন আবু তালহার ঘটনা। ইরশাদ হলো—

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

'তাঁরা নিজেদের জীবনের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দান করে যদিও তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকে।'[১]

অবস্থা এমন হয় যে, নিজেই নানা রকম অভাবে-অনটনে থাকে, তবু নিজের ভাইকে নিজের ওপর প্রাধান্য দান করে। ভাইয়ের জন্য ঈসার করে। মানবতার সমগ্র ইতিহাস কি ঈসার তথা অন্য ভাইকে নিঃস্বার্থ সহায়তার এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে? কোনো দিনও পারবে না।

আমাদের ইসলামের ইতিহাসেই শুধু এটা পাওয়া যাবে। কারণ, ইসলামের নবী আমাদের প্রিয়তম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার সামগ্রিক জীবনে দরদ, ভালোবাসা, প্রেম ও মমতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সাইয়্যেদুনা ওমর (রাযি.) একবার হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর সাথে দেখা করতে এলেন। দেখলেন, তাঁর সামনে একটি রেজিষ্টার খাতা পড়ে আছে। তার মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও বিধবাদের নামের তালিকা করা। প্রত্যেক নামের বরাবর তার প্রাপ্য অনুদানের পরিমাণও লিখিত আছে। আবার একথা লেখা আছে যে, এ নামের লোকটির খেদমতের যিম্মাদারী কে নিয়েছে। তিনি গোটা তালিকা দেখলেন। সেখানে লক্ষ করলেন এক বুড়ো

---

১. সূরা হাশর : আয়াত ৯

মহিলার নাম তো আছে, ঠিকানাও আছে, কিন্তু তার খেদমতে কে নিযুক্ত, সেই নাম নেই। হযরত ওমর চিন্তা করলেন, এই বুড়োর খেদমত আমি করব। তাই পরের দিন ফজর নামায পড়ে ঠিকানা অনুযায়ী ওই বুড়ির বাড়িতে পৌঁছলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। বুড়ি জিজ্ঞেস করলেন, কে? ওমর বললেন, আমি আপনার খেদমত করতে এসেছি। কোনো কাজ করে দিতে হবে কিনা বলুন। সে যুগে দুটি কাজই সাধারণত থাকত। একটি ঘর পরিষ্কার করে দেওয়া। আরেকটি বাইরে থেকে পানি এনে দেওয়া। আর বাকি কাজ ঘরের লোকেরাই করে নিত।

বুড়ি ভেতর থেকে জবাব দিলেন, একটু আগেই কে একজন এসে তো আমার ঘরের সব কাজ করে দিয়ে গেছে। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কতো দিন থেকে এখানে আসে? বুড়ি বললেন, অনেক দিন আগ থেকেই তো আসছে। ওমর বললেন, তো সেই লোকটার নামটা কি বলতে পারেন? বুড়ি বললেন, না তো। আমিও কোনোদিন তাকে জিজ্ঞেস করিনি আর কোনো দিন সেও আমাকে বলেনি। সে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, আপনি পর্দায় চলে যান। তো আমি কুঠরিতে চলে যাই। লোকটা কাজকর্ম শেষ করে বলে যায়, আমি যাচ্ছি। আপনার কাজ শেষ হয়েছে। পরে আমি বাইরে আসতাম। আমি তো কখনও তার আকার-আকৃতি ও চেহারা দেখিনি।

ওমর (রাযি.) বড়ই আশ্চর্য হলেন। আরে! কে এমন মানুষটা? এবার পরের দিন তাহাজ্জুদের নামায পড়েই ওমর বুড়ির ঘরে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, কাজ কর্ম শেষ হয়ে গেছে এবং খেদমতকারী চলে গেছে।

হযরত ওমর এবার পরের দিন এশার নামায পড়ে বুড়ির ঘরের পথে বসে পড়লেন। আজ তিনি দেখবেন, কে এই বুড়ির কাজ করে দেয় এভাবে। হযরত ওমর অপেক্ষায় আছেন। রাত গভীর হলো। লোকেরা গাঢ় গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেল। গোটা নগরী নীরব-নিস্তব্ধ। এমন সময় দূর থেকে কোনো এক আল্লাহর বান্দা ধীর কদমে আসছে দেখা গেল। এত ধীরে-ধীরে হাঁটছেন যেন জমিনও কষ্ট না পায়। ওমর বড় হতবাক হলেন। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? প্রশ্নের জবাবে আমীরুল মু'মিনীন আবু বকরের আওয়াজ শোনা গেল। বললেন, আমি আবু বকর।

ওমর বললেন, আমিরুল মুমিনীন! ওই বুড়ির কাজ প্রতি রাতে আপনি এসে করে দিয়ে যান? খলীফা জবাব দিলেন, হ্যাঁ। ওমর (রাযি.) লক্ষ করলেন, আমীরুল মু'মিনীন খালিপায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। পায়ে জুতা ছিল না

তাঁর। ওমর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জুতা কেন পরিধান করলেন না? আমীরুল মুমিনীন আবু বকর জবাব দিলেন, জুতা রেখে এসেছি। রাতের বেলা তো। লোকেরা ঘুমাচ্ছে। এমন যেন না হয় যে, আমি গলি পথে হাঁটছি আর আমার পায়ের শব্দে ঘুমন্ত মানুষের কষ্ট হলো।

এ হচ্ছে মানবতা। এই হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের দরদ ও মমতা। এই মমতা ও দরদের নমুনা আজ কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! আম্বিয়া কেরাম মানবকূলের হৃদয়জগতকে সজ্জিত করেছেন। ইনসানিয়ত ও মানবতার বুনিয়াদ রেখেছেন তাঁরা সেই হৃদয়গুলোতে। তাই তো তাঁরা অন্যকে সহায়তা করা এবং নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়াকে ওয়াজিব মনে করতেন। তাদের জন্য সহজ ছিল অন্যের তরে নিবেদিত হওয়া। অন্যের জন্য নিজের স্বার্থ ও প্রাপ্তিকে পরিত্যাগ করা। কারও ওপর ইহসান করছেন এ মানসিকতা তাঁদের ছিল না। বরং অন্যের সহায়তা করাকে নিজের কর্তব্য মনে করতেন তাঁরা।

আজকের সভ্য-শিক্ষিত সমাজের অনুগ্রহ ও অনুদানের স্বরূপ দেখুন। কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাষ্ট্রের ওপর অপর কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো রাষ্ট্র যদি অনুগ্রহ বা অনুকম্পা করতে চায়, তাহলে তার ওপর থেকে ঋণের সুদ কমিয়ে দেয় বা সুদটা মাফ করে দেয়। সভ্য শিক্ষিত জাতি। এ হচ্ছে অনুদান, অনুগ্রহ।

একটু ভেবে দেখুন। আম্বিয়া কেরাম যে সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি, এমনকি পরিবারনীতি উপহার দিয়েছেন, মানবতার যে শিক্ষা তাঁরা দুনিয়াবাসীকে দিয়েছেন এটি সামগ্রিক জীবনের জন্য সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য সত্যি এক অনন্য ও অতুলনীয় বিষয়।

তাঁরা মানবের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। মানবাত্মাকে তারা গ্রহণ করেছেন পরিচর্যার বাগানরূপে। ফলে মানবের মাঝে তৈরি হয়েছে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, তৈরি হয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও বিশ্বাস। এমন অবস্থা হয়েছে যে, লোকেরা ঘরে তালা লাগাত না। কিতাবে বর্ণিত আছে, রাস্তায় চলাচলের সময় যদি কারও উটের পিঠ থেকে কম্বল পড়ে যেত, তাহলে এই কম্বল কেউ স্পর্শ করত না। বছরের পর সেই লোকটি সফর শেষ করে যখন ফিরত এই পথ হয়ে, তখন সে দেখত, মাটি ও পানিতে মিশে কম্বল গলে গেছে। তবু তার কম্বল স্বস্থানেই পড়ে আছে।

কতটা সততা ও বিশ্বাসের জীবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা। মানবতার সুমহান এই আদর্শ তাঁরা এজন্য উপহার দিয়েছেন যে তাদের হৃদয়ের পরিচর্যা করেছেন আমাদের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁদের আত্মাকে সুসজ্জিত করে দিয়েছেন আমাদের প্রিয়তম নবী। আজ আমরা আমাদের পূর্বসূরী মহামানবদের জীবনেতিহাস ভুলে গেছি। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এখন একান্ত অপরিহার্য। তাদের এই সুমহান আদর্শকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করা একান্ত কর্তব্য। সাহাবায়েজীবনের পরের যামানায়ও ইনসানিয়ত, মানবতা, এখলাছ একনিষ্ঠতা ও নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্যদানের বহু দৃষ্টান্ত পৃথিবীবাসী উপহার পেয়েছে।

ওলামায়ে কেরামের ঈছার

আবুল হাসান নূরী (রহ.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তৎকালের বিচারক তাঁকে কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সত্য-সত্য মাসআলাটি বলে দিলেন। অন্য আরও কয়েকজনকে বিচারক একই মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তারাও সত্য উত্তর দিয়ে দিলেন। কিন্তু এটি ছিল বিচারকের মর্জির বিপরীত। বিচারক সকলকে গ্রেফতার করলেন। জল্লাদকে তাদের হত্যার নির্দেশ প্রদান করলেন । বিচারক দেখলেন, আবুল হাসান নূরী লাইনের প্রথমে দাঁড়ানো। জল্লাদ উপস্থিত। বিচারকের হৃদয়ে আবুল হাসান নূরীর প্রতি মহব্বত ছিল। সে চাইল আগে সকলকে হত্যা করে দেওয়া হোক এবং পরে আবুল হাসান নূরীকে কোনো অজুহাতে ছেড়ে দেবে।

বিচারক বলল, এই স্থানটা হত্যার উপযোগী নয়। তোমরা সবাই ওই স্থানটাতে লাইন ধরো। এস্থানে এসে আবারও কাতার করা হলো। আবুল হাসান নূরী সবার আগে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাকিদের পেছনে দিলেন। বিচারক আবারও বাহানা করে বলল, কাতার হয়নি। ওই স্থানটাতে গিয়ে কাতার করো।

দেখা গেল, আবুল হাসান নূরী আবারও আগে সবার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বিচারক হতবাক হয়ে বলল, কেন আপনি এমন করছেন? বারবার সবার সামনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন কেন আপনি? হযরত নূরী বললেন, আমি চাচ্ছিলাম, আমাকেই আগে হত্যা করা হোক আর আমার ভাইয়েরা সামান্য হলেও আমার চেয়ে বেশি বেঁচে থাকুক।

এ হচ্ছেন আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম!

মনে-মনে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের অঙ্গীকার করবে

এই সুমহান আদর্শ নববী শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'নিশ্চয় আপনি সর্বোন্নত আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'[১]

নবীজি তাঁরই আখলাক উম্মতকে শিখিয়েছেন। তাই সমগ্র জীবনে যদি আমরা শান্তি নিরাপত্তা, হামদরদি ও ভালোবাসার প্রেমময় জীবন যাপন করতে চাই, তাহলে এই প্রিয়তম নবীর জীবনাদর্শ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের পথেই আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। আজ আমরা আমাদের আত্মা থেকে, আমাদের ভেতর থেকে বদলানো শুরু করব। আত্মাকে আগে পরিশুদ্ধ করব। বৃক্ষ যেমন ভেতর থেকেই সবুজ হয়ে বের হয়, আমরাও ভেতর থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে যাব। এই মাহফিল থেকেই অঙ্গীকার করব, আজ থেকে আত্মার ব্যাধি দূরীকরণে মনোনিবেশ করব, হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করব। আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় অন্তর পূর্ণ করব। যেন আমাদর সব ভালোবাসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়। সমগ্র হৃদয় জুড়ে যেন আল্লাহ-আল্লাহ ছড়িয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

---

১. সূরা কলম : আয়াত ৪

গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকুন

'বাহ্যিক দৃষ্টিতে গুনাহ্ বড়ই সুন্দর দেখায়। স্বাদ অনুভূত হয়। সামান্য সময়ের জন্য খুব প্রশান্তিও আসতে পারে। কিন্তু হৃদয় বড় অস্থির ও পেরেশান হয়ে যায় গুনাহের কারণে। আমরা যত বেশি গুনাহ্ করব, আমাদের জীবন তত বেশি অস্থির হয়ে উঠবে। যে-সকল নেককার বান্দা নিজেদের গুনাহ্ থেকে রক্ষা করে চলেন, আল্লাহ্ তাদের হৃদয়ে অনেক প্রশান্তি ও এক প্রকার স্নিগ্ধতার অনুভূতি দান করেন। শিশু তার মায়ের কোলে যেমন শান্তি ও প্রশান্তি পায় ঠিক তেমন। তাই বলছি, গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা একান্তই অপরিহার্য।'

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَ بِهٖ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ : وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

গুনাহ কাকে বলে?

ইরশাদ হচ্ছে–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

'বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব গুনাহ ছেড়ে দাও।'[১]

গুনাহ মানে আল্লাহর নাফরমানি করা। নবীজির সুন্নত তরক করা। কোনো বেদআতের ওপর আমল করা। এসব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে। তাই প্রকাশ্যে বা গোপনে গুনাহের যে-কাজই আছে, তা থেকে আমরা বিরত থাকব।

গুনাহের প্রভাব

গুনাহের মাঝে একটা প্রভাব স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান যে, এই গুনাহ কোনো-না-কোনোভাবে মানবাত্মাকে অস্থির ও পেরেশান করে রাখে।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০

যেকোনো বিষয় লাভ করার জন্যই মানুষ যেকোনো গুনাহ করুক না কেন, গুনাহ মানব হৃদয়কে অস্থির ও পেরেশান করে তুলবেই। সূচনাতে গুনাহের এই প্রভাব কাঁচা ও নরম থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রভাব অনেক কঠিন মনে হয়। মানুষ গুনাহ করার সময় ভাবে, এই তো আজ একটু কাজ করি। আগামীতে এমন কাজ আর করব না। কিন্তু আজ নয় কাল এভাবে করতে-করতে গুনাহ ওই ব্যক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে ফেলে। ফলে গুনাহ থেকে লোকটি আর পরিত্রাণ পায় না। তার অভ্যাসে পরিণত হয় সেই গুনাহ। ফলে শৈশবে যে-গুনাহের অভ্যাস হয়ে যায়, বড় হয়ে গেলেও তা আর দূর করা সম্ভব হয় না।

তাই তো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। যার শরীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যায়, তার শরীরে আর কোনো গতি থাকে না। কোনো একটা অঙ্গে যদি পচন ধরে, তাহলে সেই অঙ্গকে কেটে ফেলে দিতে হয়। যদি না কাটা হয়, তাহলে গোটা দেহকে রোগাক্রান্ত করে পচিয়ে দেবে। গুনাহও তেমনি। যদি গুনাহ বর্জন না করা হয়, তাহলে তা তোমার ব্যক্তিত্বকে, তোমার সমগ্র সত্তাকে একেবারে বিনষ্ট করে দেবে। মানুষ গুনাহকে ছোট মনে করে। অথচ হাফেয ইবনে কাইয়িম (রহ.) লিখেছেন, হে বন্ধু! তুমি এটা দেখো না যে, গুনাহটা ছোট না বড়। সেই সত্তার বড়ত্বের দিকে তাকাও, যার তুমি নাফরমানি করছ।

لَاتَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحُصٰى

'ছোট গুনাহকে হেয় মনে করো না। ছোট ছোট কঙ্কর থেকেই তো পাহাড় তৈরি হয়।'

কঙ্কর তো বড়ই ক্ষুদ্র। কিন্তু একটা-একটা করে অনেকগুলো কঙ্কর মিলে পাহাড়ে পরিণত হয়ে যায়।

ধূলিকণা তো খুবই ছোট থাকে। কিন্তু ধুলোরাশি জমা হয়েই তো পরিণত হয় টিলায়। যে মানুষ গুনাহকে অতি সাধারণ বিষয় মনে করল, সে নিজেকে বরবাদ করে দেওয়ার উপকরণ সংগ্রহ করল। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীন গুনাহকে অত্যন্ত ভয় করতেন। অন্যায় ও অপরাধের দিকে তারা এক পা-ও দিতেন না। কারণ, গুনাহের কারণে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নারাজ হয়ে যান। স্মরণ রাখুন হে ভাইয়েরা! গুনাহের দ্বারা মানুষের জীবন কোনো দিনই ভালো কাটে না। গুনাহের কারণে এক দিকে সামান্য লাভ হতে দেখা যায় ঠিক; কিন্তু অন্য দিকে হয়ে যায় বিরাট ক্ষতি। ধোঁকাবাজি করে কোনো দিন টিকে

থাকা যায় না। ধোঁকাবাজ মানুষকে অন্যরা চিনে ফেলে অতি দ্রুত। মানুষ অল্পক্ষণই অন্যকে ধোঁকা দিয়ে চলতে পারে। সব সময় মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখতে পারে না কেউই। গুনাহ মানুষকে হঠাৎই মুসিবতে ফেলে দিতে পারে। গুনাহের বিপদ বড় বিপদ। তাই গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে গুনাহের পথ পরিত্যাগ করা। গুনাহ দুনিয়ার দিক থেকেও মানুষকে অপমান করে, আখেরাতের দিক থেকেও মানুষকে অপমান করে। আর গুনাহের প্রথম আঘাতই হচ্ছে অন্তরকে অস্থির করে তোলা।

এক বুযুর্গকে আল্লাহ ইলহামের মাধ্যমে জানালেন, হে আমার বান্দা! লোকদের বলে দাও, যখন তারা গুনাহ করে, তখন যেন ছোট একটা বাচ্চা সাথে থাকলেও ওই বাচ্চাটার ভয়ে গুনাহ না করে; অথচ আমাকে সামনে রেখে তারা দিব্যি গুনাহ করে বেড়াচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে তারা গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে না। আমি তাদের সকল কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছি; অথচ, তারা আমাকে কিছুই মনে করে না। তোমরা তো অন্য মানুষরা যে দরজা দিয়ে তোমাদের দেখতে পাবে, ওই দরজা বন্ধ করে দিতে পার। কিন্তু যে দরজা দিয়ে রব্বে কারীম পরোয়ারদেগার আল্লাহ তোমাদের দেখতে পান, সেই দরজা তোমরা কোনোভাবেই বন্ধ করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাদের দেখতে পাচ্ছেন। তোমরা প্রকাশ্যে কী করছ তা তো দেখেনই; গোপনে কী করছ তাও তিনি দেখেন। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে–

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা পরিত্যাগ করো প্রকাশ্য গুনাহ এবং অপ্রকাশ্য তথা গোপন গুনাহ।'[১]

পক্ষান্তরে নেকি ও পুণ্যের কাজে রয়েছে অন্য রকম এক প্রভাবশালী ক্ষমতা। ফলে মানুষ হৃদয়ে লাভ করে এক অনাবিল প্রশান্তি। তাই তো যারা গুনাহ করে, যারা মনচাহি যিন্দেগি যাপন করে, বিপুল ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের হৃদয়টা আপনি দেখবেন অত্যন্ত পেরেশান। অত্যন্ত অস্থির। অত্যন্ত শান্তিহীন তাদের মন। কারণ, তাদের দ্বারা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নাফরমানি চলছে। সে-কারণে অন্তর তাদের বড়ই পেরেশান হয়ে আছে। তাদের জীবন থেকে আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন। আমরা গুনাহ করি আর আল্লাহ আমাদের জীবন থেকে বরকত উঠিয়ে নিয়ে যান।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০

দেখুন, আল্লাহর রহমত আমাদের ওপর চাদরের মতো ছড়িয়ে আছে। রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য যেমন আমরা ছাতা ব্যবহার করি, তেমনি বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপর তাঁর রহমতের চাদর ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমরা যখনই গুনাহ করি, ওই চাদর ছিদ্র হয়ে যায়, ফেটে যায়। আর তখনই নানা রকম বিপদ মুসিবত আর বেবরকত আমাদের গ্রাস করে নেয়।

তাই গুনাহ করা মানে নিজের ওপর মুসিবত ডেকে আনা। পেরেশানিকে নিজের ওপর ডেকে আনা। আমরা গুনাহ যদি না ছাড়ি, গুনাহ যদি পরিত্যাগ না করি, তাহলে পেরেশানির সাগরেই আমাদের ডুবে থাকতে হবে। তাসবিহর ছড়া ছিঁড়ে গেলে যেমন দানাগুলো অঝোরে ঝরে পড়ে, তেমনি গুনাহ করলে আমাদের ওপর মুসিবত বড় কঠিনভাবে পতিত হয়। তাই তো মানুষ গুনাহ করে আর বিপদে পড়ে আমাদের কাছে আসে আর বলে, হুজুর! কী করতে পারি? একটা পথ বলে দিন। বড় পেরেশানিতে আছি। স্ত্রী আমাকে মানে না। ছেলেমেয়েরা কথা শোনে না। সবাই আমার অবাধ্যতা করে। তো দেখুন, কোনো-না-কোনোভাবে আল্লাহ তাদের পেরেশানিতে ফেলে রেখেছেন।

عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں

زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

'ইনসাফ ও ন্যায়বিচার শুধু হাশরের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়।
এ জীবনটাও গুনাহের শায়েস্তায় আবৃত হয়।'

গুনাহের কারণে দুনিয়ার জীবনেও শাস্তি আসে। দুনিয়ার এই শাস্তি থেকেও বাঁচার উপায় হচ্ছে গুনাহের কাজ ছেড়ে দেওয়া। গুনাহমুক্ত জীবন যাপনের চেষ্টা করা। আমাদের এই নকশবন্দিয়া তরিকার একজন বুযুর্গ ছিলেন হযরত খাজা আবুল হাসান খিরকানি। তিনি বলেছেন, যেলোক একটি দিন গুনাহমুক্ত কাটাল, সে যেন সেই দিনটি নবীর সংস্পর্শে থেকে কাটাল। তো প্রত্যেকটা দিনই আমাদের মাঝে যেন একটা উদ্দম তৈরি করে। প্রত্যয় গ্রহণ করবে, হে পরয়ারদেগার! আমাদের আজকের দিনটি যেন তোমার নাফরমানি ছাড়া কাটে। তোমার আনুগত্যে যেন দিনটি গুজরান হয়। এই উদ্দমের সঙ্গে জীবন যাপন করবে। গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে। তাহলে দুনিয়াতেও সম্মান পাওয়া যাবে আর আখেরাতে তো পাওয়া যাবেই।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকো।'[১]

গুনাহের দিকসমূহ

গুনাহ করার চারটি দিক আছে। এই চারটি দিকের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আলোচনা করেছেন।

গুনাহের প্রথম দিক : গুনাহ করার প্রথম দিক কেউ দেখছে না। আর এতটুকু যদি সে জানতে পারে, তাকে ছোট একটি বাচ্চাও দেখছে, তাহলে সে আর গুনাহের কাজটা করে না। তাই আল্লাহ সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন–

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'নিশ্চয় তোমার রব তোমার সকল কর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন।'[২]

مِرْصَادْ তথা পর্যবেক্ষণ কাকে বলে? মুফাসসিররগণ বলেন, কোনো শিকারি যখন তার কাঙ্ক্ষিত প্রাণীটাকে শিকার করতে যায়, তখন বড় গভীর ও নিবিড়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিঃশ্বাসটা যেন বন্ধ করে নেয় সে। পলক ফেলে না একটুও। একেই বলা হয়, مِرْصَادْ বা পর্যবেক্ষণ।

বান্দার সকল কর্ম আল্লাহর সামনেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পর্যবেক্ষণ করছেন, বান্দা কী করে আর কী না করে।

দ্বিতীয় দিক : বান্দা গুনাহ করার সময় চিন্তা করে, আমি কাউকে টের পেতে দেইনি। গুনাহটা এমনভাবে করেছি। বান্দা মনে করে, আমি যে-গুনাহ করেছি, কেউই তা জানতে পারেনি।

এরই জবাবে আল্লাহ বলেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

'আমি তোমাদের চোখের খেয়ানতকে জানি। তোমাদের হৃদয়ে যা লুকিয়ে আছে তা-ও আমার অজানা নয়।'[৩]

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০
২. সূরা ফাজর : আয়াত ১৪
৩. সূরা মু'মিন : আয়াত ১৯

আল্লাহ বলে দিলেন, তোমরা এই মনে করে ধোঁকা খেয়ো না যে, তোমাদের কেউই দেখছে না। তোমাদের ব্যাপার কেউই জানে না। বরং আমি সবই দেখছি। আমি সবই জানি।

তৃতীয় দিক : গুনাহ করার সময় বান্দা মনে করে, আমি যখন গুনাহটা করছিলাম, তখন আমার কাছে ও আশপাশে কেউ ছিল না। আমার সাথে ও নিকটে কেউ ছিল না। ফলে কেউ দেখেনি কী গুনাহ আমি করেছি। এর জবাবে আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক-না কেন।'[১]

তো বান্দার এই ভুল খেয়াল ভেঙে দিয়ে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন, হে বান্দা! আমি তো সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছি।

চতুর্থ দিক : গুনাহকারী বান্দা গুনাহ করার সময় ভাবে, আরে! আমার কাজ আমি করব তাতে কার কী করার আছে। আমি যা খুশি করব। আমি কারও কাছে ঠেকা নই। আমার যেভাবে ইচ্ছা, যা ইচ্ছা আমি করে যাব। আমাকে বাধা দেবে কে? এভাবে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখিয়ে গুনাহ করতে থাকে। এই বেপরোয়া লোকের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা–

اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

'আল্লাহর ধরা বড়ই কড়া।'[২]

وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ

'তিনি এমন কঠিনভাবে পাপাচারীকে বাঁধেন যে, এমন করে আর কেউ বাঁধতে পারে না।'[৩]

اِنِّيْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

'আমি পাপাচারীকে এমন শাস্তি দেব যেমন শাস্তি সমগ্র পৃথিবীর আর কেউ দিতে পারে না।'[৪]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ৪
২. সূরা হূদ : আয়াত ১০২
৩. সূরা ফাজর : আয়াত ২৬
৪. সূরা মায়েদা : আয়াত ১১৫

কোনো জাতি যখন নাফরমানি করে, তখন আল্লাহ বলেন–

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

'...তারপর তোমার রব তাদের ওপর আযাবের চাবুক আরোপ করেন।'[১]

তাই বলছি বন্ধুগণ! আমরা বড় দুর্বল মানুষ। আমাদের শক্তি আর কতটুকু। কখনও একথা ভাববেন না যে, কী হবে গুনাহ করলে। ভাই! গুনাহ করলে কী না হতে পারে এটা ভাবুন। তাই গুনাহমুক্ত জীবন অবলম্বন করুন।

কেয়ামতে গুনাহের সাক্ষ্য

কেয়ামতের দিন গুনাহের ওপর আল্লাহ চারটি সাক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। কেয়ামতের দিন চারটি সাক্ষ্য পেশ করা হবে।

প্রথম সাক্ষ্য : কিরামান কাতেবীন নামে কাঁধে যে-ফেরেশতা আছে, প্রথম সাক্ষ্য দানকারী হবে সেই ফেরেশতা।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِينَ ۝١٠ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝١١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝١٢

'নিশ্চয় তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক নিযুক্ত আছে। নাম কিরামান কাতেবীন। তারা জানে তোমরা যা কর তার সব।'[২]

এরা সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তো আমাদের গুনাহ করতে দেখেনই। পাশাপাশি সাক্ষীও রাখেন অন্যকে যেন অস্বীকারের কোনো সুযোগই না থাকে।

দ্বিতীয় সাক্ষী : দ্বিতীয় সাক্ষী মানুষের আমলনামা।

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

'সেদিন আমলনামা উপস্থাপন করা হবে। সেই আমলনামা দেখে পাপাচারীরা ভয় পেয়ে যাবে।'[৩]

ভয় পেয়ে বলবে–

يَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ

'আফসোস! এটা আবার কেমন কিতাব! (সবই দেখছি লিখিত)।'[৪]

---

১. সূরা ফাজর : আয়াত ১৩
২. সূরা ইনফিতার : আয়াত ১-১২
৩. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৪৯
৪. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৪৯

لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝

'এ কিতাব তো ছোট-বড় কোনো কথা-ই ছাড়েনি। সবই তো সংরক্ষিত রয়েছে এতে। যা তারা দুনিয়ায় করেছে সবই তারা তাতে দেখতে পাবে। তোমার রব কোনো মানুষের প্রতিই জুলুম করেন না।'

এটি দ্বিতীয় সাক্ষী।

তৃতীয় সাক্ষী : তৃতীয় সাক্ষীটি হচ্ছে এই জমিন। এই জমিনকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে জমিন বলে দেবে বান্দা কখন তার কোন এলাকায় কী করেছে।

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۝

'সেদিন জমিন তার ভেতরকার সব সংবাদের ব্যাপারে কথা বলবে। কারণ, রব্বে কারীম তাদের এ বিষয়ে নির্দেশ দেবেন।'[১]

এভাবে জমিনে বলে দেবে তার বুকে অবস্থান করে কী কী অন্যায় মানুষ করেছে।

চতুর্থ সাক্ষী : গুনাহগার বান্দার বিচারকার্যে আল্লাহর চতুর্থ সাক্ষী থাকবে তারই অবয়ব। তা-ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

ইরশাদ হচ্ছে—

حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'যখন মানব তাদের আমলের কাছে আসবে, তখন তাদের (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) তাদের কান, তাদের চক্ষু এবং তাদের চর্ম তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা যা করত সে ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করবে।'[২]

লোকেরা তখন বলবে—

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا

'কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ।'[৩]

---

১. সূরা যালযালাহ : আয়াত ৪, ৫
২. সূরা মু'মিন : আয়াত ২০
৩. সূরা মু'মিন : আয়াত ২১

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলবে, আল্লাহ আমাদের কথা বলবার ক্ষমতা দান করেছেন। যিনি সর্বপ্রকার জিনিসকেই দান করে কথা বলার ক্ষমতা।'[১]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ

'আরে! তোমরা তো তোমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথেও পর্দা রক্ষা করতে না।'[২]

মোটকথা, এভাবে চারটি জিনিসকে আল্লাহ মানবের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে কেয়ামতের দিন উপস্থাপন করবেন। সেদিন এরা তরতর করে সব বলে দেবে।

গুনাহ্ পরিত্যাগের জন্য একটি বিস্ময়কর নসীহত

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর কাছে এক যুবক এল। বলল, হযরত! গুনাহ তো পরিত্যাগ করতে পারছি না। আল্লাহর ভয়ও হয়, আযাবেরও ভয় হয় আবার গুনাহ করতেও ইচ্ছে হয়।

আল্লাহওয়ালাদের নিয়ম হচ্ছে, দুঃখ না দিয়ে, ঘৃণা সৃষ্টি হয় এমন কিছু না বলে সহজে এমন কিছু করেন, যাতে ব্যক্তির আমল বদলে যায়। বড় মহব্বত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তিনি তাদের বুঝিয়ে দেন। হযরত ইবনে আদহামও তা-ই করলেন। বললেন, আমি তোমাকে একটি পদ্ধতি বলে দিচ্ছি শোনো। লোকটি বলল, হযরত! আপনি আমাকে এমন একটি পথ ও পদ্ধতি বলে দিন, যাতে আমি গুনাহও করতে পারি আবার আমি আযাব থেকেও বেঁচে যেতে পারি।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বললেন, প্রথম পথ তো এই যে, তুমি গুনাহ করো। তবে আল্লাহর দৃষ্টির ভেতরে অবস্থানরত অবস্থায় করো না। আল্লাহ থেকে লুকিয়ে গুনাহটা করে ফেলো। যুবক এবার বলতে লাগল, আমি আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে যাব কীভাবে? তাঁর দৃষ্টির বাইরে গিয়ে তো গুনাহ করার কোনো সামর্থ্য আমার নেই। আপনি আমাকে অন্য একটা পদ্ধতি বলে দিন।

---

১. সূরা মু'মিন : আয়াত ২২
২. সূরা মু'মিন : আয়াত ২২

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম বললেন, তুমি আল্লাহর রিযিক ভক্ষণ করা ছেড়ে দাও। আল্লাহর রিযিকির খেয়ো না, তাঁর কথাও মানবে না। যুবক বলল, আল্লাহর রিযিক ভক্ষণ করা ছাড়ব কী করে? এটা তো সম্ভব নয়। হযরত! আমাকে তৃতীয় আরেকটি পথ বলে দিন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন, তোমরা আল্লাহর মালিকানায় থেকে কী করে আল্লাহরই অবাধ্যতা কর। এই জমিন আল্লাহর। এই আসমান আল্লাহর। তো সব কিছুই আল্লাহর মালিকানা। তাঁর মালিকানার আওতা থেকে বের হয়ে গুনাহ করো।

যুবক বলল, কী করে আমি আল্লাহর মালিকানার সীমানা থেকে বের হয়ে যেতে পারি? জমিন ও আসমানের সীমানা থেকে বের হয়ে যাব কোথায়? আল্লাহই তো বলে দিচ্ছেন–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

'হে জিন ও মানবসম্প্রদায়! যদি তোমরা আসমান ও জমিনের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যেতে পার, তাহলে বের হয়ে যাও। তোমরা তো ছাড়পত্র ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে না।'[১]

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ

'হে জিন ও ইনসান! আমরা তোমাদের জন্য দ্রুতই অবসর হয়ে যাব।'[২]

আল্লাহু আকবার! কত চমৎকার কথা! এখানে দ্বি-বচনের ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। হে আমার জমিনের দুই বোঝা! অর্থাৎ– নাফরমান জিন ও ইনসান। এখানে মানব ও জিনকে উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে, হে জিন ও ইনসান! আমি নিজেকে তোমাদের তরে কর্মমুক্ত রাখব। তোমাদের খবর নেব। তোমাদের অবস্থা দেখব। যেমন মা কোনো কাজ করার সময় তার বাচ্চাকে ধমক দিয়ে বলে, এই ওই কাজটা করছিস না কেন? আমি আসছি রাখ, দেখাব তখন। আল্লাহও তেমন করেই বলছেন, হে আমার জমিনের বোঝা! আমি এখনই নিজেকে তোমাদের জন্য ফারেগ করে নিচ্ছি। কর্মমুক্ত করে নিচ্ছি। আমি তোমাদের হিসাব নেব।

---

১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৩৩
২. সূরা আর রাহমান : আয়াত ৩১

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

'কেয়ামতের দিন ইনসাফের সাথেই আমি তাদের আমল মাপার পাল্লা প্রতিষ্ঠিত করব।'[১]

তো সেই যুবক বলল, আমি তো জমিন ও আসমানের সীমানার বাইরে বের হতে পারব না।

এবার হযরত বললেন, ঠিক আছে; তাহলে আমি আরেকটি পদ্ধতি বলছি শোনো। তুমি গুনাহ করতে থাকো। আর যখন মালাকুল মওত আসবে, তখন আজরাঈল ফেরেশতাকে বোলো, ভাই! সামান্য একটু দেরি করো। আমার জন্য একটু অপেক্ষা করো। আমি সত্য হৃদয়ে তাওবা করে নেই। তারপর আমাকে মৃত্যু দিয়ো। এবার যুবক বলল, হযরত! আজরাঈল ফেরেশতা তো সেই সুযোগ দেবে না আমাকে। আমার জন্য তো সে অপেক্ষা করবে না একটুও। যে শ্বাসটি ফেলার সময় মৃত্যু আসবে, তারপর তো আরেকটি শ্বাসও নেওয়া যায় না।

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

'যখন তাদের মৃত্যু আসবে, তখন সামান্যও সময় ক্ষেপন করা হবে না। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় থেকে একটু সময়ও অপেক্ষা করা হবে না। ছাড় দেওয়া হবে না। আবার সামান্য তাড়াহুড়া ও করা হবে না।'[২]

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ

'সে ওসিয়ত করার সুযোগও পাবে না। তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরতেও পারবে না।'[৩]

এবার যুবক বলল, হযরত! আমি এটাও তো করতে পারব না। আমাকে তো এই সুযোগটুকুও দেওয়া হবে না। এবার হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন, আচ্ছা! তাহলে শোনো; আমি আরেকটি পদ্ধতি বলে দিচ্ছি। যখন তোমাকে কবরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মনকার নাকীর ছাওয়াল-জাওয়াব করতে আসবে, তখন তাদের বলে দিয়ো, আমার কবর থেকে বের হয়ে যাও।

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৪৭
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩৪
৩. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫০

যুবক বলল, হযরত! কবরে গেলে কারও আর কোনো ক্ষমতা থাকে না। এটাও তো আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) বললেন, তাহলে আমার শেষ পদ্ধতিটা শোনো। তা হলো, মনে করো, তুমি গুনাহ করতে থাকলে। মৃত্যু হলো তোমার। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তোমার বিচার করলেন। তো ফেরেশতারা যখন তোমাকে ধরে জাহান্নামে নিয়ে যেতে শুরু করবে, তখন তুমি রুখে দাঁড়িয়ো। বোলো, আমি যাব না।

যুবক বলল, হযরত! ফেরেশতার সামনে আমার কতটুকুই শক্তি থাকবে? আমি তো একথা বলতেও পারব না।

এবার ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) তাঁর মাথায় খোঁচা মেরে বললেন, হে প্রিয় বন্ধু! তুমি এগুলোর মধ্যে থেকে কোনো পথই যেহেতু অবলম্বন করতে পারবে না, তাহলে আপন রব্বে কারীমের নাফরমানি কেন করবে?

এবার যুবক বলল, হযরত! আমি বুঝে ফেলেছি। আজ থেকে কোনোদিন কোনোভাবেই আমি আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহের কাজ করব না।

দেখুন, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীনের বোঝানোর স্টাইলই ভিন্ন রকম। তারা বড় চমৎকারভাবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে পারেন। চিন্তা করুন ভাই ও বন্ধুগণ! এভাবে নিজেকেও নিয়ে চিন্তা করুন। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন গুনাহ ছাড়বেন, নাকি করেই চলবেন।

মুসলমানের জন্য পথ দুটি

প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ভাইগণ! মুসলমানের জন্যে দুনিয়ায় পথ দুটি। হয়তো নেকির কাজ করবে; তাহলে সে হতে পারবে জাতির ইমাম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নাহয় সে গুনাহ করবে; তাহলে সে হবে জাতীয় দাস ও অনুগত গোলাম। আজ আমরা জাতিগতভাবে এভাবে অনুকরণপ্রিয় ও অনুগত গোলামে পরিণত হয়েছি কেন? গুনাহের কারণে। এই কুরআনই আমাদেরকে সমস্ত গোলামিও অন্যের অনুগত্যের জিঞ্জির থেকে মুক্তি দান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে—

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

'আপনি পাঠ করুন। আর আপনার রবই সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।'[১]

---

১. সূরা আলাক : আয়াত ৩

তাই বলছি, মুমিন বান্দার জন্য পথ দুটিই। এক. নেক আমল করা। এতে মুমিন শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। দুই. গুনাহের পথ ধরা। এতে মুমিন অধঃপতিত, লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

পেরেশানির কারণ গুনাহ

আমাদের আজকের এ-জীবনের সকল পেরেশানির কারণ হচ্ছে আমাদের গুনাহগুলো, পাপগুলো। গুনাহগুলো যদি আমরা পরিত্যাগ করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে শান্তি ও প্রশান্তি আসবে। কথাটা বলছি এজন্য যে, আজকাল অনেক মুরীদ এমন আছে যে, তারা আমাদের কাছে আসে তো সেই পেরেশানি নিয়ে আসে। বলে, হযরত! আমি বহু বড়-বড় শায়খ-মাশায়েখ দেখেছি। তবু আপনার কাছেই আমি বাইয়াত হয়েছি। দেখুন ভাইয়েরা! তারা আমাদের হাতে বাইয়াত হয়ে মনে হয় আমাদের ওপর অনুগ্রহ করেছে। ভাবখানা তাদের এমন। এমনটা করে তারা পীর সাহেবের অন্তরকে আগে থেকেই তাদের ব্যাপারে দুর্বল করে রাখার জন্য। এবার নিজের হালত শোনাবার বেলায় এসে বলে, হযরত! কাজকারবার বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আপনি দয়া করে ব্যবসার উন্নতির জন্য তাবিজ দিয়ে দিন। আরেকটা সমস্যা হলো, স্ত্রীর সাথে বনিবনা হয় না। দয়া করে স্ত্রীটাকে কিছু আমল দিয়ে দিন। হুজুর! অজিফা ঠিকমতো আদায় করা সম্ভব হয় না। একটু ফুঁ দিয়ে দিন। এমনসব দুনিয়াবি সমস্যা নিয়ে তারা আমাদের সামনে আসে।

তো এসব বিষয় নিয়ে যদি তারা আমাদের সামনে আসে, তাহলে তারা তাছাওউফ তথা আধ্যাত্মিকতা কী শিখবে? এরা দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য আসে আর মনে করে, আমি আল্লাহকে পেয়ে যাব। কেউ আছে তিন বছর থেকে মুরীদ। কেউ পাঁচ বছর থেকে। কিন্তু কোনো আমলই করে না। পীরের ওপর ভরসা করে গাফলতিতে ডুবে থাকে। ভাবে, পীরই আমাকে সব করে দেবে। তাই বিষয়গুলো খুলে-খুলে বলে দিচ্ছি। আমাদের জীবনের সঠিক গন্তব্য আগে বুঝে নিতে হবে। অন্যথায় আমাদের জীবন থেকে পেরেশানি কখনও দূর হবে না।

বুঝুন ভাইয়েরা! মা-বাবা তার সন্তানকে পেরেশানিতে ফেলে কোনোভাবেই শান্তি পায় না। আল্লাহ তো আমাদের পেরেশানিতে ফেলতে চান না।

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

'আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর এবং ঈমান আনয়ন কর।'[১]

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অযথা শাস্তি দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাই বান্দার উচিত ছাওয়াবের কাজ করা।

إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের ব্যাপারে সহনশীল ও দয়াবান।'[২]

এমন রহীম, কারীম, সহনশীল ও দয়াবান আল্লাহ কী করে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার, আযাব দেওয়ার ও পেরেশানি দেওয়ার ইচ্ছে করতে পারেন। আমরা যদি ভালো হয়ে যাই, তাহেল তো আমাদের আযাব দেওয়া দূরের কথা বরং নেয়ামত দিয়ে আমাদের জীবনকে ভরে দেবেন। আজ আমরা আমাদের রব্বে কারীমের হুকুম অমান্য করছি, নবীজির সুন্নত অমান্য করছি। এভাবে তো আমরা পেরেশানি টেনে আনছি। কোন্ পরিবারটা আছে আজ, যেঘরে নবীজির সুন্নতকে জবাই করা হচ্ছে না? নেককারদের ঘরেও কোনো-না-কোনো সুন্নত অমান্য করা হচ্ছে। আজ আপনি আমাদের ঘর-বাহির অলিগলি আর বাজারের দিকে তাকান, সব জায়গাই আজ নবীজির সুন্নতের কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। এরপরও আমরা বলছি, আমাদের শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। আজ থাকছি আমরা দুনিয়ায় আর অবাধ্য আচরণ করছি আমরা এই দুনিয়ার মালিকের সাথে। তো বলুন, কীভাবে আমরা শান্তিতে থাকব দুনিয়ায়?

আমার কাছে এক ব্যক্তি এল। বড় একটা ফ্যাক্টেরির ম্যানেজার। এসেই কাঁদতে লাগল। বলল, হযরত! আমি এতটা পেরেশান, যা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। বেতন যা পাই, তাতে হয় না। খরচ বেশি। আমার মালিক আমার জন্য একটি গাড়ি দিয়েছেন। আমার বাচ্চাদের জন্য একটি গাড়ি দিয়েছেন। চিকিৎসা থেকে শুরু করে তেল পর্যন্ত সব খরচ মালিকে। ৭৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন পাই; কিন্তু তাতে আমার চলে না।

ফয়সালাবাদ থেকে এক মহিলা এল। পর্দার আড়াল থেকে কথা বলল। কাঁদতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট কেঁদে-কেঁদে একটি কথা বলল। বলল, হযরত! দু'আ করুন আমার খরচা কুলায় না। আমার বেতনে যথেষ্ট হয় না।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৭
২. সূরা হজ : আয়াত ৬৫

বললাম, পরিবারের সদস্য কজন? বলল, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই। সন্তান নেই। কত টাকা দেয় স্বামী আপনাকে? মহিলা বলল, মাসে ৫০ হাজার টাকা। আমি ভাবলাম, অবস্থাটা কী? মহিলা বলল, সব টাকা ওষুধে খরচ হয়ে যায়। বাস্তবেও তা-ই ছিল। ৫০ হাজার টাকা শুধু স্ত্রীর খরচা দেয় স্বামী। কিন্তু ডাক্তারখরচেই তা চলে যায়।

আমি ওই ম্যানেজার আর এই নারী দুজনকেই বোঝালাম, আল্লাহর নাফরমানি পরিত্যাগ করুন। ইনশা আল্লাহ জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা চলে আসবে। আপনাদের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা বরকত ছিনিয়ে নিয়েছেন। ৫০/৭৫ হাজার ৫০/৭৫ লক্ষও আপনাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। আমাদের জীবনে আজ তাসবীহর ছড়া ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো যেমন একটির পর একটি পড়তে থাকে, তেমনি মুসিবতও আমাদের ওপর একটির পর একটি আরোপিত হচ্ছে। পেরেশানি আরোপিত হচ্ছে। যত দিন আমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পথে না ফিরব, ততদিন এভাবে হতেই থাকবে।

নিজেকে রবের হাওয়ালা করে দিন

কেউ-কেউ বলে, বড় দুঃখে-কষ্টে কেঁদে-কেঁদে জীবন কাটে। একটি কবিতায় আছে–

اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ
کدی راہ پے گئے کدی بھلدے رہے
اے دیوا امید دا بلدا رہیا
لکھ جھکڑاں ہنیریاں دے چلدے رہے
پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ
اسی تیرے جہان وچ رلدے رہے
پر دامن امید دا چھڈ یا نہ
اسی نال تقدیر دے گھلدے رہے

'এই যে দুঃখের জীবন আজ আমাকে কষ্টে জর্জরিত করে দিয়েছে। কখনও রাস্তা পাই– দুচোখে পথ দেখি আবার কখনও পথ হারাই। হে

দেবতা! জীবনে দুঃখের নেই কোনো সীমানা। হাজারো-লাখো ধাক্কা আমাকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়। আমার অবস্থা তো বাতাসে ঝরে পড়া পাতার মতো হয়ে গেছে। আমার তাকদীরে কি নেই ভালো কিছু। আশার আঁচল আজ পূর্ণ হয়ে গেল হতাশায়। আমার তাকদীরে লিখে দাও ভালো কিছু।'

একথা শুনে আমি বললাম, ভাই! বসন্তকালের পত্ররাশি পতিত হয়ে যাওয়ার মতো পতনের কোনো দরকার নেই তোমার। তুমি নিজেকে রব্বে কারীমের হাওয়ালা করে দাও। তিনি তোমাকে হতাশায় ছেড়ে দেবেন না। তাই ঝরা পাতার মতো তোমাকে কাঁদতে হবে না। তাকদীর থেকে হতাশ হয়ে যেতে হবে না। বরং তাকদীর নির্ধারণকারী রব্বে কারীমের সাথে তুমি সম্পর্ক করো। তারপর দেখো সেই পরোয়ারদেগার রব্বে কারীম তোমাকে কীভাবে শান্তি ও প্রশান্তি দান করেন।

আজ আপনি মানুষকে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করুন। কোনো মানুষ বলবে, আমার ভাই আমাকে পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছে। কেউ বলবে, আমার পড়শী আমাকে পেরেশানির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কেউ বলবে, আমার স্ত্রী আমাকে পেরেশান করে দিয়েছে কিংবা বলবে, আমার সন্তান আমাকে পেরেশান করে দিয়েছে।

আমাদের উচিত ভাইয়েরা! কথাটা এভাবে চিন্তা করা যে, আমাদের অন্য কেউ পেরেশানিতে ফেলে দেয়নি। আমরাই আমাদের পেরেশানিতে ফেলে দিয়েছি। আমরা শান্তি পাওয়ার জন্য গুনাহ করি। সেই গুনাহ আমাদের অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়।

میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب

اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے رہے

'আমার কী যে হলো? যার কারণে আমি আজ রোগাক্রান্ত, তার থেকেই নিচ্ছি আমি চিকিৎসাপত্র। নিচ্ছি তার থেকে ওষুধ!'

তো যেসব কাজের কারণে পেরেশানি, অস্থিরতা ও অশান্তি আসে, বান্দারা আজ সেসব কাজই করছে শান্তির প্রত্যাশায়।

স্মরণ রাখবেন, বাহ্যিকভাবে গুনাহকে বড়ই সুন্দর দেখায়, মজাদার মনে হয়। সাময়িকভাবে সামান্য শান্তি হয়ও। কিন্তু বাস্তবতার দিকে তাকালে বোঝা যায়, এই গুনাহই মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয়। এই গুনাহই মানুষকে অস্থির ও পেরেশান করে তোলে। তাই সর্বপ্রথম গুনাহ থেকেই আত্মরক্ষা করা উচিত?

এই যে আল্লাহওয়ালারা তাঁদের জীবনকে শান্তি ও প্রশান্তিতে ভরে নেন। গুনাহ পরিত্যাগ করে বান্দা সেই প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, যে প্রশান্তি প্রাপ্ত হয় একটি ছোট্ট শিশু তার মায়ের কোলে।

তাই বলছি মুহতারাম হাজিরীন! যদি শান্তি কামনা করেন, তাহলে গুনাহকে পরিত্যাগ করুন।

জেনেবুঝে গুনাহ করা

জেনে ও ইচ্ছে করে গুনাহের কাজ করাকে আল্লাহ বড়ই অপছন্দ করেন। নিজের অজ্ঞাতসারে গুনাহ হয়ে গেলে দ্রুত মাফ পাওয়া যায়। কিন্তু যখন মানুষটা জেনেবুঝে ও ইচ্ছে করে গুনাহের কাজ করে, তাহলে আল্লাহ মারাত্মকভাবে রাগান্বিত হয়ে যান। কিন্তু আল্লাহ বড়ই সহনশীল। তিনি প্রথমবারেই বান্দাকে আযাবে ফেলে দেন না। তিনি বান্দাকে সুযোগ দেন। কিন্তু গুনাহ করতে-করতে বান্দা যখন সীমা অতিক্রম করে ফেলে, তবেই আল্লাহ পাকড়াও করেন। আল্লাহ বান্দাকে সতর্ক করেন। যদি বান্দা সতর্ক না হয়, তাহলে এবার তাকে পেরেশানিতে নিপতিত করেন। যেন বান্দা গুনাহ থেকে সরে এসে আল্লাহর অভিমুখী হয়। এক আল্লাহপ্রেমিক বলেছেন—

سکھ دکھاں تو دیواں دار

دکھاں آن ملایوں یار

'বান্দা সুখে থাকলে বড় গাফেল ও উন্মাদ হয়ে যায় আর দুঃখে পড়লে বন্ধুকে খোঁজে।

সুখ বান্দাকে গাফেল করে, দুঃখ তাকে জাগ্রত করে

সুখ মানুষকে গাফলতের ঘোরে ডুবিয়ে দেয় আর দুঃখ সেই ঘোর থেকে জাগ্রত করে। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলা মাঝে-মাঝেই বান্দাকে রোগাক্রান্ত করেন। পেরেশানিতে ফেলেন। দুঃখ দেন। এই দুঃখ ও বেদনার কালে আল্লাহর ভালো বান্দাগণ আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে। নামায পড়ে। তাহাজ্জুদে জাগ্রত হয়। কিছু যিকির-দরূদও পাঠ করে। বিপদে পড়ে বান্দা বুঝতে পারে, আল্লাহ আমাকে তাঁর ঘরে ডাকছেন। কত পবিত্র সেই পারওয়ারদেগার নিজের অবাধ্য বান্দাদের পেরেশানি, বিপদ ও মুসিবতের জিঞ্জিরে বেঁধে তার দিকে টেনে নিয়ে আসেন।

বোঝা গেল, পেরেশানি ও মুসিবত আসে বান্দাকে জাগ্রত করার জন্য। কিন্তু আমরা তো জাগ্রত হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি গুনাহের কাজ করে ফেলি। আরো বেশি অন্যায়ে জড়িয়ে যাই। আমাদের বোঝা উচিত, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নাফরমানির কারণে বান্দার ওপর বিপদ আসে। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আসে। কাজে ব্যর্থতা আসে। যদি মানুষ অন্যায় ও পাপ ছেড়ে দিয়ে আখেরাতের অভিমুখী হয়, তাহলেই সে সফল। তাই বলছি, আমাদের জন্য গুনাহ পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো বলেই রেখেছেন–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ

'বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার গুনাহ পরিত্যাগ করো হে বান্দারা!'[১]

গুনাহ তো ছাড়তে হবেই

একদিন-না-একদিন বাধ্য হয়ে এ-গুনাহ ছাড়তেই তো হবে। বিপদ-মুসিবত একদিন গুনাহ থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেই। তাই আগে-আগে নিজ থেকেই গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে। যে-বান্দা স্বেচ্ছায় নিজ থেকেই গুনাহ পরিত্যাগ করতে পারবে, আল্লাহ তার কোনো দু'আই আর ফিরিয়ে দেবেন না। সব দু'আই তার কবুল করবেন। সহজ কথায় ওই বান্দা মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ হয়ে যাবে।

মানুষ আমাদের জিজ্ঞেস করে, হুজুর! ইমসে আজম কী? বলে, আমাকে ইসমে আযম বলে দিন। আরে ভাই! গুনাহ পরিত্যাগ করতে পারার চেয়ে বড় ইসমে আযম আর কী আছে? গুনাহ ছেড়ে দাও; তারপর দেখো, কীভাবে দু'আ কবুল হয়। এটাই ইসমে আযম। তাই তো বর্ণিত আছে, যেলোক গায়রে মাহরাম থেকে নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে পারবে, আল্লাহ তাকে ইবাদাতের স্বাদ দান করবেন।

বোঝা যায়, প্রত্যেকটা গুনাহকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই কোনো-না-কোনো স্বাদ ও মজা অনুভূত হয়। তাই বলছি, গুনাহ ছেড়ে দিন। যেন আল্লাহ অন্তরে প্রশান্তি দান করেন। আমলের স্বাদ ও মজা দান করেন।

বান্দার কাজ বন্দেগি করা

আরে ভাই! আমাদের তো বোঝা উচিত যে, আমাদের কাজই হচ্ছে বন্দেগি করা। আমাদের উচিত দয়াময়ের বান্দা হওয়া– সুখ ও দয়ার বান্দা

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ১২০

না হওয়া। কিছু মানুষ সর্বদা মজা খুঁজতে থাকে। সুখ খুঁজতে থাকে। আরে ভাই! আমরা তো মজা ও সুখ করতে আসিনি। আমরা তো দুনিয়ায় এসেছি এবং দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছি আল্লাহর বন্দেগি করার জন্য। তবেই তো আমরা জীবনের স্বাদ ও মজা পাব।

নেককার ও বদকারের পেরেশানি ও মুসিবতের মাঝে পার্থক্য

আপনারা হয়তো একটা প্রশ্ন করবেন যে, নেক কাজ করা সত্ত্বেও তো মুসিবত ও পেরেশানি আসে। সেটা কেন? হ্যাঁ ভাই! নেককারদেরও পেরেশানি আসে। আর গুনাহগারদের তো আসেই। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যটা বুঝে নিতে হবে। আল্লাহ তাঁর নেককার বান্দাকে তার মর্যাদা বুলুন্দ করার জন্য পেরেশানি ও বিপদ দেন। এমন মর্যাদার স্তরে নেক বান্দাকে আসীন করতে চান, যে-স্তরে বান্দা তার মেহনত দ্বারা উন্নীত হতে পারবে না। এই পেরেশানিকে উসিলা বানিয়ে আল্লাহ বান্দাকে নিজের আপন বানিয়ে নেন এবং উঁচু মর্যাদা দান করেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেছেন, সালেকদের পাকড়াও করে আল্লাহ যত মর্যাদা দান করেন, ইবাদাতে সে তত মর্যাদা ও মর্তবা পেতে সক্ষম হয় না। সালেক কব্জ অবস্থায় অর্থাৎ– তার কাইফিয়াত ছিনিয়ে নেয়া অবস্থায় উন্নতি বেশি লাভ করে। কবির ভাষায়–

تندیء باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

'হে প্রিয়! তোমাকে এই কষ্টে ফেলা হচ্ছে তোমার সাথে দুশমনির কারণে নয়। এটা তো বরং করা হচ্ছে তোমাকে উচ্চাসন দানের জন্য।'

মুহতারাম উপস্থিতি! আল্লাহওয়ালাদের ওপর মুসিবত আসে কথাটা ঠিক। তবে সেটা হয় তাদের মর্যাদা দানের জন্য। তাই তো বড়-বড় মুসিবত ও পেরেশানিতে পতিত হয়েও আল্লাহওয়ালাগণ সামান্যও বিচলিত হন না।

তাঁরা অসুস্থ হয়ে যান, বিপদে পড়েন; তবুও থাকেন শান্ত। থাকেন প্রশান্ত। যেন তারা স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট কোনো সীসাঢালা কামরায় অবস্থান করছেন। বাইরে ঝড় বইছে। আঁধার হয়ে আসছে পরিবেশ। গাছপালা সব নড়ছে। সবই সে দেখতে পাচ্ছে। তবুও সে স্থিরভাবে বসে আছে। বিপদ যেন তাকে স্পর্শ করে না। অথচ শত বিপদে সে আক্রান্ত।

আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থাও হয় এমন। তাঁরা পেরেশানি ও মুসিবত দেখেও স্থির থাকেন। কারণ, তারা জানেন, এই মুসিবত ও পেরেশানি এসেছে তার মর্যাদা বুলন্দির জন্য। মুসিবতের সময় তারা আল্লাহকে ভুলে যান না, বরং আল্লাহতে মগ্ন থাকেন। এক বুযুর্গের ঘটনা। ঘরে কিছু খুঁজছিলেন তিনি। তার ছেলের বিবাহ তখন। স্ত্রী বলল, ছেলে তো দুলা সেজে ঘোড়ায় চড়েছে। কনের বাড়িতে তো যেতে হবে। আপনি কী খোঁজ করছেন?

বুযুর্গ বললেন, আমি কাফনের কাপড়টা খোঁজ করছি। আমার কাছে সংবাদ এসেছে, আমার ছেলেটার ঠিক কখন মৃত্যু হবে। এভাবে বুযুর্গ ও তার স্ত্রী কথা বলছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে সংবাদ এল, ছেলে ঘোড়ায় চড়ার সময় পা পিছলে পড়ে গেছে এবং ঘাড়ে তীব্র আঘাত খেয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

তো ছেলে দুলা সেজেছিল আর বুযুর্গ পিতা সেই ছেলের কাফনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কবির ভাষায়–

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

'যা ঘটে তা-ই তোমার তবিয়তের সাথে মেনে নেওয়াকেই বলা হয় আনুগত্য।'

আপন রবের ওপর রাজী ও সন্তুষ্ট থাকা, রবের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নেওয়া এটাই তো বান্দার আবদিয়াত। মোটকথা, আল্লাহওয়ালাগণ বিপদ ও মুসিবতে ধৈর্য ধরেন। তাঁরা আল্লাহর দিকেই মুতাওয়াজ্জুহ হন।

আর পেরেশানি গুনাহের কারণেও আসে। সেটা পতিত হয় গুনাহগারদের ওপর। তো দুনিয়াতে প্রায় সব মানুষই পেরেশানিতে আছে।

কবির ভাষায়–

دریں دنیا کسے بے غم نا باشد

اگر باشد بنی آدم نہ باشد

'দুনিয়ায় কেউই নিশ্চিন্ত নেই। যদি থাকে, তবে সে বনী আদম নয়।'

দুনিয়ার সব স্থানেই কিছু চিন্তা-দুশ্চিন্তা থাকবেই। দুশ্চিন্তামুক্ত স্থান হচ্ছে জান্নাত। আর আমরা তো সেখানে আজও যেতে পারিনি। জান্নাতেই সকল চিন্তা-দুশ্চিন্তাকে খতম করে দেওয়া হবে।

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'তারা সেখানে আতঙ্কগ্রস্ত হবে না এবং হবে না দুশ্চিন্তাগ্রস্তও।'[১]

দুনিয়ায় তে দুশ্চিন্তা-আতঙ্ক ছিল। সেখানে কিছুই থাকবে না। সামান্য ভয়ও থাকবে না। ভাইয়েরা পরীক্ষা তো এই দুনিয়ার বিষয়। আর আখেরাতে গেলে তো বড় প্রতিদান মিলবে। বড় প্রতিদানের জন্য কি সামান্য পরীক্ষার কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারব না?

لطف سجن دم بدم قهر سجن گاه گاه

این بھی سجن واه واه اوں بھی سجن واه واه

'আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ তো পাচ্ছি সর্বদা-ই। প্রতিটা নিঃশ্বাসে, প্রতিটা কদমে। মাঝে-মাঝে সামান্য কঠোরতা আসে, সংকীর্ণতা আসে। দয়া অনুগ্রহ পেলেও আমি খুশী। সংকট-সংকীর্ণতায় পড়লেও আমি খুশী।'

মাওলা কারীম বান্দার জন্য যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা মেনে নেওয়াই বন্দেগি। অথচ মাওলা পরীক্ষার জন্য সামান্য পেরেশানি চাপিয়ে দিলেই আমরা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেই। কোনো অবাধ্য কুলাঙ্গার তাবিজ-তদবিরকারীকে দেখলেও তার কাছে মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য তাবিজ চাই। অথচ যে-মাওলা বিপদ দিয়েছেন, তার সামনে এসে মাথাটা নত করি না। এ-ই তো আমরা। জাদুকরদের কাছে গিয়ে ঈমানটাও বিক্রি করে দেই। এভাবে তাবিজ-তদবিরকারী আর জাদুকর ও রাশিগণকদের কাছে কোনোভাবে যাওয়া উচিত নয়।

যেকোনো বিপদ আসে, মুসিবত দেখা দেয় তো আমাদের উচিত হচ্ছে মসজিদের দিকে ছুটে যাওয়া। আল্লাহকে নিজের মনের কথাগুলো খুলে-খুলে বলা। নিজের দিলের দুঃখ আল্লাহর সামনে পেশ করা। আমরা আমাদের মনের কথা ও হৃদয়ের বেদনা যদি সাচ্চা দিলে আল্লাহর সমীপে নিবেদন করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সেই দু'আ কবুল করবেন। কুরআনের ভাষায়—

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'আল্লাহ সংকুচিত করেন ও সম্প্রসারিত করেন। আর তার দিকেই সবার প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[২]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১১২
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৫

তো আমাদের উচিত ওই আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তাঁর দিকে ফিরে যাওয়া। তাহলেই আল্লাহ আমাদের পেরেশানি খতম করে দেবেন। মুসিবত-পেরেশানি তো অধিকাংশই আমাদের গুনাহের কারণে আসে। তাই যখনই মুসিবত আসবে, তখনই তার থেকে আত্মরক্ষার দু'আ করবে এবং পাশাপাশি কাতরভাবে কায়মনোবাক্যে এস্‌তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! একথাও মাথায় রাখুন যে, যখন কোনো মানুষকে তার অসচেতনতা ও গাফলতি থেকে জাগানো হয়, তখনও যদি সে না জাগে, তাহলেই রাগটা ওঠে। তেমনি আল্লাহও তো কিছু মুসিবত দিয়ে বান্দাকে জাগ্রত ও সচেতন করতে চান। যদি বান্দা তখনও না জাগে, সচেতন না হয়, তাহলেই আল্লাহর গোস্বা হয়। ফলে এমন কঠোরতা করেন যে, ওই বান্দাকে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন।

কুরআনের ভাষায়–

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ

'তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের ওপর বছরে একবার বা দুবার মুসিবত আরোপিত করি? তারপরও তারা তাওবা করবে না? তারপরও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'[১]

সামান্য বিপদ দিয়ে সচেতন করার পরও যখন বান্দা সাবধান হয় না, তখন আল্লাহ তাকে এমন আযাব ও শাস্তি দান করেন যে, তা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।

কেন এমন করা হবে না–

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً

'এমন করা হবে না কেন, যে গুনাহ করেছে তার সঙ্গে? তার গুনাহ ও পাপাচার তাকে এভাবে গ্রাস করেছে।'[২]

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'তারা-ই জাহান্নামবাসী। তারা জাহান্নামে থাকবে সর্বদা।'[৩]

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১২৬
২. সূরা বাকারা : আয়াত ৮১
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৮১

তো তার গুনাহ তাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। আমাদের এই মিছে জীবনটার সবই মিছে। কার সাথে আপনার সম্পর্ক? মানুষ তো মানুষের সামনে মিথ্যা বলে যাচ্ছে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, বান্দা মিথ্যা বলতে-বলতে এমন হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা তাকে 'মিথ্যাবাদী' উপাধি দিয়ে দেন এবং তা তার আমলনামায় লিখে দেন। মিথ্যাবাদীর খাতায় তার নাম লেখা হয়।

নিজের গোপন সম্পর্ক, নিজের অনৈতিক কাজকর্ম সব মানুষ অপর মানুষ থেকে গোপন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরোয়ারদেগার রব্বে কারীম থেকে তো কেউই কিছু গোপন করতে পারে না। অনেক সময় মানুষ তার বদ-অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করে না বা করতে পারে না। ফলে সে গুনাহের মাঝেই ডুবে থাকে। এই অন্যায়কে লুকানোর জন্য বারবার সে মিথ্যা বলে, মিথ্যার আশ্রয় নেয়। ফলে এই মিথ্যা তাকে শেষ পর্যন্ত মুসিবতের মধ্যে ফেলে দেয়।

তাহলে বলুন, যিকিরের মধ্যে উন্নতি আসবে কীভাবে? সূলূকের পথে অগ্রসর হবে কীভাবে? কিছু-কিছু অযিফা, তাসবীহ, তাহলীল পড়া হচ্ছে। সাথে কবীরা গুনাহও করা হচ্ছে। তাহলে লাভ হলো কী? এটা তো এমন হলো যে, কেউ সর্দির জন্য ওষুধ সেবন করছে আবার সাথে-সাথে ঠান্ডা পানি ও বরফ পান করছে।

তাই বলছি, যিকির ও সূলূকের পথের পথিকদের প্রথম কদম তো এই হবে যে, মানুষ নিজের গুনাহ থেকে সত্য দিলে তাওবা করে নেবে। এই কাজটি করতে পারলেই পরে দেখা যাবে, সামান্য সময়ের মোরাকাবা আমাদের জন্য কতখানি বরকত নিয়ে আসে।

অনেকে মনে করে, আরে! গুনাহের কারণে তেমন আর কী-ইবা হবে। আমাকে আমার শায়েখের তাওয়াজ্জুহই ওপরে উঠিয়ে দেবে। শুনুন ভাই! তাওয়াজ্জুহ আপনাকে ওপরে উঠিয়ে দেবে তা ঠিক; কিন্তু আগে গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে।

আমার প্রিয় দোস্তগণ! আমরা যা-ই পেয়েছি আমাদের মাশায়েখে কেরামের তাওয়াজ্জুহর বরকতেই পেয়েছি। আমাদের মেহনত তো কিছু নেই। তো তাওয়াজ্জুহর কারণেই পেয়েছি তাস তো ঠিক; কিন্তু সাথে-সাথে আমরা তো সত্যবাদী ছিলাম। মসজিদে উপবেশনকারী ছিলাম। আমরা আল্লাহর ফজল ও করম পাওয়ার জন্যই তো বসেছি।

তাই বলছি, আমরা যখন গুনাহসমূহ পরিত্যাগ করব, তখন এমনিতেই তাওয়াজ্জুহ পেয়ে যাব। বুযুর্গানে দীনের নেক দৃষ্টি পেয়ে যাব। তখন তাওয়াজ্জুহ অন্তরের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করতে শুরু করবে। আমাদের হযরত খাজা আহমদ সাঈদ কুরাইশি (রহ.)-এর-জীবনীগ্রন্থে পীর সাইয়েদ যাওয়ার হুসাইন শাহ (রহ.) লিখেছেন, তিনি কখনও-কখনও সারা শহরের মানুষকে তাওয়াজ্জুহ দিতেন এবং বলতেন, কিছু-কিছু অন্তর আমার ফয়েজ ও বরকত গ্রহণ করতে পারত না। ফয়েজ ও বরকত ওইসব অন্তরে ধাক্কা খেয়ে আমাকে বলত, আমার জন্য তার হৃদয়ে কোনো স্থান নেই। যদি হৃদয়ে গুনাহের ময়লা এত বেশি হয়, তাহলে বলুন, তাওয়াজ্জুহ তাতে আর কী ফায়দা দেবে? কী উপকার করবে? তো এই ময়লা, এই গুনাহ আগে হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। অন্তরটাকে আগে পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সত্য তাওবা করতে হবে। তারপর দেখবেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের হৃদয়কে কেমন সুসজ্জিত করে দেন।

শয়তানের ফাঁদ ও প্রতারণা দুপ্রকার

অতীব জরুরি একটি কথা বলছি। শয়তান দুই পথে, দুভাবে মানুষকে ধোঁকা দেয়, প্রতারিত করে।

১. শাহওয়াত তথা কামরিপুর মাধ্যমে।

২. শুবুহাত তথা সন্দেহ সৃষ্টির মাধ্যমে।

অর্থাৎ– কিছু আছে শাহওয়াত তথা রিপুর তাড়নায় কৃত গুনাহ। আর কিছু আছে শুবুহাত তথা সন্দেহের গুনাহ। যেমন– কুদৃষ্টি করা, চুরি করা, যিনা করা এবং এরকম আরো অন্যসব গুনাহ। এগুলো প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। শয়তান যাদের এ-ধরনের গুনাহে মগ্ন করতে না পারে, তাদের সন্দেহের গুনাহে ফেলে দেয়। যেমন– মানুষকে বলে, আরে! এই মোরাকাবা কি সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত? এই পীর মুরিদী কি নবীজির যুগেও ছিল? এমন হাজারো প্রকার শুবুহাত তথা সন্দেহ সৃষ্টি করে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। এই সন্দেহ এমন নিকৃষ্ট মুসিবত, যা মানবকে অধঃপতনে ফেলে দেয়, যা মানুষের আমলকে একেবারে নিঃশেষ করে দেয়। বরং আমলের মূল বুনিয়াদকেই উপড়ে ফেলে দেয়। তাই তো কুরআনুল কারীম সূচনাতেই বলে দিয়েছে–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

'এটি এমন কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই এবং তা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতকারী।'[১]

কারণ, সন্দেহের সাথে পড়ে এই কুরআন দ্বারা কেউই হেদায়েত পাবে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাই সন্দেহ থেকে, শিরক থেকে, রাগ থেকে, মুনাফিকি থেকে এবং খারাপ আখলাক ও অসৎ চরিত্র থেকে।'

দেখুন, শিরকেরও আগে নবীজি শক তথা সন্দেহ থেকে পানাহ চেয়েছেন আল্লাহর কাছে। এই সন্দেহটা বড়ই খারাপ ও নিকৃষ্ট জিনিস, যা বান্দাকে একেবারে ঈমানহারা করে ছাড়ে।

লোকেরা আজ ইসলাম নিয়ে সন্দেহের বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করেছে। বলছে, আরে! মৌলভীরা এসব নিজে থেকে বানিয়েছে। কত করে তাদের বোঝানো হয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। এভাবে ইসলামের বিষয়েই মানুষ আজ সন্দেহে জড়িয়ে যাচ্ছে।

তো আজ শয়তান সন্দেহ ও সংশয়ের মাধ্যমে মানুষজনকে ধোঁকা ও প্রতারণার শিকারে পরিণত করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! বলছিলাম, আল্লাহ কেন মানুষের ওপর মুসিবত দেন সে কথা। দুই কারণে আল্লাহ মানুষকে মুসিবত দেন।

১. গুনাহের কারণে, যেন বান্দা ফিরে আসে।

২. বান্দাকে নৈকট্য দানের জন্য।

তো আমাদের উচিত গুনাহের পথ পরিহার করে রব্বে কারীমের দিকে অগ্রসর হওয়া। ভাই! শয়তান ধোঁকা দিয়ে বলবে, আরে! এই কাজটা এখন ছাড়তে হবে না। বুঝুন ভাই! মৃত্যু তো এখনই আসতে পারে। পরোয়ারদেগার যদি ইচ্ছে করেন, গুনাহ পরিত্যাগ করা অতি সহজ। তাই আল্লাহর কাছে তাওফীক কামনা করুন যেন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারেন। দু'আ করুন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করো। তুমি আমাকে হেফাজত করো। একবার গুনাহ হয়ে গেলে আবার ক্ষমা

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২

প্রার্থনা করুন। আবার গুনাহ হয়ে গেলে আবার তাওবা করুন। ইনশা আল্লাহ একদিন-না-একদিন তাওফীক হয়েই যাবে। একদিন ফিরে আসতে পারবেন অন্যায় থেকে। গুনাহ হয়ে গেলে লজ্জিত হবেন এবং কেঁদেকেটে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন। হাদীছে বর্ণিত আছে–

اَلنَّدَمُ تَوْبَةً

'লজ্জিত হওয়াও এক প্রকার তাওবা।'

তাই গুনাহ করে লজ্জিত হবেন। গুনাহ হয়ে গেলে সাথে-সাথেই আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবেন। আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে বলবেন–

غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا
مجھے کسی گناہ کا مرقع نصیب نہ کرنا

'হে আমার মাওলা! আমার জীবনকে দুশ্চিন্তায় ঢেকে দিয়ো না।
আমার এই গরিবের দিলকে নিঃস্ব করে দিয়ো না হে মালিক!
আমি তো পরীক্ষার উপযুক্ত নই হে আল্লাহ!
আমাকে গুনাহের কোনো সুযোগ দিয়ো না হে রব্বে কারীম!'

বান্দা আল্লাহর কাছে দু'আ করে, আমাকে গুনাহ থেকে রক্ষা করো হে আল্লাহ! এভাবে বান্দা যখন কাঁদে, আল্লাহ তখন তাকে বাঁচিয়ে দেন, রক্ষা করেন। রাবেয়া বছরিয়া (রহ.) একজন নেককার হাদীছে ছিলেন। তিনি বড় সুন্দর করে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি তো আসমানকে জমিনের ওপর পড়ে যাওয়া থেকে প্রতিহত করে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আপনি শয়তানকে আমার সাথে যুক্ত হওয়া থেকে প্রতিহত করে দিন।

তো তাই বলছি আমরা যখন নিজেকে নিজে আল্লাহর সোপর্দ করব তখন আল্লাহই আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আমাদেরকে মাফ করে দেবেন। তাই আমরা গুনাহ থেকে আত্ম রক্ষার জন্য আগেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে নেব। গুনাহ যদি কখনো হয়েও যায়, তাহলে দ্রুত সত্য দিলে তাওবা করে নেব।

আল্লাহর প্রতিদান গ্রহণ করতেই হবে

হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) একটি বড় আশ্চর্য কথা লিখেছেন তাঁর কিতাবে। কুরআনের আয়াত–

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

'যে সামান্য গুনাহ করল, তাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে।'[১]

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, আমরা যত গুনাহ করেছি আমাদের প্রত্যেক গুনাহের বদলায় সাজা ভোগ করতে হবে। এই সাজা দুই প্রকারের। বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়।

১. হয়তো এই দুনিয়ায়ই আমাদের লজ্জা, অপমান ও অনুতাপের আগুনে জ্বলতে হবে। মনে-মনে বলতে হবে, হে আল্লাহ! আমাদের ভুল হয়ে গেছে– মাফ করে দাও।

তো এও এক প্রকার আগুনে জ্বলা। এতেও দিলে আগুন জ্বলে। আল্লাহ! আমাদের মাফ করে দিন। আল্লাহ! আমি পেরেশান হয়ে গেছি– মাফ চাই, তাওবা করি। আমি আর গুনাহ করব না। আমাকে মাফ করে দাও। এই বান্দা সত্য তাওবার দরুন দুনিয়াতে লজ্জা ও অনুতাপের আগুনে জ্বলেছে।

২. দুই নম্বর পদ্ধতি হলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলা। যদি দুনিয়ায় তাওবা করে লজ্জার আগুনে নিজেকে জ্বালিয়ে না যায়, তাহলে পরকালে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

তো আমাদের জন্য পথ সহজ হয়ে গেল। এই দুনিয়ার লজ্জা ও অনুতাপের আগুনে নিজেকে যদি জ্বালাতে পারি, জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারব। তাই নিজেকে আমরা এই দুনিয়ায়ই জ্বালিয়ে যাব। গুনাহ হয়ে গেলেই অনুতপ্ত ও ভীত হয়ে তাওবা করে নেব। হাদীছে আছে, যখন শয়তান মানুষকে প্রতারিত করতে কসম খেয়েছিল এবং বলেছিল, আমি তোমার বান্দাদের প্রতারণার শিকারে পরিণত করব। তাদের আমি ডান, বাম, সামনে ও পেছন সর্ব ক্ষেত্রেই ধোঁকা ও প্রতারণায় ফেলব। বলেছিল–

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ

'তাদের অধিকাংশকেই আপনি কৃতজ্ঞ ও শোকরগুজার পাবেন না।'[২]

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১২৩
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭

সে-সময় ফেরেশতারা বড় আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, হে আল্লাহ! বনী আদমের তো বড় বিপদ হয়ে গেল। এই শয়তান তো সব দিক থেকে তাদের পিছু নেবে। তাদের জন্য তো কোনো সুযোগ বিদ্যমান থাকবে না। আল্লাহ্ বললেন, হে আমার ফেরেশতারা! এই শয়তান চার দিকের কথা বলেছে। দুই দিকের কথা ভুলে গেছে। ১. নিচের দিক ২. ওপরের দিক। আমার গুনাহগার বান্দা যখন গুনাহ্ করে আমার দুয়ারে হাজির হবে এবং আমার সামনে ক্ষমা প্রার্থনায় হাত প্রসারিত করবে, তখন তো হাত ওপরের দিকে উঠবে। আমি তখন তার গুনাহগুলো মাফ করে দেব। আর আমার বান্দা যখন গুনাহের কারণে পেরেশান হয়ে নিজের মাথা সেজদায় নত করে দেবে, তখন শয়তান নিচের দিক থেকে বান্দাকে ধোঁকা দিতে পারবে না। আমার বান্দা সেজদা থেকে মাথা উঠানোর আগেই আমি আমার বান্দার গুনাহগুলো মাফ করে দেব।

শয়তান আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে যখন মানুষকে প্রতারিত করার কথা বলেছে, তখন আল্লাহ্ তার জবাবে বলেছেন, আমার বান্দারা মানবসুলভ দুর্বলতার কারণে হয়তো গুনাহ্ করবে, কিন্তু মৃত্যুর আগে-আগে যদি সে সত্য হৃদয়ে সাচ্চা তাওবা করে নিতে পারে, তাহলে আমি আমার সেই বান্দাকে একেবারে মাফ করে দেব। আমার ইজ্জত ও জালালের কসম করে আমি একথা বলছি।

তো শয়তান একটি কসম করে তার কথা বলেছিল আর আল্লাহ্ দুটি কসম করে নিজের কথা বলে দিয়েছেন নিজের দুর্বল বান্দার পক্ষে।

আল্লাহ্ দান করে খুশি হন

আল্লাহর প্রত্যেকটি গুণেরই একটি করে নাম আছে। তবে রহম গুণের জন্য তাঁর দুটি নাম। ১. রহমান ২. রহীম। অন্য কোনো গুণ এমন নেই যে তার জন্য আল্লাহর নাম দুটি আছে।

এবার চিন্তা করুন, কত দয়াবান আমাদের আল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের দান করেই খুশি হন। তিনি আমাদের মাফ করে আনন্দিত হন।

একবার আমি দাওরায়ে হাদীছের মেয়েদের পর্দার এপাশ থেকে দরস দান করছিলাম। তাদের জিজ্ঞেস করলাম, বলো তো শুনি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সহজ কাজ কী? এক মেয়ে জবাব দিল, নিজের মাকে কোনো বিষয়ের জন্য রাজি করানো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কীভাবে?

মেয়েটি বলল, আমার অভিজ্ঞতা আছে এ বিষয়ে। মা অনেক সময় তার সন্তানের ওপর নারাজ হয়ে যান। তখন তার খবর নিতে চান না। কিন্তু তার মন তাকে সন্তানের খবর নিতে বাধ্য করে। অপর সন্তানকে জিজ্ঞেস করে, সে কি রুটি খেয়েছে রে! খাবার নিয়েছে রে! লুকিয়ে-লুকিয়ে মা-ই ওর কাপড়গুলো গুছিয়ে দেন। বই কিতাব গুছিয়ে দেন। বিছানা ঠিক করে দেন। ওপরে ওপরে নারাজি প্রকাশ করেন; কিন্তু মাতৃমমতা তাঁকে বাধ্য করে। তাই আরেক সন্তানের কাছে ওর খবরাখবর জিজ্ঞেস করে। গোপনে-গোপনে সবকিছু প্রস্তুত করে দেয়, গুছিয়ে দেয়। আরেক সন্তানের মাধ্যমে ওর খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়।

বোঝা গেল মা দিল থেকে কিছু করেন না। অন্তর থেকে রাগ হন না। এসবই বাইরে-বাইরে। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে ঠিকই সন্তানের জন্য কাঁদেন, দুঃখ বোধ করেন। মেয়েটি বলল, তাই আমি বলছি, মাকে রাজি করানো খুব সহজ। যে মায়ের মমতা এমন, সেই মা সব কিছুতেই অতি সহজেই রাজি হয়ে যান। সহজেই মা সন্তানের সব ভুল মাফ করে দেন। সহজেই সন্তানের সব দাবি মেনে নেন। যত নারাজই হোন না কেন মা তার সন্তানের চোখে পানি দেখতে পারে না। সন্তানের চোখে পানি দেখলেই মা ছুটে এসে তার মমতার আঁচল দিয়ে সেই পানি মুছে দেন। মাকে রাজি করানো বড়ই সহজ।

মেয়েটির কথা শুনে আমি বললাম, মা ছাড়া আরেকজন সত্তা আছেন, যাকে রাজি করানো মাকে রাজি করানোর চেয়ে আরো বেশি সহজ। ৭০ গুণ সহজ। তিনি হচ্ছেন আমাদের পরোয়ারদেগার আল্লাহ। মাকে তো জবানে কিছু বলতে হয়। তার সামনে গিয়ে ভান ধরতে হয়। কৌশল করতে হয়। পা ধরে ক্ষমা চাইতে হয়। অশ্রু ঢালতে হয়। কিন্তু আমাদের পরোয়ারদেগার আল্লাহ। তিনি তো আল্লাহই। মনে-মনে অনুতপ্ত হলেই আল্লাহ জেনে যান। অন্তরে লজ্জিত হলেই তিনি সেই খবর পেয়ে যান। মনে-মনে বললেই চলে হে আল্লাহ! আমি গুনাহ থেকে মাফ চাই। আমি সত্য তাওবা করছি। আমাকে তুমি মাফ করে দাও। আমাকে সংশোধন করে দাও। আমাকে তোমার বানিয়ে নাও। আমাকে শয়তানের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দাও, রক্ষা করো। এভাবে মনে-মনে বললেও আল্লাহ শুনতে পান। মুখে বলতে হয় না। অন্তরের ভাব ও ভাবনাকেই আল্লাহ কবুল করে নেন। বান্দার প্রতি সহজেই আল্লাহ তা'আলা রাজি হয়ে যান।

তাই বলি, আল্লাহকে রাজি করা মাকে রাজি করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশি সহজ। আল্লামা ইবনে কায়্যিম (রহ.) লিখেছেন, আমি গলি পথে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, একটি ঘরের দরজা খোলা। সেই ঘরে মা তার সন্তানকে প্রহার করছিল আর বলছিল তুই আমাকে অপমান করেছিস্। পেরেশান করেছিস্। নাফরমান কোথাকার! কোনো কথাই তুই আমার মানিস্ না। বাচ্চাটা কাঁদছিল। ফোঁপাচ্ছিল। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, বাচ্চাটা ঘর থেকে কাঁদতে-কাঁদতে বের হয়ে একদিকে চলে গেল। এর খানিক পরেই ফিরে এল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ফিরে এসেছ কেন? বাচ্চাটা বলল, চিন্তা করছিলাম, কোথাও চলে যাব। তারপর চিন্তা করলাম, দুনিয়ার সব জিনিস আমি হয়তো পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু অন্যত্র চলে গেলে তো 'মা' পাব না, মায়ের ভালোবাসা পাব না। তাই একথা চিন্তা করে ফিরে চলে এলাম।

আমি দেখলাম, বাচ্চাটা দরজায় বসে পড়ল। ঘটনার শেষ দেখার জন্য সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলাম। একসময় বাচ্চাটার নিদ্রা এসে গেল। সে দরজায়ই ঘুমিয়ে গেল। একটু পরে মা এলেন। দেখলেন, বাচ্চাটা শুয়ে আছে। তাকে জাগালেন। বললেন, তোকে না বলেছি এই ঘর ছেড়ে চলে যেতে। কেন এখানে পড়ে আছিস্। শুনে বাচ্চা বলল, মা! আমি অন্যত্র যেতে পারব। কিন্তু দুনিয়ার কোথাও গিয়ে তো আমি আরেকজন 'মা' পাব না। আমি এই দুয়ার ছেড়ে কীভাবে যেতে পারি?

বাচ্চার মুখের এই কথাগুলো শুনে মায়ের চোখে পানি চলে এল। বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নিল। আরে বেটা! তুই যখন বিশ্বাস করিস্ এই ঘর ছাড়া তোর কোনো ঘর নেই, তাহলে শুনে রাখ; আমি তোকে মাফ করে দিলাম– আয় বাবা! ঘরে আয়।

হযরত ইবনে কায়্যিম লিখেছেন–

যখন গুনাহগার বান্দা নিজের রবের দুয়ারে আসে, তখনও তেমনই ঘটনা ঘটে। এভাবে বান্দা আল্লাহকে বলবে, হে আল্লাহ! আমার ভুলগুলো মাফ করে দাও। আমার গুনাহ মাফ করে দাও। হে ভাঙ্গা হৃদয়ের প্রশান্তিদাতা, হে রক্ষাকারী! হে রহমাতওয়ালা! আমাদের তুমি মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও। আমাকে শয়তানের হাতে ধোঁকা খাওয়া থেকে রক্ষা করো। আমি সংশোধনের জন্য উপস্থিত হয়েছি। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমতের চাদরে ঢেকে নাও।

যখন বান্দা এভাবে নিজেকে আল্লাহর সামনে সোপর্দ করে দেয়, সাথে-সাথে আল্লাহ তার এই বান্দার তাওবা কবুল করে নেন।

আল্লাহ আমাদের সত্য তাওবা করার এবং তাওবা করে এখান থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

খুতুবাতে যুলফিকার

২৬তম খণ্ড

আল্লাহপ্রেমের ভিত্তি

'আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের মহব্বত কেমন হবে? মায়ের প্রতি ছোট বাচ্চার যেমন হয় তেমন। ছোট বাচ্চাকে তার মা থেকে সামান্যের জন্যও যদি পৃথক করে দেওয়া হয়, তাহলে কেমন ছটফট করে, কেমন কান্নাকাটি করে এবং কেমন তড়পাতে থাকে সে? হাজারো নারী যদি তাকে কোলে তুলে নেয়, শত সুন্দরী রমণীও যদি আদর-সোহাগে ভরে দেয়, তবুও সে শান্ত হয় না। তবুও তার কান্না থামে না। অথচ মায়ের কোলে তুলে দিলে সাথে-সাথেই শান্ত হয়ে যায়। থেমে যায় তার কান্না। কারণ? কারণ, মায়ের প্রতি তার রয়েছে অগাধ প্রেম, ভালোবাসা ও মহব্বত। আবার বাচ্চা সামান্য কেঁদে উঠলেই শত ব্যস্ত থাকলেও মা ছুটে আসেন বাচ্চার কাছে। বুকে তুলে নেন সন্তানকে। তো মা ছাড়া বাচ্চাটি যেমন শান্ত ও স্থির হতে পারে না, তেমনি আমাদের উচিত রব ছাড়া আমরাও ব্যাকুল-বেকারার থাকা। তেমন মহব্বত যেন আমাদের নসিব হয়ে যায় যেমনটা মায়ের প্রতি সন্তানের হয়। বাচ্চা মায়ের প্রতি দেওয়ানা হয়। মুমিন বান্দা আল্লাহর প্রতি দেওয়ানা হওয়া উচিত।'

আল্লাহপ্রেমের ভিত্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'আল্লাহর সাথে ঈমানদারদের গভীর ভালোবাসা থাকে।'[১]

ঈমানদাররা আল্লাহকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।

মহব্বতের খামির

আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রত্যেক মানুষকে নিজের মহব্বতের খামিরের মধ্যে গুলে দিয়েছেন। প্রত্যেক মানুষের মনে মহব্বত জন্মগতভাবেই বিদ্যমান থাকে। হক ও সত্যকে অন্বেষণ করার একটা অনাবিল ইচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মাঝে জন্মগতভাবেই বিদ্যমান থাকে। ইরশাদ হচ্ছে–

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ

'প্রত্যেক বাচ্চা ইসলামের তরিকার ওপর জন্ম গ্রহণ করে।'[২]

আর বাচ্চাটি যখন কালিমা পড়ে নেয়, তখন সে ও আল্লাহপ্রেমী বান্দাদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। তাই তো প্রত্যেক ঈমানদার বান্দার দিলে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বিদ্যমান থাকে। তবে কম-বেশি তো

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

২. তিরমিযি : হাদীছ নং ২০৬৪

হয়ই। যে আল্লাহপ্রেমের তরে মেহনত-মুজাহাদা করে, তার হৃদয়ে মহব্বতের মাত্রা বেশি থাকে। আর যে মেহনত-মুজাহাদা করে না, তার হৃদয়ে মহব্বতের মাত্রা কম থাকে। যে আল্লাহকে ভালোবাসার তরে যত বেশি নিবেদিত থাকে, তার হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমের অগ্নি তত বেশি প্রজ্বলিত থাকে।

মহব্বতের অবস্থান ও ফলাফল

তাছাওউফ ও সূলূকের পথে যতগুলো স্তর ও মাকাম আছে, সব কিছুর মূল আরাধ্যই কিন্তু আল্লাহকে পাওয়া, আল্লাহর মহব্বত তৈরি ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা। তবে মহব্বতের এসব স্তরে প্রভেদও আছে। মহব্বতের কিছু স্তর তো এই তাওবা, ইনাবাত, যুহ্দ, রিয়াজত এভাবে দশটি মাকাম আছে। আর যখন মহব্বত হাসিল হয়ে যায়, তখন বাকি মাকামগুলো তার ফলাফল হয়। সবই তো মহব্বতের ফলাফল। মহব্বতের দ্বারা-ই সকল মাকাম ও স্তর অতিক্রম করা যায়। এতে রব্বে কারীমের বন্দেগি করা বড় আসান ও সহজ হয়ে যায়।

তোমার ওপর আমার কিছু অধিকার আছে

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ اَشْيَاءَ لَكَ وَخَلَقْتُكَ لِيْ

'হে আদম সন্তান! আমি সকল জিনিস তোমার জন্য বানিয়েছি আর তোমাকে বানিয়েছি আমার জন্য।'

তো দেখুন, আল্লাহ সারা দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজের জন্য।

আরেকটি হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে–

يَا عَبْدِيْ اَحِقِّنِيْ اٰدَمَ اِنِّيْ لَكَ مُحِبٌّ فَبِحُبِّيْ عَلَيْكَ كُنْ لِيْ مُحِبًّا

'হে আদমের সন্তান! আমি তোমাকে মহব্বত করি। তাতে তোমার ওপর আমার এই অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তুমি আমাকে মহব্বতকারী হয়ে যাও।'[১]

---

১. দালায়িলুন নুবুওয়াহ ১/৭৯

তাই তো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ

'ওই ব্যক্তির ঈমানই নেই, আল্লাহর প্রতি যার মহব্বত নেই।'[১]

মহব্বত পেতে মহব্বতপূর্ণ দু'আ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নেয়ামতটি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। বলতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত চাই। আপনার ভালোবাসা প্রার্থনা করি।'[২]

আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলছেন–

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

'হে মাহবুব! আপনার ওপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ'[৩]

এত ফজল ও করম এবং এত দয়া ও অনুগ্রহ সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রার্থনার আঁচল পেতে রেখেছেন। আল্লাহর সকাশে মহব্বত বৃদ্ধির দু'আ করেছেন।

নবীজি দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَاءِ اِلَيَّ

'হে আল্লাহ! আপনার মহব্বতকে আমার জন্য অন্য সকল জিনিসের মহব্বত থেকেও বেশি প্রিয় বানিয়ে দিন।'[৪]

অর্থাৎ– আপনার মহব্বতই সকল জিনিসের মহব্বতের চেয়ে প্রাধান্য করে দিন। কুরআনেও এমনই মহব্বতের চাহিদা ব্যক্ত করা হয়েছে।

---

১. মাউসূ'আতুল খুতাব : পৃষ্ঠা ১
২. মুসনাদে আহমাদ ৩৬/৪২৩
৩. সূরা নিসা : আয়াত ১১৩
৪. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ৩৬৪৮

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ ﴿٢٤﴾

'আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের বাবা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, স্বামী এবং তোমরা যে মালসম্পদ উপার্জন কর সেই সম্পদ এবং তোমাদের ওই ব্যবসা, যা মন্দা হয়ে যাওয়ার ভয় কর আর তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থান আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।'[১]

এখানে মহব্বতের এক জ্বলন্ত হুকুম প্রতিভাত হচ্ছে। অর্থাৎ– কিছু মহব্বত তো এমন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। যেমন– মা-বাবার প্রতি মহব্বত। সন্তানের প্রতি মহব্বত, স্বামী ও স্ত্রীর মহব্বত। এসব তো জায়েয। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলের মহব্বতকে অন্য সকল মহব্বতের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

নবীজির আরেকটি দু'আ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি দু'আ হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

'হে আল্লাহ! আপনি আপনার মহব্বতকে আমার নিজের জীবন, প্রাণ এবং নিজের পরিজন ও শীতল পানির প্রতি মহব্বত থেকেও বেশি করে দিন।'[২]

এখানে শীতল পানির কথাও বলা হয়েছে। কারণ, একজন মরুচারী যখন চলতে থাকে, তখন সে ঘর্মাক্ত হয়ে যায়, তার কণ্ঠনালী শুকিয়ে যায়, তখন তার সারাটা দেহই শীতল পানি প্রত্যাশা করতে থাকে ব্যাকুলভাবে। তেমনিভাবে যখন কারও মহব্বত ও ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তা তার শিরা-উপশিরায় মিশে যায়। তখন সে ওই ব্যক্তিকে পেতে এবং ভালোবাসা বাস্তবায়ন করতে ব্যাকুল হয়ে যায়। পিপাসিত বান্দা পানির

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ২৪

২. তিরমিযি : হাদীছ নং ৩৮২৮

প্রতি যেমনটা ব্যাকুল হয়। তাই এখানে মহব্বত প্রাপ্তির দু'আয় শীতল পানির কথা ও আলোচিত হয়েছে।

নবীজির আরেকটি দু'আ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি দু'আ হচ্ছে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰی لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰی وَجْهِكَ الْكَرِیْمِ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা এবং তোমার মহান চেহারা দেখার স্বাদ প্রার্থনা করছি।'[১]

محبت معانی والفاظ میں لائی نہیں جاتی

یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی

'প্রেম-ভালোবাসা ও মহব্বতের কথা কোনো ভাসা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

এটি এমন এক নির্মম বাস্তবতা, যা বোঝানো যায় না।'

প্রেম-ভালোবাসা যে কী জিনিস, তা নিজে-নিজে বুঝে নেওয়ার ব্যাপার। এটি বোঝানো ব্যাপার নয়।

لطف مے تا نہ شناسی بخدا تا نہ چشی

কোনো ব্যক্তি এই ভালোবাসার শরাবের মজাও স্বাদ সম্পর্কে অবগতি অর্জন করতে পারবে না। যতক্ষণ সেই মহব্বতের শরাব সে পান না করবে।

কোনো এক আল্লাহপ্রেমিক বলেছেন–

کچھ حقیقت نہ ہو محبت کی

اک نشہ سا ضرور ہوتا ہے

মহব্বতের কোনো বাস্তব রূপ বা ছবি নেই। তবে তা একটি নেশা বটে।

মহব্বতের এই পরিচয়, যার মাঝে মহব্বতের অবস্থা বিরাজ করবে অবশ্যই তার মাঝে নেশার মতো একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে। তার মাঝে এক প্রকার উন্মাদনা ও মাতালতা থাকবে। সে তার মাহবুবের সন্তুষ্টি এবং

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৩৯২০

প্রিয়তমের নৈকট্য ও সান্নিধ্য অর্জনের তরে নিবেদিত থাকবে। কারণ, তার হৃদয়ে মাহবুবের প্রেমের নেশা ঘুরপাক খাচ্ছে।

দোতরফা প্রেম : একটি আদর্শ কেইস

এই ভালোবাসা একদিক থেকে হয় না। বরং উভয় পক্ষ থেকেই এবং দুদিক থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বান্দার প্রতি আর ঈমানদারদের মহব্বত আল্লাহর প্রতি। কিন্তু দুনিয়ার নীতি এই যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে মহব্বত পাওয়া যায়, তাহলে বলা হয় বড় চমৎকার জুটি তারা। বড় সুন্দর মহব্বত তাদের। কিন্তু দেখুন, আমাদের রব্বে কারীমের মহব্বত বান্দার প্রতি বেশি। আল্লাহর প্রতি বান্দার মহব্বত অপেক্ষা বান্দার প্রতি আল্লাহর মহব্বতই বেশি এবং গভীর। আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন–

اَلَا كَانَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ اِلٰى لِقَاءِىْ وَاَنَا اِلٰى لِقَائِهِمْ لَاَشَدُّ شَوْقًا

'জেনে রাখো, আমার মোলাকাতের জন্য নেক লোকদের আগ্রহ বেড়ে গেছে। আর আমিও তাদের সাথে মোলাকাতের জন্য তাদের চেয়ে বেশি আগ্রহী।'[১]

কেমন যেন বান্দা রবের রহমতের দিকে এক কদম অগ্রসর হয় আর রবের রহমত বান্দার দিকে দুই কদম অগ্রসর হয়। তাই তো ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

'আমার দিকে বান্দা যদি হেঁটে আসে, তাহলে আমি তথা আমার রহমত বান্দার দিকে দৌড়ে যায়।'[২]

মাহবুবের সাথে মিলনের আকুলতা

মহব্বত শব্দটি মাত্র চারটি বর্ণের সমষ্টি। কিন্তু এর গভীরতা সমুদ্রের চেয়েও অধিক। তার উচ্চতা পাহাড় থেকেও বেশি। আর উষ্ণতা ও উত্তাপ সারা দুনিয়ার অগ্নি অপেক্ষা বেশি গরম। মহব্বতের কারণে বান্দার মাঝে এক বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হয়। জীবনভর ওই বান্দার দিলে এমন একটা অবস্থা বিদ্যমান থাকে, যা তাকে আহার-নিদ্রা ইত্যাদি বিষয়ে অনাগ্রহী করে

---

১. জামিউল আহাদীছ : হাদীছ নং ১১৬০

২. ইবনে মাজা : হাদীছ নং ২৮১২

তোলে। দিন ও রাত তার জন্য সমান হয়ে যায়। খাবারদাবার তার কাছে কষ্টের কাজ হয়ে যায়। তার দৃষ্টিতে সর্বদা একটি কাজই করণীয় হয়ে যায়।

আমার মাহবুবের নৈকট্য আমার নসিব হয়ে যায় যেন।

আমার মাহবুবের সাথে আমার মিলন হয়ে যায় যেন।

আমার মাহবুবের সন্তুষ্টি আমার নসিব হয়ে যায় যেন।

মহব্বত ও মারেফতের আবশ্যকতা

মারেফত যত বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, মহব্বতও তত পরিমাণে বাড়ে। উদাহরণস্বরূপ–

১. যদি কোনো ব্যক্তির অবগতি অর্জন হয় যে, অমুক ফল এমন মিষ্ট, তার স্বাদ এত মধুর, তখন এই ব্যাপারটা বান্দা যত বেশি জানতে পারবে, ফলটির প্রতি তার হৃদয় তত বেশি আকৃষ্ট হবে। ফলটির জন্য তার মন তত বেশি ব্যাকুল হবে।

২. যদি কোনো অঞ্চল বা এলাকার সৌন্দর্যের খবর জানতে পারে কোনো ভ্রমণবিলাসী ব্যক্তি, তাহলে তার কাছে যতটা বিশ্লেষণের সাথে এবং সবিস্তার আলোচনার সাথে সংবাদটি আসবে, সে ওই জায়গার সফরের জন্য ততটা ব্যাকুল হয়ে যাবে।

৩. একবার এক বাচ্চার সামনে আমি জান্নাতের ঘটনাবলি শুনিয়েছি। শুনে তো বাচ্চা বলতে লাগল, হযরত! আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন। জান্নাতের আলোচনা শুনে সে এতটা ব্যাকুল হয়ে গেছে যে, বলতে শুরু করেছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।

তো বোঝা গেল, একটি জিনিসের দিকে আকৃষ্ট হতে হলে তার সম্পর্কে অবগতি প্রয়োজন। আর এই অবগতিটাই তো মারেফত। মহব্বতের জন্য তাই মারেফত জরুরি। তাই তো হাসান বছরি (রহ.) বলেছেন–

مَنْ عَرَفَ اللهَ لَمْ يُحِبَّ غَيْرَهُ وَمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا زَهَدَ فِيْهِ

'যেব্যক্তি আল্লাহকে চিনল, সে আল্লাহর সাথে মহব্বত তৈরি করা ছাড়া থাকতে পারবে না। আর যেব্যক্তি দুনিয়ার প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত হতে পারল, সে দুনিয়াকে পরিত্যাগ না করে পারবে না।'[১]

---

১. তাবাকাতুস সূফিয়া

প্রকৃত নেয়ামতদাতার সাথে মহব্বত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহর সাথে মহব্বত স্থাপন করো। কারণ, তিনি তোমাদের নেয়ামত দান করেছেন।

এখন একজন বান্দা যদি একথা কল্পনা করে যে, আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তাকে কত রকম নেয়ামত দান করেছেন এবং সে এ ব্যাপারটির গভীরে যদি পৌঁছতে পারে, তাহলে অবশ্যই তার হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত প্রেম, ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হবে এবং সে মহব্বত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়েছেন। আকল ও জ্ঞান দান করেছেন। ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন, রিযিক দান করেছেন। আরো কত শত নেয়ামত তিনি আমাদের দান করেছেন। কোনোরূপ প্রার্থনা ছাড়া-ই তো তিনি আমাদের এসব নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং এসব চিন্তা করলে অবলীলায় দিল থেকে এই ধ্বনি বেরিয়ে আসে যে, হৃদয়ের গভীর থেকে এই নেয়ামতদাতার প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করা হোক।

মারেফতের বুনিয়াদ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَلْمَحَبَّةُ اَسَاسُ الْمَعْرِفَةِ

'মহব্বতই মারেফতের ভিত্তি।'

দুনিয়ার প্রতি মহব্বতের ফল

আল্লাহকে ভালোবাসার আরেকটি কারণ দেখুন—

দুনিয়ার যত প্রিয় ব্যক্তিই আছে সকলেই একদিন-না-একদিন পৃথক হয়ে যাবেই। কারণ, যেব্যক্তি দুনিয়াকে মহব্বত করল, তাকে তো একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবেই। আর যেব্যক্তি আল্লাহর সাথে মহব্বত স্থাপন করল, একদিন-না-একদিন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবেই।

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত জিবরাইল (আ.) আগমন করলেন। এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর প্রিয় হাবীব!

وَاحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ

'আপনি যাকে ইচ্ছে মহব্বত করুন। তবে একদিন আপনাকে তার থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে।'[১]

দেখুন, যদি দুনিয়ার দুজন বান্দার মাঝে মহব্বতের সম্পর্ক থাকে, তাহলে তারা উভয়ে সর্বদা একসাথ হতে পারবে না। আরে ভাই! স্বামী-স্ত্রীর মহব্বতের দিকেই তাকান। তারাও তো সর্বদা একসাথে থাকতে পারে না। কখনও স্বামী বাইরে থাকে আবার কখনও স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে চলে যায়। অর্থাৎ– দুনিয়াতেও উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ চলতে থাকে। মৃত্যুর সময় এই বিচ্ছেদটাই হয়ে যায়। যত গভীর প্রণয়ই থাকুক আর যত দৃঢ় ভালোবাসার বন্ধনই স্থাপিত হোক মৃত্যু এসে সকল ভালোবাসার বাঁধনকে ছিঁড়ে দেয়। তো দুনিয়ার প্রিয়তম একদিন দূরে সরে যাবে, পৃথক হয়ে যাবে। সর্বদা একসাথে থাকা, একসাথে চলা এটি তো কোনোভাবেই সম্ভব হবে না।

ওলামায়ে কেরাম فَإِنَّكَ مُفَارِقَهُ -এর ব্যাখ্যায় একটি সূক্ষ্ম কথা লিখেছেন। বলেছেন, এখানে অলংকার সাস্ত্রের দারুণ একটি সৌন্দর্য স্থাপিত হয়েছে। এখানে باب مفاعله থেকে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর باب مفاعله এর বিশেষত্ব হলো, দুই পক্ষ থেকেই ব্যাপারগুলো ঘটতে পারে। অর্থাৎ– এখানে বিচ্ছেদটা দুজনের কোনো একজনের পক্ষ থেকেই হতে পারে। কখনও স্বামীর পক্ষ থেকে হতে পারে আবার কখনও স্ত্রীর পক্ষ থেকে হতে পারে। এমনও তো হতে পারে যে, স্বামী স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়েছে অথবা তাদের দুজনের কোনো একজনের মৃত্যু এসে গেছে।

আল্লাহর মহব্বতের শেষ ফলাফল

দেখুন, এই দুনিয়াবি ভালোবাসার, এই পার্থিব প্রণয়ের শেষ ফল অবশ্যই অবশ্যই বিচ্ছেদ। শুধু একজন মাহবুব, একজন প্রিয়তম এমন আছেন, যার সাথে মহব্বত করলে সেই মহব্বতের সমাপ্তি আসবে না কোনোদিন। সেই মহব্বতের বিচ্ছেদ হবে না কোনো কালে। সেই প্রিয়তম দূরে সরে যাবেন না, পৃথক হয়ে যাবেন না কোনো সময়। সর্বদা-ই মানুষের সাথে থাকেন তিনি। দিনেও থাকেন, রাতেও থাকেন। সুস্থতায়ও থাকেন, অসুস্থতায়ও থাকেন। আনন্দেও থাকেন, বেদনায়ও থাকেন। মানুষ যদি

---

১. শু'আবুল ঈমান ১/১০৫৪

পাহাড়ের শিখরেও চলে যায়, জমিনের গভীরেও হারিয়ে যায় কিংবা সমুদ্রের অতলে ডুবে যায়, তবুও সেখানে সেই দূর প্রান্তরেও থাকবেন সেই মহান সত্তা, মহান মাহবুব। তবুও তিনি সঙ্গ দেবেন। তবুও তিনি সাথে থাকবেন। পৃথক হবেন না। কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে–

هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।'[১]

এটি এমন একটি কথা, যার কারণে দিল মজবুর হয়, হৃদয় বাধ্য হয় যে, মানুষ যদি কাউকে ভালোবাসতেই হয়, তাহলে আল্লাহকেই ভালোবাসবে। রব্বে কারীমকেই ভালোবাসবে।

এক পা আগে বাড়ুন

আল্লাহ বান্দাকে মহব্বত করেন। আবার বান্দাও আল্লাহকে মহব্বত করে। বান্দা তার মহব্বতে এক পা এগিয়ে যেতে সক্ষম হতে পারে। তা এভাবে যে, যখন কালেমাপড়া বান্দা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতে শুরু করে, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত ওই বান্দাকে নিজের মাহবুব বানিয়ে নেন। তো বান্দা জমিনে বসে আল্লাহর যিকির করে আর তার বদলায় আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আরশে বসে তার যিকির করতে থাকেন। আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দা!

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ

'তুমি আমার যিকির করো; আমি তোমার যিকির করব।'[২]

আবার যখন এই বান্দা নবীজির পেয়ারা সুন্নতের ওপর আমল করবে, তখনও আল্লাহ তাকে প্রিয় বানিয়ে নেন। আল্লাহ বলেন–

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

'হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার সুন্নতের অনুসরণ করো। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।'[৩]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ৪
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৬
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩২

ইত্তেবায়ে সুন্নতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে প্রিয় বানিয়ে নেন।

যখন একজন বান্দা নিজেকে ইবাদাতের মাঝে মগ্ন করে দেয়, তখনও আল্লাহ তাকে নিজের মাহবুব বানিয়ে নেন। যেমন– ইরশাদ হয়েছে–

يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهُ

'আমার বান্দা নফল ইবাদাত দ্বারা আমার এতটা নৈকট্য পেয়ে যায় যে, আমি তাকে মহব্বত করতে শুরু করি।'[১]

অর্থাৎ– ইবাদাতগুজার বান্দা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যায়। তাই মুমিন বান্দার উচিত উক্ত আমলগুলো দ্বারা আল্লাহর মহব্বত অর্জন করে নেয়া।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবাসেন। কারণ, আল্লাহ তো বান্দার খালেক ও মালিক। পক্ষান্তরে বান্দা হচ্ছে আল্লাহর মাখলুক। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে–

يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ ذَكَرْتَنِيْ ذَكَرْتُكَ وَاِنْ نَسِيْتَنِيْ ذَكَرْتُكَ

'হে বনী আদম! যদি তুমি আমার যিকির কর, তাহলে আমি তোমার যিকির করি আর যদি তুমি আমাকে ভুলে যাও, তবুও আমি তোমার যিকির করি।'

আমি আমার রহমতকে ভাগ করে তোমার ওপর পাঠাতে থাকি।

এক বুযুর্গ বলেন, হে দোস্ত! যদি তুমি খাওয়ার জন্য তেমন কিছু না পাও, তুমি যদি সবজিও খাও, তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। এটা দেখো না যে, তুমি কী খেতে পেয়েছ। বরং তুমি এটা চিন্তা করে শুকরিয়া আদায় করো যে, যখন আল্লাহ রিযিক বণ্টন করেছেন, তখন তোমার কথাও মনে রেখেছেন। কিছু-না-কিছু তিনি তোমার জন্য রেখে দিয়েছেন।

সত্য মহব্বতের দলিল

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন–

صِدْقُ الْمَحَبَّةِ فِيْ ثَلَاثٍ

'মহব্বতের সত্যতা তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল।'

---

১. আল-আহকামুশ কারণয়্যাহ : ৩/৬২০

প্রথম বিষয়

اَنْ يَّخْتَارَ كَلَامَ حَبِيْبِهٖ عَلٰى كَلَامِ غَيْرِهٖ

'অন্যদের কথার ওপর প্রিয়তমের কথাকে প্রাধান্য দেওয়া।'

অর্থাৎ– তার কাছে তখন কুরআন মাজিদের তেলাওয়াতই ভালো লাগবে। দুনিয়াবি কথাবার্তার স্থলে, গল্পগুজব করার স্থলে এবং অহেতুক কথাবার্তার স্থলে তার কাছে কুরআনের তেলাওয়াতে বেশি মজা লাগবে। কুরআনের তেলাওয়াতে সে স্বাদ বেশি পাবে। কারণ, এটি মাহবুবের কালাম। এটি প্রিয়তমের কথা। এমন অবস্থা-ই সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বিদ্যমান ছিল। কুরআন পাঠের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল। কুরআনের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল।

দ্বিতীয় বিষয়

وَيَخْتَارُ مَجَالِسَةَ حَبِيْبِهٖ عَلٰى مَجَالِسَ غَيْرِهٖ

'অন্যের মজলিসের ওপর প্রিয়তমের মজলিসকে প্রাধান্য দেয়।'

আজকের যুগে তো অবস্থাটা এমন হয়ে গেছে যে, বন্ধুদের সাথে গল্পগুজবের জন্য বসা সহজ হয়ে গেছে। অথচ নির্জনে বসে রব্বে কারীমকে ডাকা, রব্বে কারীমকে স্মরণ করা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে গেছে। আমার শিষ্যদের যখনই জিজ্ঞেস করি, ভাই! মোরাকাবা করা হয়েছে তো? তখন তারা উত্তর দেয়, হযরত! সময় পাইনি। সুযোগ হয়নি। এ যুগের মজনুদের অবস্থা দেখুন। লাইলিকে একটু স্মরণ করার সময় আজ তাদের নেই। নবযুগের মজনু এরা। আল্লাহকে ডাকার, আল্লাহকে স্মরণ করার সময় আজ তাদের নেই। বলুন, তাহলে কার স্মরণে এই দিন, এই রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন? উচিত তো ছিল মাওলার স্মরণ, মাওলার যিকির কখনও দিল থেকে দূর হবে না। কখনও হৃদয় তাঁর ভাবনা থেকে খালি হবে না।

তৃতীয় বিষয়

وَيَخْتَارُ رِضَاءَ حَبِيْبِهٖ عَلٰى رِضَاءِ غَيْرِهٖ

'অন্যের সন্তুষ্টির ওপর প্রিয়তমের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।'

অর্থাৎ– প্রিয়তমের হৃদয় খুশী রাখাকে প্রাধান্য দান করে। এই ভালোবাসাটা বিবাহের পর বেশি দেখা যায়।

একটি বিবাহে কতজনের মন রক্ষা করতে হয়? চাচা-চাচির মন রক্ষা করতে হয়, খালা-খালুর মন রক্ষা করতে হয়, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের মন রক্ষা করতে হয়। একটা বিবাহের সময় কতজন অভিমান করে বসে? কতজনের মন রক্ষা করে চলতে হয়? সবার মন রক্ষা করতে একটি বিয়েতে কত কিছুরই না আয়োজন করা হয়। অথচ যে-আল্লাহর সন্তুষ্টি সর্বপ্রথম প্রয়োজন, সুন্নতের খেলাফ কাজ করে সেই আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়া হয়, তাঁকে নারাজ করা হয়, তাঁকে অসন্তুষ্ট করা হয়।

মহব্বতের হাকীকত

যখন মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন বান্দা সব কিছুই নিজের মাহবুবের জন্যে কোরবান করে দেয়। তারপর সে দুনিয়ার দিকে তাকায় না। শুধু মাহবুবে খোদার দিকেই তাকিয়ে থাকে।

তাই তো বলা হয়—

حَقِيْقَةُ الْمَحَبَّةِ اَنْ تَهِبَ كُلَّكَ لِمَنْ اَحْبَبْتَ وَلَا تَبْقِىْ مِنْكَ شَيْئًا

'মহব্বতের হাকীকত হলো, যাকিছু তোমার কাছে আছে তুমি তা তোমার প্রিয়জনকে দান করে দাও। এমনভাবে উজাড় করে তোমার সর্বস্ব তাকে বিলিয়ে দাও যে, তোমার কাছে আর কিছুই বাকি থাকবে না।'

নিজের ভালোবাসা, নিজের প্রেম, নিজের চাওয়া-পাওয়া, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা সব আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের জন্যই হওয়া উচিত।

এলাহিপ্রেমের ছয় বিষয়

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেছেন, যদি মানুষ দেখতে চায়, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি কতটুকু ভালোবাসা আছে, তাহলে যেন সে ছয়টি বিষয় নিরীক্ষা করে দেখে।

১. মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ : যার মহব্বত আল্লাহর সাথে হবে, তার কাছে মৃত্যু প্রিয় হবে। মৃত্যুশঙ্কাহীন হবে সেই ব্যক্তি। ভাই! যদি আমি সংবাদ পাই, আল্লাহ আমার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট আছেন, তাহলে এই মুহূর্তে আমি এ-জায়গায় বসা অবস্থায়ই মৃত্যুর জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। কারণ, আমার জীবনের আরাধ্যই তো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এখন তা যদি আমার অর্জিত হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কোনো কথা-ই নেই।

নবীজি বলেছেন–

اَلْمَوْتُ جِسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبَ اِلَى الْحَبِيْبِ

'মৃত্যু একটা সেতু। আর এই সেতু এক বন্ধুকে আরেক বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দেয়।'

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট মালাকুল মাওত ফেরেশতা আগমন করলেন। বললেন, হযরত! আল্লাহ আপনাকে স্মরণ করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) উত্তর দিলেন–

هَلْ رَاَيْتَ خَلِيْلاً يَقْبِضُ رُوْحَ خَلِيْلِهٖ

'তুমি কি দেখেছ কোনো বন্ধু তার বন্ধুর রূহ কব্জ করে?'

মালাকুল মাওত ফিরে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতকে ইবরাহীম (আ.)-এর একথা বলে দিলেন। আল্লাহ পয়গাম পাঠালেন, তুমি গিয়ে আমার খলীলকে বলো–

هَلْ رَاَيْتَ خَلِيْلاً يَكْرَهُ لِقَاءَ خَلِيْلِهٖ

'তুমি কি কোনো বন্ধুকে দেখেছ যে, সে তার বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়াকে অপছন্দ করে?'

হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝে গেলেন, রূহ কব্জ হওয়াটাই প্রিয়তম রব্বে কারীমের সাথে মোলাকাতের মাধ্যম। তাই সাথে-সাথে তিনি বলে দিলেন, আরে! দ্রুত করো। দ্রুত করো। আমার রূহটা দ্রুত আমার রবের কাছে নিয়ে চলো।

২. অন্য সব কিছু থেকে দিল বিমুখ হয়ে যাবে : অন্তর অন্য সব জিনিস থেকে বিমুখ হয়ে যাবে। দুনিয়া থেকে যতক্ষণ দিল বিচ্ছিন্ন হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার স্বাদ পাবে না। যদি কেউ এই আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমি আল্লাহর মহব্বতও চাই আবার দুনিয়া ও চাই, তাহেল তার এই আশা হবে দিবা স্বপ্ন। এটা অসম্ভব। ইরশাদ হচ্ছে–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ

'আল্লাহ কোনো বান্দার বুকে দুটি হৃৎপিণ্ড স্থাপন করেননি।'[১]

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪

কাউকে দুটা কলব দান করেননি যে, একটা দিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসবে আর অপরটা দিয়ে নফস, শয়তান ও দুনিয়াকে ভালোবাসবে।

৩. সর্বদা যিকরে ইলাহীতে লিপ্ত থাকার তাওফীক নসিব হবে : এমন বান্দা সর্বদাই আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকার তাওফীক প্রাপ্ত হবে। শুয়ে-বসে, চলাফেরায় সর্বদা-ই সে যিকিরে মগ্ন থাকবে, আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকবে। তাঁর জবানে মাহবুবের কথা-ই চলমান থাকবে। রহমানের কথাই শুধু তার ভালো লাগবে। এই কথাটা-ই কুরআন মজীদে এভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে,

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'তারা এমন বান্দা, যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোওয়া তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতে থাকে। তাঁরা আমার জ্ঞানী-গুণী বান্দা।'[১]

৪. আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি মহব্বত হবে : 'শাআইরিল্লাহ' তথা আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি তার গভীর প্রণয় সৃষ্টি হবে। আল্লাহর নিদর্শনাবলি তো তা-ই যা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সাথে বান্দার সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। এমন একটা সেতু নির্মাণ করে দেয়, যার মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।

কালামুল্লাহ তথা কুরআন আল্লাহর নিদর্শন বা শাআইরুল্লাহ।

বাইতুল্লাহও শাআইরুল্লাহ।

রাসূলুল্লাহও শাআইরুল্লাহ।

আউলিয়াউল্লাহও শাআইরুল্লাহ।

বরং বলে দেওয়া ভালো যে, যেখানে আল্লাহর খাঁটি আউলিয়া কেরামের কদম পড়ে, সেই স্থানটাও শাআইরুল্লাহ হয়ে যায়। এরই সাক্ষ্য কুরআনে আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন—

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

'নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলির মাধ্য থেকে অন্যতম একটি নিদর্শন। এগুলোও শাআইরুল্লাহ।'[২]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯১
২. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৮

আর একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে মহব্বত বেড়ে যায়, তখন তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখে যেসব জিনিস, সেগুলোর সাথেও মহব্বতের মাত্রা বেড়ে যায়। তখনই হৃদয়ে বাইতুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, কালামুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, রাসূলুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এই মহব্বত এর দলিল যে, আল্লাহর প্রতি তার মহব্বত আছে। আমি আপনাদের গ্রামাঞ্চলের মহব্বতের একটি ঘটনা শোনাচ্ছি।

একজন মাওলানা সাহেব পড়াশোনা শেষ করে গ্রামে এসেছেন। মাওলানা সাহেবের হাদীছ ইয়াদ ছিল ভালোই। বয়ানের মধ্যে অনবরত বলে যেতেন নবীজির হাদীছ। গ্রামে একজন সহজসরল মানুষ ছিলেন। লোকটি তো আরবি জানত না। কিন্তু প্রতিদিনই বয়ানে قال رسول الله শোনে। কিন্তু এর অর্থ তার জানা নেই। কিছুদিন তো ধৈর্যের সাথে থাকল। লোকটি قال رسول الله এর অর্থ মনে করত কালা (রং) রাসূল। বারবার ওই আলেমের মুখে কালা রাসূল, কালা রাসূল শুনে তার মনে রাগ ধরে গেল। একদিন মাওলানার জামার কলার ধরে বলল, ওই মৌলভী সাহেব, আপনি কালো, আপনার বংশ কালো। আমার রাসূল কালা না– তিনি সুন্দর, আমার রাসূল সুশ্রী।

তো লোকটি রাসূলের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার কারণেই এমনটা করেছে। সে যদিও না বুঝে একাজ করেছে; কিন্তু এর দ্বারা নবীজির প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের শিরায় নবীজির প্রতি এমন ভালোবাসা-ই মিশে গেছে।

৫. গভীর রাতে দু'আ করার প্রতি আকুল হয়ে যায় : দু'আর প্রতি মানুষটির আকুলতা বেড়ে যায়। সে রাতের গভীরে উঠে আল্লাহর সামনে দু'আ-মুনাজাত করতে ব্যাকুল হয়ে যায়। হযরত দাউদ তাঈ (রহ.) বলেছেন, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলা এলহাম প্রেরণ করেছেন যে, হে দাউদ! ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে আমার মহব্বতের দাবি করে অথচ রাত নেমে এলে সে শুয়ে পড়ে। প্রেমিক কি তার প্রেমাস্পদের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করতে চায় না? অর্থাৎ– যদি কোনো ব্যক্তি আমার মহব্বতের দাবি করে, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, সে রাতের শেষ প্রহরে, মধ্য প্রহরে ঘুম হতে উঠে যাবে। নিজের প্রিয়তম রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাবে, রোনাজারি করবে। আল্লাহর সাথে গভীর প্রেমালাপ করবে। এতে ইবাদাতের প্রতি তার হৃদয় আকৃষ্ট হবে। তার জন্য রবের ইবাদত করা সহজ হয়ে যাবে। আরে ভাই! দুনিয়ায় যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসে, তাহলে তারা

উভয়ে নির্জনে মিলতে চায়। যদি বলা হয়, কিছুক্ষণ তোমরা একসাথে থাকো, তাহলে তারা আরও খুশি হয়। একে মুসিবত মনেই করে না। বরং দীর্ঘ সময় প্রেমালাপ করেও বলবে, আহা! সময়টা কোন ফাঁক দিয়ে চলে গেল। আরও কিছু সময় প্রিয়তমের সাথে আলাপচারিতায় মগ্ন থাকতে চায়। এমনটাই মুমিন ও আল্লাহর মাঝে হয়ে থাকে। যখন মুমিন বান্দা মাসজিদে অবস্থান করে, তখন বড় শান্তভাবে ইবাদাত করে। শান্তি পায় সে মসজিদে।

اَلْمُؤْمِنُ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ

'মুমিন মসজিদে তেমন শান্তি পায়, মাছ পানিতে যেমন শান্তি পায়।'[১]

৬. ঈমানদারদের ভালোবাসা : আল্লাহর সাথে যার ভালোবাসা তৈরি হবে, ঈমানদারদের প্রতিও তার ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে স্বভাবগতভাবে। মুমিন বান্দার প্রতি তৈরি হবে তার প্রাণের টান। দেখুন, বাবা-মায়ের প্রতি মানুষের মহব্বত থাকে। সে-কারণে ভাই-বোনের প্রতিও তাদের প্রেম-ভালোবাসা জন্ম নেয়। তেমনি করে যখন আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা জন্ম নেবে, তখন আল্লাহর বান্দাদের প্রতিও তার অগাধ ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে এমনিতেই। তখন তার কাছে ঈমানদারদের ভালো লাগবে। ঈমানদারের প্রতি তার হৃদয়ের আকর্ষণ বিদ্যমান থাকবে।

তিনটি আশ্চর্য কথা

কুরআনে তিনটি বড় আশ্চর্যজনক কথা আছে। একটি কথার আলোচনা এভাবে এসেছে—

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ

'আল্লাহ তাদের মহব্বত করেন এবং তারাও আল্লাহকে মহব্বত করে।'[২]

আরেকটি আয়াত নাযিল হয়েছে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে। ইরশাদ হচ্ছে—

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।'[৩]

---

১. কাশফুল খাফা : হাদীছ নং ২৬৭৯
২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪
৩. সূরা বায়্যিনা : আয়াত ৮

তো সর্বত্র মহব্বতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আর এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় আরেক স্থানে ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا

'আল্লাহ তাদের অভিমুখী হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে।'[১]

কুরআন পাকের এই তিনটি কথা যখন পাঠ করি, তখন বড় বিস্মিত হয়ে যাই। বুঝতে পারি, আল্লাহ বাস্তবেই চান যে, তার বান্দা তাকে ভালোবাসুক। মহব্বতের সম্পর্ক গড়ে তুলুক।

আল্লাহর সাথে মহব্বত কেমন হবে

আল্লাহর সাথে বান্দার মহব্বত কেমন হবে? মায়ের সাথে বাচ্চার যেমন হয়, তেমন। যদি ছোট একটা বাচ্চাকে সামান্য সময়ের জন্যও পৃথক করে দেওয়া হয়, তখন বাচ্চাটা অস্থির হয়ে যায়, কান্না কাটি করে। যত বড় শিক্ষিত নারী-ই যদি তাকে কোলে তুলে নিক, যত সুন্দরী রমণী-ই তাকে কোলে তুলে নিক, তাতে কিছুতেই তার কান্না থামে না। কারণ, মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা আছে। মা বাচ্চার কারণে আরাম করেন না। বড় অস্থির থাকেন। কান্নাকাটি করেন। মা যত ব্যস্ত ও মশগুলই থাকুন-না কেন, বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে সব কিছু ছেড়ে চলে আসেন। বাচ্চাটাকে বুকে টেনে নেন।

তো শিশুদের মা ছাড়া স্থিরতা আসে না। এমনিভাবে আমাদেরও রব ছাড়া স্থিরতা আসা উচিত ছিল। আমাদের মহব্বত যেন মায়ের প্রতি বাচ্চার মহব্বতের মতো হয়ে যায়। শিশু বাচ্চা মায়ের পাগল আর মুমিন বান্দা আল্লাহর পাগল হওয়া দরকার। যেমনিভাবে মাছ পানিতে গেলেই শান্তি পায়, তেমনিভাবে মুমিনও আল্লাহর স্মরণে, আল্লাহর যিকিরে, আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হলেই শান্তি পাওয়া উচিত। মুমিন মসজিদে এলেই শান্তি অনুভব করা চাই।

স্মরণ রাখবেন, যদি হৃদয়ে আপন রব্বে কারীমের মহব্বত পৌঁছাতে হয়, তাহলে মুছল্লার সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে। যদি মুছল্লায় আসার সুযোগই না

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৮

হয়, যদি এমন হয় আপনার অবস্থা যে, শুধু নামাযটা কোনোমতে পড়ে দৌড় দেন আপনি, কিছুক্ষণ যিকির অজিফা আদায় না করেন, তাহলে বুঝতে হবে, আল্লাহর সাথে আপনার মহব্বত নেই।

তো আল্লাহর প্রতি যারই মহব্বত হবে, সে-ই মুছল্লায় কাটাবে তার সময়। মুছল্লায় বসতে পারলে তার কাছে ভালো লাগবে। মুছল্লায় এলে সে শান্তি পাবে।

এসে গেছে সেই যামানা

আজ এমন যামানা এসে গেছে যে, আসল খালিক ও মালিক রব্বে কারীমকে ছেড়ে আমরা দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলছি। কারণ, আমরা আজ কঠিন ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার। দুনিয়া আজ আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

سَيَأْتِيْ زَمَانٌ عَلٰى اُمَّتِيْ يُحِبُّوْنَ خَمْسًا وَيَنْسَوْنَ خَمْسًا

'অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন একটা সময় আসবে, যখন তারা পাঁচটা জিনিসকে ভালোবাসবে আর পাঁচটা জিনিস ভুলে যাবে।'

يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا وَيَنْسَوْنَ الْاٰخِرَةَ

'তারা দুনিয়াকে ভালোবাসবে আর আখেরাতকে ভুলে যাবে।'

يُحِبُّوْنَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ

সম্পদকে ভালোবাসবে আর হিসাবের কথা ভুলে যাবে।'

يُحِبُّوْنَ الذُّنُوْبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ

'গুনাহকে ভালোবাসবে আর তাওবা ভুলে যাবে।'

يُحِبُّوْنَ الْقُصُوْرَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُوْرَ

'তারা প্রাসাদ-বাড়িকে মহব্বত করবে আর কবরকে ভুলে যাবে।'

আজকের একটা বাস্তব সত্য বিষয় হলো, আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। এমন মানুষও এখন আর নেই, যে ভোর-ভোর দ্রুত মসজিদে আসবে, আযানের 'আল্লাহু আকবার' শব্দ শুনে দুনিয়ার কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদের পথে রওনা হবে। যাদের মনে

আল্লাহর মহব্বত থাকবে, তারা তো সর্বদাই আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকবে আর আল্লাহর সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজতে থাকবে।

تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یار دان کی دلنشیں ہوتی

'বাসনা হলো, এমন কোনো স্থান যদি হতো, যেখানে নির্জনে বসে শুধু তার ভাবনায়ই হৃদয়ে ধারণ করে রাখা যেত। তাঁর ভাবনায়ই মশগুল হওয়া যেত।'

কবি কত বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন!

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھے رہیں تصور جاناں کیے ہوئے

'রাত-দিন অন্তর খুঁজে ফিরে এমন সুযোগ যে, আমি বসে থাকব তার ভাবনায়, তার স্মরণে।'

তো মানুষটি তখন আল্লাহর মহব্বতের স্বাদ ও মজা পাবে। আর এই মহব্বতই মানুষের আমলে রূহ পয়দা করে, মানুষের ইবাদাতকে প্রাণবন্ত করে।

হযরত থানবি (রহ.) এক আশ্চর্য তথ্য প্রদান করেছেন

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) বলেছেন, শয়তান আল্লাহর প্রতি এই মহব্বত ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারেনি বলেই বিতাড়িত হয়েছে। তার কাছে তো ইল্‌ম ছিল, আমল ছিল, ইবাদাত ছিল। তারপরও সে মরদূদ হয়েছে। কারণ, তাঁর মাঝে আল্লাহর প্রেম ছিল না। ভালোবাসা ছিল না, মহব্বত ছিল না। হযরত বলেছেন, চারটি শব্দ আছে, যার শুরু ع(আইন) দ্বারা–

১. علم ـ ع বর্ণে শুরু
২. عمل ـ ع বর্ণে শুরু
৩. عارف ـ ع বর্ণে শুরু
৪. عاشق ـ ع বর্ণে শুরু

তো চারটি শব্দ এখানে ع দিয়ে শুরু হয়েছে। আর বিতাড়িত শয়তানের কাছে প্রথম তিনটি ছিল; কিন্তু শেষটি ছিল না। চতুর্থ শব্দটি হলো عاشق। এটি শয়তানের কাছে ছিল না। তো তিনটি থাকা সত্ত্বেও একটি না থাকার কারণে শয়তান বিতাড়িত হয়ে গেছে।

কবি বলেন–

نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی
اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی
پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل
عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی
عشق فرمودہ قاصد سے سبک کام عمل
عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی

'উন্মাদ বুলবুল! তোমার বিলাপ এখনো!
একে স্বীয় বুকে আরেকটু চেপে রাখো।
বিবেক পরিপক্ব হয় যখন সে পরিস্থিতির উপযুক্ততা বোঝে।
অবশ্য পরিস্থিতির উপযুক্ততা বোঝে এমন এশক এখনো অপরিপক্বই।
এশক হলো প্রেমিকের পক্ষ থেকে উন্মাদনার প্রকাশ।
বিবেক তো এখনো প্রেমবার্তার মর্মই বোঝেনি!
এশক নির্ভীক হয়ে নমরুদের অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়েছে
আর বিবেক এখনো নির্বাক তামাশা দেখছে!'

ভালোবাসার পরীক্ষা

যে আল্লাহর সাথে ভালোবাসা ও মহব্বতের দাবি করবে এবং পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা এসে যায় আর লোকটি আল্লাহর শেকায়েত করে বেড়ায়, আল্লাহ তো আমার কথা শোনেন না। আমার দু'আ

কবুল করেন না। আমি তো এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না। তো এমন করলে বুঝতে হবে, সে যে আল্লাহর মহব্বতের দাবি করেছে, তা মিথ্যা।

একজন বুযুর্গ ছিলেন। তার কাছে কিছু মানুষ জমা হলো। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছ তোমরা? জবাব দিল, হযরত! আমরা আপনাকে মহব্বত করি। বুযুর্গ একথা শুনে হাতে পাথর তুলে নিলেন এবং সকলকে মারতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে সকলে পলায়ন করল। এবার বুযুর্গ পেছন থেকে চিৎকার করে বলে দিলেন—

لَوْ كُنْتُمْ اَحِبَّاءِىْ مَا فَرَدْتُمْ عَلٰى بَلَاءِىْ

'যদি তোমরা আমাকে মহব্বতকারী হতে, তাহলে আমার পরীক্ষা দেখে পালাতে না।'

তো এমনিভাবে যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পরীক্ষা চলে আসে, তাহলে বান্দার উচিত সবর ও ধৈর্যধারণ করা। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহর ঘরের দরজা-ই ভুলে গেলে।

ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী

দারুণ সূক্ষ্ম একটি কথা শুনে নিন। যেব্যক্তি নবীজির প্রতি মহব্বতের দাবি করবে এবং ওলামায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত না রাখবে, তাহলে বুঝতে হবে, লোকটি মিথ্যা কথা বলছে। প্রেমে মিথ্যাবাদী সে। আমাদের হযরত মুরশিদে আলম (রহ.) ওলামায়ে কেরামের এত ইকরাম, এহতেরাম ও মহব্বত করতেন যে, তিনি বলতেন, যদি কোনো আলেম আমার বুকে পা দ্বারা চাপ দিয়ে পার হয়ে যায়, তাহলেও আমি সামান্যও কষ্ট পাব না।

যেব্যক্তি জান্নাত ভালোবাসে বলে দাবি করবে আর ইবাদাত না করবে, তাহলেও বোঝা যাবে, লোকটি তার দাবিতে মিথ্যাবাদী। এমনটা কী করে হতে পারে যে, বান্দার দিলে জান্নাতের প্রতি আকর্ষণ আছে আর বান্দা জান্নাতের সামানা সংগ্রহ করছে না, তাহলে তো সে জান্নাতে যাওয়ার যে-দাবি করছে তা অসার। তার জন্য জান্নাতে যাওয়া অলীক স্বপ্ন। মাশয়েখে কেরাম বলেছেন—

صِدْقُ الْمَحَبَّةِ عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَةِ الْمَحْبُوْبِ

'মহব্বতের সত্যতার আলামত হলো প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে কাজ করা।'

কিছু কিতাবে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর নাম লেখা আর কিছু কিতাবে অন্য আরেকজনের না লেখা, তিনি বলেছেন–

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهُ

اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيْعُهُ

'তোমার প্রেমের দাবি যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তার অনুগত হয়ে যাবে। মানুষ যাকে ভালোবাসে, তার অনুগত হয়ে চলা-ই নিয়ম।'

আসল ও নকল চেনার উপায়

স্মরণ রাখুন, যে ভালোবাসা শুধু মুখের কথা, সেটা অসার, মিথ্য ও মূল্যহীন। আসল ভালোবাসা তো অন্তর থেকে আসবে। প্রকৃত ভালোবাসা যার হৃদয়ে আছে, আল্লাহর প্রতি যার বাস্তবেই প্রেম আছে, তাকে যদি বলা হয়, আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে দাও, তাহলে সে সাথে-সাথে রাজি হয়ে যায়।

وَلَوْ قِيْلَ لِيْ مُتْ مُتُّ سَمْعًا وَطَاعًا

وَقُلْتُ لِدَاعِي الْمَوْتِ اَهْلاً وَمَرْحَبًا

'যদি প্রিয়তম বলে, তুমি মরে যাও, তাহলে আমি তার আনুগত্যে মৃত্যুর জন্য তৈরী। তার এই মৃত্যুর ডাককে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।'

جان دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کی حق ادا نہ ہوا

' যে-জীবন আমি বিলিয়েছি, এতো তাঁরই দেওয়া জীবন। তাই সত্য কথা হলো, কোনো হকই আদায় হলো না।'

তো জীবন দিয়েও সে বুঝল, হক আদায় করা হলো না। মাওলানা রুমী বলেছেন, যেমনিভাবে আগুনের শিখা জ্বলে-জ্বলে ওঠে, তেমনিভাবে ইশক-মহব্বতও গুমগুম করে বারবার জেগে ওঠে। অথৈ সাগরের মতো জোশ ও জোয়ার শুরু হয়ে যায়।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার পুরস্কার

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত দাউদ (আ.)কে ওহী নাযিল করেন, হে দাউদ! জমিনওয়ালাদের বলে দিন, যেব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, আমি তার প্রিয় হয়ে যাই। যে আমার কাছে বসে, আমি তার বসার সঙ্গী হয়ে যাই। যে আমার যিকির করে, আমার সাথে সম্পর্ক গড়ে, আমি তার সাথে সম্পর্ক করে নেই। যে আমার সাথে থাকবে, আমি তার সাথে থাকব। যে আমাকে গ্রহণ করে নেবে, আমি তাকে গ্রহণ করে নেব।

আমরা যখন আল্লাহর হুকুম মানতে শুরু করব, তখন এটা কেমন করে হতে পারে যে, আমাদের পরোয়ারদেগার আল্লাহ আমাদের দু'আ কবুল করা শুর করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে তার ভালোবাসার মূল্য পূর্ণভাবেই দান করেন।

একটি প্রশ্ন ও তার অপনোদন

দুনিয়ার মানুষ আজ বলে বেড়ায়, ইবাদাতকারীরা ইবাদত করে নগদ-নগদ আর তার বিনিময় প্রাপ্ত হয় বাকিতে। ইবাদত করে এখন আর জান্নাত পাবে কোটি বছর পর। পাবে আখেরাতে। আরে ভাই, এটি একটি ভ্রান্তি। এমন প্রশ্ন তোলাও ভ্রান্তি। ভালো করে শুনে নিন। এক বুযুর্গ বলেছেন, বান্দা নগদ-নগদ ইবাদত করে আল্লাহ থেকে বিনিময়টা বাকি ফেলে রাখবে এটা আল্লাহর শানের সাথে অসমঞ্জস। ইবাদত করবে নগদ আর বিনিময় পাবে বাকিতে; আখেরাতে এ কী করে হতে পারে? কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, আল্লাহ একজন মানুষকে তাঁর আনুগত্যের জন্যে যে-বিনিময় প্রদান করতে চান, তা দুনিয়ায় পাওয়া-ই সম্ভব নয়। না মানে, না পরিমাণে।

কারণ, আল্লাহ তো বিনিময় দেবেন তাঁর মতো শানদার কোনো জিনিস। আর সে-রকম শানদার জিনিস তো দুনিয়ায় নেই। কারণ, জান্নাতের খাবারদাবার, জান্নাতের পোশাকপরিচ্ছদ, জান্নাতের ফলমূল আর জান্নাতের পরিবেশ এমন হবে, যার কল্পনাও করা যায় না দুনিয়ায়। জান্নাতের ব্যাপার তো এমন যে, জান্নাতিরা তাদের পোশাক মেলে দিলে তার আলোকরশ্মি সূর্যকেও হার মানাবে। আর থুতু ফেললে পানি সুমিষ্ট হয়ে যাবে। কোনো মৃত মানুষের সাথে কথা বললে সে জীবিত হয়ে যাবে। তো চিন্তা করুন, এসব দুনিয়ায় কী করে পাওয়া যাবে? দুনিয়াতেই এই নেয়ামত দিলে তো দুনিয়াটা আর পরীক্ষাকেন্দ্র থাকল না। দুনিয়াটা আর দুনিয়া থাকল না। যে আখেরাতে

সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাত প্রাপ্ত হবে, তার জান্নাতটা-ই হবে এই সমগ্র দুনিয়ার দশ গুণ বড়। তাহলে চিন্তা করুন, এই বিনিময়, এই নেয়ামত দুনিয়ায় পাওয়া যাবে কেমন করে? আল্লাহ তো বিনিময় দেবেন তাঁর শান মোতাবেক। তবে তা পাওয়ার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি তো থাকতে হবে। তাই এটা সম্ভব নয় যে, পুরো আমলের বিনিময় দুনিয়াতেই নগদ-নগদ দেওয়া হবে। আর যে আমল ও ইবাদাতের বিনিময় পাওয়ার উপযুক্ত বান্দা হয়, সেই বিনিময় এই দুনিয়ায় গ্রহণ করার যোগ্যতা বান্দার নেই। তাই মূল বিনিময়টা দেওয়া হবে আখেরাতে। আর প্রত্যেক দাতা তো তার শান মোতাবেকই দিয়ে থাকেন। আমি ও আপনি যদি কাউকে কিছু দান করি, তাহলে কিছু তো তাকে দেই আবার কিছু নিজেরা উসুল করে নেই ওই গ্রহীতা থেকেই। আবার যদি কোনো বাদশাহর কাছে কেউ কিছু চায়, তাহলে বাদশাহ তার কর্মচারীকে বলবেন, এই সম্পদটা ওর ঘরে পৌঁছে দেবে। এটি তার শান।

আর আল্লাহ তা'আলার শান কী? হ্যাঁ; আল্লাহর শান হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর সমগ্র দান কেয়ামতের দিন দেবেন। আর কেয়ামতের দিন এমন দেবেন, যার কল্পনাও কোনো মানুষ করতে পারবে না। আর যদি মেনে নেওয়াও হয় যে, ঠিক আছে; আল্লাহ তাঁর সমগ্র দান ও আমলের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দিন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা দেবেন। কিন্তু দুনিয়াটা তো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অথচ আল্লাহ বলছেন, আমি চিরস্থায়ী; আমি সর্বদা থাকব। আমি মানবকে পুরস্কারটাও এমন দেব, যা সর্বদা থাকবে। আমার দেওয়া বিনিময় ও পুরস্কার এমনই হবে, যা চিরস্থায়ী হবে। তাই তো আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে দান করার ওয়াদা করেছেন। বলছেন, হে বান্দা! তুমি ওই নশ্বর দুনিয়া থেকে বেরিয়ে এসো। দুনিয়ায় আমার কী দান তা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ। আখেরাতে তো আমার দান দেখে তুমি বিস্ময়ে অভিভূত হবে। এখানে যা আছে, তার কল্পনাও তুমি কোনোদিন করতে পারবে না। এখানকার নেয়ামত দেখতে হলে নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আসতে হবে তোমাকে। এখানে এসেই দেখো না তোমাকে আমি কী নেয়ামত দান করি।

ইবাদাতের নগত পুরস্কার

কেয়ামতের ওয়াদার কথা তো গেল। নগদ দানের কথা তো রয়ে গেল। শুনুন, আল্লাহ তা'আলা ইবাদাতের নগদ কিছু বিনিময়ও দান করেন। ইবাদাতের কারণে আপনি কি জান্নাতের নেয়ামতই পাবেন? অন্য একটা

বিনিময়ও তো আপনি পাবেন। এই প্রাপ্তিকেই আল্লাহর প্রেম, ভালোবাসা ও নৈকট্য বলে। এই দুনিয়ায় মহব্বতটা কি নগদ পাচ্ছেন না? নগদই তো পাচ্ছেন। এর দ্বারা জানা যায়, যে-বান্দা আল্লাহর বন্দেগি করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে নিজের প্রেম-ভালোবাসা দেবেন, মহব্বত দেবেন। এটি তো তার মহা নেয়ামত।

আল্লাহর পর্যবেক্ষণ

যে-বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসে, আল্লাহ তার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি তাঁর পর্যাবেক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান।

ইরশাদ হচ্ছে—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

'আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক।'[১]

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

'তিনি কত চমৎকার মাওলা। কত চমৎকার সাহায্যকারী।'[২]

তো আল্লাহ তার জন্য তখন উকিল হয়ে যান, সাহায্যকারী হয়ে যান। আল্লাহই তখন তার সব কিছুর নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণ করেন।

চমৎকার একটি কথা

দারুণ চমৎকার একটি কথা শুনুন। ছাত্রদের জন্য বড় চমৎকার ও মজার কথা। আর প্রেমভিখারী ভাইদের জন্য এক সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন—

مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ

'তোমাদের মধ্যে থেকে যে তার দীন থেকে বিমুখ হয়ে গেল, অচিরেই আল্লাহ এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটাবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে।'[৩]

সেই মুগ্ধকর কথাটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন, যারা আপন দীন থেকে বিমুখ হয়ে গেল, মুরতাদ হয়ে গেল, দীন ছেড়ে দিল, তাতে

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
২. সূরা আনফাল : আয়াত ৪০
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৫৪

আল্লাহর কী এল আর গেল! অচিরেই তিনি এমন একটি জাতি তৈরি করবেন, যাদের তিনি নিজে ভালোবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।

তো আল্লাহর সাথে যে-জাতির ভালোবাসা থাকবে, তারা হবে ওই দীনহীন মুরতাদ লোকদের বিপরীত দল। কারণ, নিয়ম হলো, একটি জিনিসের বিপক্ষে তার বিপরীত জিনিসের আলোচনা-ই উপস্থাপন করা হয়। তারা পরস্পর বৈপরীত্য করতে পারে এমন হয়ে থাকে।

তো দেখুন, একদল যখন মুরতাদ হলো, তার বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি দল সৃষ্টির ঘোষণা দিলেন, যারা তাকে ভালোবাসবে আর যাদের তিনি ভালোবাসবেন। অর্থাৎ– তারা হবে আহলে মহব্বত– প্রেমপ্রিয় মানুষ। রবের প্রেমে দেওয়না মানুষ। এর দ্বারা একথাটা স্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, আহলে মহব্বত তথা আল্লাহতে যাদের প্রেম ও ভক্তি আছে, তারা কখনও দীনহীন হয়ে যাবে না। তারা কোনোদিন মুরতাদ হয়ে যাবে না। তারা কোনোদিন দীন থেকে বঞ্চিত হবে না। যদি এরা এমন না হতো, যদি মুরতাদ হয়ে যাওয়াদের দশা এদেরও হয়ে যায়, তাহলে আর এদের সৃজনের মাহাত্ম্য কী দাঁড়াবে? তো যেব্যক্তি আহলে মহব্বত হয়ে দুনিয়ায় কালাতিপাত করবে, জীবন কাটাবে, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক তৈরির কত বড় পুরস্কার এটি। সুবহানাল্লাহ! কুরআন থেকেই এর সমর্থনে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তাদের ঈমান সুরক্ষিত থাকবে। তাই তো আল্লাহও তাদের মহব্বতপ্রত্যাশী, আল্লাহ নিজেও তাদের মহব্বতকারী।

ভালোবাসার ঝরনাধারা

বিখ্যাত তাফসীরকারক আল্লামা আলূসি (রহ.) বলেছেন–

قَدَّمَ اللهُ تَعَالٰى مَحَبَّتَهٗ عَلٰى مَحَبَّةِ عِبَادِهٖ

'আল্লাহ নিজের ভালোবাসাকে বান্দার ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দান করেন।'

কারণ কী? কারণ হলো–

اِنَّهُمْ يُحِبُّوْنَ رَبَّهُمْ بِفَيْضَانِ مَحَبَّةِ رَبِّهِمْ

'তারা তাদের রবকে মহব্বত করে তিনি মহব্বতের যে-ঝরনাধারা দান করেছেন তার কারণে।'

তো, আমরা আল্লাহকে এ-কারণে মহব্বত করি যে, তিনি আমাদের মহব্বত করেন। কেমন যেন এই মহব্বতই আল্লাহ তা'আলার দলিল।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ

'যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন।'

আবার তার বিপরীতে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ

'যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন।'[১]

আহলে মহব্বতের সংস্রব গ্রহণের নির্দেশ

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

سَائِلُوا الْعُلَمَاءَ وَجَالِسُوا الْكُبَرَاءَ وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ

'ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করো, বড়দের মজলিসে উঠাবসা করো আর গুণীদের সংস্রব গ্রহণ করো।'[২]

তাঁরা-ই তো আহলে মহব্বত। তাঁদের সাথে খুব আন্তরিকভাবে সম্পর্ক বজায় রেখে জীবন পরিচালনা করবে যেন তাদের মহব্বতের দান তোমারও নসিব হয়ে যায়। এক খরবুজা আরেক খরবুজার রং দেখে রঙিন হয়। এক খরবুজা আরেক খরবুজার রং গ্রহণ করে। চুম্বকের সাথে থাকতে-থাকতে লোহাও চুম্বক হয়ে যায়। তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত ও সংস্রবে থেকে সালেক আল্লাহর মহব্বত পেয়ে যায়। তার প্রতি আল্লাহ রাজি হয়ে যান, পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসেন।

আল্লাহকে নারাজ করার ক্ষতি

সাইয়েদা আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেছেন, যে-বান্দা এটি চায় যে, আমি মাখলূককে রাজি করে নেব; আল্লাহ নারাজ ও অসন্তুষ্ট হন তাতে আমার

---

১. দারেমি : হাদীছ নং ২৮৫৬
২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : হাদীছ নং ২৬১০২

কিছু যায় আসে না। এমন বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মাখলুককেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট বানিয়ে দেন। বাস্তবেই আপনি দেখবেন যে, বিয়েশাদির সুযোগে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গিয়ে অন্য সব লোকদের খুশি করার পেছনে ছোটে। শেষে পরিণামটা এই দাঁড়ায় যে, যাদের রাজি করার জন্য এত দিনের সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ঢেলে দেওয়া হলো, তারাই এখন তার ওপর বড় নাখোশ, বড় অসন্তুষ্ট।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রতিদান

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে বান্দার কোনো পরোয়া করে না, সকল মাখলুক মিলে যত বিরোধিতা-ই করুক-না কেন, একটা সময় এমন আসবে, যখন আল্লাহ সকল বিরোধীকেও পক্ষে এনে দেন। শত্রুকেও বন্ধু বানিয়ে দেন। কারণ, দিল তো আল্লাহর কুদরতি হাতে। তাই আমাদের উচিত আমরা আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকব। অধিকহারে তাঁর যিকির করব, শুয়ে-বসে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ইরশাদ করেছেন, আমি একবার নবীজির সাথে এক ছাওয়ারিতে আরোহী ছিলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

يَا غُلَامُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ

'হে ছেলে! তুমি আল্লাহর ধ্যানে থাকো; আল্লাহও তোমার ধ্যানে থাকবেন। তুমি আল্লাহর অভিমুখী থাকো। আল্লাহও তোমার অভিমুখী থাকবেন।'[১]

তাই খোশ হালতের সময় আল্লাহর সাথে আত্মার বাঁধন গড়ে তুলবেন। আল্লাহ তা'আলা বদ হালতের সময় আপনার সাথে বাঁধন তৈরি করে রাখবেন। কোনো কিছু চাইতে হলে আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। সাহায্য চাইলেও আল্লাহর কাছেই চাইবে। তাহলেই আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুত সাহায্য আপনার-আমার ওপর বর্ষিত হবে।

মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গ

মনে করুন, কেয়ামতের দিন। এখনও মাখলূকের হিসাব-কিতাব শুরু হয়নি। তখন একটি ঘোষণা প্রদান করা হবে। বলা হবে, মর্যাদাবান লোকেরা

---

১. শু'আবুল ঈমান : হাদীছ নং ১৯৫

কোথায়? তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে যাবে। তাদের বলা হবে, তোমরা জান্নাতে চলে যাও। তোমাদের হিসাব নেই। লোকেরা ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবে, এই যে মর্যাদাবান লোকগুলো– এরা কারা? ফেরেশতারা উত্তর দেবে, এরা ওইসব লোক, দুনিয়ায় যাদের ওপর কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করা হলে তারা মাফ করে দিত। এটা তারা আল্লাহর জন্য করত। অথচ আজ আমরা বলে থাকি, ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেওয়া হবে।

সবরকারী লোক

তারা যখন জান্নাতে চলে যাবে, এরপর ঘোষণা করা হবে, সবরকারী বান্দারা কোথায়? তখন কিছু মানুষ দাঁড়াবে। তাদেরও জান্নাতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কোনো হিসাব নেওয়া হবে না তাদের থেকে। লোকেরা এবারও ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবে, সবরকারী লোক কারা? বলা হবে, আল্লাহর হুকুম পালনের ক্ষেত্রে যারা নিজের নফসকে দমিয়ে রেখেছে, ধৈর্য ধরে নিজের ইচ্ছের বিপরীত কাজ করেছে, এরা হচ্ছে তারা। তারা আজ কোনো হিসাব ছাড়া-ই জান্নাতে চলে যাচ্ছে।

দেখুন, যখন যৌনকামনা জাগ্রত হবে আর বান্দা তার নফসকে বাঁধা দান করবে, বেগানার দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে আর বান্দা চোখকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়, অন্তর গুনাহ করতে চায় আর বান্দা নিজের অন্তরের লাগাম টেনে ধরে, আল্লাহর আনুগত্যে এই সবরের বিনিময়ে কেয়ামতের দিন বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে।

আল্লাহর পড়শী

এবার তৃতীয়বারের মতো ঘোষণা হবে, আল্লাহর পড়শীরা কোথায়? জবাবে এবারও কিছু লোক দাঁড়াবে। তাদেরও বলা হবে, তোমরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাও। বিস্ময়ে লোকেরা একেবারে অভিভূত হয়ে যাবে। লোকেরা ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করবে, আল্লাহর পড়শী কারা? তাদের বলা হবে, তারা এমন লোক, যারা একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে ভালোবাসত। আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে মহব্বহ করত। তারা আল্লাহর মহব্বত দুনিয়াতে প্রাপ্ত হবে বিনিময় হিসেবে। আর আল্লাহর সুবাদে, আল্লাহর জন্য যদি কোনো মাখলুককে ভালোবাসে, তবে তার বিনিময়ে কেয়ামতের দিন পাওয়া যাবে বিনা হিসাবে জান্নাত।

তাই আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের দরবারে দু'আ করবে, হে আল্লাহ! আমাদের আপনি আপনার সত্য মহব্বত দান করুন। আপনার ভালোবাসা আমাদের দান করুন। আপনার ভক্তি ও মহব্বত দান করুন।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যত যতক্ষণ পর্যন্ত চাইবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই নেয়ামত আমরা পাব না। কাজ তো এখানে হয়; কিন্তু ইশারা তো আসে ওখান থেকে– রব্বে কারীমের দরবার থেকে। তখন তো পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে রবের সামান্য নেক দৃষ্টিতেই।

حسن کا انتظام ہوتا ہے

عشق کا یونہی نام ہوتا ہے

ইশকের নাম এ তো নয় যে, সব সময় তোমার জন্য সুন্দরের ব্যবস্থা হবে।

যখন রব্বে কারীম চাইবেন, তখন তার নিকট গমনের পথটা তিনি সহজ ও সরল করে দেন।

سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں

گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں

হে দোস্ত! তুমি শুনে নাও। যখন সুদিন আসবে, তখন তোমার সকল প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করবার জন্যে তিনি নিজেই বলে দেবে।

প্রাপ্তির পথও তিনি নিজেই খুলে দেবেন, পথও বলে দেবেন। তিনিই তখন রাতে জাগিয়ে দেবেন। দুনিয়ায় পয়গম্বর পাঠিয়ে দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবেন, পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাও পাঠিয়ে দেবেন। বলবেন, যাও; আমার অমুক বান্দাকে তোমার কোমল পেখমের ছোঁয়ায় জাগিয়ে দাও। এটি আমার দেওয়ার সময়। তাহাজ্জুদে উঠে সে আমার কাছে চাইবে। দু'আ করবে। প্রার্থনা করবে। আমি আল্লাহ। আমি তার আঁচল ভরে দেব।

একটি অমূল্য সুসংবাদ

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহি (রহ.) একটি কথা বলতেন যে, আল্লাহর নাম তুমি যত গাফলতির সাথেই নাও না কেন, এর কারণে কেয়ামতের দিন কিছু-না-কিছু ফায়দা অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

আল্লাহর নাম অত্যন্ত বরকতময়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'তোমার রবের নাম বরকতময়।'[১]

তো প্রতিপালক আল্লাহ নিজেই বলে দিচ্ছেন–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ

'আপনার রবের নাম বরকতময়।'[২]

তাহলে তো একটু কল্পনা করে দেখা দরকার কত বরকতময় হতে পারে রহমান ও রহীম আল্লাহ তা'আলার নাম। দেখুন, যদি কেউ গাফলতির মধ্যে থেকেও আল্লাহ নাম উচ্চারণ করে, তবুও এই নাম উচ্চারণটাই মানুষটিকে উপকৃত করবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি ভক্তি ও মহব্বতের সাথে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে তারপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তাহলে তার কতটুকু ফায়দা হবে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। হয়তোবা এর পরিমাণ দীর্ঘ কল্পনা করেও আমরা উপলব্ধি করতে পারব না।

এক ব্যক্তি বলেছেন, হে যুবক! তুমি কি সব সময়ই আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ করতে থাক? উত্তরে আমি তাকে একটি কবিতা আবৃতি করে শুনিয়ে দিলাম।

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو
ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

আমরা লাভবানই হয়ে থাকি। যদিও আল্লাহ-আল্লাহ নাম উচ্চারণে আমাদের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে। আমরা তো আশেক তোমারই নামের হে রব! হে খোদা!

আরে ভাই! যদি কারও প্রতি মহব্বত থাকে, তাহলে তার নাম উচ্চারণ করবার সময়ও মুখে এক প্রকার মিষ্ট স্বাদ, এক প্রকার মাধুর্য অনুভূত হয়।

তেমনি আল্লাহর নাম উচ্চারণের সময় মধুর স্বাদ আমাদের জিহ্বাকে আমোদিত করে দেয়।

---

১. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৭৮
২. সূরা আর-রাহমান : আয়াত ৭৮

সামান্য আমলেই জাহান্নাম হতে মুক্তি

স্মরণ রাখুন, যেব্যক্তির যবান থেকে আল্লাহর নাম মহব্বতের সাথে উচ্চারিত হবে আর যার চোখ থেকে অনুতাপের অশ্রু গড়িয়ে পড়বে, সে একদিন-না-একদিন জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাই বলছি, মহব্বতের সাথে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে-করে দু'আ করুন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নামের বরকতে এই-এই প্রার্থনা করছি। আপনি আমার দু'আ কবুল করে নিন। দয়া ও মেহেরবানি করে আমার প্রার্থিত জিনিসটি আমাকে দান করুন।

আমাদের গুনাহের অবস্থান

আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর রহমতের সাগরের সামনে আমাদের গুনাহের অবস্থান তেমন আর কী। একটা মাছি এসে একবার এক হাতির ওপর বসল। উড়ে চলে যাওয়ার সময় ক্ষমা প্রার্থনা করল, হাতি ভাই! আমি তোমার ওপর বসেছিলাম। এখন চলে যাচ্ছি; মাফ করে দিও। হাতি বলল, আরে বেটা! তোমার আসার খবর আমি পেয়েছি নাকি? না তোমার যাওয়ার খবর আমি পেয়েছি।

ভাইয়েরা! যদি গায়ে মাছি বসলে হাতির অনুভূতি না হয়, তাহলে বান্দার গুনাহ আল্লাহর রহমতের সামনে তো দেখা-ই যাবে না। আমাদের গুনাহের কী অবস্থান আছে আল্লাহর রহমতের সামনে! যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সমীপে নিজেদের মাফির জন্য প্রার্থনা করি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। তাঁর মহব্বতে আমাদের ধন্য করবেন।

তাই আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। তিনি দু'আ শোনেন। তবে দু'আ করতে হবে একবারে দিল থেকে। গাফলতির সাথে দু'আ করলে তাতে ফায়দা হবে না। যদি কেউ আমাদের সামনে ভিক্ষার জন্য হাত পাতে আর চেহারাটা পেছনের দিকে ফিরিয়ে রাখে, তাহলে কিছু দেওয়ার বদলে তাকে বরং থাপ্পর দিয়ে দিতে চাই। বলি, বদতমিজ কোথাকার! কারও কাছে কিছু চাইতেও জানিস না।

তো দু'আ করলাম; কিন্তু দিলকে আল্লাহ থেকে গাফেল রাখলাম, তাহলে আমাদের ওপর যে আযাব এল না, তা-ই তো আল্লাহর বড় দয়া। তবুও তো আল্লাহ এই দু'আকেই আমল হিসেবে আমলনামায় লিখে দেন। অন্যথায়

আমাদের এসব দু'আ পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের মতো করে আমাদের মুখে মেরে দেওয়া হতো।

আল্লাহকে দিল থেকে ডাকে যে

আমার ভাইয়েরা! আল্লাহ শোনেন। যারা তাঁকে ডাকে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেন। এক বৃদ্ধা নারী ছিল। তার স্বামী কোনো কারণে রেগে গেছে এবং তাকে বলেছে, তুমি আমার জন্য মায়ের মতো। এভাবে বলাকে ফিকহের পরিভাষায় 'যিহার' বলা হয়। আরব সমাজে এরূপ বলাকে স্থায়ীভাবে তালাক গণ্য করা হতো। বৃদ্ধা পেরেশান হয়ে গেল। এই বয়সে স্বামী আমাকে এমন স্থায়ী তালাক দিয়ে দিল! নবীজির খেদমতে হাজির হলো বুড়ি। বলল, হে আল্লাহর হাবীব! আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। আমি বুড়ো মানুষ; কোনো ঠাঁই তো এখন নেই। ঘরদুয়ারও তো নেই আমার। কোথায় যাব? কে আমাকে এ-বয়সে বিয়ে করবে? আমার তো আর কোনো সন্তান হওয়ার বয়স নেই। কী করব এখন আমি?

ঘটনা শুনে আল্লাহর হাবীব বলে দিলেন, আইন অনুযায়ী তালাক তো হয়ে গেছে। এবার মহিলা আরও পেরেশান হয়ে গেল। বৃদ্ধা দুচোখে আর কোনো পথ দেখল না। রবের দিকে মুতাওয়াজ্জু হলো। চিৎকার করে-করে ডাকতে লাগল, হে আমার মালিক ও মাওলা! আমার পুরো অবস্থা তোমার জানা। আমি এখন বড় নিরুপায়। আমি এখন কোথায় যাব? কোথায় থাকব? তোমার হাবীবও তো কোনো পথ বলে দিলেন না মাওলা! আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমার দুঃখ শোনো। তুমি আমাকে রক্ষা করো। আল্লাহ তার কাতর আহাজারি শুনলেন। সাথে-সাথে তিনি ওহী পাঠালেন–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

'নিশ্চই আল্লাহ শ্রবণ করেছেন ওই নারীর কথা, যে আপনার সাথে বিবাদ করেছে তার স্বামীর ব্যাপারে এবং অভিযোগ ও কান্না করেছে আল্লাহর সমীপে।'[১]

কত দয়াবান আমাদের আল্লাহ। একজন বৃদ্ধা নারী আল্লাহর দরবারে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে আবেদন করেছেন। কত বড় দয়ালু আমাদের আল্লাহ।

---

১. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১

তার কান্নাকে আল্লাহ এত পছন্দ করলেন

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ওয়ায করলেন। অনেক প্রভাব সৃষ্টিকারী ও সারগর্ভ ছিল নবীজির সেই ওয়ায। এক সাহাবি কাঁদতে লাগলেন । তার আর্তনাদ শুনে নবীজি বললেন, আল্লাহ তার ক্রন্দনকে এত পছন্দ করলেন যে, তার কারণে তিনি সেই মজলিসে উপস্থিত সবার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কত বড় দয়ালু রহমান ও রহীম আমাদের আল্লাহ। একজনের উসিলায় সকলকে মাফ করে দিলেন।

তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই

একবার এক সাহাবির সামনে কেয়ামতের আলোচনা করা হলো। শুনে সাহাবি অন্যদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কেয়ামতের দিন হিসাব নেবেন কে? সাধারণ একটি প্রশ্ন। উত্তর দেওয়া হলো আল্লাহ। সাহাবি বলতে লাগলেন, যদি আল্লাহ হিসাব নেন, তাহলে তো ভালোই। তিনি বোঝাতে চাইলেন, হিসাব যদি ফেরেশতারা নেয়, তাহলে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু যেহেতু হিসাবটা নেবেন খোদ মহান আল্লাহ, তাই কোনো সমস্যাই নেই। কারণ, আল্লাহ তো বড়ই দয়াবান, মেহেরবান ও করুণার আধার। লক্ষ করুন প্রিয় বন্ধুগণ! আল্লাহর ওপর সাহাবির কত অগাধ ভরসা ছিল।

মাফ করার বাহানা দেখুন

হাদীছে আছে, এক বান্দা বড় গুনাহগার। একবার সে অনুতপ্ত হয়ে বলে উঠল, ইয়া রব!– হে আল্লাহ! সাথে-সাথে আল্লাহ তার গুনাহগুলো মাফ করে দিলেন। ফেরেশতারা তো আশ্চর্য হয়ে গেল। সারাটা জীবনের গুনাহ ইয়া রব! ডাকের কারণেই আল্লাহ মাফ করে দিলেন। আল্লাহ বললেন–

اَعَلِمَ عَبْدِیْ اَنَّ لَهٗ رَبًّا

'আমার এই বান্দাও কি অবগত হলো যে, তার একজন রব আছে?'

তাহলে আমি রব তার এই গুনাহগুলো মাফ করে দিতে সমস্যা কোথায়? সে তো আমি রবের রহমই চাচ্ছে।

তাহলে আল্লাহ আমাকে কবে দান করবেন?

এক বৃদ্ধা নারী ছিল। মহিলা ছিল বড়ই অসহায় ও অক্ষম। মানুষের দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা করত। কেউ তাকে দিত আবার যারা দিত না, তারা

বলত, শোনো বোন! তোমাকে আল্লাহই দেবেন, আল্লাহই দেবেন। আল্লাহর কী শান যে, বুড়ি একদিন মারা গেল। কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখল। বলল, একটু বলুন তো শুনি কী আচরণ হয়েছে তোমার সাথে। বুড়ি বলল, আমাকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হলো। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করল, কী আমল নিয়ে এসেছ? আমি কাঁদতে লাগলাম। বললাম, আমি তো সারাটা জনমই মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা করে ফিরেছি। লোকেরা আমাকে হাত পাততে দেখে বলত, আল্লাহ দেবেন, আল্লাহ দেবেন। এখন আমি আল্লাহর সামনে এসেছি। আমি তো সারাটা জনম শুনলাম, আল্লাহ দেবেন। অথচ তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করছ, কী নিয়ে এসেছি? আরে! কী নিয়ে আসব আমি? বলো, আল্লাহ আমাকে কবে দান করবেন। আল্লাহ আমার কথাটা খুব পছন্দ করলেন। পছন্দ করে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

মহব্বতের ইশারা

এক ব্যক্তির একটা ঝুপড়ি ছিল। কোথা থেকে যেন এক হাতিওয়ালা এল এবং বলল, আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। ঝুপড়িওয়ালা বলল, আমি তো করতে পারব না। লোকটা জিজ্ঞেস করল, কেন? বলল, আরে! তুমি তো হাতিওয়ালা। তুমি হাতি নিয়ে এসেছ। হাতি নিয়েই আসবে। আর আমার ঝুপড়িতে তো হাতি আসতে পারবে না। শুনে হাতিওয়ালা হেসে বলল, তুমি শুধু হ্যাঁ বলো। আমি তোমার এই ঝুপড়িকে শাহী মহল বানিয়ে দেব। তখন তো হাতি আসতে পারবে।

দেখুন, হাতিওয়ালা বন্ধুত্ব তৈরি করতে হ্যাঁ শব্দ শুনবার জন্য ঝুপড়িকে মহল বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে! পারওয়ারদেগার তার বান্দার সাথে এমনই তো করেন। ইরশাদ হচ্ছে–

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ ওই ব্যক্তির বন্ধু, যে ঈমান আনে।'[১]

আল্লাহ তো সেই হাতিওয়ালার মতো তার ঝুপড়িওয়ালা মুমিনদের সাথে আচরণ করবেন। এখন মুমিন যদি শুধু হ্যাঁ বলতে পারে, তাহলেই আল্লাহর দোস্ত হয়ে যাবে। তো আমাদের উচিত আল্লাহর ডাকে লাব্বাইক বলা। যদি বলতে পারি, তাহলে আমাদের তথা মুমিনদের সর্বপ্রকার সমস্যা আল্লাহ দূর

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৭

করে দেবেন। তিনি বিনিময়ে নেয়ামত দেবেন। আরে ভাই! রবের পক্ষ থেকে তো মহব্বতের ইশারা এটা। আল্লাহ বলে দিচ্ছেন, আল্লাহর দোস্ত তারা, যারা ঈমান আনে। আল্লাহ আমাদের ইশারা দিচ্ছেন। এখন তার ওই ইশারায় সাড়া দেওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। বলা উচিত, হে আল্লাহ! আমরা তোমার মহব্বতের ডাকে সাড়া দিতে প্রস্তুত।

মেহনতে মহব্বত মিলে

মেহনত ও মহব্বত শব্দের লিখনপদ্ধিতে পার্থক্য খুব বেশি নয়। উচ্চারণও কাছাকাছি। আর এই মেহনতের দ্বারাই মিলে মহব্বত। মেহনত মানে অহংকার ইত্যাদি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মাঝে বিনয় পয়দা করতে হবে, মাশায়েখদের সম্মানে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। মেহনত করলেই পরে মানুষ বিনিময়ে আল্লাহর মহব্বত পাবে। একটি কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

'ঈমানদারগণ আল্লাহকে ভীষণ মহব্বত করে।'[১]

এখানে কিন্তু মহব্বতের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। নির্দেশসূচক শব্দও কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি। এখানে বরং একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনরা আল্লাহর ভালোবাসায় প্রবল।

এই আয়াতটি পড়ে ছাত্রদের অন্তরে প্রশ্ন জাগতে পারে, এখানে কোন নির্দেশবাচক শব্দ প্রয়োগ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালোবাসার হুকুম দিলেন না। মুফাসসিরীনে কেরাম এর জবাবে বলেছেন, যেলোক সুন্দর হয়, তার মাঝে নিজের সৌন্দর্যের ওপর গর্ব থাকে। কেমন যেন সে বলে, আমি যেহেতু এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তাহলে আমাকে ভালোবাসার কথা আমি কাউকে বলতে হবে না। সোন্দর্যের কারণে এমনিতেই তাকে মহব্বত করা হবে। এখানেও কেমন যেন বলা হচ্ছে, হে ঈমানদারগণ! আমিও বলছি আমি অনেক সুন্দর। তাই এই সৌন্দর্যের দিকে ইঙ্গিত পাওয়ার পরও, আমার সৌন্দর্যের কথা অবগত হওয়ার পরও কী করে তোমরা আমাকে ভালোবাসবে না? আমি তো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমার সৌন্দর্যের কথা যখন তোমারা শুনবে, তখন তোমরা আমাকে ভালোবেসে ফেলবেই। আমার দয়া ও

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা শুনবে, আমাকে যখন জানবে আমি কত বড় মেহেরবান, তখন আমাকে তোমরা মহব্বত না করে থাকতে পারবে না। এই মহব্বত এমনই কল্যাণকর ব্যাপার যে, এই মহব্বত ছাড়া বান্দা থাকতেই পারে না।

আমার বন্ধুগণ! এখানে প্রেমের ছলনামূলক বড় একটি কথা আছে। সৌন্দর্যবান ব্যক্তি বলে, আমার চাহিদা অনেক, আমাকে কামনা করে অনেকে, তাই কারও ব্যাপারে আমার পরোয়া নেই। এ তো প্রেমের এক চূড়ান্ত ছলনা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন জানিয়ে দিচ্ছেন, ঈমানদাররা আমাকে অত্যধিক মহব্বত করে। যদি কেউ মহব্বত না করে, তা আমার সৌন্দর্য ও শোভার মাঝে কোনো প্রভেদ আনবে না, আমার বড়ত্ব ও মহত্বের মাঝে কোনো প্রভেদ হবে না। আমার তো চাহিদা অনেক। তাই তোমাদের ভালোবাসা পেয়ে আমি ধন্য হব না। আমার ভালোবাসা পেয়ে তোমরা ধন্য হবে।

আল্লাহকে যে কামনা করে

মনে রাখবেন, আল্লাহকে কামনাকারী অনেক। আল্লাহর সাথে মহব্বত তৈরি করা লোক সবচেয়ে বড় ইউসুফ ও জোলেখা। আল্লাহর সাথে মহব্বত তৈরি করা লোকদের মাঝে সবচেয়ে বড় লাইলা ও মজনু। তাই আমাদের প্রয়োজন, আমরা আল্লাহকে মহব্বতকারী হয়ে যাব। এটি আমাদের কর্তব্য। কত মানুষ যে আল্লাহপ্রেমিক ছিলেন এ জগতে। কোটি-কোটি মানুষ তাদের কামনার এই সত্তাকে ডেকেছে রাতের গভীরে, তাঁর সামনে আঁচল পেতে পড়ে ছিল, তাঁর নামে কোরবান করে দিয়েছে নিজেদের জীবন। ধনসম্পদ তো বিলিয়েছেই। প্রেম আর ভালোবাসায় তারা এত নিবেদিত ছিলেন যে, রাতে কেঁদে-কেঁদে সাগর বানিয়েছেন। তাঁদের ইতিহাস শুনে তো বিস্মিত হতে হয়।

মাসিক আল কাউসার, বর্ষ:২০,সংখ্যা, ০৪,২০২৪

আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি বনী ইসরাঈলের সেই বৃদ্ধকে, যে নির্জন বনে একাকী কথা বলছিল আপন মাওলায়ে কারীমের সাথে। আল্লাহ! মূসা কালীমুল্লাহ বলেছেন, তোমার স্ত্রী নেই, তোমার সন্তান নেই, তোমার কোনো খেদমতকারী নেই। আমি তোমাকে দাওয়াত দিচ্ছি; তুমি আমার কাছে চলে এসো; আমি তোমার সব খেদমত করে দেব। তোমার এই করে দেব, ওই করে দেব। এভাবে আরজি জানাচ্ছিল লোকটি।

মূসা (আ.) দেখে তাকে ধমক দিলেন এই মিয়া! তুমি কী প্রলাপ বকছ! এ তো আল্লাহর শানে চরম গোস্তাখি। এভাবে বলা অন্যায়। বৃদ্ধ ভয় পেয়ে চুপসে গেল। মূসা (আ.) চলে গেলেন। এবার আল্লাহ হযরত মূসার কাছে ওহী পাঠালেন, হে মূসা! আমি তো তোমাকে মানুষকে আমার সাথে জুড়ে দিতে পাঠিয়েছি। আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তো পাঠাইনি।

দেখুন, বুড়ো আল্লাহর শানের খেলাফ কথা বলছিল। কিন্তু শানের খেলাফ কথা মহব্বতের তাড়নায় বলার কারণে তা আল্লহর নিকট পরিণত হলো অত্যন্ত প্রিয় কথায়।

এক নারী তাহাজ্জুদের পর দু'আ করলেন–

হে আল্লাহ! তুমি আমার সাথে যে-মহব্বতের সম্পর্ক রাখ, সেই সুবাদে তুমি আমার এ-কাজটির এভাবে সমাধান দিয়ে দাও। একব্যক্তি মহিলাকে বলল, এভাবে না বলে বরং বলো, হে আল্লাহ! আমি তোমার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখি...। এবার এই নারী বলতে লাগল, এ কেমন করে হতে পারে? যদি আল্লাহ আমার সাথে ভলোবাসার সম্পর্ক না রাখতেন, তাহলে তো তাহাজ্জুদের জন্য আমাকে জাগ্রত করতেন না এবং তোমাকে সারাটা রাত ঘুমে আচ্ছন্ন রাখতেন না।

চিন্তা করুন। এ ছিল আল্লাহপ্রেম।

এমন আল্লাহপ্রেমিকদের একজন হযরত শিবলি (রহ.)। যখন তাঁর সামনে কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত, তার মুখে তিনি মিষ্টি তুলে দিতেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন আল্লাহর নাম উচ্চণকারীর মুখে মিষ্টান্ন দিয়ে দেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার প্রেমাস্পদ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে তার মুখে মিষ্টি দেব না তো কী করব?

রাতের নির্জনতায় ইমাম আযম (রহ.) কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আপন রবের সঙ্গে কথা বলতেন। ৪০ বছর পর্যন্ত ঈশার উজু দিয়ে ফজর নামায পড়ে নিজের রবের প্রেমের প্রমাণ দিয়েছেন।

আল্লাহর প্রেমিকদের একজন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)। তাঁকে আল্লাহর কুরআনের খাতিরে বেদম বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তিনি সেই বেত্রাঘাতকে সহ্য করে নিয়েছিলেন।

আল্লাহপ্রেমিক আরেক মহাপুরুষ ইমাম মালেক (রহ.)। সমকালীন শাসনকর্তা তাঁর মুখে কালি মেখে দিয়েছেলেন। তাঁকে মদীনার পথে-পথে ঘুরিয়েছিলেন। তাঁকে বেঈজ্জত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই

বলতে লাগলেন, যে জানে সে তো জানেই আর যে জানে না সে-ও জেনে নিক যে, আমি মালেক ইবনে আনাস; দীনের জন্য আমাকে এমন করা হচ্ছে। আল্লাহর প্রেম অন্বেষীগণ নিজেদের ইজ্জত ও জানমাল কোরবান করে দিয়েছেন।

আল্লাহপ্রেমিকদের কাফেলা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মাশায়েখে কেরাম অতীত হয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের জীবনচরিত্র পড়ুন। বুঝবেন, হৃদয়ে তাদের আল্লাহপ্রেম কেমন ছিল। তাদের উদাহরণ যেন একটি কাফেলা আল্লাহপ্রেমের পথে চলছে। শেষ পর্যন্ত যে কাফেলা সফল হয়েছে, তাদের পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। আজ যদি আমরা প্রেমের এপথে হাঁটি এবং সামনে অগ্রসর হই, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তার গভীর মহব্বত দান করবেন। আর যদি আমরা পেছনে পড়ে থাকি, তাহলে শুনুন বন্ধুগণ! ক্ষতিটা আমাদেরই। আল্লাহর প্রেমিক বান্দার তো অভাব নেই দুনিয়াতে।

আল্লাহর কাছেই চেয়ে নিন আল্লাহকে

তাই আজকের এই মাহফিলে আমরা আল্লাহর কাছে সত্য হৃদয়ে দু'আ করব, হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে আপনার প্রেমও ভালোবাসায় ভরে দিন। হায়াত তো চলে যাচ্ছে। কেউ বলে, অমুকের হাতে বাইআত হয়েছে, কেউ বলে অমুকের হাতে। কেউ বলে, এ হচ্ছে সুফি-সাধক। কেউ বলে, এ হচ্ছে সালেক। কেউ বলে, যাকের। এসবই আপন-আপন স্থানে ঠিক আছে। কিন্তু যদি হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমের সুধা না থাকে, তাহলে কেয়ামতের দিন আমরা কী করে মুখ দেখাব আল্লাহকে? আজ এই আল্লাহপ্রেমের মাহফিলে তোমার কাছে একটি জিনিসই চাই হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ حُبَّكَ

'হে আল্লাহ! তোমার কাছে তোমার প্রেম চাই, ভালোবাসা চাই।'[১]

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়গুলো তোমার ভালোবাসায় পূর্ণ করে দাও। এই যে দুর্বল নামায; কতদিন আর তা পড়তে থাকব! এই রসহীন সেজদা আর কতদিন করতে থাকব? দাঁড়াই তো মসজিদে; কিন্তু মন পড়ে থাকে

১. তিরমিযি : হাদীছ নং ৩৪১২

বাজারে। এই অবস্থা আর কতদিন চলবে? কবে আমাদের আমলে গভীরতা আসবে? ইহসানের মাকাম কিতাবে যা পড়ি, তা কবে আমাদের নসিব হবে?

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ

'আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ।'[১]

এগুলো কি কিতাবের পাতায়ই থেকে যাবে? আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হবে কবে? হে মালিক! আপনি কত বড় দয়াবান, মেহেরবান! আপনি রব দাবিদার ফেরাউনকে দাওয়াত দিতে নবীকে বলেছেন–

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

'তোমরা তাকে দাওয়াত দাও নরম ভাষায়।'[২]

অথচ ফেরাউন দাবি করেছিল–

اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى

'আমিই তোমাদের বড় ও শ্রেষ্ঠ রব।'[৩]

আপনি কত দয়ালু অথচ আমরা তো সেজদায় বলি–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

আমাদের রব পবিত্র। আপনি আমাদের কী করে বঞ্চিত করবেন!

হে মালিক! আমাদের মাহরুম না করে আমাদের سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى কবুল করে নিন। আমাদের সেজদাগুলো ফিরিয়ে দেবেন না হে মালিক! আপনি انا ربكم الاعلى যে বলেছে, তার সাথে নরম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى যারা বলে, তাদের এই মজমা, এই মজলিস। আপনি আমাদের এই মজলিসকে ব্যর্থ করবেন না হে মালিক! আমরা আপনার রহমতের ভিখারী। আমরা আপনার অন্বেষী। কত মানুষ আজ এখানে এই মাহফিলে কত দূর থেকে হাজির হয়েছে। মাওলা! নারী-পুরুষ অনেক এসেছে। এসেছে তোমার সাথে সম্পর্ক গড়তে এবং তোমাকে রাজি করতে। হে মালিক! আমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিও না। আপনি আমাদের

---

১. ইবনে মাজাহ : হাদীছ নং ৬২

২. সূরা ত্বহা, আয়াত : ৪৪

৩. সূরা নাযিয়াত : আয়াত : ২৪

আজকের এই মাহফিলে আপনার মহব্বতের নেয়ামত দান করে দিন। আপনার গভীর ও প্রবল ভালোবাসা আমাদের দিয়ে দিন। আমরা আপনার প্রেমিকদের দলে শামিল হতে চাই। হে রব্বে কারীম! আমাদের মাঝে যোগ্যতা নেই। আপনি আমাদের যোগ্যতা দিয়ে দিন। আমাদের মাঝে কোনো ভালো গুণ নেই। আমাদের ভালো গুণ দান করুন। আপনি চাইলেই আমাদেরকে আপনার নৈকট্যশীল বানাতে পারেন।

হে আল্লাহ! ছোট বাচ্চা যখন তার পিতার দিকে হাঁটতে যায়, তখন সে দুলতে থাকে। কিন্তু বাবা তাকে পড়তে দেয় না। পড়ে যেতে চাইলে তাকে তুলে বুকে নেয়। আমরাও তো তেমনই। আমরা তোমার পথে চলতে চাই। শয়তান তোমার পথ থেকে আমাদের ফেলে দিতে চায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পতনের হাত থেকে রক্ষা করুন। তার আগে আমাদের আপনার রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন। আমাদের সাথে দয়ার আচরণ করুন। আমাদের জন্য রহমতের ফয়সালা করে দিন হে আল্লাহ! আমাদের রগরেশায়, শিরায়-উপশিরায় আপনার মহব্বত মিশিয়ে দিন। আমাদের পতনের পথ রুদ্ধ করে দিন। কেয়ামতের দিন আপনার প্রিয় বান্দাদের সাথে আমাদের হাশর করুন।

কিতাবে আছে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক আপনার সামনে উপস্থিত হয়ে হাসবে। আমাদেরও আপনি এমন করে দিন যেন সেই হাসি আমরাও হাসতে পারি। আপনিও যেন আমাদের দেখে হাসেন আমাদের এমন বানিয়ে দিন।

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَٰدِى وَادْخُلِى جَنَّتِى

'হে প্রশান্ত হৃদয়! তোমার রবের অভিমুখী হও সন্তুষ্টভাবে এবং সন্তুষ্ট হয়ে। আর প্রবেশ করো আমার বান্দাদের দলে এবং প্রবেশ করো জান্নাতে।'[১]

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

১. সূরা ফাজ্‌র : আয়াত ২৭-২৯

আল্লাহর নৈকট্যের স্তরসমূহ

'আদবের দ্বারা মানবের ভেতর ইল্‌মে নাফে সৃষ্টি হয়। আর ইল্‌মে নাফে দ্বারা বান্দা আমল করার তাওফীক প্রাপ্ত হয়। আমলের বরকতে মানুষের মাঝে হেকমতের ফোয়ারা ফোটে। আর হেকমতের মাধ্যমে দুনিয়াটাকে তার দৃষ্টিতে বড়ই তুচ্ছ মনে হয়। আখেরাত অভিমুখী হয় বান্দার হৃদয় এমন। আর আখেরাতের সাথে হৃদয়ের বাঁধন তৈরি হওয়ার কারণে আখেরাতের আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। নফল নামায, তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ সবই তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর এ-সকল আমলের দ্বারাই বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।'

আল্লাহর নৈকট্যের স্তরসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ : عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ

وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

সবচেয়ে বড় নেয়ামত

দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের ওপরই আল্লাহর বেশুমার ইহসান ও অগণিত করুণা রয়েছে। বান্দার ওপর আল্লাহর এ পরিমাণ নেয়ামত রয়েছে যে, যদি মানুষ তা গুণতে চায়, তবে কোনোভাবেই সে সক্ষম হবে না। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

'যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণনা করতে চাও, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না।'[১]

তবে সকল নেয়ামতের মধ্যে একটি নেয়ামত সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে উন্নত। সেই নেয়ামতটি হচ্ছে আল্লাহ বান্দাকে নিজের নৈকট্য দান করা। কারও প্রতি আল্লাহ রাজি হয়ে যাওয়াও বড় নেয়ামত। কাউকে ঈমান ও হেদায়েত দান করাও বড় নেয়ামত। তবে সেই ঈমানদারদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের একেবারে আপন ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বানিয়ে নেওয়া সবচেয়ে বড় নেয়ামত, বড় অনুগ্রহ। যখন ফেরাউন জাদুকরদের ডাকল এবং মূসার বিরুদ্ধে জাদু প্রয়োগ

---

১. সূরা নাহল : আয়াত ১৮

করতে বলল, তখন জাদুকররা প্রশ্ন করেছিল, যদি আমরা আমাদের এ-কাজে কামিয়াব হয়ে যাই, তাহলে আমরা কী প্রতিদান পাব? ফেরাউনের কাছে তো সোনা-চাঁদির কমতি ছিল না। তবুও সে উত্তরে বলেছিল–

وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'তাহলে তোমরা আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে যাবে।'[১]

বোঝা গেল, নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়া যে কেমন ব্যাপার, তা তো বলাই বাহুল্য।

কী করে পাওয় যাবে আল্লাহর নৈকট্য

এটি যখন আল্লাহ তা'আলার এত বড় নেয়ামত এবং এত বড় অনুগ্রহ, তাহলে তো প্রত্যেক মুমিনেরই তামান্না হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আমি আজকের মাহফিলে আল্লাহর নৈকট্য কীভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করব।

আদব প্রথম অলংকার

একজন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, তা হচ্ছে আদব।

اَدِّبُوا النَّفْسَ اَيُّهَا الْاَصْحَابُ

طُرُقُ الْعِشْقِ كُلُّهَا اٰدَابٌ

নিজের নফসকে আদব শিক্ষা দাও ওহে প্রিয় বন্ধু ! কারণ, ইশ্‌ক ও ভালোবাসার সকল পথ আদবের ওপর নির্ভরশীল। তাই আদব ব্যতীত বান্দা কিছুই পাবে না ।

তাই তো বর্ণিত আছে–

باادب بانصیب بےادب بےنصیب

'আদববান লোক সৌভাগ্যবান আর আদবহীন লোক হতভাগা।'

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১১৪

দীন পুরোটাই আদব

বর্ণিত আছে–

اَلدِّيْنُ كُلُّهٗ اَدَبٌ

'দীন পুরোটাই আদব।'

আল্লাহর আদব, রাসুলের আদব, কালামুল্লাহ্‌র আদব, বাইতুল্লাহর আদব, আউলিয়াউল্লাহর আদব, মাতাপিতার আদব, ওস্তাদের আদব– দীন পুরোটাই আদব। কিছু মানুষ কেমন যেন সেই আদব গুলোকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে। এই আদবকে তাওহীদের বিপরীত বিষয় মনে করে তারা ধোঁকা খাচ্ছে। আমি হারাম শরীফে বাইতুল্লাহর এরিয়ায় এক লোককে জুতা পরে ঘুরতে দেখেছি। এশরাকের সময় ছিল। তখন কোনো গরম ছিল না। একজনকে কুরআনুল কারীম মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। সে কালামুল্লাহ শরীফকে ইংরেজী বইয়ের মতোই তুচ্ছ মনে করেছে।

আমাদের ওলামায়ে কেরাম আমাদের ওপর এত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, তাঁরা আমাদের আদব শিক্ষ দিয়েছেন। তাই তো বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মানুষ আদবের গুণে গুণান্বিত একটু বেশি পরিমাণে। উক্ত ঘটনার এত কিছু দেখলে আমাদের এই দেশগুলোর মানুষ তো অস্থিরই হয়ে যায়।

তো দেখে বৃদ্ধ শুয়ে থাকা লোকটির মাথার নিচ থেকে কুরআনটি টেনে বের করে বুকে তুলে নিলেন। লোকটা চটে যাচ্ছিল। বলছিল, আমার ঘুমের ডিস্টার্ভ করলে! আবার এক তরুণ জুতাপরা লোকটাকে গিয়ে বলল, আরে ভাই! এটা তো মসজিদ! সে বলে দিল, সমস্যা নেই। এতে যুবক ক্ষেপে গেল। আমি বললাম, শোনো যুকব! এক হচ্ছে কুরআন পড়া, আরেকটা হচ্ছে কুরআন বোঝা। এই আরব কুরআন পড়েছে বটে; কিন্তু কুরআন বোঝেনি। দেখো, আল্লাহ তা'আলা তুর পর্বতের ওপর তাজাল্লি দিলেন আর নবীকে নির্দেশ দিলেন–

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ

'আপনার জুতাজোড়া খুলে ফেলুন।'[১]

---

১. সূরা ত্বহা : আয়াত ১২

দেখুন, তুর পর্বতে আরোহণের জন্য জুতা খোলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। আর এই যে বাইতুল্লাহ; এখানে কি জুতা খোলার নির্দেশ প্রয়োগ হবে না? তাদের এই কথাটুকু বুঝে আসে না যে, এটি আল্লাহর ঘর মসজিদ। তাই বলছি, সর্বদা হৃদয়ে একথা ধারণ করে রাখব যে, এটি বাইতুল্লাহ। এটি আল্লাহর ঘর।

আদব ও ইল্‌মে নাফে'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَدَّبَنِيْ رَبِّيْ فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبِيْ

'আমার রব আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন এবং তিনি বড় সুন্দর আদব শিখিয়েছেন।'[১]

এরপর নবীজি বলেছেন–

عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمِيْ

'আল্লাহ আমাকে ইল্‌ম ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং বড় উত্তম ইল্‌ম তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'

মুহাদ্দিছীনে কেরাম লিখেছেন, আদব মানুষের মধ্যে আগে আসে। তার পর ইল্‌মে নাফে আসে। তাই যার মাঝে আদব থাকবে না, সে ইল্‌মে নাফে প্রাপ্ত হবে না। হ্যাঁ, কিছু জ্ঞান সে শিক্ষা করতে পারবে। মেধা থাকার কারণে অনেক কিছু মুখস্থ রাখতে পারবে। কিন্তু তার মাঝে ইল্‌মে নাফে আসবে না যদি তার মাঝে আদব না থাকে। কারণ, মানুষ ইল্‌মে নাফে প্রাপ্ত হবে আদব দ্বারা। আর সেই ইল্‌মে নাফে'র দু'আ হাদীছে বর্ণিত আছে।

হযরত আনোয়ার শাহ (রহ.)-এর আদব

একবার হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.) ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, আল্লামা কাশ্মিরি কীভাবে এত বড় হয়েছেন? জবাবে কেউ বলল, তিনি কুরআন বোঝার কারণে বড় হয়েছেন। কেউ বলল, হাদীছ বোঝার কারণে বড় হয়েছেন। বালাগাত, মান্তেক, আরবি সাহিত্য ইত্যাদি একেকজন একেকটার নাম বলল যে, এর মাধ্যমে তিনি এত বড় হয়েছেন। তিনি

---

১. কানযুল উম্মাল : হাদীছ নং ৩১৮৯৫

বললেন, তোমাদের কারও উত্তর সঠিক হয়নি। ছাত্ররা বলল, হযরত দয়া করে আপনি আমাদের বিষয়টি জানিয়ে দিন।

মুফতী কেফায়েতুল্লাহ (রহ.) বলেন, খোদ হযরত কাশ্মীরিকে তাঁর এ-প্রশ্নটা করা হয়েছিল। তখন হযরত কাশ্মীরি নিজের সম্পর্কে যে-জবাব দিয়েছেন, তার সারাংশ হচ্ছে, আমি দীনি কিতাবের সাথে আদব রক্ষা করে চলতাম। এর কারণেই আল্লাহ আমাকে তার দীনের ইল্‌ম দিয়েছেন। তাঁকে বলা হলো, হযরত! সবাই তো কিতাবের সাথে আদব রক্ষা করে। তিনি বললেন, আমি তো এতটুকু আদবও রক্ষা করতাম যে, কখনও ইতিহাসের কিতাব দীনি কিতাবের ওপর রাখতাম না। সাধারণ দীনি কিতাবের নিচে হাদীছের কিতাব রাখতাম না। হাদীছের কিতাবের নিচে কুরআন রাখতাম না। সবার ওপর কুরআন, তারপর হাদীছের কিতাব, তারপর সাধারণ দীনি কিতাব, তারপর ইতিহাসের কিতাব। এভাবে আমি কিতাব রাখতাম। আমি কখনও হাদীছের কিতাব উজু ছাড়া স্পর্শ করতাম না।

হযরত কাশ্মীরি আরও বলেন, আমি পড়ার সময় কখনও কিতাবকে নিজের অনুগত বানাইনি। নিজের দিকে কিতাব না ফিরিয়ে বরং আমি কিতাবের দিকে ফিরে গেছি। কিতাবের বাঁকা হাশিয়া ও টীকা আমি কখনও কিতাব ঘুরিয়ে দেখতাম না। আমি নিজে ঘুরে সেই বাঁকা হাসিয়া পড়ে নিতাম। এত আদব আমি রক্ষা করতাম। কিতাবের আদবই আমাকে আমার রবের পক্ষ থেকে ইল্‌মের খাযানা এনে দিয়েছে।

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর আদব

হযরতে মুরশিদে আলম (রহ.)কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি মুরশিদে আলম কী করে হলেন? তখন তিনিও উত্তরে বলেছেন, আমি কখনও আমার শায়খের চেহারা উজু ছাড়া দেখিনি। আমাদের সিলসিলায়ে আলিয়ায় একজন বুযুর্গ ছিলেন মিরাজুদ্দীন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, আমি সারা জীবনে উজু ছাড়া অবস্থায় বাইতুল্লাহর দিকে তাকাইনি। এটি ফরজও নয় ওয়াজিবও নয়। তবে একেই বলা হয় আদব। এর কারণে মানুষ বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আল্লাহর এসব মহাসৃষ্টির আদব হৃদয়ে ধারণ করা চাই। যার মাঝে এই আদব থাকবে, আল্লাহ তাকে ইলমে নাফে' দান করবেন।

হযরত গোলাম রাসূল পুনটুবি (রহ.)-এর আদব

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর এক শাগরেদ ছিলেন গোলাম রাসূল। মুলতানের বড় একটি শহরের নাম শুজাআবাদ। সেখান থেকে সামনের একটি গ্রামে থাকতেন তিনি। গ্রামের নাম পুটনা। তিনি গ্রামে মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। মাদরাসাটি সড়ক থেকে ত্রিশ কি.মি. ভেতরে ছিল। আর সেই এলাকায় যেতে হলে বোঝা মাথায় করে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হতো। না টাঙ্গা ছিল, না রেল ছিল। তালেবুল ইল্‌মরা মাদরসায় যেতে মালপত্র নিয়ে ত্রিশ মাইল পথ হাঁটতে হতো। সেই দুর্গম ক্লান্ত পথ পাড়ি দিয়ে শত-শত ছাত্র তার কাছে পড়তে যেত।

হযরত এত বড় নাহুবিদ ছিলেন যে, খাইরুল মাদারিসের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানের বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ে আযম পাকিস্তান ও শাইখুল হাদীছগণ এসে উপস্থিত হলেন। মাওলনা খায়ের মুহাম্মাদ, যিনি হযরত থানভী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন, অনেক বড় আলেম ছিলেন এবং অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন– স্টেজে দাঁড়িয়ে মাওলানা গোলাম রাসূলকে ডাকলেন এবং ঘোষণা দিলেন, এখন তাশরীফ রাখবেন শামসুন নুহাত মাওলানা গোলাম রাসূল পুনটুবি। চিন্তা করুন, যাঁকে সারা দেশের ওলামায়ে কেরামের সামনে 'শামসুন নুহাত' বলা হলো, তিনি কত বড় আলেম!

কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অসামান্য ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন। কীভাবে আপনি এত ইল্‌ম প্রাপ্ত হয়েছেন? উত্তরে তিনি বলেছেন, এই ইল্‌ম আমি আমার ওস্তাদদের আদবের বিনিময় পেয়েছি। লোকেরা বলল, হুজুর! ওস্তাদকে তো সব ছাত্রই আদব করে। তিনি বললেন, তা নয়। আমি যখন হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.)-এর নিকট বোখারি শরীফ পাঠ করি, তখনকার ঘটনা। হুজুর দাওরা হাদীছ পর্যন্ত পড়াতে আসতে একটি পথ হেঁটে আসতে হতো। আমি চুপেচুপে রাতের গভীরে ওই পথটা পরিষ্কার করে দিতাম। একদিন ঝাড়ু খুঁজে পাইনি। সেদিন আমার মাথার পাগড়ি খুলে তা দিয়ে ওস্তাদের আগমনের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি। আল্লাহর কারিশমা যে, সেদিন আমি হযরত শাইখুল হিন্দের নজরে পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন, গোলাম রাসূল! তুমি কী করছ? আমি বলতে বাধ্য হলাম। তাই বিস্তারিত ঘটনা বললাম। হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি আমাকে দু'আ দিলেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! দেখুন, কবুল হতে কতক্ষণ লাগে। এক লমহায় তিনি পেয়ে গেলেন বিশাল মর্যাদার আমল, যা মানুষ বছরের-পর-বছর চেষ্টা করেও পায় না।

একবার তিনি তালেবুল ইল্মদের নসীহত করতে গিয়ে বলেন, সারা দুনিয়া থেকে যদি শরহেজামী কিতাবটি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয় আর আমাকে কোনো ছাত্র এসে বলে, হযরত! শরহেজামীর প্রয়োজ, তাহলে আমি আমার স্মৃতি থেকে তাকে কিতাবটি হুবহু লিখে দিত পারব।

তো আমি বলতে চেয়েছি, মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে-বিষয়টি দরকার, তাহলো আদব। আদব অর্জিত হলে ইল্ম আগমনের দুয়ার খুলে যায়। আদব ছাড়া বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করা যাবে। তবে সেই ইল্মকে ইল্মে নাফে' বলা যাবে না এবং তা ইল্মে নাফে' হবেও না।

ইল্মে নাফে' প্রাপ্ত হলে আমল নসিব হবে

ইল্মে নাফে'-এর পরিচয় হলো, মানুষ তার ইল্ম অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য লাভ করবে। ইল্মে নাফে'-এর পরিচয় হলো, কোনো মানুষ জানে, সব ধরনের জ্ঞান তার আছে; কিন্তু ইল্ম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক তার হয়নি বা হচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে, তার ইল্ম ইল্মে নাফে' নয়। হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) একবার ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, ইল্ম কাকে বলে? তখন নানাজন নানা জবাব দিল। হযরত বললেন, দেখো, ইল্ম ওই নূরের নাম, যা অর্জিত হওয়ার পর তদনুযায়ী আমল করা ছাড়া বান্দা শান্ত ও স্থির হতে পারে না। তো যে ইল্মের ওপর আমল করার তাওফীক নসিব হয়ে যাবে, তাকে ইল্মে নাফে' বলা হয়। কোনো এক বুযুর্গ বলেছেন–

اَلْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلَا ثَمَرٍ

'আমল ছাড়া ইল্ম ফলবিহীন বৃক্ষের মতো।'

আমলে হেকমত মিলে

আদব দ্বারা ইল্মে নাফে' আর ইল্মে নাফে দ্বারা আমলের তাওফীক হয়। আর আমল দ্বারা লাভ হয় হেকমত। দুটিই মহাপ্রাপ্তি। আল্লাহর পক্ষে থেকে তা পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

'যে হেকমত প্রাপ্ত হলো, সে মহাদান ও অত্যধিক কল্যাণ প্রাপ্ত হলো।'[১]

এটি এমন নেয়ামত, যার দ্বারা বান্দা সময়ের সাথে-সাথে সর্বপ্রকার বিষয়ের তথ্য ও মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে পারে। দীনের দাঈর জন্য এটি আবশ্যিক বিষয়। ইরশাদ হচ্ছে–

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

'আপন রবের দিকে ডাকুন হেকমত ও সুন্দর বয়ানের দ্বারা।'[২]

এখানে প্রথমে হেকমতের কথা বলা হয়েছে। (বাংলায় হেকমত মানে কৌশল। অর্থাৎ কোন কথাটা কিভাবে বলতে হবে সেই মর্ম উপলব্ধিকে বলা হয় হেকমত) আমলের দ্বারা-ই বান্দা এই হেকমত প্রাপ্ত হয়।

হেকমত কাকে বলে?

হেকমত প্রাপ্তির আলামত হচ্ছে, বান্দা দীনের বিষয়ে বুঝবান হবে। তার কাছে দীনের বিষয়গুলো আলোর মতো স্পষ্ট থাকবে। সর্বপ্রকার সংশয়-সন্দেহ অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যাবে। দীনের কোনো বিষয়ে তার কোনো প্রশ্ন থাকবে না। তখন তার স্বভাবজাত ক্রিয়াই শরীয়ত হয়ে যাবে। তার প্রতিটি কাজই শরীয়ত মোতাবেক হবে। আল্লাহ তার হৃদয়ে সর্বপ্রকার বিষয় উদ্ভাসিত করে দেবেন।

আমাদের হযরতের মাদরাসয় একজন ওস্তাদ ছিলেন মাদানী (রহ.)-এর শাগরেদ। মাদানীর কাছে তিনি দেওবন্দে পড়াশোনা করেছেন। তিনি দু-বছর দেওবন্দে ছিলেন; কিন্তু মাদানীর কাছে বাইআত হওয়ার সাহস তার হয়নি। যেদিন হযরত মাদানীর ওফাত হলো, সেদিন তো তার মাথায় পাহাড় ভেঙে পড়ল। পরে অনেক দিন পর্যন্ত কান্নায় বিভোর ছিলেন তিনি। একদিন তিনি আমাকে বললেন, আপনি আমাকে বাইয়াত করে নিন। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলাম যে, আপনি হচ্ছেন হাদীছ পড়ানোর লোক, আমার ওস্তাদতুল্য। কী করে আমি আপনাকে বাইয়াত করাই। আমি বারবার মানা করছি দেখে তিনি কেঁদে দিলেন।

মাঝে-মাঝে তিনি বিস্ময়কর কথা বলতেন। একবার বললেন, হযরত! আমি আপনাদের আমার চোখে দেখা একটি ঘটনা শোনাব। আমি বললাম,

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৯
২. সূরা নাহল : আয়াত ১২৫

ঠিক আছে শোনান। বললেন, আমরা দারুল উলূম দেওবন্দে ছিলাম। হাদীছের সবক খতমের সময় কাছাকাছি ছিল। সৌদি আরব থেকে কিছু আলেম এলেন। বললেন, আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে ইলমি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে চাই। আমরা কয়েকটা প্রশ্ন করব; আপনারা উত্তর দেবেন।

নাযেমে তা'লীমাত সাহেব (শিক্ষাসচিব) বললেন, বলুন, আপনাদের কী প্রশ্ন। তারা বললেন, হাদীছে আছে بناء على القبور অর্থাৎ– কবরের ওপর দালান নির্মাণ জায়েয নেই। তাই আমরা জান্নাতুল বাকীর সব ইমারত ভেঙে দিয়েছি। এখন নবীজির সবুজ গম্বুজের পালা। এটিও কি ভেঙে ফেলা হবে? রাষ্ট্রপক্ষ আমাদেরকে এর সমাধানের জন্য বিভিন্ন দেশের ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পাঠিয়েছেন। সবাই যা সিদ্ধান্ত দেবে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতেই আপনাদের কাছ এসেছি।

নাযেম সাহেব বললেন, তিন দিনের মধ্যে বড় একটা কনফারেন্স ডেকে সকল ওলামায়ে কেরামের সাথে মাশওয়ারা করে এ বিষয়ের সুরাহা করব। নাযেম সাহেব অতি দূত এ সংবাদ দেশময় ছড়িয়ে দিলেন। সমগ্র এলাকা থেকে আলেমগণ দারুল উলূম দেওবন্দে একত্রিত হলেন। পুরো দারুল উলূম ওলামায়ে কেরামের পদভারে এমন মুখর হয়ে উঠল, যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। কেউ হাদীছ পড়তে থাকলেন। কেউ পরস্পর পর্যালোচনা করতে থাকলেন। কেউ ব্যখ্যাগ্রন্থ অধ্যায়ন করতে থাকলেন। সারাটা রাত ওলামায়ে কেরাম নবীজির রওজা বিষয়ে দু'আ-মুনাজাত ও কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলেন।

কানায়-কানায় পূর্ণ ওলামায়ে কেরামের সেই কনফারেন্সে আবারও সেই আরব মেহমানগণ তাদের প্রশ্ন উত্থাপন করে বললেন, এখন নবীজির রওজা শরীফের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেব? এই সবুজ গম্বুজ কি ভেঙে ফেলা হবে, নাকি আপন অবস্থায় বহাল রাখা হবে? প্রশ্ন করেই আরব মেহমান বসে গেলেন। সমগ্র মজলিস ও কনফারেন্স হলে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। ওলামায়ে কেরাম হেঁচকি মেরে-মেরে কাঁদতে লাগলেন। কেউ উত্তর দিতে দাঁড়ালেন না।

শেষ পর্যন্ত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) উত্তর প্রদানমূলক ভাষণ শুরু করলেন। বলতে শুরু করলেন,

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার দিলে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন যে, আপনারা যে-হাদীছ বলেছেন, তা একেবারেই সহীহ। এর সনদের ব্যাপারেও কোনো জরাহ-তাদীল বা সমালোচনার সুযোগ নেই। হাদীছের মতনও সহীহ। কোনো দুর্বলতাও নেই। بناء على القبور তথা কবরে স্মৃতিস্তম্ভ ও কবর ইমারত করার কোনো অনুমতি নেই।

আরবরা বললেন, যদি হাদীছ সহীহ হয়, তাহলে কি সবুজ গম্বুজ ভেঙে দেব? হযরত থানভী বললেন, না নবীজির রওজার সবুজ গম্বুজ ভাঙা যাবে না। আরব মেহমান বললেন, তার ব্যাখ্যা কী? আপনার মাকসাদ কী? হযরত থানভী বললেন, দেখুন ভাইয়েরা! কবরে স্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি নেই এই হাদীছ সহীহ। কিন্তু নবীজির সবুজ গম্বুজ ভাঙা যাবে না। কারণ, নবীজির রওজার ওপর স্থিত এই ইমারত তো بناء على القبور তথা কবরের প্রাসাদ নয়। এটি ছিল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর হুজরা। আর ঘরের ভিত্তি তো আগে হয়েছে; পরে তাতে কবর নির্মিত হয়েছে। কবরের ওপর কোনো ছাদ ও প্রাসাদ তৈরি করা হয়নি। আগেই এখানে ছাদ ও গৃহ নির্মিত ছিল। এই নির্মিত ঘরের মধ্যেই পরে কবর নির্মাণ করা হয়েছে। তাহলে বলুন, আপনারা কেন সেই নির্মিত ঘরে স্থাপিত কবরের ওপর থেকে ঘরের ছাদটি ভেঙে দেবেন?

পুরো মজলিস খুশির কান্নায় গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। সবাই বড় সান্ত্বনা পেল। আরব মেহমানরা বড় বিস্ময়ের সঙ্গে জবাবটি মেনে নিল। এই ব্যাখ্যায় সারা দেশের সব ওলামায়ে কেরাম আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। সকল মানুষ এত সুন্দর সমাধানে শুকরিয়া আদায় করল। আরব-অনারব সকলে এই সিদ্ধান্ত মাথায় তুলে নিয়ে ফিরে গেলেন। আজও এই সবুজ গম্বুজ যথাস্থানে বিদ্যমান। এটি ওলামায়ে দেওবন্দের খেদমতের একটি নিশানা।

তাই বলছিলাম, আদব দ্বারা মানুষ ইল্‌মে নাফে' প্রাপ্ত হয় আর ইল্‌মে নাফে' দ্বারা আমলের তাওফীক প্রাপ্ত হয়। আমল দ্বারা হেকমত প্রাপ্ত হয় আর এই যে হযরত থানভীর উক্ত ব্যাখ্যা এটি তো ছিল তাঁর আমলের বরকতে প্রাপ্ত একটি বিশাল হেকমত।

হেকমতের সুফল দুনিয়াবিমুখতা

এই হেকমতই হচ্ছে খাইরে কামাল তথা চূড়ান্ত কল্যাণ। এই হেকমতের বিনিময়ে মানবহৃদয় উদ্ভাসিত হয়, আলোকিত হয়। মনের দুয়ার খুলে যায়।

এই হেকমত প্রাপ্ত হলে দুনিয়াকে বড়ই তুচ্ছ মনে হয়। কারণ, জ্ঞানবান মানব সে, যে দুনিয়ার তুচ্ছতা বুঝতে পারে। ফোকাহয়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে আর তার রেখে-যাওয়া-সম্পদ বন্টন করতে হয় এবং সে ওসিয়ত করে যায়, আমার রেখে-যাওয়া-সম্পদগুলো জ্ঞানবান লোকদের মাঝে বন্টন করে দিয়ো, তাহলে ফতাওয়া হলো, তার সম্পদ দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।

দুনিয়াবিমুখতার সারকথা

দুনিয়াবিমুখতা কাকে বলে? দুনিয়ার মজা পরিত্যাগ করাকে কি দুনিয়াবিমুখতা বলে? অনেকে তা-ই মনে করে । তারা মনে করে, দুনিয়া ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে হবে, পাহাড়ে চলে যেতে হবে। না; একে দুনিয়া পরিত্যাগ বলে না। আপনি দুনিয়ার মাঝেই অবস্থান করে আল্লাহর হক আদায় করছেন। আবার বান্দার হকও আদায় করছেন। তাহলে নরম গদিতে, ফুলের শয্যায় শয়ন করলেও আপনি আল্লাহকে পাবেন। তবে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ না থাকতে হবে। আপনার দিল চাওয়া ছাড়া যা পেয়ে যাবেন, তাকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করবেন। তবে দুনিয়ার পেছনে ছুটবেন না। একে বলা হয় দুনিয়ার স্বাদ ও মজা পরিত্যাগ করা। দুনিয়ার ভালো খাবার ছেড়ে দেওয়ার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়। বরং দুনিয়াবিমুখতা হলো, যে খাবার শরীয়তে নাজায়েয, তা পরিত্যাগ করো আর শরীয়ত যেসব খাবার হালাল বলেছে, তা ভক্ষণ করো। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, বিয়ে করা যাবে না, স্ত্রীর কাছে গমন করা যাবে না। এর নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়।

এক ব্যক্তির ঘটনা। নদীর পাশে তার বসবাস। নদীর ওপারে তার একটি মামলা ছিল। তাই তার নদী পার হওয়া খুবই জরুরি ছিল। লোকটা তার এলাকার বুযুর্গের কাছে গেল। নদীতে তখন উথাল পানি। বুযুর্গ যেন দু'আ করে দেন। বুযুর্গের স্ত্রী-বাচ্চা সবাই ছিল বুযুর্গ। তিনি কিছু হাদিয়া দিয়ে বললেন, নদীর অপর তীরে এক বুযুর্গ আছেন। এই হাদিয়াটুকু তাকে দেবে। নদীর পাড়ে গিয়ে বলো, আমাকে এমন একজন লোক পাঠিয়েছেন, যিনি কোনোদিন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করেননি। অথচ এই বুযুর্গের ৫/৭ জন সন্তান রয়েছে। লোকটি বিস্মিত হলো এবং গিয়ে নদীকে হুবহু তা-ই বলল। আল্লাহর শান দেখুন। দরিয়ায় রাস্তা হয়ে গেল। লোকটি অপর পাড়ে গেল এবং ওখানকার বুযুর্গকে হাদিয়া দিয়ে দিল। ফেরার পথে এই বুযুর্গকে নদী

পার হওয়ার কথা বলল। বুযুর্গ বললেন, নদীর তীরে গিয়ে বলো, আমাকে ওই লোক পাঠিয়েছেন, যিনি কোনো দিন খাবার খাননি।

লোকটা অবাক হলো। এইমাত্র খানা খেয়ে বলে কিনা খানা খায়নি! লোকটি নির্দেশমতো নদীকে বলল। নদীতে রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। সে নদী পার হয়ে চলে এল। গিয়ে আগের বুযুর্গের কাছে আজকের এই ঘটনা ও কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইল। বুযুর্গ বললেন, এর অর্থ হলো, তিনি যে-খাবার খান, তা আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে খান। ভোগ-বিলাসিতার জন্য নয়।

وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

'তোমার ওপর তোমার নিজেরও হক আছে।'

তো নিজের প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য নয়– আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য তিনি খাবার খান। আর আমি যে জীবনে কোনোদিন স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করিনি বলেছি, তার ব্যাখ্যা হলো, কখনও নিজের খায়েশ পূরণের জন্য আমি স্ত্রীর সাথে মিশি না। বরং আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার স্ত্রীর হক পালনার্থে তার সাথে মেলামেশা করি।

এই ঘটনা দ্বারা দুনিয়াবিমুখতার রূপরেখা সহজে বোঝা যায়। কেউ সুন্দর কাপড় পরল মানুষকে দেখানোর জন্য। তার এটা দুনিয়ার মজা। আর কেউ আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য পরিধান করল। এরপরও সে দুনিয়াবিমুখ। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন–

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

'প্রত্যেক নামাযের সময় সৌন্দর্য ধারণ করো (এটাই পথ)।'[১]

দুনিয়াত্যাগের ফলে আখেরাতের ভাবনা নসিব হয়

দেখুন, একজন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথমেই আদব থাকতে হয়। আদবের বিনিময়ে ইল্‌মে নাফে' নসিব হয়। ইল্‌মে নাফে'-এর বিনিময়ে আমলের তাওফীক লাভ হয়। আমলের বরকতে আল্লাহ মানুষকে হেকমত দান করেন। আর হেকমতের নূর মানবতার মাঝে দুনিয়ার মর্ম ও তত্ত্ব স্পষ্ট করে দেয়। ফলে মানবাত্মা দুনিয়াবিমুখ হয়ে ওঠে এবং আখেরাতের ভাবনা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। বোঝা গেল, দুনিয়াবিমুখতার দ্বারা মানুষ انابه الى الاخرة তথা

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৩১

আখেরাত-অভিমুখী হওয়ার তাওফীক পায়, التجافى عن دار الغرور। (ধোঁকার এই দুনিয়া থেকে হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। والانابة الى دار لخلود তথা স্থায়ী আবাস জান্নাতের অভিমুখী হওয়া তার নসিব হয়। হযরত হাসান বছরি বলেন, আমরা তাছাওউফের নেয়ামত অযিফা দ্বারা পাইনি। পেয়েছি তরকে দুনিয়া আর নফসের বিরোধিতা করার দ্বারা। আল্লাহ আমাদের নসিবেও এই নেয়ামত দিয়ে দিন। দুনিয়ার ঝাঁকজমক আমাদের প্রতারিত না করুক ।

আখেরাতের ধ্যানেরই নাম আল্লাহর নৈকট্য

যে-বান্দার انابة الى الاخرة তথা আখেরাতের অভিমুখী হওয়ার নেয়ামত নসিব হয়ে যাবে এবং সে আখেরাতের আমল শুরু করে দেবে তাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের নৈকট্য অর্জনের নেয়ামত দান করবেন। যে আখেরাতের ধ্যানে বিভোর থেকে আপন রবের ইবাদত, দীনের খেদমত ও আমলে সালেহর মাঝে মশগুল থাকবে, তাকে বিনিময়ে আল্লাহ আপন নৈকট্য দান করবেন। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِالنَّوَافِلِ

'আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার কাছাকাছি চলে আসে।'[১]

আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে। ভাইয়েরা! আমার কথার মর্ম এ নয় যে, আপনি ফরজগুলো ছেড়ে দিয়ে শুধু নফলে মশগুল থাকবেন এটা নয়। বরং ফরজ আদায়ের পাশাপাশি নফল আদায় করতে হবে। ইশরাক পড়তে হবে, চাশত পড়তে হবে, আওয়াবীন পড়তে হবে, তাহাজ্জুদ পড়তে হবে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়তে হবে, তাহিয়্যাতুল উজু পড়তে হবে। দিলে ইবাদতের আগ্রহ এমন রাখবে যে, নেক কাজ তবিয়ত ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। যখনই সুযোগ হবে, নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যাবেন।

তো বোঝা গেল, বান্দা যখন আখেরাতের ভাবনায় বিভোর হয়ে নেক আমল করতে থাকবে, তখনই আল্লাহ তাকে নৈকট্য দান করবেন, নিজের কাছে স্থান দেবেন, কুদরতি কোলে টেনে নেবেন।

---

১. আল-আহকামুশ কারণয়্যাহ ৩/২৬০

নেওয়ার তরিকা দুটি

নেওয়ার তরিকা দুটি। একটি হলো নিয়মের তরিকা। একটি হলো সম্পর্কের তরিকা। সম্পর্কের মাধ্যমে নেওয়া যেমন একজন চাকর তার মালিকের কর্মস্থলে ডিউটি করল ৮ ঘণ্টা এবং মাস শেষ ৮ ঘণ্টা হিসাবে নির্ধারিত বেতন নিয়ে নিল। মনে করুন, সেই বেতন ৮ হাজার টাকা। হঠাৎ তার বোনের বিবাহ ঠিক হলো বা মা অসুস্থ হয়ে গেল। মালিক বিষয়টি শুনলেন। চাকর মালিককে বিস্তারিত অবস্থা জানাল। এখন মালিক তার মর্জিমতো মনে করুন ২০ হাজার টাকা অতিরিক্ত দিলেন। তো এই দান সম্পর্কের মাধ্যমে, সর্ম্পকের কারণে। এত দিন ৮ ঘণ্টা ডিউটি করে মাসে পেত ৮ হাজার টাকা আর এখন দুমিনিট কথা বলে সর্ম্পকের কারণে, মালিক-চাকরের পরিচয়ের কারণে পেয়ে গেল ২০ হাজার টাকা।

সম্পর্কের দ্বারা নেওয়া

বান্দা যখন নফল পড়ে, তেলাওয়াত করে, তখন বান্দা যেন সেই সম্পর্কের মাধ্যমে নিচ্ছে ও গ্রহণ করছে। এখন বুঝে এসে গেল, কেন বলা হয় ইশরাক পড়লে এক হজ ও এক ওমরার ছাওয়াব হবে। একটি হজ ও ওমরা করতে অনেক টাকা খরচ হয়। শারীরিক বহু কষ্ট করতে হয়। তার পরই ছাওয়াব পাওয়া যায়। তা-ও সামান্য নিয়তের গড়মিল হলে সব বরবাদ হয়ে যায়। এটা হলো নিয়ম অনুযয়ী প্রাপ্তি। আর একেবারে একটা কবুল হজের ছাওয়াব পেয়ে যাওয়া এটা সম্পর্কের কারণে প্রপ্তি। আর সম্পর্কের কারণে কত দেবেন মালিক তার হিসাব তো কেউ জানে না।

একজন শ্রমিক মালিকের ৮ ঘণ্টার কাজ ৮ ঘণ্টা-ই করল। সব শ্রমিক তখন চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই শ্রমিক আট ঘণ্টার পরও আরও কিছু সময় মালিকের কাজ করে দিল। প্রতিদিনই দেয়। মালিক বিষয়টি দেখলেন। শ্রমিককে ডাকলেন। বললেন, কী করছ তুমি এখনও? শ্রমিক বলল, সময় হয়ে গেছে বলে সকলেই তো চলে গেছে। আমি দেখলাম, কিছু মাল বাইরে রয়ে গেছে। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। মালগুলো তো নষ্ট হয়ে যাবে। তাই একটু গুছিয়ে যাচ্ছি। বলুন, সামান্য এই কাজটুকুর কারণে মালিক তাকে কত ভালোবাসবেন? সারা দিন কাজ করার কারণে কোনো ভালোবাসাই মালিকের মনে জন্ম নেবে না। কিন্তু এই একটু কাজের জন্য অনেক ভালোবাসা জন্ম নেবে মালিকের মনে। মালিক এখন তাকে নৈকট্য দান করবেন, তাকে আপন বানিয়ে নেবেন এবং অঢেল পুরস্কার দেবেন। ঠিক তেমনি ফরজ আমল তো

আমাদের দায়িত্ব। ফরজ আমলের পর যদি মালিক আল্লাহকে সামান্য নফল ইবাদত করে দেখানো যায়, তাহলে আল্লাহ এত অফুরন্ত ভালোবাসা দেবেন বান্দাকে, যে ভালোবাসা বান্দা সারা দিনের ফরজগুলো আদায় করেও পায়নি। এমন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা অনেক ভালোবাসেন।

বান্দার আমল ফেরেশতাদের দেখানো

হাদীছ শরীফে এর দলিল পাওয়া যায়। একবার একটি বাহিনী রাতের বেলা সফর করছিল। তারা ক্লান্ত হয়ে গেলে এক পর্যায়ে নিদ্রা প্রবল হলো। একস্থানে সকলে থামল। অল্পসময়ের মধ্যেই সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। মাত্র একজন বান্দা উজু করে মশগুল হয়ে গেল নফল নামাযে। বর্ণিত আছে, আল্লাহ ফেরেশতাদের নিয়ে ওই বান্দার ব্যাপারে গর্ব করে বলেন, দেখো-দেখো, এ তো ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিল। তবু আমার ভালোবাসায় সে জেগে আছে, আমারই প্রেমে সে নামায পড়ছে। এভাবে যে আল্লাহর মহব্বতে নফল ইবাদত করবে, তাকেই আল্লাহ তা'আলা এভাবে মূল্যায়ন করেন।

সারকথা

আজকের আলোচনার সারকথা দাঁড়ালো এই' যে, আদবের দ্বারা মানুষ ইল্‌মে নাফে পায়। ইল্‌মে নাফে' দ্বারা আমল করার তাওফীক পায়। আমলের বরকতে মানুষ হেকমত তথা মর্ম ও জ্ঞান লাভ করে। আর এই হেকমত দ্বারা বান্দা দুনিয়াকে তুচ্ছ ভাবতে শেখে, আখেরাতমুখী হতে পারে। ফলে তার জন্য আমল করা সহজ হয়ে যায়। আর অধিক নফল ইবাদতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে নৈকট্য দান করেন।

দোতরফা ভালোবাসা

এর মাঝে মজার কথা হলো, যে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে নিজের কাছে টেনে নেন। দুনিয়াতেও তো একজন আরেকজনকে যদি ভালোবাসে আর দ্বিতীয়জন যদি তার এই ভালোবাসায় সাড়া দেয় এবং ভালোবাসার আচরণ দেখায়, তাহলে দারুণ মজা অনুভূত হয়।

دونوں طرف ہے اگ برابر لگی ہوئی

'উভয় দিক থেকেই জ্বলছে প্রেমের আগুন।'

এদিকেই প্রেমের আগুন জ্বলছে, ওদিকেও প্রেমের আগুন জ্বলছে। এদিক থেকেও ভালোবাসা, ওদিকে থেকেও ভালোবাসা। আর আল্লাহর প্রেমের ব্যাপারটা-ই আলাদা। বান্দার আল্লাহকে যতখানি ভালোবাসেন, আল্লাহ বান্দাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। হাদীছে কুদসীতে আছে,

أَنَا إِلَيْهِ لَأَشَدُّ شَوْقًا

'আমি তার প্রতি আরো তীব্র অনুরাগী হই।'

আল্লাহু আকবার! বান্দা আল্লাহকে যতটুকু ভালোবাসে, আল্লাহ তার প্রতি তার চেয়েও অধিক ভালোবাসেন। হাদীছে বর্ণিত আছে–

وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا

'যদি বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে এক কদম বাড়ে, আমি তার দিকে দুই কদম বাড়ি।'

وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا

'যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'

আল্লাহ তা'আলা এমন দয়ালু আমাদের ব্যাপারে। তাই বলছি বন্ধুরা! বেশি করে নেক আমল করুন। আল্লাহ অতিসত্তর তাঁর নৈকট্য দান করবেন। আমাদের দুর্বল ও খাঁদযুক্ত আমল আল্লাহর সামনে পেশ করার উপযোগী নয়। আর তাই আমাদের আমলগুলো নিখুঁত করতে হবে।

ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর দু'আ

তাহাজ্জুদ নামায পড়ব। তাহাজ্জুদের পর আল্লাহর সামনে আঁচল পেতে ধরব। আল্লামা শামী (রহ.) একটি কথা লিখেছেন। বলেছেন, ইমাম আযম আবুহানিফা (রহ.) শতবার আল্লাহর দিদার লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১০০তম বারে তিনি আল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যার দ্বারা আপনার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর আল্লাহর নৈকট্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তো ইমাম আযমের প্রশ্নে আল্লাহ বললেন, তাহাজ্জুদের সময় এই দু'আটি পাঠ করবে।

سُبْحَانَ الْاَبَدِيِّ الْاَبَدِ

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ

سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ

سُبْحَانَ رَافِعِ السَّمَآءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْاَرْضَ عَلٰى مَآءٍ جَمَدٍ

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَاَحْصَاهُمْ عَدَدًا

سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَلَمْ يَنْسَ اَحَدًا

سُبْحَانَ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا

سُبْحَانَ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি থাকবেন আজীবন।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি একক।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি একজন এবং অমুখাপেক্ষী।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি আসমানকে স্তম্ভ ছাড়াই ঝুলিয়ে রেখেছেন।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি যমিনকে পানির ওপর বিছিয়েছেন।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের গণনার আওতায় এনেছেন।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি রিযিক বণ্টন করেন এবং কাউকে ভোলেন না বঞ্চিত করেন না।

ওই সত্তা পবিত্র, যার স্ত্রী নেই এবং কোনো সন্তানাদিও নেই।

ওই সত্তা পবিত্র, যিনি কারও থেকে জন্মাননি এবং কাউকে জন্মও দেন না।

আমাদের উচিত নেক আমলও করা এবং তাহাজ্জুদের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করা। তারপর আঁচল পেতে ধরবে, আল্লাহর কাছে চাইবে, হে আল্লাহ! দুনিয়ার বাদশাহরা তাদের দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছে; কিন্তু তোমার দরজা খোলা। তোমার সামনে আঁচল পেতে ধরলাম। আমি তোমার ছায়া ও দয়া পেতে তোমারই সামনে আঁচল পেতেছি। হে আল্লাহ! আমি এই তাহাজ্জুদের সময় কাঁদছি। তোমার কাছে হাত পেতেছি। আমাকেও তোমার নৈকট্যপ্রাপ্ত

বান্দাদের মাঝে শামিল করো। আমাদের সকলকে তোমার নৈকট্য দান করো। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

তাওবার দর্শন

'এক হচ্ছে গুনাহ, আরেক হচ্ছে অবাধ্যতা। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান আছে বিস্তর। গুনাহ হচ্ছে নিজের নফসের কারণে অন্যায় করে ফেলা, কিন্তু নিজেকে অপরাধী মনে করা। আর অবাধ্যতা হচ্ছে অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে না মানা। অন্যায়কে ন্যায় মনে করা এবং নিজে সঠিক কাজ করছে বলে মনে করা, নিজের করা কাজকেই সম্পূর্ণ ঠিক মনে করা। এ বিষয়ে এখানে আলোচনা হবে।'

তাওবার দর্শন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

গুনাহ্ কাকে বলে?

আল্লাহর যে-সৃষ্টি শুধুই ভালো কাজ করে, তারা হচ্ছে ফেরেশতা। যে-সৃষ্টি শুধুই ক্ষতি করে, তার নাম শয়তান। আর যে-সৃষ্টি কল্যাণ ও অকল্যাণ, নেক ও গুনাহের মিশেলে সৃষ্ট, তারা হচ্ছে মানুষ। মানুষ অনেক সময় পরিবেশ এবং নানা ঘটনা ও পরিস্থিতির শিকার হয়ে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে ফেলে। একে গুনাহ বলে। আল্লাহর হুকুম ও নবীর সুন্নত অমান্য করা হচ্ছে গুনাহ। গুনাহ করলে মানুষ ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। আর নেক কাজ করলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরি হয়। গুনাহের কারণে মানবজীবনে বেবরকতি নেমে আসে আর নেক কাজের কারণে মানবজীবন বরকতময় হয়ে যায়। গুনাহের কারণে মানুষ অপমানিত হয় আর নেক কাজ দ্বারা মানুষ সম্মানিত হয়।

তাওবা কাকে বলে?

যে-মানুষ গুনাহ করে ফেলল, এখন এই গুনাহ থেকে সে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং নেক জীবন কীভাবে শুরু করতে পারে, তার জন্য আমল করাকে তাওবা বলে।

هِيَ رُجُوْعُ الْعَبْدِ اِلَى اللّٰهِ

'তাওবা হচ্ছে বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরে গুনাহ পরিত্যাগ করে আল্লাহর কাজে মশগুল হওয়ার নাম।'

একেই এক কথায় তাওবা বলে।

তাওবার গুরুত্ব

তাওবা করা প্রত্যেক বান্দার জন্য জরুরি। যে-বান্দা কবীরা গুনাহে পতিত হয়ে যায়, সে তার থেকে তাওবা করে নেবে। যে শুধু সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে, সে-ও তার থেকে তাওবা করে নেবে। যে গাফলতির মাঝে ডুবে আছে, সে গাফলত থেকে তাওবা করে নেবে। যে-বান্দার দিলে নফসের কুপ্রবৃত্তি প্রবল, শয়তানী কর্মের আকর্ষণ তীব্র, চিন্তাচেতনা ও ধ্যানধারণা খারাপ, সে তার থেকে তাওবা করবে।

সুতারং বোঝা গেল, চূড়ান্ত অন্যায়কারীও তাওবা করতে হবে এবং সাধারণ অন্যায়কারীও তাওবা করতে হবে। সালেকদের জন্যও তাওবা জরুরি। ওয়াসেলদের জন্যও জরুরি। শিষ্যদের জন্যও জরুরি, গুরুদের জন্যও জরুরি।

তাওবার আলোচ্যবিষয়

তাওবা সবসময়কার আলোচ্যবিষয়–

مَوْضُوْعُ السَّاعَةِ وَكُلِّ سَاعَةٍ

'আজকেরও আলোচ্য, প্রতিটি মুহূর্তেরও আলোচ্য।'

كَيْفَ اَعُوْدُ اِلَى اللهِ

'আমি কিভাবে আল্লাহর দিকে ফিরতে পারব?'

মানবের তো নেয়ামত একটাই– আল্লাহর অভিমুখী হওয়া। তার চিন্তা যদি তাকে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়, গুনাহের পর লজ্জিত হয়, তার ভাবনায় এটা আসে যে, এমনটা করা আমার পক্ষ থেকে উচিত হয়নি, তার অন্তরে এই যে অনুতাপ সৃষ্টি হলো, এখন সে কীভাবে তাওবা করবে? এটি একটি স্বতন্ত্র আলোচনা, যা বুঝবার মতো বিষয়। জীবনের এটি একটি অধ্যায়।

আল্লাহর ও বান্দার মাঝে দশটা প্রতিবন্ধক

এখানে আগেই একটি কথা বলে দেওয়া জরুরি যে, গুনাহের কারণে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কিছু পর্দা পড়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

اَلْحَجَبُ الْعَشْرُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ

'বান্দা ও আল্লাহর মাঝের প্রতিবন্ধক দশটা।'

এই পর্দাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ছিঁড়ে ফেলতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর দিদারে ধন্য হতে পারব না। সেই পর্দাগুলোর আলোচনা এখানে করা হচ্ছে। দিলের কান দিয়ে শুনুন।

প্রথম পর্দা আল্লাহর সম্পর্কে অজ্ঞতা : প্রথম পর্দা اَلْجَهْلُ بِاللهِ বা আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞতা। আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে যে-বান্দার সঠিক ধারণা ও জ্ঞান থাকবে না, তার মাঝে জাহেলিয়্যাত থাকবে। সে জানতেই পারবে না, আল্লাহ তাওবা কবুলকারী। কোনো মানুষ যত বড় গুনাহই করুক না কেন, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। যদি সে তাওবা করে নেয়, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেবেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হে আমার বান্দা! যদি তুমি জমিন ও আসমানের মধ্যবর্তী শূন্য জায়গা পরিমাণও গুনাহ কর আমি তোমার এই অসীম গুনাহও মাফ করে দেব। তবুও আমার কোনো কিছুই হবে না। মানুষ যত গুনাহই করুক, আল্লাহর রহমত তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তো আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ যত বেশি জানতে পারবে, তাঁর রহীম হওয়ার সম্পর্কে, তাঁর রহমান হওয়া সম্পর্কে, তাঁর ধৈর্যশীল ইত্যাদি যত গুণ আছে, সেগুলো সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারবে, ততই সে মজবুতভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে চাইবে। এর জন্য প্রচেষ্টা করবে সে।

কিন্তু অজ্ঞতা এই চেষ্টা করতে দেয় না গুনাহগারকে। তা না হলে তো একটা ভুল করেই মানুষ ভাবত, আমাকে তো মরতে হবে। তাই অন্যায় ছাড়তে হবে। তা না হলে আমাকে তো আযাব দেওয়া হবে। অথচ অনেকে মনে করে, যা করেছি তো করেছি। ভুল তো হয়ে গেছে। আরও কিছু করি। আযাব যেহেতু দেওয়া হবে, আগুনে যেহেতু পুড়তেই হবে তো আরও কিছু করি। দুনিয়াটা ভোগ করে যাই। তার এমন ভাব ও ভাবনাকে শয়তান কাজে লাগায়। শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়, জাহান্নামে তো যেতে হবেই। যে-গুনাহগুলো করতে পারনি, সেগুলোও করে নাও। এভাবে শয়তান তার জন্য গুনাহের পথ খুলে দেয়। অথচ সে তাওবা করলে মাফ চেয়ে ফিরে এলে

গুনাহের সেই পথটা বন্ধ হয়ে যেত। জাহালাতের পর্দা পড়ে গেছে। তাই সে বোঝে না। বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না। তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী পর্দা তৈরি হয়ে গেছে। আল্লাহ যে সাত্তার– সব গুনাহ তার লুকিয়ে রাখবেন এ বিষয়ে সে অজ্ঞতার মাঝে ডুবে গেছে। আল্লাহ যে গাফ্ফার, রহমান– দয়া করে তার গুনাহ তিনি মাফ করে দিতে পারেন, সে কথা সে ভুলে গেছে। তার মাঝে এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির মাঝে পর্দা পড়ে গেছে। ফলে সে রবের দিকে ফিরে না এসে আরও অন্যায়ে ডুবে গেছে, আরও পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে।

জ্ঞানী ও সহনশীল সত্তা আল্লাহ

আল্লাহর বড় মজার দুটি সিফাত আছে। সিফাত দুটির আলোচনা আল্লাহ তা'আলা একই স্থানে উপস্থাপন করেছেন–

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

'আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সহনশীল।'[১]

عَلِيْمٌ মানে তিনি সর্ববিষয় জানেন। এমনকি হৃদয়ের গভীরের কথাও তিনি জাননে। বান্দা এখন কোন গুনাহের ফন্দি আঁটছে, তা-ও তাঁর জানা। তিনি সহনশীল। অর্থাৎ– বান্দা গুনাহ করে; তবু তিনি সহ্য করেন– আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন না বান্দাকে। তিনি সুযোগ দেন। সর্ববিষয় অবগত হয়েও সহনশীল থাকা বড়ই আজব বিষয়। এটি আল্লাহর শান। অন্যথায় বাবা যদি জানতে পারে, আমার ছেলে আমারই বিরুদ্ধে কথা বলে, তাহলে তো বাবা-ই তার ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেবে। আল্লাহ বান্দাকে দেখেন। বান্দার সর্ব বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। তবুও তিনি ধৈর্য ধরেন। তিনি সহনশীল থাকেন। আল্লাহ তাকে সুযোগ দেন। মৃত্যুর আগেও যদি তাওবা করে মাফ চেয়ে নিতে পারে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এত কিছু জেনেও আল্লাহ বান্দার জুলুম ও পাপাচার সহ্য করেন।

আল্লাহ হান্নান-মান্নান– সহানুভূতিশীল ও অনুগ্রহশীল

আল্লাহ তা'আলা হান্নান ও মান্নান। হান্নান বলা হয় তাঁকে, যিনি কাউকে রাগ হয়ে, অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যেতে দেন না– সহানুভূতি দেখান। আর মান্নান

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৫১

বলা হয় তাঁকে, যিনি অন্যোর ওপর অনুগ্রহ করেন। কেউ যদি আল্লাহর দুয়ারের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবুও আল্লাহ রাগ হন না। অথচ উচিত তো ছিল, যে তার থেকে মুখে ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি খতম করে দেবেন। কিন্তু তিনি সহানুভূতি দেখান। তিনি সহানুভূতিশীল। তিনি মহব্বতের সাথে বলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝

'হে মানুষ! দয়াময় আল্লাহ থেকে ফিরিয়ে কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকা দিয়ছে?'[১]

কেন রব থেকে সরে পড়েছো তুমি তো রবের আজমত ও বড়ত্বের কথা জান না।

মূর্খতা দূরত্ব তৈরি করে

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে তৈরি-হওয়া প্রথম পর্দাটা হচ্ছে অজ্ঞতা। আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে যে অজ্ঞ হয়ে যায়, সে মনে করে, আমি তো ধ্বংস হয়েই গেছি– যা পাপ আছে সব করে নেই। কথায় আছে–

اَلنَّاسُ اَعْدَاءٌ لِّمَا جَهِلُوْا

'মানুষ যে-বিষয়ে অজ্ঞ, সেই বিষয়ের শত্রু।'

তো মানুষ তার অজ্ঞতা ও জ্ঞানহীনতার কারণে আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ে। আরে ভাই! ভুল তো সব মানুষেরই হয় এবং হবেই। কম-বেশি সবারই হয়। কিন্তু তাই বলে ভুল হয়ে গেলে তাওবা করবে না? আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেবে না? তার এই ভুল থেকে, ভুলের পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার মাধ্যম হচ্ছে তাওবা– আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া।

পরিচয় ভালোবাসা তৈরি করে

যার ইল্‌ম আছে, যে আল্লাহ সম্পর্কে অবগত, সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

مَنْ عَرَفَ اللهَ يُحِبُّهُ

'যে আল্লাহকে চিনবে, তাঁকে সে মহব্বত করবেই।'

---

১. সূরা ইনফিতার : আয়াত ৬

এটা চূড়ান্ত বিষয় যে, যে আল্লাহর মারেফত অর্জন করতে পারবে, সে আল্লাহকে ভালো না বেসে স্থির থাকতে পারবে না। আর যে দুনিয়ার বিষয়ে অবগতি লাভ করবে, দুনিয়ার আসল রূপ দেখতে পাবে, সে দুনিয়াকে অপছন্দ না করে পারবে না। আল্লাহ তো এমন সত্তা, যে তাঁকে চিনতে পারবে, সে তাঁর নৈকট্য পাবে। মজার কথা হলো, কেউ যদি কোনো সৃষ্টিকে ভয় করে, তাহলে তার থেকে দৌড়ে পালায়। কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারটা ভিন্ন। যে আল্লাহকে ভয় পাবে, যে যত বেশি ভয় পাবে, সে আল্লাহর তত কাছে আসতে পারবে। আল্লাহ তো এমনই একটি মহান সত্তা! তাই বান্দার উচিত–

اَنْ يَّعْرِفَ عِزَّتَهٗ فِيْ قَضَائِهٖ

'আল্লাহর ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের ইজ্জত ও মর্যাদা আছে বলে জানবে।'

আল্লাহর ফয়সালার মাঝেই তার ইজ্জত রয়েছে এ কথা বিশ্বাস করবে।

وَبِرَّهٗ فِيْ سَتْرِهٖ

'নিজের কল্যাণ বোঝে আল্লাহর সাত্তার গুণের মাঝে।'

وَكَرَمَهٗ فِيْ قُبُوْلِ الْعُذْرِ

'আল্লাহর করম ও দয়াকে নিজের উযর কবুলের মধ্যে মনে করবে।'

وَفَضْلَهٗ فِيْ مَغْفِرَتِهٖ

'এবং তাঁর ক্ষমার মাঝে নিজের মর্যাদা লুকায়িত আছে মনে করবে।'

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা-ই হচ্ছে প্রথম পর্দা।

দ্বিতীয় পর্দা বেদআত : গুনাহের কারণে বান্দাও আল্লাহর মাঝে দ্বিতীয় যে-পর্দাটা পড়ে, তা হচ্ছে বেদআতে লিপ্ত হওয়া। গুনাহের কারণে অনেক সময় বান্দা বেদআতের কবলে পড়ে। দীন মনে করে কুসংস্কারে মশগুল হয়। এ-বিষয়টা বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে হটিয়ে দেয়। সে কারণে আমাদের এই নকশবন্দিয়া তরিকার মধ্যে সুন্নতের গুরুত্ব যত বেশি আলোচিত হয়, তার চেয়েও বেশি আলোচিত হয় বেদআত থেকে আত্মরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে।

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.), যিনি আমাদের সেলসেলায়ে আলিয়ার ইমাম, তাঁর লেখনীর মধ্যে বেদআতকে এমনাভাবে অপনোদন করেছেন যে, একজন মানুষ তা পড়ে বড়ই হতবাক হয়ে যায়।

তিনি বলেন, যে-জাতি বেদআতে লিপ্ত হয়, সেই জাতি থেকে আল্লাহ তা'আলা চিরদিনের জন্য একটা বেদআতের বিনিময়ে একটি সুন্নতকে উঠিয়ে নিয়ে যান। এ-জাতি সর্বদার জন্য এই সুন্নত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الْاِسْلَامِ

'যেব্যক্তি বেদআতীকে সম্মান দেখাল, সে ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার কাজে সহায়তা করল।'

তাই বেদআত থেকে আত্মরক্ষা করা একান্তই জরুরি। বোখারি শরীফে বর্ণিত আছে–

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ مَرْدُوْدٌ

'যেব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে কোনো নতুন বিষয় সংযুক্ত করল, সে আমার থেকে বিতাড়িত।'

স্মরণ রাখবেন, আল্লাহর রাসূলের দেখানো পথ ব্যতীত আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সকল পথ বন্ধ ও রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাসূলের পথই এমন পথ, যার ওপর চলে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। এছাড়া বাকি সমস্ত পথ কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ। শয়তান এতই বদমাশ যে, সে বান্দার মনে উদয় করে দেয়, আরে! সামান্য একটু বেদআত করলে সমস্যা কী? এ আর এত খারাপ কী? এই যে কাজটা এটা তো ভালো কাজই। যে-কাজ নবী করেননি, সাহাবায়ে কেরাম করেননি, আউলিয়া কেরাম করেননি– আজ যদি আমরা দীনের অংশ মনে করে সেই কাজ করি, তাহলে কেমন যেন আমরা দাবি করছি, উক্ত সকল বড়-বড় ব্যক্তি এই নেক কাজ থেকে মাহরুম ছিলেন। তাঁরা তো দুনিয়া থেকে চলে গেছেন; কিন্তু তারা এই নেক থেকে বঞ্চিত! বলুন, ব্যাপারটা কত বড় জঘন্য!

বেদআত কীভাবে শুরু হয়?

বেদআত যখন শুরু হয়, তখন খুবই সাধারণ থাকে। কিন্তু ধীরে-ধীরে বাড়তে-বাড়তে ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রথম-প্রথম মনে করা হয়, এটা ভালো একটা কাজ; কিন্তু যে সকল ওলামায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা অন্তর্চক্ষু দান করেছেন, তাঁরা এর পরিণতি উপলব্ধি করেন। ফলে শুরু থেকেই তাঁরা ওই সকল বিষয় থেকে বারণ করেন।

জাহেলী যুগে নায়েলা নামে এক নারী আর মাসা নামে এক পুরুষ ছিল। উভয়ের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। একবার উভয়ে তাওয়াফ করতে এল এবং বাইতুল্লাহর ভেতরেই দুজনে অবৈধ কাজে মশগুল হয়ে গেল। আল্লাহ রাগ হয়ে দুজনকেই পাথরে পরিণত করে দিলেন। আরবের জাহেলরা চিন্তা করল, এরা বাইতুল্লাহর মধ্যে এমন জঘন্য কাজ করেছে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। কী শাস্তি দেওয়া যায় এ নিয়ে তারা পরামর্শে বসল। একেকজন একেক কথা বলে। শেষে শয়তান এসে একজনের মনে কুমন্ত্রণা ঢালল। ফলে সে বলল, তাদের একজনকে সাফা আর অপরজনকে মারওয়ায় রাখা হবে এবং সাফা-মারওয়া দৌড়ানোর সময় এদের প্রত্যেককে জুতা মারবে। সবাই মতটি পছন্দ করল। যা চিন্তা তা-ই করা হলো।

জাহিলী যুগের হজে আগত লোকেরা সাফার দৌড় শেষ করে সাফায় রাখা পাথরমানবকে জুতা মারে আর মারওয়ার দৌড় শেষ করে মারওয়ায় রাখা পাথরমানবকে জুতা মারে। কিন্তু যার জুতা নেই সে একটা থাপ্পর মারে। এভাবে চলতে-চলতে তাদের পরবর্তী বংশধর ভাবল, শুধু থাপ্পর দিলেই চলবে– জুতা মারতে হবে না। ফলে জুতা মারার পরিবর্তে থাপ্পর মারতে লাগল।

তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ভাবল, মূল কাজ হলো এগুলোতে হাত লাগানো। থাপ্পর মারার কোনো দরকার নেই। তারা তা-ই করতে লাগল। পরবর্তী প্রজন্ম ভাবল, এদেরকে বরকতের জন্য স্পর্শ করতে হয়। আর এদের স্পর্শ না করলে সাফা-মারওয়া যাওয়াই পূর্ণ হয় না। তাই তারা বরকতের নিয়তে পাথরমানবদুটিকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আসত। সাফার প্রান্তে এসে এখানকার পাথরমানবকে স্পর্শ করত আর মারওার প্রান্তে এসে সেখানকার পাথরমানবকে স্পর্শ করত।

এভাবে চলতে-চলতে একটা পর্যায়ে গোমরাহি চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। এদের চুম্বন করা শুরু হলো। সাফায় এসে একে চুমু দেয়, মারওয়ায় গিয়ে ওকে চুমু দেয়। এমনকি কিছু লোক সেখানে দু'আও চাইতে শুরু করে। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, তখনকার অবস্থা ছিল এই যে, আরবের মুশরিকরা যখন সাফায় গিয়ে হজ করত, তখন সেখানে রাখা পাথরমানবটাকে সেজদা করত আর মারওয়ায় গিয়ে সেখানকার পাথরমানবটাকে সেজদা করত।

দেখুন, বেদআতের সূচনা রূপটা কী ছিল আর শেষে এসে এর পরিণতি কী হলো। সর্বকালের প্রত্যেকটা বেদআতের অবস্থাও এমনই। কেউ বলে, আমি আযানের আগে খারাপ কিছু তো করিনি। দরুদই তো পড়লাম। শুনুন ভাই! নিজে-নিজে মনে-মনে হাজারবার দরূদ পড়ুন; কিন্তু আযানের আগে দুরুদ পড়াকে আবশ্যক বানাবেন না। উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না। আপনি তো দরূদকে আযানসম্পৃক্ত আমলে পরিণত করেছেন। অথচ আযানের সাথে দুরুদ পাঠের বিধান ইসলামে নেই। আজ আমাদের দেমাগ এই সহজ বিষয়গুলোও যেন বোঝে না। এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় এমন আসবে, যখন দুরুদকে মানুষ আযানের অংশ মনে করবে। এই যে বেদআত এটা যেহেতু দীনের কাজ মনে করে করা হয়, তাই এর থেকে তাওবা করার তাওফীক লাভ হয় না । এটা অনেক বড় পর্দা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে। তাই আমাদের উচিত আমাদের প্রত্যেকটি আমল নবীজির সুন্নত মোতাবেক সম্পন্ন করা। নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং প্রতিটি কাজ নবীজি যেভাবে করেছেন, সেভাবে করা।

আমল কবুল হওয়ার শর্ত দুটি

আমল কবুল হওয়ার শর্ত দুটি।

১. এখলাছ।

২. সুন্নতের অনুসরণ।

যেকোনো নেক আমলই করা হোক-না কেন তাতে প্রথমেই জরুরি হচ্ছে এখলাছ। আমলটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। রিয়া বা লোকদেখানো ইত্যাদি স্বভাব না থাকা। কারও থেকে বাহবা শোনার নিয়ত না থাকা। আমল কবুল হওয়ার প্রথম শর্ত এখলাছ।

দ্বিতীয় শর্ত আমলটি সুন্নত মোতাবেক সম্পন্ন করা। বেদআত যদি এখলাছের সাথেও করা হয়, তবুও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। তাই এখলাছের সাথে সুন্নত তরিকায় আমল করতে হবে। আল-কুরআনের ঘোষণা–

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ[১]

'তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।'[১]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ১০

আর বেদআত যেহেতু আমলে সালেহ-এর আওতায় পড়ে না, তাই আল্লাহর নিকট তা উপস্থাপিতও হয় না। সেজন্য বেদআতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে ।

সুন্নত ও বেদআতের মধ্যে পার্থক্য

সুন্নত ও বেদআতের একটি পার্থক্য এই যে, সুন্নত হচ্ছে সামগ্রিক ও সার্বজনীন, যাকে ইংরেজীতে Universal বলা হয়। অর্থাৎ– তামাম জাহানের যেখানেই যাবেন, সেখানেই সুন্নত অবিকল পাওয়া যাবে আর বেদআত হয়ে থাকে আঞ্চলিক। একেক অঞ্চলে একেক বেদআত একেকভাবে চালু থাকে। সব দেশে বেদআত একই রকম হয় না। এটিও সুন্নত ও বেদআতের মাঝে বড় একটা পার্থক্য।

তৃতীয় পর্দা অভ্যন্তরীণ রোগব্যাধি : তৃতীয় পর্দাটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক ব্যাধি, অভ্যন্তরীণ গুনাহ। যেমন– হিংসা, অহংকার, লোক দেখানোর স্বভাব। এগুলো সবই বাতেনি রোগ। এগুলো আল্লাহ কঠোরভাবে অপছন্দ করেন। তাকাব্বুর তথা অহংকারকে আল্লাহ এত অপছন্দ করেন যে, হাদীছে এরশাদ হয়েছে–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْكِبْرِ

'যার হৃদয়ে অণুপরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'

আরো বর্ণিত আছে–

اَعْظَمُ مِنَ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرَقَةِ

'অহংকার যিনা মদ্যপান ও চুরি অপেক্ষা মারাত্মক।'

আজ তো আমরা কত কথা-ই অহংকারমূলক বলে ফেলি। মনে রাখুন, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে যে-পথ চলে গেছে, সেই পথ আমাদের পা দিয়ে অতিক্রম করা অসম্ভব, তা অতিক্রম করতে হবে হৃদয় দিয়ে। এখন হৃদয়েই যদি রোগ থেকে যায়, তাহলে তো সেই পথ অতিক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে। চলা-ই যাবে না। গাড়ি যেমন ময়লা পেট্রল দিয়ে চলে না, মানুষও তেমনি অহংকারী মন দিয়ে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারে না। তাই অহংকার থেকে আমাদের বাঁচতে হবে।

চতুর্থ পর্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া

حجاب اهل الكبائر الظاهرة বাহ্যিক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া, চুরি করা, মদ পান করা, সুদ খাওয়া, যিনা করা, গীবত করা। এগুলো সবই প্রকাশ্য কবীরা গুনাহ। এগুলোও বান্দা ও আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকাতা সৃষ্টিকারী পর্দা। দেখুন, এক হচ্ছে গুনাহ আর আরেক হচ্ছে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দুইয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান। গুনাহ হচ্ছে নফসের ধোঁকায় পড়ে পাপ কাজ করে ফেলা। আর বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা হচ্ছে অন্যায়কে ন্যায় মনে করা, গুনাহকে গুনাহ মনে না করা। এব্যাপারটা বান্দাকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন– আপনার কাছে একটি পুরনো ছেঁড়া টাকার নোট আছে। আপনি এটি যদি ব্যাংকে নিয়ে দেখান, তাহলে তারা টাকাটা রেখে নতুন একটা টাকা আপনাকে দিয়ে দেবে। কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকে গিয়ে তাদের সামনে নোটটি টুকরো-টুকরো করে ফেলেন আর বলেন, আমি এটাকে টাকা মানি না, তাহলে কি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আপনাকে নতুন একটি নোট দেবে? না। বরং আপনাকে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করা হবে।

তো গুনাহকারীর জন্য ফের সঠিক পথে ফিরে আসা সহজ। কিন্তু অবাধ্য ও খোদাদ্রোহীর জন্য স্বাভাবিকভাবে কোনো পথই খোলা থাকে না ফিরে আসার জন্য। গুনাহগার গুনাহ করে লজ্জিত হয়। ভাবে, আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে ভুল হয়ে গেছে; আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কিন্তু অবাধ্য ব্যক্তি নিজের স্বেচ্ছাচারিতাকেই ন্যায় মনে করে। তাই সে কোনোদিন ফিরে আসতে পারে না।

পঞ্চম পর্দা সগীরা গুনাহ

حجاب اهل الصغار সগীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া। তোমরা ছাত্ররা কথাটা শুনে বিস্মিত হবে যে, আমাদের বুযুর্গানে কেরাম সগীরা গুনাহকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার পর্দা মনে করতেন। কিছু বিষয় এমনও আছে, যেগুলোর কারণে সগীরা গুনাহও কবীরা হয়ে যায়।

সগীরা গুনাহ কীভাবে কবীরা হয়ে যায়

তিনটি বিষয় এমন আছে, যেগুলোর কারণে সগীরা গুনাহও কবীরার মতো মারাত্মক আকার ধারণ করে–

১. সগীরা গুনাহ বারবার করা। সগীরা গুনাহ বারবার করতে থাকলে তখন তা আর সগীরা থাকে না– কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়।

২. গুনাহকে ছোট মনে করা। গুনাহ করে পরে মনে করা যে, সমস্যা নেই। এটা কোনো ব্যাপারই নই এমন ভাবা।

তাই কোনো গুনাহই ছোট নয়– সব গুনাহই বড়। গুনাহকে ছোট মনে করবে না।

لَاتَحْقِرَنَّ صَغِيْرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَاءِ

'তোমরা সগীরা গুনাহকে ছোট মনে করো না। ছোট-ছোট কঙ্কর মিলেই তো পাহাড় তৈরি হয়।'

বনী ইসরাইলের একটি ঘটনা আছে। একজন বুযুর্গ ছিলেন ইসরাইলী সম্প্রদায়ে। একদিন বুযুর্গ একটি পাহাড়ে গিয়ে মনে-মনে বললেন, আল্লাহ! এই পাহাড়ে তো কোনো সবুজ নেই, শ্যামলিমা নেই, তরুলতা নেই। যদি এখানে গাছগাছালি ও ঘাস-লতা হতো, তবে কতই-না চমৎকার দেখাত।

এ কথা ভাববার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে বার্তা এল, হে আমার বান্দা! তুমি তো আমার বন্দেগি ছেড়ে দিয়েছ। তুমি তো আমাকে ভালো-মন্দের ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছ। আমার সৃষ্টির মাঝে তুমি আমার দোষ ধরছ।

এবার বুযুর্গ বুঝতে পারলেন, আমার তো এমনটা ভাবা ঠিক হয়নি! বড় অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন বুযুর্গ। তিনি নিজের নফসকে সাজা দেওয়ার নিয়ত করে নিলেন। বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত আমাকে মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা না আসবে, সে পর্যন্ত আমি কিছু খাব না।

ঘটনাক্রমে বুযুর্গ একটা এলাকায় গেলেন। তারই আত্মীয় ছিল ওরা। তারা বলল, হযরত! খাবার নিন। বুযুর্গ বললেন, না; আমি খাব না। লোকেরা জানতে চাইলে তিনি ঘটনাটা বললেন। লোকেরা বলল, হযরত! এটা কোনো ব্যাপারই নয়। আমরা সকলে মিলে সমস্যাটা মিটিয়ে দেব। আপনি খাবার খান।

এ কথা বলার সাথে-সাথে আল্লাহ ওই বুযুর্গের দিলে ইলহাম করলেন, তুমি এই এলাকাটা ছাড়ো; আমি এলাকাটা ধ্বংস করে দেব। কতবড় স্পর্ধা তাদের! গুনাহকে তারা তুচ্ছ মনে করছে! ফলে ওই এলাকাটা পুরোপুরি ধসিয়ে দেওয়া হলো। এটা হয়েছে এজন্য যে, তারা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করেছে। আজ লোকেরা মিথ্যা বলে, আরও কত গনাহ করে। কিন্তু গুনাহকে কিছু মনে করে না। গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে। এটা মারাত্মক অন্যায়। তাই গুনাহ ছোট হোক বা বড় হোক গুনাহকে ক্ষতিকর ও মারাত্মকই মনে করবে।

৩. গুনাহকে স্বাদের জিনিস মনে করা। এর কারণেও ছোট গুনাহ বড় হয়ে যায়। গুনাহ করে পরে বলছে, আহ! বড় মজা লাগল। তখন আর সগীরা গুনাহ সগীরা থাকে না– কবীরা হয়ে যায়।

৪. গুনাহ গোপন থাকে বলে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা। আল্লাহ তো বান্দার গুনাহ গোপন রাখেন। এর কারণে ঔদ্ধত্য দেখানো আর মনে-মনে ভাবা যে, কেউ তো জানেই না আমি কী করি। এমন ভাবনার কারণে সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

৫. প্রকাশ্যে গুনাহ করা। প্রকাশ্যে ও দিবালোকে গুনাহ করলে তা আর সগীরা থাকে না। অথবা গুনাহ করে যদি লোকদের মাঝে বলে বেড়ায়। আজকাল নওজোয়ানরা অন্যায় ও অশালীন কাজ করে বন্ধুদের কাছে বলে বেড়ায়, আমি এই করেছি, ওই করেছি। এভাবে বলার কারণে সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়।

নবীজি বলেছেন–

كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ

'আমার সব উম্মত ক্ষমা পাবে। তবে যারা প্রকাশ্য গুনাহ করে ও গুনাহ করে তা বলে বেড়ায়, তারা ক্ষমা পাবে না।'

তাই এমন করা থেকে বিরত থাকবে।

৬. গুনাহের পথ দেখানো। আরেকটি কারণেও সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। আর তা হচ্ছে গুনাহের পথ দেখানো।

اَنْ يَّكُوْنَ رَأْسٌ يُقْتَدٰى بِهٖ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَمَضَرُّ مَنْ عَمِلَ بِهَا

এমন নেতা, মানুষ যার অনুসরণ করে, সে যদি গুনাহের পথ দেখায়, তাহলে যত গুনাহ হবে এপথে সমস্ত গুনাহের সমপরিমাণ গুনাহ পথপ্রদর্শনকারীর নামেও লেখা হবে। যেমন– বাবা ঘরে টিভি আনলেন। এই টিভির মাধ্যমে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের যত গুনাহ হবে, সকলের গুনাহের সমপরিমাণ বাবার আমলনামায় যোগ করা হবে। কারণ, তারই কারণে এই গুনাহটা সংঘটিত হচ্ছে।

ষষ্ঠ পর্দা শিরক : আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার প্রতিবন্ধক পর্দাগুলোর মধ্য থেকে একটি বড় পর্দা হলো শিরকের পর্দা।

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেছেন–

শিরক দুই প্রকার। এক হলো শিরকে জলী, আরেক হলো শিরকে খফী। শিরকে জলী মানে প্রকাশ্য শিরক। যেমন– মূর্তিপূজা করা। শিরকে খফী মানে অপ্রকাশ্য শিরক। যেমন– কেউ আল্লাহর হুকুম পরিত্যাগ করে নফসের দাসত্বকে মেনে নেয়। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ

'লোকদের মধ্যে থেকে এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর সমকক্ষতা স্থাপন করে। তারা আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদের ভালোবাসে।'[১]

আবার নফসকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

'আপনি কি দেখেছেন সেই লোককে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে?'[২]

তাই নফসের আনুগত্য করা হচ্ছে শিরকে খফী।

সপ্তম পর্দা সম্পদ ও প্রাচুর্যের পর্দা : যাদের অত্যধিক ধনসম্পদ দান করা হয়েছে, ধনসম্পদের পেছনে পড়ে তারা আল্লাহকে ভুলে যায়। সন্ধ্যায় অফিস থেকে আসে। স্ত্রীকে নিয়ে পার্কে-শপিংমলে যায়। রমজানের মোবারক রাতগুলো রেস্টরেন্টে আর শপিংমলে কাটিয়ে দেয়। ফলে এমন মানুষ ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব বাড়তে থাকে।

ভাই! আপনার যা কিছু পছন্দ, যা কিছু হালাল তা ক্রয় করে এনে ঘরে বসে স্ত্রীকে নিয়ে খান। আমাদের নবীজি তো তাঁর কোনো স্ত্রীকে বলেননি, চলো বাজারে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি। এটা কাফেরদের রীতি। কিছু মুসলমানও এই নীতি অবলম্বন করছে। আমাদের অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা উচিত। অর্থসম্পদ আল্লাহ খুশি হন এমন স্থানে ব্যয় করা উচিত।

অষ্টম প্রতিবন্ধক গাফলতির পর্দা : গাফেল মানুষ নিজেদের কারণেই আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর কথা তাদের স্মরণেই আসে না। যেন দুনিয়ার কাজকারবার আর চাকরির ফাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করার, আল্লাহর ইবাদত করার সামান্য সময়ও তাদের হাতে নেই। আপনি যদি তাদের

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৫

২. সূরা জাছিয়া : আয়াত ২৩

বলেন, চলো ভাই! অমুক শহরে তিন দিন ইজতেমা আছে, তারা বলবে, আরে ভাই! আমার কত কাজ! না-না; আমার সামান্য সুযোগও নেই। আজ বলল, সময় নেই, দুদিন পরেই এই লোক এসে বলে, হযরত! দু'আ করুন একটা নতুন কারখান দিচ্ছি, যেন বরকত হয়। আরে ভাই! তোমার এজতেমায় যাওয়ার সময়-সুযোগ হলো না; আরেকটা কারখানা তৈরির সময় পেলে কোথায়! এরা হচ্ছে গাফেল। যত গাফলতি আল্লাহর কাজে! সমস্ত উদাসীনতা আল্লাহর কাজে।

নবম পর্দা রেওয়াজ ও কুসংস্কার

حجاب العادات والرسوم যত রেওয়াজ-রসম আছে এগুলোও আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিবাহ-শাদীর সময় নানা কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে মানুষ। নারীরা তো তখন মুফতিয়ে আযম হয়ে যায়। নিত্যনতুন কত রসম যে তারা আবিষ্কার করে! এ-বিষয়টি বান্দাকে আল্লাহ থেকে দূরে হটিয়ে দেয়। বিবাহ-শাদীতে তারা আল্লাহকে নারাজ করেই ছাড়ে।

দশম পর্দা নফসের ওপর ভরসা

حجاب اعتماد بالنفس নফসের ওপর ভরসা করার কারণেও আল্লাহ ও বান্দার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এর অর্থ হচ্ছে, বান্দা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, আমি যা পড়েছি, যা বুঝেছি তার ওপরই আমল করব। সে কাউকে নিজের চেয়ে বড় মনে করে না। নিজেকে সবার চেয়ে বড় মনে করে কারও অনুসরণ করে চলাকে সে পছন্দ করে না। তাকলীদ ও মাযহাবের অনুসরণ করাকে সে খারাপ মনে করে। যারা বলে, আমরা মাযহাবের তাকলীদ করব না, কোনো ইমামকে অনুসরণ করব না, তাদের বলুন, আপনি কার কাছে পড়েছেন? ভাই! অমুক মাসআলাটি কার কাছে শুনেছেন? তারা বলবে, অমুক আলেমের কাছে বা অমুক ব্যক্তির কাছে। তাহলে বলবেন, তো অমুক-তমুকের আনুগত্য করতে পারেন, চার ইমামের কোনো একজন ইমামকে মানতে পারেন না কেন? আপনারা যা ইচ্ছে তা-ই করে যাচ্ছেন। যা আপনার দিলের সাথে মিলে না, তা আপনি ত্যাগ করছেন। এ কেমন কথা?

কাউকে মানে না যে

একবার আমি নিউইয়র্কে বয়ান করলাম। সেখানে স্থানীয় এক লোক ছিল। লোকটি আমার হাতে মুসলমান হলো। আমার ছেলে হাবীবুল্লাহর

নামটা সে পছন্দ করল। ফলে তার নাম রাখলাম হাবীবুল্লাহ মানে আল্লাহর বন্ধু। এবার আমি তাকে ইসলামের আহকাম ও আরকান বলতে লাগলাম। ইসলামের পাঁচ ভিত্তির কথা বললাম। সর্বশেষ বললাম, আগামী কাল এশার পর আমার কাছে আসবেন; দীনের আরও কিছু জরুরি বিষয় শিখিয়ে দেব। লোকটি পরের দিন এল। বগলের নিচে একটা জিনিস সাথে করে আনল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী হাবীবুল্লাহ? বলল, বোখারি শরীফ। আমি হাতে নিয়ে দেখি, বোখারি শরীফের ইংরেজি অনুবাদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি তোমাকে কে দিয়েছে? বলল, কাল যখন এখানে আমি মুসলমান হয়েছি এবং এই মজলিস যখন শেষ হলো, তখন এক আরব লোক এসে আমাকে বলল, মাশাআল্লাহ! তুমি তো মুসলমান হয়েছ; তবে একটা জরুরি কথা শোনো। কারও পিছে চলার প্রয়োজন নেই। কাউকে মানার দরকার নেই। এই কিতাবটি নাও; এটি পড়ে-পড়ে আমল করো। তুমি দীনের অনুসারী হয়ে যাবে।

এবার বুঝুন ভাইয়েরা! যে মানুষটা আজ কালেমা পড়ে মুসলমান হলো, দীন সম্পর্কে কিছুই বোঝে না, সে কি এতটুকু যোগ্য যে বোখারি শরীফ পড়ে সে আমল করবে? অথচ এই বোখারি শরীফ পড়ার আগে একজন বুঝমান মানুষ আমাদের দেশে ৯ টি বছর পড়াশোনা করতে হয়। দশম বছরে তাঁকে বোখারি শরীফ পড়তে দেওয়া হয়। আজকের এই নতুন মুসলমান ভাইটি বোখারি শরীফের কী বুঝবে? হাদীছসমূহের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করে সে কীভাবে আমল করবে? একজন নতুন মুসলমানের হাতে বোখারি শরীফ তুলে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত হলো আপনারাই বলুন।

ইমাম আযম আবুহানীফার মর্যাদা

এ-কারণেই এই লোকগুলো ইমাম আবুহানীফার নাম শুনলেই চটে যায়। আশ্চর্য কথা হলো, ইমাম শাফেয়ীর নাম শুনে বা ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল কারও নাম শুনলে তারা রেগে যায় না। শুধু ইমাম আযমের শুনলেই তারা প্রচণ্ড রকম ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইমাম আযম (রহ.)কে এত উচ্চাসন দান করেছেন যে, সমস্ত ইমাম পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইমাম আবুহানীফারই ছাত্র। কারণ, ইমাম মালেক সেইসব উসূলে ফিকাহ-ই গ্রহণ করেছেন যেগুলো ইমাম আযম (রহ.) প্রণয়ন করেছেন। এমনিভাবে সকল ইমামই এক পর্যায়ে এসে তাঁর ছাত্র বা ছাত্রেরই ছাত্র। যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আল্লাহ ইমাম আযমকে দান করেছেন, তা আজ আর কেউ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ফিকহের মজলিসে শূরা

ফিকহের ইমামগণের মধ্যে ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর প্রায় ৪০ সদস্যের একটি বোর্ড ছিল । তাঁরা তাঁরই ছাত্র। কেউ আরবি ভাষার পণ্ডিত। কেউ কুরআনের পণ্ডিত। কেউ হাদীছের পণ্ডিত। কেউ তাছাওউফ ও সূলূকের পথে দক্ষ। কেউ কিয়াসে পারদর্শী। কেউ এজতেহাদে পণ্ডিত। এসকল মহাপণ্ডিত মিলে এক একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতেন। এ ছিল তাঁর ফেকাহ বোর্ড বা ফিকাহ একাডেমি। সকলের আলোচনা ও পর্যালোচনার পর একটি মাসআলার সমাধান বের করে সকলে সেই মাসআলায় একমত হলেই তা লিখে রাখা হতো। তার পর ইমাম সাহেবের সামনে মাসআলাটি উপস্থাপন করা হতো। ইমাম সাহেব এ বিষয়ে নিজের দলিল দিতেন। এবার সকলে মিলে যে-মাসআলাটির ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করতেন, সেই মাসআলাটি ইমাম আবু ইউসুফ লিখে নিতেন। এটিই হতো চূড়ান্ত ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত। এভাবে এক-একটি মাসআলা তৈরি করা হতো। এভাবে লাখো মাসআলার সমাধান তৈরি করা হয়েছে।

ইমাম আবুহানীফার মেধা

একটি মাসআলা দেখা দিল। একলোক চার রাকাত ফরজ নামায পড়ছিল। দু-রাকাতের পর আত্তাহিয়্যাতু পাঠের জন্য বসা দরকার ছিল। এরপর عبده ورسوله পর্যন্ত পড়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লোকটি দাঁড়ালো না– ভুলে সামনের দিকে পড়তে থাকল। এখন কী হবে? ইমাম আবুহানীফা বললেন, যদি সে اللهم পড়ে ফেলে এবং দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে এর জন্য সেজদায়ে সাহু আবশ্যক হয়নি। যদি صل পড়ে ফেলে এবং দাঁড়িয়ে যায়, তাহলেও সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। যদি على পড়ে ফেলে, তারপর দাঁড়িয়ে যায়, তাহলেও সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি محمد পর্যন্ত পড়ে ফেলে, তাহলে তার ওপর সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এভাবে যখন ফাতওয়া প্রকাশ করা হলো, তখন রাতে স্বপ্নে তাঁর নবীজির দিদার নসীব হলো। নবীজি ইমাম আযম (রহ.)-এর নাম নিয়ে বললেন, নোমান! তুমি আমার নাম পাঠকারীর ওপর সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলে? তখন হযরত আবুহানীফা (রহ.) আরজ করলেন, ও হে

আল্লাহর রাসূল! যে-মানুষ গাফলতির সাথে আপনার নাম নিয়ে ফেলবে, তার ব্যাপারে আমি সেজদায়ে সাহুর হুকুম প্রদান করি। নবীজি মুচকি হেসে বললেন, তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছ।

বুঝুন ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন প্রখর মেধা ও ধীশক্তি দিয়েছেন।

বলছিলাম নফসের ওপর ভরসার কথা। নফসের ওপর ভরসা একটি বড় ধরনের পর্দা। এমন লোকদের শয়তান বড় সহজভাবে ধোঁকায় ফেলে দেয়। কারণ, তারা তো নফসের ওপর ভরসা করে। কেউ একজন বিষয়টি এভাবে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের আত্মা নামক ইউসুফকে খাহেশাত নামক কূপে নিক্ষেপ করেছ আর অজুহাত দেখানোর জন্য তাওবা নামক জামার ওপর মিথ্যা নামক খুন মেখে নিয়েছ। মানুষ এমনই কাজ করে আর গোমরাহির অতলে হারিয়ে যায়। মানুষ যখন আল্লাহর মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এই দশ পর্দা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে, তখই তার তাওবা পূর্ণতা পাবে, আল্লাহর সাথে ওই বান্দার সম্পর্ক তৈরি হবে।

তাওবার নিয়ত

কেউ তাওবার ইচ্ছে করল। এখন তার তাওবার নিয়ত কী হওয়া উচিত? এটি একটি স্বতন্ত্র বিষয় যে, তাওবাকারী তার নিজের মনে কী নিয়ত করবে। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, বিভিন্ন প্রকারের নিয়ত করা যায়। যেমন–

প্রথম নিয়ত : তাওবার একটি নিয়ত এই করবে যে, আমি পথহারা জীবন যাপন করছিলাম। এখন আমি পথে এসেছি। আমি সরল সঠিক পথে জীবন যাপন করতে চাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ ۝

'হে আদমের জাতি! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না।'[১]

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

'এবং তোমরা আমার ইবাদত করবে। এটা সোজা পথ।'[২]

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬০
২. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬১

প্রথম নিয়ত হবে, আমি সহজ, সরল ও সোজা পথে ফিরে আসব । তাওবা করে সুন্দর জীবন যাপন করব ।

দ্বিতীয় নিয়ত : দ্বিতীয় নিয়ত এই করবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিল করছি । কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَتُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহর কাছে তাওবা করো ।'[১]

এখানে توبوا শব্দটি নির্দেশবাচক । এটি আদেশ । আল্লাহ রব্বুল আলামীন হুকুম দিচ্ছেন । তাই এই আয়াতটিকে সামনে রেখে নিয়ত করবে, আমি আল্লাহর আদেশ তামিল করতে তাওবা করছি ।

তৃতীয় নিয়ত : তৃতীয় নিয়ত এই করবে যে,

الفرار من الظلم الى الفلاح আমি জুলুমের অন্ধকার থেকে সাফল্যের পথে আসছি । কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'যারা তাওবা করল না, তারা-ই জালেম ।'[২]

তাই জুলুম থেকে ছুটে এসে কল্যাণের পথ প্রাপ্তির নিয়ত করবে ।

৪র্থ নিয়ত : ৪র্থ নিয়ত এই করবে যে, وَالْفِرَارُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ আমি আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি লাভ করতে চাই ।

ইরশাদ হচ্ছে–

فَفِرُّوٓا إِلَى اللَّهِ

'আল্লাহর দিকে ছুটে আসো ।'[৩]

সকল গুনাহ ও নফসের আনুগত্য ছেড়ে আল্লাহর দিকে এসো । আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করো । তাই আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার নিয়ত করবে ।

৫ম নিয়ত : তাওবা করার সময় পঞ্চম নম্বরে নিয়ত করবে–

---

১. সূরা নূর : আয়াত ৩১
২. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১১
৩. সূরা যারিয়াত : আয়াত ৫০

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي

'আমি আল্লাহর দিকে হিজরত করছি।'

নবীজি একবার জিজ্ঞেস করলেন, মুহাজির কে? মুহাজির হচ্ছে–

مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ

'যে অন্যায় ও গুনাহ পরিত্যাগ করেছে।'

তাই মনে-মনে গুনাহ ত্যাগ করে আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার নিয়ত করবে।

তো তাওবা করার সময় এ-সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে।

তাওবার রোকন

তাওবার রোকনগুলো কী? এ-বিষয়ে এখন কিছু কথা বলব।

প্রথম রোকন এখলাছ বা নিষ্ঠা : এখলাছ তথা নিষ্ঠা হচ্ছে তাওবার প্রথম রোকন। অর্থাৎ– একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাওবা করা। মনে করুন, কেউ জুয়া খেলে ঠকেছে। তাই সে বলল, তাওবা, তাওবা। আর কোনো দিন জুয়া খেলব না। এমন করলে একে তাওবা বলা হবে না। কারণ, সে ঠকে যাওয়ার কারণে তাওবা করেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে তাওবা করেনি। অনুরূপ কেউ চুরি করে ধরা খাওয়ার কারণে তাওবা করল বা অন্য কোনো কারণে সমস্যা পড়ে তাওবা করল। তাহলেও একে তাওবা বলা হবে না। তাওবা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

أَنْ تَتُوبَ بِخَوْفٍ مِّنَ اللهِ وَتَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا لَّهُ وَخَشْيَةً لِسُقُوطِ الْمَنْزِلِ عَنْدَهُ

'আল্লাহর ভয়ে তাওবা করতে হবে। আর তাওবা করতে হবে আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদা, তাঁর আযাব ও তাঁর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাওয়ার ভয়ে।'

দ্বিতীয় রোকন বিরত থাকা : গুনাহ থেকে বিরত থাকা তাওবার দ্বিতীয় রোকন। তাওবার অর্থ এই নয় যে, মুখে তাওবা করব আবার গুনাহও করে যাব। তারওবার জন্য শর্ত হলো, গুনাহ পরিত্যাগ করতে হবে গুনাহ পরিত্যাগ করতে গিয়ে যতখানি কষ্ট স্বীকার করতে হবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ততখানি সাহায্য আসবে।

আমাদের মাশায়েখে কেরাম বলেন–

عَلٰى قَدْرِ الْمَعُوْنَةِ تَأْتِى الْمُؤُوْنَةُ

'মানুষের কষ্ট অনুযায়ী আল্লাহর সাহায্য আসে।'

তাই গুনাহ পরিত্যাগ করতে যত কষ্ট হবে, আল্লাহর সাহয্য তত বেশি আসবে।

তৃতীয় রোকন লজ্জিত হওয়া

اَلنَّدَمُ তথা লজ্জিত হওয়া তাওবার তৃতীয় রোকন। হাদীছে বর্ণিত আছে–

اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ

'লজ্জিত হওয়াই তাওবা।'

নিজের কৃতকর্মের ওপর, গুনাহের ওপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া যে, আহ! আমি আল্লাহর বিধানের মূল্যায়ন করলাম না।

مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

'আল্লাহর যতখানি মূল্যায়ন করা দরকার ছিল ততখানি করেনি।'[১]

আরও ইরশাদ হচ্ছে–

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝

'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহকে মর্যাদা দিচ্ছ না?'[২]

তাওবার ক্ষেত্রে লজ্জিত হয়ে এস্তেগফার করবে। মানুষ যেমন বলে আবেহায়াত পান করলে নতুন জীবন মিলে, তেমনি যে এস্তেগফারের ইনজেকশন গ্রহণ করবে, সেও নতুন রূহানী জীবন লাভ করবে।

তাওবা কীভাবে করবে

তাওবা করার যে-পদ্ধতিগুলো ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, সেগুলো এই–

১. তাওবার শুরু : তাওবার সূচনা কীভাবে হয়?

الوعظ والتذكير নিজেকে নসীহত করা, মনে করিয়ে দেওয়া।

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৬৭

২. সূরা নূহ : আয়াত ১৩

আজকাল দেখা যায়, মানুষ নিজেকে নসীহত করে না; যত ওয়াজ সব পরের জন্য। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَوْصِىْ نَفْسِىْ اَوَّلًا وَاِيَّاكَ بَعْدَهٗ

'আমি প্রথমে নিজেকে নসীহত করি; তারপর তোমাদের বলি।'

يَا نَفْسِىْ تُوْبِىْ قَبْلَ اَنْ تَمُوْتِىْ

'হে আমার নফস! তুমি মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করে নাও।'

তো নিজে-নিজে চিন্তা করা এবং নিজেকে বোঝানো যে, আমাকে সৎ পথে এবং সুন্দর আখলাকের পথে পরিচালিত হতে হবে আর গুনাহ করা যাবে না, আল্লাহর নাফরমানি পরিত্যাগ করতে হবে একেই 'তাওবার সূচনা' বলা হয়।

২. গুনাহের স্থান থেকে নিজেকে রক্ষা করা : দ্বিতীয় পর্যায়ে যে আমলটি করতে হবে, তা হচ্ছে–

عَدَمُ النَّفْسِ عَنْ مَوَاقِعِ الْمَعْصِيَةِ

নিজের নফসকে গুনাহের সুযোগ ও সম্ভাব্য স্থান থেকে দূরে রাখা। ওইসব স্থানে কখনও যাবে না, যেসব স্থানে সাধারণত আল্লাহর নাফরমানি হয়, কোথাও যদি গীবত চলে, তাহলে সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে চলবে। যেখানে মদ্যপান চলছে, যেখানে সিনেমা চলছে বা যেখানে যে-গুনাহই চলছে, সেখান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। মনে রাখবে, আজ যে আমাকে বন্ধু বানিয়েছে, কেয়ামতের দিন সে আমার সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক দুশমনে পরিণত হবে।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾

'সেদিন প্রত্যেক বন্ধুই একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।'[১]

সেদিন কেউ-কেউ আফসোস করে বলবে–

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾

'হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!'[২]

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৬৭
২. সূরা ফুরকান : আয়াত ২৭

আজ মোবাইলে, ফোনে পরস্পর সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। কেয়ামতের দিন এই বন্ধুরা-ই কাল হয়ে দাঁড়াবে। এসকল অবৈধ সম্পর্ক পরিত্যাগ করা একান্তই অপরিহার্য।

৩. বেশি-বেশি রোযা রাখা : নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রোযা রাখা একটি বড় উপকারী আমল। নিজেকে দুনিয়ার স্বাদ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে এবং রোযা রাখার মাধ্যমে আত্মার চিকিৎসা করা। মজাদার জিনিস বেশি ভক্ষণ করলে পাশবিক চাহিদা বেড়ে যায়। মস্তিতে মত্ত থাকলে যৌনতা সুযোগ পেয়ে যায়। রোযার মাধ্যমে এটা দমন হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের লক্ষ করে বলেছেন, হে যুবকের দল! তোমাদের মাধ্য থেকে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। তাই যুবক ও যুবতিদের উচিত বেশি-বেশি রোযা রাখা। প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীজ তথা চাদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা, সপ্তাহে সোম ও জুমাবারে রোযা রাখা বা নিজেই কোনো একটা দিন নির্বাচন করে প্রতি সপ্তাহের ওই দিনে রোযা রাখা। সবচেয়ে উত্তম হলো, এক দিন রোযা রাখবে, আরেকদিন স্বাভাবিকভাবে খাবারদাবার করবে। এভাবে জীবন অতিবাহিত করব যদি নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়। ইনশাআল্লাহ! নফস সোজা হয়ে যাবে। অনেকে রোযা রাখে। পরে এসে বলে, হুজুর! রোযা রেখে ফায়দা হলো না। নফসের খাহেশ তো কমল না। তাদের ব্যাপারে বলব, সাহরি আর ইফতার মিলিয়ে যদি আপনি দুদিনের খাবার একসাথেই খেয়ে নেন, তাহলে তো খায়েশ কমার বদলে আরও বাড়বে। ভাই! একটু কমিয়ে খান; দেখবেন ফল হবে ইনশাআল্লাহ।

৪. আখেরাতের ভাবনা : চতুর্থ বিষয়টি হলো–

اِرْفَعْنَا بِفِكْرِ اَعْلَامِ الْاٰخِرَةِ

আখেরাতের ভাবনাকে উঁচু করা। আখেরাতের কথা বেশি-বেশি স্মরণ করা। জাহান্নামের আযাবের কথা মনে-মনে চিন্তা করা। জান্নাতের নেয়ামতের কথা কল্পনা করা। আখেরাতের কথা যত বেশি চিন্তা করা যাবে, গুনাহ থেকে মন তত বেশি দূরে সরে আসবে। নেক কাজ করার জন্য অন্তর প্রস্তুত হবে। মানুষের অভ্যাস হলো, সামান্য অনুপ্রেরণা দিলে মানুষ অনেক আমল করে। আমি একবার আমর ছোট ছেলে সাইফুল্লাহর সামনে জান্নাতের আলোচনা শুরু করলাম। আমি বললাম, জান্নাত হবে এমন স্থান, এমন বাগান, যা ফলে-ফলে এমন-এমন সুসজ্জিত। নদী প্রবাহিত থাকবে। দুধ ও

মধুর নহর থাকবে। আল্লাহর দিদার হবে। চমৎকার মজার স্থান জান্নাত। ইত্যাদি-ইত্যাদি আলাচনা আমি তার সামনে উপস্থাপন করলাম। কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর বাচ্চাটা বলল, চলো আব্বু! তাহলে আমরা সেখানে চলে যাই।

দেখুন, সামান্য অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা পেলেই মানুষ কেমন যেন হয়ে যায়, প্রস্তুত হয়ে যায়, নেক কাজের দিকে ধাবিত হয়। নফস ও কলব আখেরাতের জন্য তৈরি হয়ে যায়।

৫. গাইরুল্লাহর মূর্তিগুলো ভেঙে দিতে হবে : পরিশেষে বলব, গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হলে গাইরুল্লাহর ভাবনাকে অন্তর থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে, গাইরুল্লাহর যে-মূর্তিগুলো আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করছে তা ভেঙে দিতে হবে।

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

মনের মূর্তি ভেঙে দাও চাই তা কাল্পনিক মূর্তি হোক, রাস্তার মূর্তি হোক আর নফসানি মূর্তি হোক এগুলো ভেঙে দিতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই গাইরুল্লাহর মূর্তি তথা মনের মূর্তিগুলো ভেঙে দিতে না পারব, ততক্ষণ আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া সম্ভব হবে না। তারপর বলবে, হে আল্লাহ!

تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا * كَذَالِكَ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْبَصِيْرُ

'আমি লাত-ওযযা সব ছেড়েছি। জ্ঞানী ব্যক্তিরা তো এমনই করে।'

তো আমরা আল্লাহর রেজা ও সন্তুষ্টির তরে এসব নফসানি খাহেশাতের মূর্তিগুলো ভেঙে দেব।

গুনাহ কীভাবে ছাড়বে

অনেকে তথা আধ্যাত্মিক সাধনার ছাত্ররা প্রশ্ন করে, গুনাহ ছাড়ব কীভাবে? বদ-অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করব কীভাবে? চলুন এ বিষয়ে কিছু কথা বলি। গুনাহ পরিত্যাগের জন্য সাতটি আমল করা যায়।

প্রথম আমল গুনাহের কঠিন পরিণতির প্রতি লক্ষ রাখা : পদ্ধতিটা এই যে, গুনাহের কী কঠিন পরিণতি হবে তা চিন্তা করতে থাকা যে মানুষের এই খবর হবে যে গুনাহ কত মারাত্মক। এর পরিণাম কত কঠিন। তখন বান্দা

সহজেই গুনাহ পরিত্যাগ করতে পারে। আর যে গুনাহ করবে, গুনাহের পরিণতির শিকার তো সে হবেই। যেমন গুনাহের কারণে–

১. অপমানিত হতে হয় : গুনাহের প্রথম প্রভাব হচ্ছে, গুনাহের কারণে বান্দা অপমানের শিকার হয়। হাদীছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْعِزَّةَ وَالْوَقَارَ لِمَنْ تَابَعَ أَمْرِيْ

আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির জন্য সম্মান ও মর্যাদা রেখেছেন, যে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করবে।

অর্থাৎ– যে শরীয়তের হুকুম মেনে চলবে।

আরও বলেছেন–

وَجَعَلَ الذِّلَّةَ وَالصِّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيْ

'আর অপমান ও হীনতা ঐ ব্যক্তির জন্য রেখেছেন, যে আল্লাহর বিধান অমান্য করে।'

তাই বোঝা যায়, যদি আমরা শরীয়তের ওপর আমল করি, তাহলে আমরা মর্যাদা পাব। আর অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হলে অপমানের শিকারে পরিণত হব।

২. রূপ-লাবণ্যহীন চেহারা : গুনাহের কারণে বান্দার মাঝে এই প্রভাব পড়ে যে, বান্দার চেহারা কালো হয়ে যায় অথবা কালো না হলেও চেহারার রূপ-লাবণ্য হারিয়ে যায়, চেহারাটা বান্দার আমলের সাইনবোর্ড হয়ে যায়। লুকিয়ে, গোপনে যে-গুনাহ করেছে, সেই গুনাহের অন্ধকার তার চেহারায় ফুটে ওঠে। আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখুন। দারুন তরতাজা ও সতেজ-সজীব দেখতে পাবেন। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, যে-বান্দা নামায পড়ে না, তার চেহারা সুন্দর হলেও একটা ভাব ফুটে আছে। যে নারী পর্দা করে না, তার চেহারা সুন্দর হলেও কেমন যেন পানসা-পানসা দেখায়।

৩. আত্মার অন্ধকারচ্ছন্নতা : আরে ভাই! শুধু যে অপমান আসে আর চেহারার সৌন্দর্য সজীবতা হারিয়ে যায়, তা-ই নয়। গুনাহের কারণে বান্দার আত্মা কঠিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অন্তরটাও তার কালো হয়ে যায়। বরং বর্ণিত আছে, তার হৃদয় সংকীর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়। সর্বদা আত্মাটা মুষড়ে থাকে। কোনো কিছুই ভালো লাগে না।

৪. দুশমনের মোকাবেলায় দুর্বলতা : গুনাহের কারণে বান্দার মাঝে দুশমনের মোকাবেলায় দুর্বলতা চলে আসে। আল্লাহর সাহায্য সে পায় না । সব সময় অপমানিত ও অপদস্থ হয়। সম্মানের স্থানেও অসম্মানের শিকার হয়ে যায়।

৫. পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক ভালোবাসা কমে যায় : গুনাহের কারণে বান্দার মাঝে ও তার ঘরের লোকদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসায় ঘাটতি দেখা দেয়। বান্দার মাঝে রুঢ়তা জন্ম নেয়। তাই তো স্বামী বলে, আমার স্ত্রীটাকে আর ভালো লাগে না। স্ত্রী বলে, স্বামীর সাথে আমার স্বভাব খাপ খায় না। এসব কিছু হয় গুনাহের কারণে। বাইরে কুদৃষ্টি করার কারণে ঘরে বউ থাকা সত্ত্বেও তাকে ভালো লাগে না। গুনাহের কারণে আল্লাহ ভালোবাসাকে রুঢ়তা ও রুক্ষতায় পরিণত করে দেন। বউয়ের কোমল হৃদয় পাষাণ হয়ে যায়।

৬. নিজের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বৈরিতা এসে যায় : গুনাহের কারণে শুধু অন্যের প্রতি কঠোরতা আসে, তা-ই নয়। এই ভাব তার নিজের প্রতিও এসে যায়। বিতৃষ্ণা লাগে। মেজাজ রুক্ষ হয়ে যায়। প্রতিটা কাজে সব সময় মাথা গরম থাকে। মরে যেতে মন চায়। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। নিজের প্রতি নিজের রাগ ওঠে। আপনি কিছু মানুষ দেখে থাকবেন, যে যাকে-তাকে গালি দেয়। প্রত্যেকটা জিনিসকে গালি দেয়। নিজেকেও নিজে গালি দেয়। সামান্য কিছুতেই চটে যায়। কেন? আল্লাহ গুনাহের কারণে ওই বান্দা ও তার নিজের আত্মার মাঝে একটা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে দেন । অসন্তোষের ভাব তৈরি করে দেন

৭. বান্দা ও আল্লাহর মাঝে বৈরিতা : গুনাহের কারণে বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব পয়দা হয়। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। বৈরিতা এসে যায়। ফলে তার কাছে আল্লাহর কোনো প্রকার আলোচনাই ভালো লাগে না। একব্যক্তি আমাকে বলল, হুজুর! আল্লাহ তো বড়ই স্বার্থপর ও একপেশে। বললাম, কেন ভাই? বলল, আল্লাহ তো শুধু দাড়িওয়ালার দু'আ শোনেন। আমাদের দু'আ তো শোনেন না। দেখুন, এই লোকটির এমন ভাবনাকেই বলা হয় বৈরিতা। আল্লাহ ও তার মাঝে ভালোবাসা নেই বলেই সে এমন কথা বলেছে। দেখুন, গুনাহের কারণে প্রথমে বান্দার পরিবার থেকে ভালোবাসা উঠিয়ে নেওয়া হয়। তারপর বান্দা ও আল্লাহর মাঝে যে এক অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকে, তা উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে সে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে।

৮. অনিঃশেষ আক্ষেপ : গুনাহের অষ্টম পরিণতি হচ্ছে–

وُقُوْعُ الْعَبْدِ فِيْ بِئْرِ الْحَسَرَاتِ

'বান্দা আক্ষেপের গভীর কূপে পতিত হয়ে যায়।'

আহ! ঘরটা ভালো না! স্ত্রীটা ভালো না! ওই রকম একটা সংসার যদি হতো আমার! ওই মহিলা যদি আমার স্ত্রী হতো! ওই রকম একটা জিনিস যদি আমার থাকত। এভাবে আফসোসের-পর-আফসোস, নতুন-নতুন হাহাকার জন্ম নেয় তার মনে। এই নেই, ওই নেই, এই লাগবে, ওই লাগবে এভাবে ছটফট করতে থাকে।

৯. রিযিকের স্বল্পতা : গুনাহের আরেকটা ভয়াবহ ক্ষতি হলো বান্দার রিযিকের ক্ষতি। গুনাহের কারণে রিযিকে অভাব দেখা দেয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اِنَّ الْعَبْدَ يَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ

'বান্দা রিযিক থেকে মাহরুম হয়ে যায় গুনাহের কারণে।'

আল্লাহ বলেন–

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ

'মানুষদের মাঝে আমি রিযিক বণ্টন করে দিয়েছি।'[১]

আল্লাহ যদি বান্দাকে কিছু দিতে চান, তাহলে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। যদি আল্লাহ ছিনিয়ে নিতে চান, তাহলেও কেউ ফেরাতে পারবে না। ভাই! কেউ আমাদের রিযিক বন্ধ করে রাখে না। আমাদের গুনাহ আমাদের রিযিকের পথ বন্ধ করে দেয়। মেয়েকে উপযুক্ত স্থানে বিবাহ দেওয়া যায় না। এটাও তো একটা রিযিকই। কোনো চাকরিতে বা ব্যবসায় হঠাৎ ধস নেমে যায়। পাপচার ও অন্যায় পথে টাকা উপার্জন করা হয়। কিন্তু তা তো হালাল রিযিক নয়। এই টাকার মধ্যে প্রশান্তি থাকে না। হালাল রিযিক পেতে হলে গুনাহ ছাড়তে হবে।

ব্যয়ের খাত দেখে আয়ের উৎস বোঝা যায় : ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন, আমাদের মালের ব্যয়খাত ও পাপীদের মালের ব্যয়খাত দেখেই বোঝা যায়, কার মাল হালাল কার মাল হারাম। কার সম্পদ বৈধ আর কার

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩২

সম্পদ অবধৈ। কারণ, হালাল সম্পদ নেক কাজে ব্যয় হয় আর হারাম সম্পদ গুনাহের কাজে ব্যয় হয়। একব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হয়রত! আপনার এই বক্তব্যের অর্থ কী?

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, চলো বিষয়টা পরীক্ষা হয়ে যাক। হযরত পকেট থেকে কতগুলো টাকা বের করে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকাগুলো নিয়ে শহরে যাও। যে লোকটাকে তোমার কাছে মনে সবচেয়ে ধনী মনে হবে, তাকে এগুলো দাও এবং তার পেছনে-পেছনে গিয়ে লক্ষ রাখো, লোকটা টাকাগুলো কী করে। লোকটি টাকাগুলো নিয়ে বাজারে গেল এবং ঠিকই সুন্দর পোশাকপরা দেখতে উচ্চ বংশীয় মনে হয় এমন এক লোককে ইমাম মালেকের দেওয়া টাকাগুলো দিল এবং খেয়াল রাখল, লোকটা কী করে।

টাকা পেয়ে লোকটা বাজারের অপর পাশে গেল এবং হাতে রাখা বাজারভর্তি ব্যাগটা ফেলে দিল। দোকানে গিয়ে হরেক রকম আহার্য ক্রয় করে বাড়ির পথ ধরল। দাতা লোকটি পেছনে-পেছনে গেল এবং ঘরে গিয়ে হাজির হলো। জিজ্ঞেস করল, ভাই! আমি আপনাকে টাকা দিলাম আর সাথে-সাথে আপনি আপনার হাতের ব্যাগটা ফেলে দিয়ে বাজার করে নিয়ে এলেন! ঘটনাটা কী? এবার যাকে টাকা দেওয়া হয়েছে, সে বলল, ভাই! আমি আজ দু-তিন দিন ধরে ক্ষুধার্ত। বাচ্চারা ক্ষুধার্ত, স্ত্রী ক্ষুধার্ত। নিজে অসুস্থ। তাই কাজ করতে পারি না, কারও কাছে ভিক্ষাও করতে পারি না। নদীতে একটা মরা বকরি ভেসে যেতে দেখে তার রান কেটে ব্যাগে নিয়েছিলাম। কারণ, আমার এমন কঠিন অবস্থায় তো মরা জন্তু আমার জন্য হালাল। কিন্তু তোমার দেওয়া টাকার মালিক হওয়ার পর তো আমি খাদ্য ক্রয়ের সক্ষমতা অর্জন করেছি। এখন সেই জন্তুর গোশত আমার জন্য হারাম। তাই তা ফেলে দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে পরিবার ও বাচ্চাদের আহারের ব্যবস্থা করলাম।

লোকটি ইমাম মালেকের নিকট এসে পুরো ঘটনা শোনাল এবং খুব বিস্ময় প্রকাশ করল। ইমাম মালেক বললেন, দেখেছ তো আমার টাকাটা কীভাবে একটি নেক কাজে, মানবিক কাজে এবং অনাহারের আহার সংগ্রহের কাজে লাগল? এবার তোমার পকেট থেকে কিছু টকা যাকে তুমি সবচেয়ে গরিব, অসহায় ও ভিক্ষা পাওয়ার যথাযথ হকদার মনে কর, তাকে দান করো। লোকটা টাকা নিয়ে বের হলো এবং একজন ছেঁড়া কাপড় পরা ল্যাংড়া

দরিদ্র লোককে দিল আর তার পেছন-পেছন লক্ষ রাখল, লোকটার গতিবিধি দেখল। লোকটা সোজা একটা মদের দোকানে গেল। মদ নিল। তার পর একটা বেশ্যালয়ে গেল এবং যিনা করল।

দাতা লোকটি ইমাম মালেকের কাছে এসে ওই ঘটনাটাও সবিস্তারে বলল এবং একথাও স্বীকার করল যে, হযরত! আপনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। আমার টাকাটা হারাম ছিল। আমি একজন গরিব মানুষ খুঁজে টাকাটা দিলাম। তবুও তা গুনাহের কাজে ব্যয় হলো। আর আপনার টাকাটা নেকের কাজে ব্যয় হলো।

তাই ভাইয়েরা! যদি দেখেন, কেউ পাপাচারী আর সে অঢেল সম্পদের মালিক, অবৈধ কাজে টাকা ব্যয় করে, তাহলে বুঝবেন, তার এই রিযিক, এই অর্থ হালাল নয়– হারাম।

১০. প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় : গুনাহের ক্ষতিকর পরিণতির মধ্যে আরেকটা পরিণতি হলো নিজের প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া। প্রত্যেক মানুষের কিছু-না-কিছু প্রভাব ও ব্যক্তিত্ব থাকে। গুনাহের কারণে সেই ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়।

تَتَبَدَّلُ حِقَارَتُهُ فِيْ قُلُوْبِ النَّاسِ

'বান্দার হীনতা ও নিকৃষ্টতা মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়।'

তাকে সকলে তখন তুচ্ছ মনে করে। হয়তো বাহ্যিকভাবে তার ভয়ে তাকে সম্মান করবে; কিন্তু বাস্তবে সবাই তাকে ভর্ৎসনা করবে, ঘৃণা করবে।

১১. শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায় : আরেকটা ক্ষতি হলো, শয়তান তার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে যায়।

يَكُوْنُ الشَّيْطَانُ مَوْلَاهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

'আল্লাহর পরিবর্তে শয়তান তার বন্ধু হয়ে যায়।'

আল-কুরআনের বাণী–

وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا

'শয়তান যার সঙ্গী হয়েছে, সে বড়ই নিকৃষ্ট সঙ্গী পেল।'[১]

১২. অন্তর রঙিন হয়ে যায় : আর কুরআনের ঘোষণা–

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৩৮

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

'সাবধান! তাদের অন্তর রঙিন হয়ে গেছে, দিলে ঝং ধরে গেছে। আর সে-কারণে তারা আর ভালো-মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ চিনতে পারে না।'[১]

১৩. নেক কাজের স্বাদ থেকে মাহরুম হয়ে যায়

حرمان من حلاوة الطاعة নেক কাজের একটি বিশেষ স্বাদ ও মজা আছে। সেই মজা থেকে গুনাহগার ব্যক্তি মাহরুম হয়ে যায়। ফলে তার মনে নেক কাজ করার ইচ্ছেই জাগে না। সে মোরাকাবায় স্বাদ পায় না, যিকিরে স্বাদ পায় না, দীনের ফিকিরে স্বাদ পায় না।

১৪. আল্লাহর হেফাযত থেকে মাহরুম হয় : গুনাহগার তার গুনাহের কারণে আল্লাহর হেফাযত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। আল্লাহর হেফাযত ও সুরক্ষার কেল্লা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে। তাকে বের করে দেওয়া হয়। ফলে তার ওপর কী বিপদ এল এবং তার কী হলো এসব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ পালন করেন না।

১৫. ইল্‌ম থেকে মাহরুম হয়ে যায় : গুনাহের বড় একটি ক্ষতি হলো, গুনাহগার ইল্‌ম প্রাপ্ত হয় না। গুনাহগার ইল্‌ম থেকে মাহরুম হয়ে যায়। ছাত্র সবক ইয়াদ করবে আবার ভুলে যাবে। অনেক সময় সবক ইয়াদ হবেই না। ভালো যেহনের কারণে কিছু দিন খুব ভালো পড়ালেখা করবে হয়তো। কিন্তু একসময় তার এই গুনাহ তাকে ছোবল মারবে। সে ইল্‌মের পথ থেকে ছিটকে পড়বে এবং ইল্‌ম থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

১৬. আয়ু কমে যায় : গুনাহের কারণে বান্দার হায়াত কমে যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে-বান্দা গুনাহ করে, আল্লাহ তা'আলা তার হায়াত কমিয়ে দেন। এর দুটি ব্যাখ্যা আছে।

১. একেবারে বাস্তবিক জীবনে থেকেই তার হায়াত কমে যাবে।

২. কার্যক্ষেত্রে হায়াতের কমতি দেখা যাবে। ২৫ বছরের যুবক; কিন্তু কাজে ও কর্মে বৃদ্ধের মতো হবে। তার যৌনক্ষমতা থাকবে না। দৃষ্টিশক্তি থাকবে না। বুড়ো মানুষের শরীরের মতো হয়ে যাবে। তার শরীরটা রোগের বাসা হয়ে যাবে, যেন বাচ্চা বয়সেই তার বার্ধক্য এসে গেছে। এমন হবে গুনাহগার বান্দার অবস্থা।

---

১. সূরা মুতাফফিফীন : আয়াত ১৪

১৭. ইসলামের দুশমনদের সাদৃশ্য হয়ে যায় : গুনাহ করার আরেক বড় বিপদ গুনাহগার বান্দার ইসলামের দুশমনদের সাথেসাদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে হাদীছ শরীফের বক্তব্য অনুযায়ী তার ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তার ওপর শয়তানকে নিযুক্ত করে দেন।

আমার ভাইয়েরা! গুনাহ করার আগে গুনাহের এই অসুভ পরিণামগুলোর কথা চিন্তা করুন। যদি এই চিন্তাটা হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন, তাহলে গুনাহের কাছে যেতেও ভয় হবে। আল্লাহ গুনাহ থেকে রক্ষা করবেন।

আমাদের আলোচনা চলছিল গুনাহ কীভাবে ত্যাগ করা যায় সে বিষয়ে। তো গুনাহ ত্যাগ করতে হলে প্রথমে যে-আমলটি করতে হবে, তা হলো গুনাহের শেষ পরিণাম ও পরিণতির কথা সর্বদা চিন্তা করবে। এবার আমরা দ্বিতীয় আমলের কথা আলোচনা করছি।

দ্বিতীয় আমল আল্লাহকে লজ্জা করা : মানুষ গুনাহ ছাড়ার জন্য বড় যে পদক্ষেপটি প্রয়োজন, তাহলো আল্লাহকে লজ্জা করা। আমার চাওয়া ব্যতীতই আল্লাহ আমাকে কত নেয়ামত দান করেছেন! আমি কত বড় নির্লজ্জ যে, আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুম তামিল করছি না। একটা অবুঝ শিশুও যদি কাছে ও পাশে থাকে, তাহলেও মানুষ গুনাহ করতে সাহস করে না। অথচ যে-আল্লাহ সর্বদা আছেন, আমাকে দেখছেন, কীভাবে তাঁর সামনে তাঁর জমিনে অবস্থান করে তার অবাধ্যতা করছি। তারপর আল্লাহ যত নেয়ামত দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারেও চিন্তা করবে যে, আমার রব আমাকে আবেদন ছাড়াই এত নেয়ামত দিয়েছেন, তারপরও আমি তার নাফরমানি করব।

তৃতীয় আমল আল্লাহর ভয় : কখনও গুনাহের কারণে বান্দার হাতে ধরা খেতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

'তারা গুনাহের দ্বারা আমাকে যখন রাগান্বিত করল আমি তখন তাদের থেকে বদলা নিলাম।'[১]

আল্লাহর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। তাই তাঁর অসন্তুষ্টির ও পাকড়াওয়ের ভয় মনে-মনে পোষণ করবে।

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৫৫

চতুর্থ আমল মৃত্যুকে স্মরণ করা

قَصْرُ الْاَمَلِ وَكَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ

'আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কমিয়ে ফেলা এবং মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করা।'

মৃত্যুর ভাবনার কারণেও গুনাহের আগ্রহ দমন হয়।

পঞ্চম আমল নফসের মুজাহাদা : গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি তরিকা হচ্ছে নফসকে লোভ-লালসা, বদঅভ্যাস ও অসদাচরণ থেকে বিরত রাখা।

مُجَانَبَةُ الْفُضُوْلِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

'অত্যধিক খাবারদাবার থেকে বিরত থাকার দ্বার গুনাহের খাহেশ কমে।'

ষষ্ঠ আমল নিজেরর হিসাব নেওয়া : সকাল-সন্ধা মোরাকাবা করা যে, আজ সারা দিন আমার দ্বারা কী-কী নেক আমল ও কী-কী বদ আমল ঘটল এর হিসাব করা।

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا

'তোমাদের হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও।'

সপ্তম আমল ভালো মানুষের সাহচর্য : বুর্যুগানে দীনের সাহচর্যে থাকা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার অন্যতম একটি মাধ্যম।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করো এবং সৎ লোকদের সংস্পর্শে থাকো।'[১]

গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এই পদ্ধতিগুলো অত্যন্ত উপকারী। এ সকল বিষয়ে আমরা অভ্যস্ত হলে অতি সহজে গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারব।

তাওবা কবুলের আলামত

শেষ কথাটা বলছি। মনে করুন, আপনি তাওবা করলেন। সমস্ত বদঅভ্যাস ত্যাগ করলেন। তাওবা করলেন এবং আর কখনও পাপ করবেন না বলে দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করলেন। এখন এই তাওবা কতটা গ্রহণযোগ্য

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১১৯

হলো, কতটুকু কবুল হলো, তা কীভাবে বুঝবেন? এর কিছু আলামত আছে, যেগুলো দেখে বোঝা যায়, আমার তাওবা কবুল হলো কিনা।

১. সামনের দিনটি অতীত থেকে ভালো কাটে : ইরশাদ হচ্ছে–

اَنْ يَّكُوْنَ بَعْدَ التَّوْبَةِ خَيْرَ مِنْ مَا كَانَ قَبْلَهَا

তাওবার পরের অবস্থাটা তাওবার পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভালো কাটে। এমন যদি হয়, তাহলে এটি তাওবা কবুলের আলামত। তাওবার পর নামায কাজা হয় না, পাপের পথে পা বাড়ে না, আমলে-আখলাকে মানুষটি ভালো হয়ে গেছে, তাহলে বুঝবে, তাওবা কবুল হয়েছে।

২. ফের পথ হারানোর ভয় : দ্বিতীয় আলামত–

اَنْ لَّا يَزَالَ الْخَوْفُ مِنَ الْعَوْدَةِ اِلَى الذَّنْبِ مُصَاحِبًا لَّهٗ

এটিও একটি আলামত যে, বান্দা সর্বদা মনে-মতে ভয়ার্ত থাকে যে, আমি আবারও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাব না তো! সে নিজের নফসের ওপর ভরসা করে না। তাই সে সব সময় ভয় করে চলে।

৩. গুনাহে অনাগ্রহী হওয়া : তৃতীয় আলামত হচ্ছে–

اِنْخِلَاءُ الْقَلْبِ وَتَقَطُّعُهٗ نَدَمٌ وَخَوْفٌ مِّنَ الْعُقُوْبَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْاٰجِلَةِ

'মানবাত্মা গুনাহের আগ্রহমুক্ত হবে। আত্মা থেকে গুনাহের আকর্ষণ বের হয়ে যাবে গুনাহের প্রতি তার অনাগ্রহ তৈরি হবে।'

আজকালের নওজোয়ানরা তো বড়ই উন্মাদ। বড়ই অদ্ভুতভাবে বেড়ে গেছে তাদের কুদৃষ্টির মহামারি। হৃদয়ের লালসা তীব্র হয়ে গেছে। লালসা থেকে জন্ম নেয় অপরাধ। কেউ-কেউ দ্বিতীয়, তৃতীয় বিবাহের জন্য পাগল হয়ে যায়। আমার কাছে কোনো-কোনো ব্যক্তি চিঠি লিখে বলে, হযরত! দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিন। আমি বলি, শরীয়তে তো চারটা পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ। তবে তুমি এ-বিষয়ে তোমার প্রথম স্ত্রীর সাথে পারমর্শ করো। একথার পর তাদের খাহেশ চুপসে যায়।

লালসা বের হয় কীভাবে : আমি একবার একস্থানে গেলাম। চার-পাঁচটা তরুণ বসে আছে সেখানে। সকলেই বিবাহিত। তারা আরেকটা করে বিয়ে করা নিয়ে কথা বলছে। তারা ছিল ছাত্র। আমি তাদেরকে কিছু কথা বললাম। বললাম, দেখো তুমি দ্বিতীয় বিবাহের নেশায় পড়ে গেলে তো ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেদমত করতে পারবে না। আজকের যুগটা এমন নয় যে,

দুটা বিয়েও করবে আবার বিদ্যাচর্চার কাজও চলু রাখবে। যদি ইল্‌ম ও দীনের খেদমত করতে চাও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে যে একটা বউ দিয়েছেন, যে বউটা ভালো, সুন্দরী, নেককার, সুস্থ-সবল এবং সর্বকাজে সক্ষম, সেই বউটাকে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো– অন্য বিয়ে করার চিন্তাও করো না। ইল্‌মের খেদমতে মশগুল থাকা অবস্থায় দুই বউয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ তুমি করতে পারবে না। অথচ ইসলাম ও কুরআন স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে কঠোরভাবে। তাই যে-স্ত্রীটা আছে, তাকে নিয়েই জীবন যাপন করো।

তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, হযরত আমাদের অন্তর থেকে আরেকটা নারীকে যে পছন্দ করলাম, তার লালসা দূর হচ্ছে না। সে-কারণেই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বদনজর ও কুদৃষ্টি হয়ে যায়। আমি বুঝিয়ে বললাম, আরে ভাই! আল্লাহ তোমাদের পড়াশোনা ও ইল্‌ম অর্জনের জন্য সবল করেছেন। তোমরা ইল্‌মের পথে অগ্রসর হও। ঘরে আল্লাহ তোমাকে স্ত্রী দিয়েছেন। এই স্ত্রীকেই ভালোবাসো, তাকে আদর-স্নেহ করো, সুন্দরভাবে জীবন যাপন করো। তারা সকলে ওয়াদা করল, বদনজর ও কুদৃষ্টি করবে না এবং লোভলালসা পরিত্যাগ করবে।

কিছুদিন পর তাদেরই মধ্য থেকে একজন হাফেজ আমার কাছে এল এবং বলল, হযরত! যেদিন থেকে আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বাইরের কোনো নারীতে লালসা করব না, সেদিন থেকে কী যে হলো বুঝতে পারছি না, আমার স্ত্রীটা আমার কাছে এত ভালো লাগে, এত সুন্দর লাগে যে, বলে বোঝাতে পারব না। তো এটা একটা স্বভাবজাত ব্যাপার। মানুষ যখন বাহ্যিক দিক থেকে লালসাহীন হবে, তখন আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাত তাকে স্ত্রীর ভালোবাসা ও প্রেম দ্বারা সিক্ত করে দেবেন।

৪. বিনয় : চতুর্থ আলামত হলো, যার তাওবা সত্য হবে, কবুল হবে, তার মাঝে একপ্রকার বিনয় চলে আসে। সে যখন কথা বলে, তখন ভাবে বোঝায়, আমি অক্ষম, আমার কোনো সামর্থ্য বা প্রভাব নেই। তার আচরণে অহংকার বলতে কিছুই থাকে না।

রিযিকে বরকত আসে যে-আমলে : এখানে আরেকটি বিষয় বলে দিচ্ছি। কিছু মানুষ আছে, রিযিকের প্রশস্ততার জন্য তারা তাবিজ নেয়। হাদীছে রিযিকের সংকীর্ণতা দূর হওয়ার কিছু আমলের কথা বর্ণিত হয়েছে।

যেমন–

◘ এস্‌তেগফারের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।

◘ অধিক ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ হজ করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ বেশি-বেশি ওমরা করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ সদকা করার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ দুর্বল ও অসহায়ের সাথে ভালো আচরণের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন।

◘ তাকওয়ার বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ সত্য বলার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

◘ হিজরতের আমলের দ্বারা আল্লাহ্ রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন ।

এই আমলগুলোর কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়গুলোর ওপর আমল করতে পারলে আল্লাহ্ ওই সকল নেয়ামত আমাদেরও দান করবেন।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! তাওবার বিষয়ে যথেষ্ট আলাচনা উপস্থাপনা করা হয়েছে। তাওবার আরকান কী, তাওবা কবুলের আলামত কী, কোন-কোন অভ্যাস ছাড়তে হবে সবই সবিস্তারে আলোচনা করা হলো। আল্লাহ্ আমাদের আমলের তওফীক দান করুন।

তাওবা করা আল্লাহর কাছে প্রিয় কাজ

তাওবা আল্লাহ্ তা'আলা এত বেশি পছন্দ করেন যে, হাদীছে বর্ণিত আছে–

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'তাওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাওবাকারীদের পছন্দ করেন।'[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২২২

আরেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে-বান্দা সত্য তাওবা করে ইয়া রব! ইয়া রব! বলে আহাজারি করে, তার ওপর আল্লাহর এত খুশি হন যে, তার ইয়া রব! ধ্বনির জবাবে আল্লাহ বলেন–

لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ

'আমি আছি তোমার তরে হে আমার বান্দা!'

আরেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, এক মুসাফির উটনিতে চড়ে কোনো এক মরুভূমিতে চলছিল। ক্লান্ত হয়ে একসময় সে শুয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উঠে দেখল, উটনি সামানপত্র নিয়ে চলে গেছে। কোনোক্রমেই উটনিকে খুঁজে পেল না। মুসাফির ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা আর নির্জন এই ভয়াবহ স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখল, তার উটনি তার কাছে আবার ফিরে এসেছে। বান্দা এত খুশি হলো যে, সে বলতে চাইল, আল্লাহ! তুমি আমার রব আর আমি তোমার গোলাম। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে বলে ফেলল–

اَللّٰهُ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ

'হে আল্লাহ! তুমি আমার গোলাম আর আমি তোমার রব।'

হাদীছে বলা হয়েছে, এই বান্দা নতুন জীবন হাতে পেয়ে যেমন খুশি হয়েছে, আল্লাহ তার চেয়েও বহুগুণ খুশি হন বান্দার তাওবার কারণে। আল্লাহু আকবার কাবীরা! যদি বান্দার তাওবা করার কারণে আল্লাহ এতটা খুশি হতে পারেন, তাহলে আমাদের কী করা উচিত হবে বলুন।

তাওবার এরাদা করুন

খতীবুল আম্বিয়া হযরত শুআইব (আ.) যখন তাঁর জাতিকে দাওয়াত দিয়ে বললেন–

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

'তোমরা আপন রবের কাছে এস্তেগফার করো। তারপর তাওবা করো। আমার রব বড়ই দয়ালু ও মহব্বতকারী।'[১]

তো আমরা যদি তাওবা করি, আল্লাহ আমাদের ওপরও রহমত নাযিল করবেন, আমাদেরও আল্লাহ মহব্বত করবেন। তাই বলছি, চলুন ভাইয়েরা!

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৯০

সকল গুনাহ পরিত্যাগ করে আজই তাওবার এরাদা করি। আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ যে, পূর্বের উম্মত কোনো গুনাহ করলে সেকথা তাদের দরজায় লেখা হয়ে যেত, এই বান্দা এই গুনাহ করেছে। নবীজি যেহেতু রহমাতুল্লিল আলামীন, তাই এ-যুগে দরজায় লেখার আযাবটা আমাদের জন্য মাফ করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই চেহারায় লেখা ভেসে ওঠার বিষয়টি বহাল আছে। যে-বান্দা-ই গুনাহ করে, আল্লাহ তার চেহারায় তা লিখে দেন। যারা পড়তে পারেন এমন লোকেরা তো পড়েও নেন। আর তারা হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও এমন দৃষ্টিশক্তি দান করুন যে, আমরা আমাদের চেহারার গুনাহের পরিণতি যেন অবলোকন করতে পারি।

আম্বিয়া কেরাম ও মহান আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার শান

আমাদের উচিত, আল্লাহর আযমত ও বড়ত্ব সামনে রাখা। ভাবা উচিত, আমরা কোন পরওয়ারদেগারের হুকুম লঙ্ঘন করছি। কত বড় ভুল করছি আমরা। আল্লাহ তো এমন সত্তা, যার সামনে আম্বিয়া কেরামও থরথর করে কাঁপেন। অথচ আম্বিয়া কেরাম সর্বদা গুনাহমুক্ত থাকেন।

এ-ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন–

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

'তারা ভালো কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে এবং মনে আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকে।'[১]

তো এই আম্বিয়া কেরামের ব্যাপারটা-ই দেখুন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নিজের অমুখাপেক্ষিতাও প্রকাশ করছেন আবার নবীদের ব্যাপারটাও বলে দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন। হযরত আদম (আ.) সামান্য একটা ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বহিষ্কার হয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের ওপর দয়া না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[২]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৯০
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ২৩

আল্লাহ হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, আমি আপনার পরিবারকে প্লাবন থেকে রক্ষা করব। নূহের সন্তান তাঁরই সামনে উত্তাল জলরাশিতে ডুবে যচ্ছিল।

وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

'তরঙ্গ তাদের দুজনের মাঝে আড়াল তৈরি করল এবং ছেলেটা ডুবে গেল।'[১]

এবার নূহ (আ.) আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন–

إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ

'নিশ্চয় আমার ছেলে আমার পরিবারভুক্ত আর আপনার ওয়াদাও তো সত্য।'[২]

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

'সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়– তার আমল মন্দ।'[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন–

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

'আমি তোমাকে নসীহত করছি, আমার সামনে মূর্খতাসুলভ কাজ করবে না।'[৪]

হযরত নূহ (আ.) সাথে-সাথে ক্ষমা চেয়ে নিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন।

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। কারণ, আমি এমন একটি বিষয় আপনার কাছে প্রার্থনা করেছি, যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়াপরবশ না হন, তা হলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৫]

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ৪৩
২. সূরা হূদ : আয়াত ৪৫
৩. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
৪. সূরা হূদ : আয়াত ৪৬
৫. সূরা হূদ : আয়াত ৪৭

আম্বিয়া কেরাম (আ.) আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত। আল্লাহর শান-মান তাঁরা বোঝেন। তাই তাঁরা ভয়ে-ভয়ে থাকেন যে, সেই রব্বে কারীমের অমুখাপেক্ষিতার শানের খেলাফ আচরণ বেরিয়ে যায় কিনা; তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

◘ সায়্যেদুনা হযরত ইবরাহীম (আ.)কেই দেখুন। সুস্থাবস্থায় তিনি প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন, আমি অসুস্থ; আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। এই সামান্য কথাটুকুর জন্যও তিনি বড়ই ভয়ার্ত হয়েছিলেন যে, কেয়ামতের দিন তিনিও আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে ভয় পাবেন।

◘ হযরত মূসা (আ.)-এর ইতিহাস দেখুন। তার হাতে এক কাফের মারা গিয়েছিল। আল্লাহর এক বান্দা তাঁর হাতে প্রাণ দিয়েছে। এর ভয়ে তিনিও কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে ভয় পাবেন।

◘ হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কষ্টের কথা ভাবুন। তাঁর ফুলের মতো সুন্দর সন্তান হযরত ইউসুফকে আল্লাহ তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনিও ভয় পাবেন আল্লাহর সম্মুখিন হতে যে, একজন সন্তানকে আমি বেশী ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

◘ হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর ইতিহাস দেখুন। তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু তাঁরও মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীর চেরা হয়েছিল করাত দিয়ে। পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও তার শরীরটাকে দুই টুকরা করে দেওয়া হলো।

◘ হযরত ইয়াহইয়া (আ.)-এর গর্দান কাটা হয়েছিল দুনিয়াতেই।

◘ ইউনুস (আ.)কে আল্লাহ তা'আলা মাছের খাবারে পরিণত করেছিলেন। এমন বড়-বড় নবীদের সঙ্গে যদি আল্লাহ তা'আলা এমন মুআমালা করে থাকেন, তাহলে আমাদের ওপর থেকে যদি রহমতের আঁচল সরিয়ে নেন, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে! ভাই! আবারও বলছি, আজ সময় এসেছে নিজেদের গুনাহ থেকে তাওবা করার। তিনি তো আমাদের কাছে দায়বদ্ধ নন– আমরা তার দয়ার ভিখারী। বালআম বাউর পাঁচশত বছর ইবাদত করেছিল। সে 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াহ' তথা দু'আ করলেই কবুল হয়ে যায় এমন ব্যক্তি ছিল। তার থেকে কিছু ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। ফলে তার পরিণতি বড়ই কঠিন হয়েছিল।

এসব হাদীস নয় ২/৪৪

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا

'আমি চাইলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম।'[১]

সে ধ্বংস হয়েছে, খাহেশাতের অনুগত হয়ে গেছে। আমি তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

'তার সদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরের মতো।'[২]

পাঁচশত বছরের ইবাদাত সত্ত্বেও আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে কুকুরের মতো হয়ে গেল সে! আল্লাহ কারও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। যদি আল্লাহ কোনোভাবে আমাদের ওপরে রাগ হয়ে যান, নারাজ হয়ে যান, তাহলে আমাদের কী দশা হবে!

এবার তাওবা করে নিন

আজই রবকে রাজি করার সময়। আজই আল্লাহর কাছে সত্য হৃদয়ে তাওবা করার সময়। আমার বন্ধুগণ! আমরা কেঁদে-কেঁদে মাফ চাইব আমাদের রবের কাছে যে, হে আল্লাহ! আমরা যত গুনাহ-ই করেছি– ইচ্ছায় করেছি আর অনিচ্ছায় করেছি; বুঝে, না বুঝে যেভাবেই করেছি, আপনি আমাদের মাফ করে দিন।

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ

'হে আল্লাহ! আপনার মাগফেরাত আমার গুনাহ অপেক্ষা বহু গুণ বিস্তৃত।'

وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

'আমরা আমাদের আমল থেকেও বেশি ভরসা পোষণ করি আপনার রহমতের ওপর।'

হে আল্লাহ! আমরা আমাদের আমলের ওপর ভরসা করি না। আপনার রহমতের ওপর ভরসা করি। তাই আমাদের আপনার রহমত দ্বারা ঢেকে নিন। আমাদের গুনাহগুলোকে মাফ করে দিন। হে রবেব কারীম! আমরা

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬
২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৭৬

আজ আপনার দরবারে মাথা নত করছি। আমরা বহু গুনাহ করে ফেলেছি। আমরা স্বীকার করছি, আমরা অপরাধী। আমাদের তাওবা কবুল করে নিন হে মাওলা!

এক বুযুর্গের কাছে একজন বৃদ্ধ এল। বুযুর্গ বৃদ্ধকে বললেন, তুমি আসতে দেরী করে ফেলেছ। বৃদ্ধ আয়াত পাঠ করল–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ

'নিশ্চয় আল্লাহর জন্য এ সকল ব্যক্তির তাওবা কবুল করা আবশ্যক যারা অজ্ঞতাবশত পাপ করে ফেলে।'[১]

শাহওয়াত তীব্র হলে বান্দার আকল-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, বান্দা যখন রাগ করে, তখন তার আকলের ওপর পর্দা পড়ে যায়। জ্ঞানীও তখন জাহেল হয়ে যায়।

ইরশাদ হচ্ছে–

ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

'তারপর তারা অবিলম্বে তাওবা করে নেয়।'[২]

তাফসীরবিদ ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এখানে قَرِيْبٍ শব্দটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মরার পূর্বে তাওবা করে নেয়। তো বুযুর্গ যখন বৃদ্ধকে বললেন, তুমি আসতে দেরি করেছ। বৃদ্ধ জবাবে বলে দিলেন, দেখুন, আল্লাহ বলেছেন, তারা অবিলম্বে তাওবা করে নেওয়া। তার মানে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সময়টাকে قَرِيْبٍ বলা হয়। মৃত্যু পর্যন্তও যদি আমার আগমন দীর্ঘায়িত হতো, মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও যদি আমি আসতাম, তাহলে সেটাও তাড়াতাড়িই আসা হতো, তাকে আমার দ্রুত আসা-ই বলা হতো।

হে আল্লাহ! আজকের এই মাহফিলে আমরা যত মানুষই আছি, সকলেই তাওবা করছি। হে আমাদের মাওলা! আমাদের ওপর অনুগ্রহ করুন। হে মাওলা! আমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। হে রব্বে কারীম! এখানে সকলে মিলে আমরা প্রার্থনা করছি, নেককারদের উসিলায় আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দাও। আমাদের তাওবা কবুল করে নাও হে মাওলা!

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১৮
২. সূরা তাওবা : আয়াত ১৮

হে আল্লাহ! আমরা তো ফেরাউনের জাদুকরদের থেকেও মারাত্মক নই। তারা তো জাদুকর ছিল। আমরা তো জাদুই শিখিনি। আমাদের সাহায্য করুন হে আল্লাহ! আমাদের আসহাবে কাহফের কুকুর থেকে হতভাগা করবেন না। ওই কুকুরের ব্যাপারে তো আপনি জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আপনি আমাদের জান্নাত থেকে মাহরুম করবেন না।

হে আমার মাওলা! সিনাই পার্বতের একটি বৃক্ষে আপনার নূরের তাজাল্লি পড়েছিল। তখন গাছ থেকে আপনার তাজাল্লি প্রকাশ পেয়েছিল। হে আল্লাহ! আমাদের পাথুরে হৃদয়ের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। ও হে আল্লাহ! যে হান্নানা বৃক্ষ নবীজির মহব্বতে ক্রন্দন করেছিল, আমাদের তার চেয়ে অনুভূতিহীন ও অসহায় বানাবেন না। যেন সেই প্রিয়তম নবীর ভালোবাসায় নিবেদিত হওয়া ব্যতীত আমাদের জীবন না কাটে। আমাদের ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করুন। আজকের এই সময়ে আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন হে আল্লাহ! আমাদের গুনাহ গুলো মাফ করে আমাদের তাওবা কবুল করে নিন হে আল্লাহ! আমরা সত্য তাওবা করছি। আপনি আমাদের মাফ করে দিন। আমাদের তাওবা কবুল করে নিন। ও হে মাওলা! আমরা তো জানি, আপনার একটি দরজা আছে, যেটি বন্ধ হয় না। আমাদের জন্য এই দরজা ছাড়া তো আর কোনো দরজা নেই।

হে আল্লাহ! এক অন্ধ ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক মানুষের দুয়ারে ভিক্ষা করতে-করতে রবের দরজা মসজিদের দরজায় এসে পড়েছিল। ভিক্ষুক এই দরজা থেকে কোনো দানকারীর জবাব না পেয়ে বলেছিল, কোনো কৃপণের দরজা মনে হয় এটি, কোনো জবাবও দেয় না। লোকেরা বলল, আরে! এটি তো মসজিদ– আল্লাহর ঘরের দরজা। তখন ওই অন্ধ ভিক্ষুক নিজের হাতের পাত্রটা ভেঙে ফেলল। বলল, আমি এখন রবের দুয়ারে এসে গেছি। এখন আর অন্যের কাছে ভিক্ষা করার প্রয়োজন আমার নেই।

হে আল্লাহ! আজ আমরাও তেমনি আপনার দরজায় এসে পড়েছি। আমরা আর কোনো দিকে চোখ তুলে দেখছি না। শুধু আপনার আযমত ও বড়ত্বের দিকে দেখি। আমাদের গুনাহের ওপর আমরা অনুতপ্ত। হে আল্লাহ! মেহেরবানি করে আমাদের তাওবা কবুল করুন। আমাদের একটি নতুন জীবন দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

ফেকাহ্ ও তাছাওউফের বুনিয়াদ

'তাছাওউফ অনারবি কোনো বিষয় নয়; বরং এটি একটি নিরেট আরবি বিষয়। কুরআনে তাছাওউফকে তাযকিয়া ও ইহ্সান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সময়ের সাথে-সাথে কুরআন ও হাদীছ রিচার্স করে এই বিষয়টিকে সুবিন্যস্ত করার পর এটি তাছাওউফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন ফেকাহ। ফুকাহায়ে কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় গ্রহণের পর কুরআন ও হাদীছ রিচার্স করে একে জমা করেছেন। এসব হচ্ছে মুক্তার মালা। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়– বরং ফেকাহায়ে কেরাম শরীয়তের কথা-ই ব্যক্ত করেছেন।'

ফেকাহ ও তাছাওউফের বুনিয়াদ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

তাছাওউফ ও সুলূকের মেহনত

নারী হোক আর পুরুষ হোক যে কেউ মেহনত করবে, আমল করবে, আল্লাহ বলেন, আমি সেই মেহনতকারী ও নেক আমলকারীকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব। প্রতিটি মানুষই চায় পবিত্র ও উত্তম জীবন তার নসিব হয়ে যাক। এই জীবন পেতে হলে আমলে সালেহর শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন আমলে সালেহ তথা নেক আমল করার উদ্দীপনা প্রবলভাবে বান্দার হৃদয়ে জেগে উঠে, যেন নেক কাজে বান্দা তেমনভাবেই ছুটে যায়, যেমন পিপাসিত মানুষ ছুটে যায় পানির দিকে। তো নেক আমল করতে হলে মেহনত করতে হয়। সেই মেহনতের নাম তাছাওউফ বা সুলূক।

বাইয়াতের উদ্দেশ্য

বাইয়াতের মাকসাদ ও উদ্দেশ্য হলো, মুরিদ অঙ্গীকার করবে, আমি আমার শায়খের কথা মান্য করব। আর পীর সাহেবের অঙ্গীকার থাকবে, আমি এখলাছ ও নিষ্ঠার সঙ্গে মুরীদের তত্ত্বাবধান করব, মুরীদকে সঠিক পরামর্শ দেব। এটা শায়খ ও মুরীদের মধ্যকার একটি অঙ্গীকার। এরপর শায়খ ঠিক করবেন, কোন মামুলাত, কোন আমল বাস্তবায়ন করার দ্বারা আমার এই মুরীদের হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা জন্ম নেবে।

চিন্তার বিষয়

একটু চিন্তা করুন, মোরাকাবা, উকূফে কালবী, দুরুদপাঠ, নবীজির ওপর সালাম প্রেরণ, এস্‌তেগফার তেলাওয়াতে কুরআন ও পীরের সান্নিধ্য এসব বিষয়কে বলা হয় মামুলাত। এখানে নামাযের কথা বলা হয়নি। এ-কারণে সাধারণ মানুষ ধাক্কা খায় যে, দেখো এত-এত নসীহতের কথা বলা হলো, এত-এত আমলের কথা বলা হলো; অথচ এগুলোর মধ্যে নামাযের কথা আলোচনা করা হলো না।

ব্যাপারটা বুঝতে হবে। কোনো মানুষ অসুস্থ হলে ডাক্তার তাকে ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ খাওয়ার উদ্দেশ্য কি পেট ভরা? বরং ওষুধের উদ্দেশ্য হলো রোগমুক্তি। কারণ, একজন মানুষ সুস্থ থাকলে তার ক্ষুধা লাগবে, খেতে পারবে। তেমনি এই মামুলাতও মানুষের চিকিৎসা। এসব আদায় করলে মানুষের রোগ খতম হয়ে যাবে, রূহানিভাবে সুস্থ হবে। তারপর নিজেই নেক কাজের উদ্দীপনা পাবে। শুধু নামাযই নয়– গোটা দীনই সে তখন মান্য করে চলবে।

শরীয়ত, তরীকত ও হাকীকত

এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ১. শরীয়ত ২. তরিকত ৩. হাকীকাত শরীয়ত ওই সকল কাজ, যা করা অথবা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ– কার্যকরী আহকামগুলোর সমষ্টির নাম শরীয়ত। আমাদের মাশায়েখে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন–

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا

'নফসকে যথাযথভাবে চেনার নাম হচ্ছে শরীয়ত।'

তরিকত হলো আমালে বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ আমলগুলোর ওপর অবিচল থাকতে পারার তরিকা ও পদ্ধতি ।

হাকীকত হলো, যখন মানবাত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং ওই বান্দার ওপর আল্লাহ রব্বুল ইয্‌যাতের রহমত ও নূর বর্ষিত হয়, সে এক তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে, তখন ঈমানের নূরের স্বাদ তার অনুভূত হয়। তখন বিশুদ্ধ আত্মার যে রূপ তৈরি হয়, তাকে বলে হাকীকত।

ইল্‌মে তাছাওউফ ইল্‌মে ফিকহেরই মতো সুবিন্যস্ত

তাছাওউফ অনারবি কোনো বিষয় নয়; বরং এটি একটি নিরেট আরবি বিষয়। কুরআনে তাছাওউফকে তাযকিয়া ও ইহসান নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সময়ের সাথে-সাথে কুরআন ও হাদীছ রিচার্স করে এই বিষয়টিকে সুবিন্যস্ত করার পর এটি তাছাওউফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন ফেকাহ। ফুকাহায়ে কেরাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় গ্রহণের পর কুরআন ও হাদীছ রিচার্স করে একে জমা করেছেন। এসব হচ্ছে মুক্তার মালা। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়– বরং ফেকাহায়ে কেরাম শরীয়তের কথা-ই ব্যক্ত করেছেন।

এই ইল্‌ম তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলেননি– শরীয়তেই বিদ্যামান ছিল। সাধারণরা যাতে বুঝতে পারেন, সেজন্য পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরাম উত্তরসূরীদের জন্য তাই লিখে দিয়ে গেছেন বড় যত্নের সঙ্গে। তারা তো বরং ছড়ানো-ছিটানো মণি-মুক্তাগুলো পুঞ্জীভূত করে দিয়েছেন। এতে চারটি মাযহাব সামনে চলে এসেছে।

তাহলে দেখুন, ফেকাহ ও হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এর পেছনে সময় ব্যয় করা হয়েছে। ফলে এতটুকু হয়েছেন যে পূর্বে কুরআন ও হাদীছের ইল্‌ম সংকলিত হয়ে গেছে। উত্তরসূরীদের কাজ শুধু ভক্ষণ করা।

ঠিক একই রকম অবস্থা হয়েছে তাছাওউফের বেলায়ও। মাশায়েখে কেরাম তাছাওউফের মূলনীতি, আইন-কানুন ও কায়েদাগুলো কুরআন-হাদীছ থেকে নিংড়ে জমা করেছেন। ফলে এটি একটি সংকলিত ইল্‌মরূপে পরিশুদ্ধ অবস্থান লাভ করেছে। এখানেও চারটি ধারা আমাদের সামনে চলে এসেছে।

ফেকাহ সংকলিত হলো কীভাবে

আজ আমরা ফিকহে হানাফীর ওপর আমল করছি। একে ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। কারণ, এই ইল্‌মের মূল বুনিয়াদ ইমাম আবুহানীফা (রহ.)।

ইল্‌মে ফিকহের বীজ বপন করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)

আমাদের আকাবিরে কেরাম কিতাবে লিখেছেন এবং দুররে মুখতার ও তাহাবি শরীফেও বর্ণিত আছে–

قَدْ قَالُوا اَلْفِقْهُ زَرَعَهُ اِبْنُ مُسْعُوْدٍ رض

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ইল্‌মে ফিকহের বীজ বপন করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।

زرعه -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–

اَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِاسْتِنْبَاطِ الْفُرُوْعِ

'শাখাগত মাসআলা উদ্ভাবনে যিনি সর্বপ্রথম কথা বলেছেন।'

কুরআনের উজু সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ করলে আমরা বড়জোর তার অর্থ বুঝতে পারি। অথচ ফুফাহায়ে কেরাম সেই আয়াত থেকে শত মাসআলা উদ্ভাবন করে নিয়েছেন। উমাইর নামে একটি ছোট বাচ্চা ছিল। সে একটা পাখি পালত। হঠাৎ সেটা মারা গেল। বাচ্চাটা নবীজির কাছে এলেই নবীজি তাকে ডাকতেন এবং বলতেন–

يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

'আবু উমাইর! তোমার পাখিটার কী হলো?'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, নবীজির এই বাক্যটি থেকে আমি ৪০টি মাসআলা উদ্ভাবন করেছি। যেমন– বাচ্চাদের কীভাবে স্নেহ করতে হবে, কীভাবে ডাকতে হবে, কেমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এমন চল্লিশটা মাসআলা উদ্ভাবিত হয় নবীজির একটি মাত্র বাক্য দ্বারা। দেখুন, বাস্তবে তারা এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাদেরকে দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সতেজ চিন্তাচেতনা দান করেছেন, সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) এর ইল্‌মি শান

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.) ইল্‌মের ময়দানে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ছয় নম্বরে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। নবীজির অতি প্রিয়জন ছিলেন তিনি। শরীর-স্বাস্থ্যে খুব দুর্বল মনে হতো। কিন্তু এলমে ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আজকালের আলেম আর তালেবুল ইল্‌ম 'এলমে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী' হোক বা না হোক 'শরীর-স্বাস্থ্যে' অবশ্যই মোটাতাজা হন।

আজকে দেহধারী আলেম ও তালেবে ইল্‌মদের দেখে তো মানুষ আঁতকে ওঠে। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.)-এর পায়ের সরু গোছা

দেখে সাহাবায়ে কেরাম হাসতেন। বিষয়টা নবীজি দেখে ফেললেন এবং বললেন, ইবনে মাসউদের পায়ের গোছা কেয়ামতের দিন উহুদ পাহাড়ের সমান হবে। তিনিই সেই সাহাবি, যিনি আবুজাহলের মস্তক কেটেছিলেন। আবুজাহলকে তো দুটি ছোট শিশু ধরাশায়ী করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এতটুকু শক্তি ছিল না যে, তারা তার গলাটা কাটবে। আবুজাহলের গলা কাটার মর্যাদা আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিয়েছেন। তিনি বদরি সাহাবি ছিলেন।

ইমাম ইবনে কায়্যেম (রহ.) লিখেছেন, সাহাবিদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৪ হাজার। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ১৪৯ জন এমন ছিলেন, যাদের ফেকাহর জ্ঞান ছিল। দীনের বিষয়ে তাঁদের ছিল অগাধ ও গভীর জ্ঞান। কোনো মাসআলা সামনে এলে বাকি সমস্ত সাহাবি তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন। তাঁরা অন্যদের তুলনায় বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। আর সেই একশত এর মধ্যেও ১৪ জন ছিলেন সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। সেই ১৪ জনের মধ্যে কারও কোনো বিষয়ে কোনোরূপ সংশয় দেখা দিলে সকলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর মতামতকে প্রধান্য দিতেন। তাঁর দিকেই সকলে মনোনিবেশ করতেন।

সেই ১৪ জনের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)। এই ১৪ জনের ইল্‌ম পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল ৬ জনের মধ্যে। সেই ৬ জনের নাম– (১) হযরত ওমর (২) হযরত আলী (৩) উবাই ইবনে কা'ব (৪) যায়েদ ইবনে সাবিত (৫) আবুদ্দারদা ও (৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। কোনো-কোনো ফকীহ এমনও লিখেছেন যে, এই ৬ জনের ইল্‌ম পুঞ্জীভূত হয়ে গিয়েছিল দুজনের মাঝে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আলী (রাযি.)-এর মধ্যে। নবীজির সমস্ত ইল্‌মি বিষয় সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করেছেন। সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আল্লাহ তা'আলা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে সর্বোচ্চ আসন দান করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ফিকহের বীজ বপণ করেছেন সর্বপ্রথম।

হযরত আলকামা পানি সিঞ্চন করেছেন

وَسَقَاهُ عَلْقَمَةُ

সেই বীজভূমে পানি সিঞ্চন করেছেন হযরত আলকামা (রাযি.)। ইনি ছিলেন তাবেয়ীনের একজন। তবে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবীজির

জীবদ্দশায়। ছোট ছিলেন বলে তাঁকে সাহাবি বলা হয় না। তিনি সায়্যেদুনা আয়েশা সিদ্দীকার কাছে ইল্‌ম অর্জন করেছেন। পানি সিঞ্চন করা মানে কি?

أَيَّدَهُ وَوَضَّحَهُ

'তিনি তাকে মজবুত করেছেন এবং খোলাসা করেছেন।'

তিনি হযরত ইবনে মাসউদের কাজকে মজবুত করেছেন এবং খোলাসা করে দিয়েছেন।

ইবরাহীম নখয়ী ফসল কেটেছেন

দুররুল মুহতারে তারপর বলা হয়েছে–

وَحَصَدَهُ إِبْرَاهِيمُ نَخْعِيٌّ

'ইবরাহীম নখয়ী ইল্‌মে ফিকহের জমিন থেকে ফসল কেটে ঘরে তুলেছেন।'

খেতে ফসল উপযুক্ত হলে তা কাটতে হয়। খেতে যখন ফসল আসে, তখন সে ফসল কেটে এনে ঘরে তুলতে হয়। ইবরাহীম নখয়ী ইল্‌মে ফিকহের খেতের ফসল কর্তন করে ঘরে তোলার কাজ সম্পন্ন করেছেন। حَصَدَهُ-এর মর্ম হলো–

جَمَعَ مَا تَفَرَّقَ مِنْ فَرَائِدِهِ وَنَوَادِرِهِ

পূর্বের ইমাম আলকামা যত কাজ করেছেন, ছড়ানো-ছিটানো সকল কাজ ইমাম নাখয়ি সুবিন্যস্ত ও একত্রিত করে দিয়েছিলেন। কেমন যেন তিনি জমিনে ছড়িয়ে থাকা ফসলগুলো জমা করে ঘরে তুলে এনেছেন।

সেই ফসল মাড়িয়েছেন হাম্মাদ

তারপর বর্ণিত হয়েছে–

وَدَاسَهُ حَمَّادٌ

'হাম্মাদ তাকে ভুষি ও চিটামুক্ত করে পরিষ্কার করেছেন।'

গম থেকে ভুষি আলাদা করতে হয়। গমের আহারযোগ্য অংশগুলো একদিক করতে হয় আর আবর্জনা ও ভুষি-চিটাগুলো আলাদা করতে হয়।

তো ইমাম হাম্মাদ খড়কুটা আলাদা করে সেই ফসল পরিচ্ছন্ন করেছেন, মাড়িয়েছেন। دَاسَهُ অর্থ اِجْتَهَدَهُ فِيْ تَنْقِيْحِهِ وَتَوْضِيْحِهِ পরিশোধিত ও পরিচ্ছন্ন

করেছেন। এই হাম্মাদ ইবনে মুসলিমই ছিলেন ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.)-এর ওস্তাদ।

ইমাম আযম (রহ.) বলেছেন, আমার ও আমার এই ওস্তাদের মাঝে ভালোবাসা এত গভীর ছিল যে, একবার আমার এই ওস্তাদ সফরে গেলেন। সফর থেকে ফিরে এলে ওস্তাদের ছেলে বলল, আব্বু! সফরে আপনার কি কারও কথা স্মরণ হয়েছিল? ওস্তাদ বললেন, হ্যাঁ; হয়েছিল। ছেলে বলল, কার কথা? ওস্তাদ বললেন, আমার শুধু নুমান ইবনে সাবেত আবুহানীফার কথা-ই স্মরণ হতো।

দেখুন, কলিজার টুকরা ছেলের কথা নয়– মনে হতো নিজের যোগ্য ছাত্র আবুহানীফার কথা। কারণ, ছেলে তো দেহের সন্তান। কিন্তু ছাত্র আবুহানীফা তার মানসসন্তান, রূহানী ছেলে। রূহানী সন্তান দৈহিক সন্তানের চেয়ে কম প্রিয় হয় না।

کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں

'কলিগুলোকে আমি বুকের রক্ত দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।'

এই যে এমন শাগরেদ তৈরি হলো, অনেক মেহনত তার পেছনে করতে হয়েছে। ইমাম আযম আবুহানীফা (রহ.) বলেন–

مَا صَلَّيْتُ صَلٰوةً اِلَّا اسْتَغْفَرْتُ لَهٗ مَعَ وَالِدَيَّ

'আমি যত নামায পড়েছি, তত নামাযের পরই আমার বাবা-মায়ের সাথে আমার ওস্তাদ হাম্মাদের জন্যও দু'আ করেছি।'

কেমন ছাত্র যে, প্রতিটি দু'আয় আপন ওস্তাদকে স্মরণ করেছেন।

ফিকহের ফসল পিষেছেন ইমাম আবুহানীফা

তারপর দুররুল মুখতারে বলা হয়েছে–

وَطَحَنَهٗ نُعْمَانٌ

আবুহানীফা নুমান ইবনে সাবেত সেই ফসলকে পিষে আটা বানিয়েছেন। ইমাম আযমের দাদা ইসমাঈল ইমাম আযমের বাবা সাবেতকে নিয়ে হযরত আলী (রাযি.)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন দু'আর জন্য। হযরত আলীর দু'আর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা সাবেতকে সন্তান দান করলেন। সেই সন্তান যুগের ইমাম আবুহানীফা নুমান ইবনে সাবেতে পরিণত হলো।

طَحَنَهُ نَعْمَانٌ-এর মর্ম হলো, তিনি এ ইল্‌মের ফসল পেষণ করেছেন, চূর্ণ ও গুঁড়ো করেছেন। আপনারা জানেন, গম-চাউল পেষণ করা খুব সহজ কোনো কাজ নয়। ওলামায়ে কেরাম طَحَنَهُ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন–

اَكْثَرَ اُصُوْلَهُ وَفَرَّعَ فُرُوْعَهُ وَاَوْضَحَ سُبُلَهُ

'ইমাম আযম আবুহানীফা ফিকহের মূলনীতিগুলোকে একত্রিত করে বর্ধিত করে দিয়েছেন।'

মানে শরীয়তে ফেকাহর যত মূলনীতি ছিল, সবগুলোকে তিনি একত্রিত করেছেন এবং শাখা-প্রশাখা বের করে তাতে আরও সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। মানে রাস্তাটাকে আরও পরিষ্কার করে দিয়েছেন। আর সেজন্যই তাঁর ব্যাপারে লেখা হয়েছে–

فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ

'ইমাম আবুহানীফা-ই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি ফেকাহকে সংকলিত করেছেন।'

وَرَتَّبَهُ اَبْوَابًا وَكُتُبًا

এবং সেগুলোকে অধ্যায় অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যাস করেছেন।

আজও সেই ধারা চলমান।

ইমাম আযমের ইল্‌মি অবস্থান

ইমাম আযম আবুহানীফাকে আল্লাহ তা'আলা এত ইল্‌ম দিয়েছেন যে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ الْفِقْهَ فَلْيَلْزَمْ اَصْحَابَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ

কেউ যদি ফিকহের ইল্‌ম অর্জন করতে চায়, সে যেন আবুহানীফার শাগরেদদের সংস্পর্শ অবলম্বন করে।

ইমাম শাফেয়ী কসম করে বলেছেন–

وَاللّٰهِ مَا صِرْتُ فَقِيْهًا اِلَّا بِكُتُبِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَنٍ

আল্লাহর কসম! ইমাম আযমের ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের কিতাব ছাড়া আমার ফকীহ হওয়া সম্ভব ছিল না।

ইমাম আযম সম্পর্কে তাঁরই সমসাময়িক এক আলেম বলেছেন–

قَالَ اِسْمَعِيْلُ بْنُ اَبِيْ رَجَاءَ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ فَقَالَ غَفَرَ لِيْ ثُمَّ قَالَ لَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُعَذِّبَكَ مَا جَعَلْتُ هٰذَا الْعِلْمَ فِيْكَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَيْنَ اَبُوْ يُوْسُفَ؟ قَالَ فَوْقَنَا دَرَجَتَيْنِ قُلْتُ فَاَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ هَيْهَاتَ ذَاكَ فِيْ اَعْلٰى عِلِّيِّيْنَ كَيْفَ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ بِوُضُوْءِ الْعِشَاءِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

ইসমাঈল ইবনে আবু রজা বলেন, আমি একবার স্বপ্নে ইমাম মুহম্মাদকে দেখলাম। তাকে আমি বললাম, আপনার সঙ্গে আল্লাহ কেমন আচরণ করেছেন? ইমাম মুহাম্মাদ বললেন, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন, আমি যদি তোমাকে আযাব দিতে চাইতাম, তাহলে তোমাকে এই ইল্‌ম দান করতাম না। ইসমাঈল বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু ইউসুফ কোথায়? ইমাম মুহাম্মাদ বললেন, তিনি আমাদের চেয়ে দুই স্তর ওপরে আছেন। আমি বললাম, তাহলে ইমাম আযম আবুহানীফা কোথায়? ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, তিনি তো জান্নাতের আলা ইল্লিয়্যিনে আছেন। কেনইবা তিনি সেখানে থাকবেন না? অথচ তিনি ৪০টি বছর ঈশার উজু দিয়ে ফজর আদায় করেছেন।

৪০ বছর ইশার উজু দিয়ে ফজর নামায!

যারা বলে, আমরা কারও তাকলীদ মানি না, সেসব ভাইয়ের সমীপে কিছু কথা বলতে চাই। এই দলটি (আহলে হাদীছ) বলে, আমরা কাউকে মানি না, আমরা কারও অনুসরণ করি না। তারা বলে, এটা কী করে সম্ভব যে, একজন মানুষ ৪০ বছর ঈশার উজু দিয়ে ফজর পড়েছেন?

চলুন এ বিষয়টি বুঝে নিই। চলুন, আগে আমরা কুরআন থেকে কিছু দৃষ্টান্ত শুনি। বিলকীসের রাজত্ব সম্পর্কে কুরআনে আছে–

اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

'তার কাছে সর্বপ্রকার জিনিস ছিল। তাকে সর্বপ্রকার জিনিস দেওয়া হয়েছিল।'

আজকে অমান্যকারী দল বলবে, বর্তমানের হাই কোয়ালিটির গাড়ি, বিমান কি তার কাছে ছিল? আমরা বলব, আরে ভাই! আপনার দেমাগটা খারাপ হয়ে গেছে।

أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সেই যামানায় বাদশাহর কাছে যত কিছু থাকার সম্ভাবনা থাকত, সবই তার ছিল। কেউ এখানে كُلّ শব্দের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে আর বলবে, এখানে كُلّ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। كُلّ বললে তো বোঝায় সর্বপ্রকার জিনিস। তার ঘরে কি এয়ারকন্ডিশন ছিল? তাকে বলব, দেখো, সাধারণত মানুষের কিছু পরিভাষা থাকে। সেই পরিভাষা মতো কথা বললে সমাজ তা গ্রহণ করে। দেখুন, আল্লাহ তা'আলা তাওরাতের ব্যাপারে বলেন–

تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

'সর্বপ্রকার জিনিসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাতে ছিল।'

আজকের কোনো ডাক্তার তাওরাতের আসল কোনো নুসখা পেল। সে كُلّ শব্দের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেক জিনিসের ব্যাখ্যা সেখানে খুঁজল। সে কিতাবটাতে পাবে কী? তাকে বরং বলতে হবে, ভাই! এটি পথপ্রদর্শনের কিতাব। তাই মানুষের পথপ্রদর্শন তথা হেদায়েতের জন্য যত কিছু প্রয়োজন সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা এখানে আছে। সমস্ত উসূল ও মূলনীতি এখানে আছে। এর মানে এই নয় যে, এখানে ডাক্তারি বিদ্যার সব আছে।

একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখুন। মনে করুন, আমাদের সমাজের একজন ছাত্র তার পড়াশোনা শেষ করে মাদরাসায় শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করল এবং পড়াতে-পড়াতে বৃদ্ধ হয়ে এক সময় তার ইন্তেকাল হলো। তো এ লোকটার আলোচনা উঠলেই তো সকলে বলে, অমুক ব্যক্তি সারাটা জীবন পড়া ও পড়ানোর কাজেই ব্যয় করেছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ তো এই নয় যে, যেদিন লোকটার জন্ম হয়েছিল, সেদিনই সে পড়তে শুরু করেছে। জুমার দিন সে ছুটি কাটায়নি। কোথাও সে যায়নি। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এ লোকটির মুখ্য কাজই ছিল পড়া এবং পড়ানো।

তো এবার মূল কথায় ফিরে আসি। সমাজের পরিভাষায় ৪০ বছর বলার দ্বারা উদ্দেশ্য তার যিন্দেগির আমলই ছিল এই যে, তিনি ঈশার উজু দিয়ে ফজর পড়তেন। হ্যাঁ, অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কখনও কখনও এই অভ্যাসগত আমল হয়তো রক্ষা হতো না। হয়তো মাঝে আবার উজু করতে হতো। যেমন কেউ বলল, অমুক লোকটার পাগড়ি বাঁধার অভ্যাস। এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য এই যে, লোকটা টুপি পরত না। শুধু পাগড়ি-ই বাঁধত। মানে সাধারণ অভ্যাস পাগড়ি বাঁধা। তবে কখনও-কখনও শুধু

টুপিও হয়তো পরিধান করতেন জরুরতের কারণে। তাই পরিভাষা ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য শব্দসহযোগে কথা বলার মর্ম বুঝতে হবে।

চলুন, ব্যাপারটা হাদীছে খোঁজ করি

হুনাইনের যুদ্ধ। মুসলমানগণ দুশমনদের ওপর হামলা করছে। সে-সময় দুশমন চুপ করে লুকিয়ে ছিল। হঠাৎ তীর মারতে লাগল। হঠাৎ এমন আমচকা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মুসলমানরা পেছনে সরে এল।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি তখন সামনে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন–

اَنَا نَبِيٌّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি সত্য নবী– মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে।'

কেউ তার শাব্দিক অর্থ ধরে বসে থাকলে তো হবে না। ভাবলে হবে না যে, নবীজি আবদুল্লাহর ছেলে হয়ে কীভাবে বললেন আমি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এভাবে বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে।

মোটকথা, ৪০ বছর ঈশার উজু দিয়ে ফজর পড়েছেন মানে হলো ঈশা পড়ে ইবাদত করতে থাকতেন। ফজর পর্যন্ত চলত ইবাদত আর ইল্‌মের সাধনা।

حَجَّ خَمْسًا وَّخَمْسِيْنَ حَجَّةً

'তিনি ৫৫ বার হজ করেছেন।'

وَرَاٰى رَبَّهٗ فِى الْمَنَامِ مِائَةَ مَرَّةً

'তিনি আল্লাহকে একশতবার স্বপ্নে দেখেছেন।'

একবার ইমাম আযম (রহ.) হজ করতে গেলেন। বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করলেন। বর্ণিত আছে–

فقام بين الابوين حتى ختم القران فلما سلم بكى وتأبى ربه الهى ما عبدك هذا العبد الضعيف حق عبادتك وهتف هاتف من جانب البيت يا ابا حنيفة قد غفر لك ولمن اتبعك ممن كان على مذهبك الى يوم القيامة

তিনি বাইতুল্লাহর ভেতরের দুটি খুঁটির মাঝামাঝিতে দাঁড়ালেন। নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করলেন। তারপর খুব কান্নাকাটি ও রোনাজারি

করলেন। মুনাজাতে বললেন, ওহে আল্লাহ! এই দুর্বল বান্দা আপনার ইবাদতের হক আদায় করেত পারেনি। অমনি বাইতুল্লাহর পাশ থেকে কোনো এক ঘোষণাকারীর ঘোষণা শোনা গেল, হে আবুহানীফা! আমি তোমাকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তোমার মাযহাবের অনুসারীদের মাফ করে দিলাম, যারা এখলাছের সঙ্গে তোমার মাযহাব মান্য করবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের জন্য রয়েছে এতে মহা সৌভাগ্য। আল্লাহর ইবাদতের মজা যে বোঝে, তার জন্য রাত জেগে ইবাদত করা তো কোনো ব্যাপারই নয়। এ-কথাটা সহজেই বোঝা যায়। কোনো এক আল্লাহপ্রেমিক বলেছেন–

ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہ تھی
گر کچھ قصور تھا تو شب مختصر کا تھا

'তাদের আয়োজন আর আমলে তো কোনো কমতি ছিল না। যদি কোনো কমতি থাকে, তবে তা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত এই রাতের কমতি।'

তারা তো অভিযোগ করে বলতেন, রাতটা ছোট হয়ে গেল।

হযরত আলী ইবনে আবু আসেম বলেছেন, যদি ইমাম আবুহানীফা (রহ.) আকলের অর্ধেক সমস্ত পৃথিবীর অন্য সকল মানুষের আকলের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে আবুহানীফার আকলই অধিক মজবুত ও পরিপুষ্ট প্রমাণিত হবে। তাই তো ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, লোকেরা ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবুহানীফার বাচ্চাদের সমান।

এই মহাজ্ঞানী ইমাম আবুহানীফা ফিকহের মূলনীতিগুলো একত্রিত করেছেন।

ইমাম আবু ইউসুফ খামিরা তৈরি করেছেন

ইমাম আযমের আটা দিয়ে খামিরা তৈরি করে দিয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)। দুররুল মুখতারে বর্ণিত হয়েছে–

عَجَنَهُ يَعْقُوْبُ

তারপর ইয়াকূব (ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর অপর নাম) ওই আটা দিয়ে খামিরা তৈরি করে দিয়েছেন, যে আটা পিষে চূর্ণ করে দিয়েছেন ইমাম আযম আবুহানীফা।

عَجَّنَهُ-এর মর্ম হলো–

دَقَّقَ النَّظَرَ فِيْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ

'ইমাম আযম প্রণীত মূলনীতির ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন।'

وَاجْتَهَدَ فِيْ زِيَادَةِ اِسْتِنْبَاطِ الْفُرُوْعِ مِنْهَا

ইমাম আযমের প্রণীত সকল শাখাগত মাসায়েলের ওপর তিনি ইস্তিম্বাত করেছেন এবং এতে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন।

তাই ইমাম আবুহানীফাকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয় য, মূলনীতিতে তিনি ইমাম আযমের অনুসরণ করতেন। কিন্তু এজতেহাদে তিনি ছিলেন ইমাম আযমের পাশাপাশি।

ইমাম আবু ইউসুফ–যিনি ইমাম আযমের শাগরেদ–মূলত এতিম ছিলেন। ব্যাপারটা এমন যে, ইমাম আযম আবুহানীফা তাঁকে লালনপালন করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফের মা তাকে ধোপার কাছে কাপড় ধোওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইমাম আযম বাচ্চা আবু ইউসুফকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। প্রতি মাসে বাচ্চাকে বেতন দিতেন। বেতনটা আবু ইউসুফ ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। শেষ পর্যন্ত এই বাচ্চা আবু ইউসুফ এত বড় আলেম হলেন যে, সমকালীন বিশ্বের ইমামে পরিণত হয়ে গেলেন। তখন গিয়ে মায়ের খবর হলো, বাচ্চাটা তার কী হয়েছে। কী মানিক মা ফেরত পেয়েছেন।

ইমাম আবু ইউসুফের ইল্‌ম সম্পর্কে খতীব বাগদাদি লিখেছেন–

هُوَ اَفْقَهُ اَهْلِ عَصْرِهٖ وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ اَحَدٌ فِيْ زَمَانِهٖ وَكَانَ النِّهَايَةُ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَالرِّيَاسَةِ

তিনি সমকালের সকল লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। ইল্‌মের পথে আর কেউ তাঁর চেয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। আপন সময়ে ইল্‌মের প্রান্তিক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তেমনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না।

সেই খামিরা দিয়ে রুটি পাকিয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)

দুররুল মুখতারে এর পরে বলা হয়েছে–

وَخَبَّزَهُ مُحَمَّدٌ

'রুটি পাকিয়েছেন ইমাম মুহাম্মাদ।'

خَبَّرَهُ এর মর্ম হলো, তিনি ইল্‌মে ফিকহের সম্পাদনায় ও পরিমার্জনে এতখানি করেছেন যে, এর পর এ নিয়ে নতুন কোনো পরিমার্জন ও পরিশুদ্ধির প্রয়োজন থাকল না।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ইল্‌মি অবস্থান

রুটি যখন তৈরি হয়ে যায়, তখন শুধু খাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ থাকে না। কাজটা তো ইমাম মুহাম্মাদ করে দিয়েছেন। রুটি তিনি তৈরি করে দিয়েছেন। তার ব্যাপারে বর্ণিত আছে–

قَدْ ظَهَرَ عِلْمُهُ بِتَصَانِيْفِهِ كَالْجَامِعِيْنَ حَتّٰى قِيْلَ اِنَّهُ صَنَّفَ فِيْ عُلُوْمِ الدِّيْنِيَّةِ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَمِنْ تَلَامِيْذِهِ الشَّافِعِيُّ

'তাঁর ইল্‌মের কথা উদ্ভাসিত হয় তাঁর লিখনী দ্বারা। যেমন– ১. জামে সাগীর ২. জামে কাবীর ৩. সিয়ারে সগীর ৪. সিয়ারে কাবীর ৫. মাবসুত ৬. যিয়াদাত ৭. নাওয়াদির। তাঁর ব্যাপরে বলা হয়েছে, উলূমে দীনিয়ায় তিনি ৯৯৯ টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজন হচ্ছেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)।'[১]

এমন বড়-বড় ব্যক্তিত্ব, যারা একেকজন বিদ্যার সাগর ছিলেন। জ্ঞানের পাহাড় ছিলেন তারা। এরা ইল্‌মে ফেকাহ নিয়ে মেহনত করেছেন, পরিশ্রম করেছেন। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূল থেকে উদ্ভাবন করেছেন নিয়মনীতি, কাওয়ায়েদ ও মূলনীতি। সমগ্র ইল্‌ম নিজেদের জীবনে লিখে দিয়ে গেছেন।

কেউ একজন ইমাম মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করেছিল, মাসআলাগুলো এখনও দেখা দেয়নি; আপনি চিন্তা করে-করে মাসআলাগুলোর সামাধান কেন তৈরি করে যাচ্ছেন? তখন ইমাম মুহাম্মাদ বলেছেন, যখন আগুন লাগে, তখন নতুন করে কুয়া খনন করা হয় না। পূর্বের খননকৃত কুয়াই কাজে লাগে। আজ আমরা আগত যিন্দেগীর মাসায়েলের সমাধান লিখে দিয়ে যাচ্ছি যেন আগামীতে কোনো সমস্যা দেখা দিলেই আগের লিখিত জবাব লোকেরা পেয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, আমি ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর সঙ্গে একটি রাত একই কামরায় যাপন করেছি। তখন দেখেছি, তিনি নিজের

---

১. মুকাদ্দামাতুর রদ্দ আলাদ্দুর ১/১২০

লিখিত পাণ্ডুলিপি পড়ছেন। তারপর চেরাগ বন্ধ করে দিতেন এবং শয়ন করতেন। আমি মনে করতাম, তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। কিন্তু একটু পর দেখতাম, আবার তিনি উঠতেন এবং পড়তে শুরু করতেন। আবার চেরাগ বন্ধ করে শুয়ে পড়তেন। এমনটা করতেই থাকলেন। আমি দেখলাম, সেই একটি রাতে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ১৬ বার শয়ন করলেন এবং উঠলেন।

এখন বলুন, ১৬ বার যে-বান্দা শয়ন থেকে উঠে-উঠে পড়তে বসে, তার কি ঘুম হয়েছে? আমি বড় অবাক হলাম। তিনি সেই ঈশার উজু দিয়েই ফজর আদায় করলেন। পরে বুঝলাম, তিনি কিতাবের একটি পৃষ্ঠা দেখতেন এবং গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য প্রদীপ নিভিয়ে চিন্তামগ্ন হতেন। আবার উঠতেন। আবার কিতাব দেখে আবার চিন্তামগ্ন হতেন। আবার চেরাগ বন্ধ করে দিতেন। তো এভাবেই তিনি রাতটা কাটিয়ে দিতেন। কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নিদ্রা যান না? তিনি বললেন, লোকেরা আমাদের ওপর ভরসা করে শুয়ে যায়। এখন আমরাও যদি শুয়ে পড়ি, তাহলে বলো, উলূমে নববীর হেফাযত ও লোকদের মাসআলার জবাব প্রদানের কাজ কে করবে?

আজ আমাদের কাজ শুধু রুটি খাওয়া

ভাইয়েরা একিনের সঙ্গে জেনে নিন। উল্লিখিত ওলামায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন আমাদের জন্য বড়ই করুণা ও অনুগ্রহ ছিলেন। তারা নিজেদের জীবনে সামনের সমাগত মাসআলাসমূহের যাবতীয় সমাধান প্রদান করে গেছেন। আজ আমাদের কাজ শুধু সেসব বিষয় আমল করা। অর্থাৎ পাকানো সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের কাজ শুধুই খাওয়া আর তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দু'আ করতে থাকা।

তাছাওউফের মেহনত কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত

ফেকাহর ক্ষেত্রে যেমন মেহনত করা হয়েছে, সময়ের সাথে-সাথে ইল্‌মের সকল দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে, তেমনিভাবে তাছাওউফ, সুলূক ও তাদবীনে হাদীছের কাজ করাবার প্রযোজন দেখা দিল। ফলে ওলামায়ে কেরাম এ-সকল বিষয়েও কাজ করলেন। কুরআন ও হাদীছ থেকে তারা দলিল বের করলেন। আমাদের আকাবিরীন তাছাওউফের সকল ইল্‌ম ও ছড়ানো-ছিটানো সকল মণিমুক্তা একত্রিত করে দিয়েছেন। ফলে তাছাওউফ আমাদের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। সময় বদলের সাথে-সাথে

শব্দও বদলাতে লাগল। শব্দ বদলে যাওয়ার কারণে কী এত সমস্যা হয়ে গেল? আগেকার যুগে তাছাওউফকে তাযকিয়া ও ইহসান বলা হতো। ইহসান সাধারণভাবেই প্রসিদ্ধ ছিল। আজ সেই তাযকিয়া ও ইহসানই তাছাওউফ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

দেখুন, প্রথমে 'খলীফা' শব্দটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপর 'আমীরুল মুমিনীন' শব্দ সর্বপ্রথম হযরত ওমরের জন্য ব্যবহার হয়েছে। কাজিয়ুল কুজাত তথা চিফ জাস্টিস শব্দটি সর্বপ্রথম ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর জন্য ব্যবহার হয়েছিল। 'উযীর' শব্দটি সর্বপ্রথম আবু সালমা হাফস (রহ.)-এর জন্য ব্যবহার হয়েছিল। 'সুলতান' শব্দটি সর্বপ্রথম মাহমূদ গযনবি (রহ.)-এর জন্য ব্যবহার হয়েছিল। 'সূফী' শব্দটি সর্বপ্রথম আবু হাশেম (রহ.)-এর জন্য ব্যবহার হয়েছিল। তিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর যামানার লোক। আল্লাহ তা'আলা এই সূফী শব্দটিকে এমনভাবে কবুল করেছেন যে, পরবর্তী কালে এই শব্দটিই ব্যবহার হতে থাকে।

এতটুকু তো মানতে হয় যে, তাছাওউফের মেহনত কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতের রাসূল থেকে উৎসারিত ও নির্গত। যদি তাছাওউফের বদলে অন্য কোনো শব্দ আপনার নিকট ভালো লাগে, তাহলে আপনি সেটিই বলতে শুরু করুন। আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না। তবে বিবাদ থাকবে তাদের সাথে, যারা বলবে আত্মার পরিশুদ্ধির কথা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

তাছাওউফের মেহনতের মাকসাদ

একব্যক্তি হযরত থানবি (রহ.)কে জিজ্ঞেস করল, তাছাওউফের মাকসাদ কী? তিনি বললেন, এমন মেহনত করা, যাতে মানবের শিরা-উপশিরা থেকে গুনাহের খাহেশ বের হয়ে যায়। এমন হলেই তাকে তাছাওউফ বলে।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কীভাবে নসিব হবে?

কেউ একজন এক বুযুর্গকে বলল, হযরত! আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে পারি কীভাবে? অর্থাৎ আমি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কীভাবে? বুযুর্গ প্রশ্নকারী লোকটিকে সামগ্রিকভাবে বলে দিলেন, যিন্দাটাকে মেরে ফেলো আর মরাটাকে যিন্দা করো; হাজিরটাকে অনুপস্থিত করো আর অনুপস্থিতাঁকে হাজির করো। দোস্তকে অপরিচিত বানিয়ে ফেলো আর অপরিচিতকে দোস্ত

বানিয়ে ফেলো। শ্রোতা লোকটি বিস্মিত হলো যে, কিছুই তো বুঝলাম না। হযরত বললেন, যিন্দাকে মারো আর মরাকে যিন্দা করো এর ব্যাখ্যা হলো, নফস যিন্দা। নফসকে মারো আর দিল মরা; দিলকে যিন্দা করো।

সুবহানাল্লাহ!

হাজিরকে গায়ের করো আর যেটা গায়েব আছে, তাকে হাজির করো মানে দুনিয় তোমার হৃদয়ে হাজির; তাকে গায়েব করো আর আখেরাতে তোমার মনে অনুপস্থিত তাকে হৃদয়ে হাজির করো। আখেরাতের দিকে তাকিয়ে জীবন পাচিালিত করো। তৃতীয় কথাটি ছিল দোস্তকে পরিত্যাগ করে তাকে অপরিচিত বানাও আর অপরিচিতকে দোস্ত বানাও। এর মানে শয়তানের সাথে তোমার বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করো, তার কথা মান্য করো না। আজ আল্লাহ তোমার কাছে অপরিচিত। আল্লাহকে তুমি চিনে নাও। এই তিনটি কাজ করতে পারলে তুমি আল্লাকে পেয়ে যাবে।

তিনটি বুনিয়াদি কথা

আমি আজও অক্ষম। যতটুকু সময় আমার মাশায়েখে কেরামের সোহবতে কাটিয়েছি সব সময় তাঁদের মুখে নিম্নোক্ত তিনটি কথা শুনেছি। এই তিনটি কথার প্রতি তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আপনারাও যদি কথাগুলো বাস্তবায়ন করেন, তাহলে অতি দ্রুতই নূর অর্জন করেত সক্ষম হবেন।

১. কম খাওয়া : প্রথম কথাটি হলো কম খাওয়া। অন্যভাবে বললে বলব, ক্ষুধার্ত থাকা। এটি তাছাওউফের বুনিয়াদ। আজ এর ওপর আমল হচ্ছে না। আমাদের যত মুসিবত; যেমন– চোখ আয়ত্তের ভেতরে না থাকা শাহওয়াতের খেয়াল বেশি-বেশি হওয়া, তাহাজ্জুদের সময় চোখ না খোলা এসকল কিছু অধিক ভক্ষণের বিপদ। কম ভক্ষণের মাঝে যে-স্বাদ আছে, আমরা তো সেই স্বাদ গ্রহণই করিনি। অথচ রমজান এসে আবার চলে যায়। তাতেও কম খাওয়ার স্বাদ আমরা উপভোগ কতে পারি না। সাহরিতে এত পরিমাণে খাই, যেন খাবার গলা দিয়ে উল্টো ফিরে আসবে। আর ইফতারের সময় তো যেন আমরা খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। বুঝি না ক্ষুধা কাকে বলে।

ক্ষুধার্ত থাকার ফজিলত

একবার হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.) ক্ষুধার্ত থাকার ফজিলত বর্ণনা করছিলেন। কেউ একজন হতবাক হয়ে বলল, হযরত ক্ষুধার্ত থাকারও কি

ফজিলত আছে? তিনি বললেন, ফেরাউনও যদি ক্ষুধার যাতনায় নিপতিত হতো, তাহলে সে খোদা দাবি করত না। পেট যখন খালি হয়, তখন বান্দা নিজেকে চিনতে পারে। তখন নিজেই ঠিক হয়ে যায়, দুর্বলতা এসে যায়। তখন আল্লাহর নেয়ামতের কদর ও মূল্যায়ন করে।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা (রহ.) বলেছেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। কয়েক দিন অভুক্ত ছিলাম। ক্ষুধার যাতনায় আমার চোখের অশ্রু বের হয়ে এসেছিল। নবীজি দেখে বললেন, আবু হুরায়রা! কেন কাঁদছ তুমি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনেক দিন থেকে কোনো খাবার পাচ্ছি না। এখন আর সহ্য করতে পারছি না। তাই বাধ্য হয়ে বের হয়ে এসেছি। নবীজি বললেন, কেঁদো না আবু হুরায়রা! ক্ষুধায় দিন কাটানো লোকদের কেয়ামতের কঠোরতা স্পর্শ করবে না। তবে ক্ষুধায় ছাওয়াবের নিয়ত থাকতে হবে। নবীজি ক্ষুধায় ছাওয়াবের নিয়তের কথা বলে আমাদের জন্য বক্তব্য স্পষ্ট বরে দিলেন। নববি দৃষ্টিতে তো সবই স্পষ্ট ছিল। নবীর চোখে সবই পরিষ্কার ছিল যে, অনাগত উম্মত তো দেহ-সুরত সুন্দর করার জন্য ডায়েটিং করবে। মেদ কমানো এবং আরও অনেক উপকারিতার জন্য আজ মানুষ খাবার কন্ট্রোল করে। তো না খেয়ে থাকলেই কেয়ামতের দিন বিনিময় পাওয়া যাবে না। বরং ছাওয়াবের নিয়তে না খেয়ে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে

সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানব

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি বলেছেন, অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন সব লোকের আগমন হবে, যারা নানা পদের খাবার খাবে, নানা রকম পানীয় পান করবে। বিভিন্ন ফ্যাশনের কাপড় পরিধান করবে। নানা রকম কথা তৈরি করে বেড়াবে। ওরা আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হবে।

আমাদের ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, মনের হৃদয়ে যে-সকল ওসওয়াসা আসে, এটা শয়তানের বীজ। শয়তানের প্ররোচনায় এ সকল ওসওয়াসা আসে। আর শয়তানের বীজ বোনার স্থান হলো পেট। বেশি আহার করা, বেশি ঘুমানোর দ্বারা সেই জমিনে পানি সিঞ্চিত হয়। আর যে বেশি খায়, সে বেশি ঘুমায়। এমন করার কারণে ফজর কাজা হয়ে যায়।

আমলের কমতির মূল বুনিয়াদ ওলামায়ে কেরাম অনেক আগেই নিরুপন করে দিয়েছেন। তালেবুল ইল্‌মরা বেশি খাওয়ার কারণে ঝিমোয়, বেশি ঘুম আসে। ওস্তাদ দরসে তাকরীর করতে থাকেন আর ছাত্র ঘুমুতে থাকে। এটি

বড়ই ক্ষতিকর দিক। তাই খাবার কম খেতে হবে। এতে ঘুম আসবে কম আর শয়তানের বোনা করা বীজ উর্বর জমি পাবে না। তাই প্ররোচনা মজবুত হবে না। রক্ষা পাওয়া যাবে সহজেই।

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে-মানুষ স্ত্রী-বাচ্চাদের সাথে মিলে খাবার খায়, দস্তরখান গুটিয়ে নেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। সুবহান্নাল্লাহ! তাই পুরুষদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে নিজের স্ত্রী-সন্তানের সাথে খাবার খাওয়া। আর খাবেও ততটুকু, যতটুকু একজন মানুষের খাওয়া প্রয়োজন। বেশি খেলে অলসতা আসে। আর এর কারণে ইবাদত থেকে মাহরুম হতে হয়।

ক্ষুধার দশটি উপকারিতা

ইমাম গায্যালি (রহ.) ক্ষুধার দশটি উপকারিতা লিখেছেন–

১. আত্মা পরিশুদ্ধ হয়।
২. আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, হৃদয় নরম হয়।
৩. ক্ষুধার্তদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ পায়।
৪. আখেরাতের ক্ষুধার কথা স্মরণ হয়।
৫. গুনাহের শক্তি কমে যায়।
৬. নিদ্রা কম আসে।
৭. ইবাদতে স্বাদ ও মজা পাওয়া যায়।
৮. শরীর সুস্থ থাকে।
৯. আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা সহজ হয়।
১০. অল্প খরচেই জীবন যাপিত হয়।

দুটি অপছন্দনীয় জিনিস

দুটি জিনিস বৈধ। তবে আল্লাহ তা খুব অপছন্দ করেন–

১. পেট পূর্ণ করে খাওয়া
২. স্ত্রীকে তালাক দেওয়া।

মাকামে মুনাজাত ও মাকামে মুলাকাত

তালেবুল ইল্মের জন্য এখানে একটি ইল্মি ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনা করছি। হযরত মূসা (আ.) যখন খিজির (আ.)-এর সাক্ষাতের সফরে বের হন, তখন তার ক্ষুধা অনুভূত হয়।

কুরআনে আছে–

اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

'আমাদের খাবার উপস্থিত করো। এই সফরের কারণে আমাদের ক্ষুধা লেগেছে।'[১]

অথচ এই মূসা নবীকেই আল্লাহ তা'আলা এক সময় কুহেতুরে ৪০ দিন অবস্থান করিয়েছে। তখন তাঁর ক্ষুধা অনুভূত হয়নি। এই দুই স্থানে ক্ষুধার এই তারতম্য কেন হয়েছে? দেখুন, খিজিরের (আ.) সাথে ছিল মূসা (আ.)-এর মোলাকাত তথা সাক্ষাতের ব্যাপার। আর আল্লাহর সাথে ছিল মূসার মুনাজাতের ব্যাপার। এ-কারণে খিজিরের বেলায় মূসার ক্ষুধা লেগেছে আর আল্লাহর বেলায় লাগেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

عَبْدِىْ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لِاَجْلِىْ

'হে বান্দা! আমি সমগ্র বস্তুকে তোমার জন্য সৃষ্টি করেছি আর তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমি আমার জন্য।'

একটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

يَا ابْنَ اٰدَمَ اُطْلُبْنِىْ تَجِدْنِىْ اِنْ وَجَدْتَنِىْ وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ اِنْ فَاتَنِىْ فَاتَ كُلَّ شَيْءٍ وَاَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

'হে আদম সন্তান! আমাকে অন্বেষণ করো; তুমি আমাকে পেয়ে যাবে। যদি আমাকে তুমি পেতে পার, তবে সমস্ত জিনিস তুমি পেয়ে যাবে। আর যদি আমাকে হাতছাড়া কর, তবে সব জিনিস তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর আমি তোমাদের জন্য সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম।'

عَبْدِىْ اَنْتَ تُرِيْدُ وَاَنَا اُرِيْدُ وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا اُرِيْدُ

'হে আমার বান্দা! তুমিও কিছু ইচ্ছে কর, আমিও কিছু ইচ্ছে করি। আর শোনো! আমি যা ইচ্ছে করি, তা ছাড়া আর কিছুই বাস্তবায়িত হবে না।'

فَاِنْ اَسْلَمْتَ لِىْ فِىْ مَا اُرِيْدُ اَعْطَيْتُكَ مَا تُرِيْدُ فَاِنْ لَّمْ تُسَلِّمْ فِىْ مَا اُرِيْدُ اَتْعَبْتُكَ فِىْ مَا تُرِيْدُ وَلَا يَكُوْنُ اِلَّا مَا اُرِيْدُ

---

১. সূরা কাহ্ফ : আয়াত ৬২

'যদি তুমি তা-ই ইচ্ছে কর, যা আমি ইচ্ছে করি, তাহলে তোমার সেই ইচ্ছে আমি পূর্ণ করব। আর যদি তুমি আমার ইচ্ছের অনুসরণ না কর, তাহলে তোমার ইচ্ছার পেছনে ফেলে আমি তোমাকে ক্লান্ত করে দেব। আর হবে তা, যা আমি ইচ্ছা করি।'[১]

খালি পেটের মজা

এখানে ক্ষুধার্ত থাকার শব্দ ব্যবহার করলাম না। পেট খালি রাখার শব্দ ব্যবহার করলাম। পেট খালি রাখার একটা মজা আছে। কোনো সালেক এমন নেই, যে কখনও ক্ষুধা অনুভব করেনি; অথচ সে নেসবতের নূর পেয়ে গেছে। যদি আমার ও আপনার হৃদয়ে নূর অর্জিত হওয়ার ইচ্ছে করেন, তাহলে সে-পথেই অগ্রসর হতে হবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে দুনিয়ায় অধিকাংশ সময় পেট পূর্ণ করে রাখে, সে কেয়ামতের দিন খালি পেট অবস্থায় উত্থিত হবে।

২. তাহাজ্জুদের পাবন্দি : নেসবতের নূর হাসিল করতে হলে, পীরের সাথে সম্পর্ক রাখার বরকত পেতে হলে তাহাজ্জুদের পাবন্দ হতে হবে। প্রত্যেক সালেক গুরুত্বের সঙ্গে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে। নেককার মানুষ ফরজ নামাযের যেমন গুরুত্ব দেয়, সালেক তাহাজ্জুদের তেমন গুরুত্ব দিতে হবে। যে আল্লাহর পথে পৌঁছার রাস্তায় চলতে চায়, তাকে তাহাজ্জুদের এহতেমাম তেমন করতে হবে, যেমন সাধারণ নেককারগণ ফরজের এহতেমাম করে।

অনেক সালেক বলে, হুজুর! আমি তো মোরাকাবা করার সুযোগ পাই না। নিয়মিত তেলাওয়াত করতে পারি না। তাসবীহ আদায় করতে পারি না। তো তাদের বলব, তাহাজ্জুদের নিয়ম করে নিন। তখন তাহাজ্জুদ থেকে ফজর পর্যন্ত সব আমল আদায় করার সুযোগ পেয়ে যাবেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়ের সহযোগী হবে দুপুরের কাইলুলা। তাই দুপুরে একটু কাইলুলা করে নেবেন। আবার রাতেও দ্রুত নিদ্রা যেতে হবে। মাসনুন যিকির ও দু'আ পড়বেন। তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়া সহজ হয়ে যাবে। তবুও উঠতে কষ্ট হলে এলার্ম দিন। নিজের পক্ষ থেকে যা কিছু করা যায় তাহাজ্জুদের জন্য তা-ই করুন। তার পর আল্লাহর ওপর ভরসা করে শুয়ে

---

১. হাশিয়াতুছ ছাবী আলাশ শারহিস সাগীর ১১/৩২৫

পড়ুন। সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যদি জাগ্রত হতে না পারেন, তাহলে পেরেশান হবেন না। যা আপনার সামর্থ্য ছিল, তা তো করলেন। কুদরতের পক্ষ থেকে তাওফীক হয়নি। তাই পেরেশান হবেন না, হতাশ হবেন না। আপনার প্রচেষ্টা আপনি অব্যাহত রাখুন।

ليلة التعريس-এ নবীজি ফজর নামায কাজা হয়ে গিয়েছিল। কেন? এটা হলো আল্লাহ উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাজা করিয়েছেন যেন উম্মত আমলের নমুনা পেয়ে যায়। এটি তাকদীরের বিষয়। তাই সর্বাত্মক চেষ্টার পরও তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে আফসোস না করে আগামী দিন ওঠার ও তাহাজ্জুদ আদায়ের চেষ্টা করবেন।

৩. শায়খের সাথে সম্পর্ক : তৃতীয় বিষয় হচ্ছে শায়খের সাথে সম্পর্ক। পীর ধরে এই সম্পর্ক বৃদ্ধি ও মজবুত করবে। আবদুল্লাহ বাহলবি নামে একজন মুফাসসিরে কুরআন বুযুর্গ ছিলেন। সময়ের কামেল পীর ও মাশায়েখ ছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার শায়খের খেদমতে হাজির হলাম। শায়খ বলেন, আমি মাদরাসায় পড়াতাম। একটু পরে এজাযত চাইলাম, হযরত! মাদরাসায় যেতে হবে। শরয়ী ও গ্রহণযোগ্য ওজর। তালেবুল ইলমদের সবক যেন ছুটে না যায়। হযরত বললেন, মাওলানা! কিছুদিন আমাদের কাছে থাকো। মাশায়েখে কেরামও প্রবলভাবে কামনা করেন, তাদের কাছে যে-নেয়ামত আছে, লোকেরা সেই নেয়ামত যেন তাঁদের জীদ্দশায়ই গ্রহণ করে। হযরত বললেন, কিছুক্ষণ থাকো। তিনি বলেন, আমি তিন দিন হযরতের কাছে অবস্থান করলাম। আল্লাহ এত করকত দিয়েছেন যে, আমি যখন ফিরে এলাম, তখন ধারাবাহিকভাবে তিন বছরে এক দিনও আমার তাহজ্জুদ ছোটেনি। তিন দিনের বরকতে তিন বছর তাহাজ্জুদের তাওফীক এসে গেল। আর আজ আমাদের কী হালত!

میری ہر نظر تیری منتظر * تیری ہر نظر میرا امتحان

'আমার প্রতিটি নজর তোমার প্রতীক্ষায়। তোমার প্রতিটি নজর আমার পরীক্ষা।'

প্রতিটি বিষয়কে পরিমাপ করা উচিত। সুন্নতের মাপকাঠি দ্বারা আমার প্রতিটি কর্মকে সুন্নত মোতাবেক হচ্ছে কিনা দেখা উচিত। তাহলেই আমি সফলকাম হব।

আজই সময়

হযরত মাদানীর শাগরেদ এক আলেম আমাদের হযরত মুরশিদে আলমের মাদরাসায় ২ বছর মুসলিম শরীফ পড়িয়েছেন। কখনও ইচ্ছেও করেছেন বাইয়াত হওয়ার। কিন্তু হননি। যখন হযরত মাদানীর এন্‌তেকাল হয়ে গেল, তখন তার সে কী কান্না! আমার কাছে এসে বললেন, সময় তো গেল চলে। রোজ হযরতের দরসে কুরআন শুনতাম। কত চমৎকার দরস! শুধু চিন্তা করতে-করতে দুটি বছর চলে গেল। হযরত দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।

তো দেখুন, চিন্তা করতে-করতেই তার দুটি বছর চলে গেল। এখন আফসোস করছেন। তাই বলা হয়, যেসব মাশায়েখে কেরাম দুনিয়ায় আছেন, তাদের থেকে ফায়দা গ্রহণ করা উচিত। অন্যথায় একটা সময় আফসোস করতে হবে। দেখুন, যে-সকল আলেম একে-একে বিদায় নিচ্ছেন, তাদের সমপর্যায়ের আলেম তৈরি হচ্ছেন না। তাই বলি ভাই! আজই সময় শায়খের হাতে নিজেকে সমর্পণ করুন।

আল্লাহ-অন্বেষীদের অবস্থা

তো খুব বেশি করে আমলে সালেহ সম্পাদন করুন। নেক কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হয়ে যান। ক্লান্ত হতে-হতে নেক কাজ করুন। মু'আযা আদাবিয়া নামে আল্লাহর এক নেক বান্দী ছিলেন। অনেক ইবাদত করতেন। তার স্বামী এক জিহাদে শহীদ হয়েছেন। তিনি দিন-রাত শুধু আল্লাহর ইবাদতেই কাটিয়ে দেন। ঈশার পরে সামন্য কিছুক্ষণ সুন্নতের নিয়তে শুয়ে পড়তেন। তারপর একথা বলে উঠে যেতেন যে, কে জানে, আজই তো হতে পারে আমার জীবনের শেষ রাত। তারপর দ্রুত উজু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন।। সারাটা রাত মুছল্লায় থাকতেন।

একবার ওভাবে ইবাদত করছিলেন। হঠাৎ তিনি তার শহীদ স্বামীকে নিজ চোখে দেখতে পেলেন। হুবহু আগের আকৃতিতে। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? স্বামী বললেন, তুকি তো ইবাদত করে-করে ক্লান্ত হয়ে গেছ। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। এতটুকুই বললেন। স্ত্রী কালেমা পাঠ করলেন। মালাকুল মওত তার জান কবজ করে নিলেন। এমনভাবে তারা নিজেকে আল্লাহর হাওলা করে দিয়েছিলেন।

রাবেয়া বছরিয়া আল্লাহর একজন নেক বান্দী। তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি দুটি কথা বলতেন তখন। প্রথম কথা, হে আল্লাহ! দুনিয়ার

সকল বাদশাহ আপন-আপন দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু হে মাওলা! আপনার দরজা-ই শুধু খোলা আছে। আমি আপনারই সামনে নিজের আঁচল বিছিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় কথা, হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি আসমানকে জমিনের ওপর পতিত হওয়া থেকে প্রতিহত করে রেখেছেন, তেমনি শয়তানকে আমার থেকে প্রতিহত করুন। কিছু পুরুষও এমন আছেন, যারা এত ইবাদত করতেন যে, প্রচণ্ডরূপে ক্লান্ত হয়ে যেতেন।

আবু রায়হান নামে একজন সাহাবি ছিলেন। তিনি অনেক বছর জিহাদে ছিলেন। একসময় ঘরে এলেন। ঈশার নামাযের সময় স্ত্রীকে বললেন, দু-রাকাত নামায পড়ে নিই। তারপর বিস্তারিত কথা বলব। নফল নামাযের নিয়ত করে কুরআন পাঠ শুরু করলেন। কুরআন পড়তে-পড়তে তিনি ভুলেই গেলেন যে, তিনি ঘরে এসেছেন। নিয়মমতো অন্য দিন হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেলাওয়াত করে যখন সালাম ফেরালেন, তখন ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যায়-যায় অবস্থা। সালাম ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে স্ত্রী বললেন, তোমার কাছে আমার কি কোনো পাওনা নেই। তুমি নিজও ক্লান্ত হয়েছ আর প্রতীক্ষায় বসিয়ে রেখে আমাকেও ক্লান্ত করেছ।

তখন স্বামী কসম করে বললেন, তেলাওয়াত শুরু করার পর আমি যে ঘরে এসেছি সেকথা ভুলেই গেছি। তুমি যে আমার অপেক্ষায় আছ সেকথা ও আমার হৃদয় থেকে উড়ে গেছে।

মুহতারাম হাজিরীন! দেখুন, কোথায় তাদের ইবাদত আর কোথায় আমাদের ইবাদত!

আমাদের ইবাতদ এখন প্লাষ্টিকের ফুলের মতো

চিন্তা করুন। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন। কোনো রোবট যদি কোনো মানুষকে পানি পান করায়, তাহলে কি তার ছাওয়াব হবে? না। কারণ, তার মধ্যে অনুভূতিই তো নেই। এটা একটা যন্ত্রমাত্র। পানি পান করানো নেকের কাজ। কিন্তু কোনো মেশিন বা যন্ত্র যদি কাউকে পানি পান করায়, তাহলে সে কোনো বিনিময় পাবে না। আমরা তো অনুভূতিহীন নই। আমাদের তো নামাযসহ যেকোনো নেকির কাজ করলে তার বিনিময় দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে এমন যে, জিহ্বা থেকে তো শব্দ বের হচ্ছে ঠিক; কিন্তু তা আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করতে পারছে না। আমাদের আমলগুলো আজ প্লাষ্টিকের ফুলের মতো হয়ে গেছে। কত চমৎকার দেখতে প্লাষ্টিকের ফুল। কিন্তু না ঘ্রাণ আছে, না স্নিগ্ধতা। অথচ প্রস্তুতকারীরা তো প্লাষ্টিকের

ফুলকে হুবহুই তৈরি করে। আবার শিশিরের ফোঁটাও ছড়িয়ে রাখে। তবু তা মানবের হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করতে পারে না, স্নিগ্ধ করতে পারে না। তেমনি আমাদের আজকের আমলও। আমরা নামায পড়ছি ঠিক, ইবাদত করছি ঠিক; কিন্তু আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আমরা পাই না।

তিনটি সূক্ষ্ম কথা

তিনটি সূক্ষ্ম কথা স্মরণ রাখুন।

১. মেনে নাও এবং সন্তুষ্ট থাকো : প্রথম কথাটি হলো আপাদমস্তক মান্যকারী হয়ে যাও। কারণ, সালেকের অবস্থা নানা রকম হয়। কারও মাঝে ভয় প্রবল থাকে। ফলে সে কাঁদতে থাকে। কারও মাঝে উচ্ছ্বাস প্রবল থাকে। ফলে সে হাসতে থাকে। কারও মাঝে চাহিদা প্রবল থাকে। ফলে সে অস্থির থাকে। এটি একটি ফুলের বাগান। আল্লাহ একেকজনকে একেক অবস্থায় রাখেন। তাই মহব্বতের তাকাজা হলো, যে শান্তিতে আছে, সে কঠোরতা প্রার্থনা করবে না। যে সমস্যায় আছে, সে হাহুতাশ না করে সবর করবে। বরং আল্লাহ যে অবস্থায় রেখেছেন, সেই অবস্থায়ই আমি খুশী। মাওলার ওপর রাজী থাকো, সন্তুষ্ট থাকো, মাওলার সকল সিদ্ধান্ত মেনে নাও। তাহলেই আত্মশুদ্ধি ও সুলূকের পথে দ্রুত উন্নতি হবে।

২. সম্পদ ও সৌন্দর্যের ওপর ভরসা না করা : দুনিয়ার প্রচুর্য আর সৌন্দর্যের ধোঁকায় পতিত না হওয়া। বরং এই ধোঁকা থেকে আত্মরক্ষা করা। আজ আমাদের জীবন বাহ্যিক সৌন্দর্যচর্চায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ উচিত ছিল, আমলের সৌন্দর্য দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করা। আমার মনে হয় ৯৯% লোকই এই টেনশনেই জীবন শেষ করে যে, হায়! আরেকটা বিয়ে যদি করতে পারতাম! একথা চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্ত্রী দিয়েছেন, সন্তান দিয়েছেন, শান্তিও দিয়েছেন। এখন আমাদের উচিত আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা।

মনে রাখুন, সম্পদ, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের পূজারি কখনও শান্তিময় জীবন প্রাপ্ত হয় না। যেমন– হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক উনিশ বছর শাসন করেছেন। শেষ যামানার দুর্যোগ তাকে এমনভাবে ছোবল মেরেছে যে, সে বসরার জামে মসজিদের গেটে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা চেয়ে খেত। ১৯ বছরের ক্ষমতাসীন নেতাকে তারই শাসিত দেশের একটি জামে মসজিদে আল্লাহর নামে ভিক্ষে করতে হলো! আব্বাসী খলীফা আল-

কাহের বিল্লাহর শেষ পরিণতি এই হয়েছিল যে, সে বাজারে-বাজারে ভিক্ষা করে ফিরত।

বড় প্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন খলীফা ওয়াসিম বিল্লাহ। চোখেই তার বড় প্রভাব ছিল। দেখেই মানুষ তাকে ভয় পেত। কিন্তু ক্ষমতা যখন হাতছাড়া হলো এবং তার যখন মৃত্যু হলো, তখন তার জানাযা প্রস্তুত করা হচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, তার কাফন নড় উঠেছে। কাফন খুলে দেখা গেল, একটা ইঁদুর তার চোখ দুটা খেয়ে ফেলেছে। আহ! এই দুনিয়াতেই শাস্তি শুরু হয়ে গেল!

সালমান ইবনে আব্দুল মালিক বড় সুদর্শন যুবক ছিল। বিয়ে করার আগ্রহ তার প্রবল ছিল। এক সাথে চারটা স্ত্রী থাকত তার। প্রত্যেক জুমার দিন একটা স্ত্রী তালাক দিয়ে নুতন একটা বিয়ে করত। যৌবনেই মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়ে গেল। তার জানাযা শেষ হলো মাত্র। কবরে লাশ রাখা হবে। এমন সময় তার কাফনের ভেতর কিছু একটা নড়াচড়া করতে দেখা গেল। দেখে তার ছেলে বলে উঠল, আরে আমার বাবা তো জীবিত! সেখানে খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার বাবা জীবিত নেই। তোমার বাবার অন্যায়ের শাস্তিদানে আল্লাহ তাড়াহুড়া করেছেন।

এমন সৌন্দর্য আর প্রাচুর্যভরা জীবনের পেছনে পড়ে লাভটা কী হলো?

ہوئے مر کر ہم جو رسواء
ہوئے کیوں نہ غرق دریا
نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا
مر کر مر ہی جاتے تو اچھا تھا مگر کیا کریں
مر کر مرنا نہیں مر کر پھر زندگی ہے

'মরে আমরা যে অপমানিত হয়েছি!
কেন যে ডুবি যাইনি উতাল দরিয়ায়!
কোথাও তাহলে জানাযাও হতো না।
কোথাও তাহলে কবর ও হতো না।'

মরে যদি মরেই যেতাম, বড় ভালোই হতো। কিন্তু কী করব? মরেও আমি মরতে পারিনি। মরার পরেও যে আছে আরেক যিন্দেগানি।

৩. তলব ও এখলাছ : তৃতীয় সূক্ষ্ম কথাটি হলো তলব ও এখলাছ। যে-বান্দা এখলাছের সাথে আল্লাহর দুয়ারে করাঘাত করবে, সে নিজের চাহিদা ও নিজের আবদার প্রাপ্তি থেকে মাহরূম হবে না। তাই এখলাছ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর দুয়ারে আবেদনটি পেশ করবে।

কুরআনে তার দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজির কাছে একবার কুরাইশের কিছু সরদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আগমন করল। নবীজি ভাবলেন, এসব প্রভাবশালী নেতাদের ইসলামের কথা বোঝাতে পারলে এবং এরা ইসলাম গ্রহণ করলে এদের দেখাদেখি আরও বহু মানুষ ইসলাম কবুল করবে। নবীজি এদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এদিকে একজন বৃদ্ধ অন্ধ সাহাবি নবীজির দরবারে এলেন কিছু জানবার, বুঝবার ও অবগত হওয়ার নিয়তে। তিনি তো আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য নবীজির কাছে এসেছেন। নবীজি তখন কুরাইশের নেতাদের সাথে কথা বলছিলেন।

নবীজি বৃহৎ উপকারের দিকে তাকিয়ে অন্ধ সাহাবির প্রতি একটু বিরক্ত হলেন এবং বলতে চাইলেন, ভাই তুমি তো মুসলিম আছই। পরে কামরায় আমার কাছে এসো। এরা তো কাফের। আমি এদের সাথে এখন কথা বলছি। এখন তোমার সাথে কথা বলতে পারব না। এদের সাথে কথাবার্তা শেষ করি। তারপর তোমার সাথে কথা বলব। কিন্তু তলব নিয়ে, পিপাসা নিয়ে এখলাছের সাথে আগমনকারী অন্ধ সাহাবির আগমনকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেছেন, বেশি ভালোবেসেছেন। এত ভালোবেসেছেন যে, নবীজির সাথে আল্লাহ তার সেই বন্ধুসুলভ ভাব রেখে বললেন–

عَبَسَ وَ تَوَلّٰۤى ۝١ اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝٢ وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰۤى ۝٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَ مَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَ اَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَ هُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠

'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করেছে। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশে তার উপকার হতো। ওপরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল! সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোনো

দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে এল এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।'[১]

বোঝা গেল, অন্বেষণের আগ্রহকে আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং মূল্যায়ন করেন।

এক নারীর ঘটনা। বুড়ো নারী। ঘটনাটা আমরা অগেও উল্লেখ করেছি। বুড়িকে তার স্বামী কোনো কারণে বলে দিয়েছে, তুমি আমার মায়ের মতো। জাহিলী যুগে এমন কথা বললে স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত। বুড়ি বড় চিন্তিত হয়ে নবীজির কাছে এল। নবীজিও আগের হুকুম মতোই বলে দিলেন, তোমার স্বামী তোমার জন্য হারাম হয়ে গেছে। বুড়ি বড় পেরেশান হয়ে গেল। বলতে লাগল, আমার যৌবন শেষ হয়ে গেছে। আমাকে তো কেউ বিয়েও করবে না। মহিলার বাচ্চাকাচ্চাও নেই। ঘরবাড়ি নেই। কোথায় থাকবে, খাবে দু-চোখে অন্ধকার দেখল বুড়ি। বান্দার সব সহায় যখন শেষ হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত তখন বর্ষিত হয়। বুড়ি আল্লাহর কাছে মিনতি জানাতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার এখন কী হবে? আমি এখন কী করব? আমার জীবন কীভাবে কাটবে? তোমার নবীও বলে দিয়েছেন, আমার স্বামী হারাম হয়ে গেছে। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই মাওলা।

এভাবে চিৎকার করে-করে মহিলা রব্বে কারীমের দরবারে আরজি পেশ করতে থাকল। ফলে আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নাযিল করলেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ اِلَى اللّٰهِ

'আল্লাহ অবশ্যই শুনে নিয়েছেন ওই নারীর অর্তনাদ, যে আপনার কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে বিবাদ করেছে এবং আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেছে।'[২]

আল্লাহ বলে দিলেন, এর সুরাহা হলো, হয়তো একটা গোলাম আযাদ করবে, না হয় ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। এভাবে কাজ করলে স্ত্রী আবার স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। একে মাসআলায়ে যিহার বলে। আর যিহারের কাফফারা দিলেই স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হয়ে যায়।

---

১. সূরা আবাসা : আয়াত ১-১০

২. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১

তো দেখুন, একজন নারী আল্লাহর দরবারে কত ব্যথিত হৃদয়ে মর্মস্পর্শী আর্তনাদ করেছে যে, তার সমাধানের জন্য খোদ রাব্বে কারীম আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন।

একবার হযরত ওমর (রাযি.) মসজিদে নববি থেকে বের হচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধা তখন পথ অতিক্রম করছিলেন। মহিলা বলল, ওমর! একটা সময় ছিল যখন মানুষ তোমাকে শুধু ওমর নামে জানত। আজ তুমি খলীফা হয়েছ। শোনো, মানুষের অধিকারের দিকে খেয়াল রেখো। গাফেল হয়ে বসে থেকো না। ওমর (রাযি.) শুনলেন তার কথাগুলো। কথা বলা শেষ করে বৃদ্ধা তার পথ ধরল। লোকেরা হযরত ওমরকে বললেন, এত বড় সাহস এ নারীর! আপনাকে ধমক দিয়ে গেল!

হযরত ওমর বললেন, এই সেই নারী, যার কথা আরশে গ্রহণ করা হয়েছে। আর আমি ওমর জমিনে কেন তার কথা শুনব না?

বোঝা গেল, এখলাছের বড় মূল্য আছে রব্বে কারীমের দরবারে। এখলাছের সাথে যা আবেদন করা হয়, যা আবদার করা হয়, তা-ই আল্লাহ কবুল করে নেন।

সম্মানিত উপস্থিতি! আমাদের মধ্য থেকে যে-ই এই মজলিসে এখলাছের সাথে এসেছে আল্লাহ তাকে মাহরূম করবেন না। তাকে আল্লাহ ফিরিয়ে দেবেন না। বরং তার চাওয়া পূর্ণ করবেন রাব্বে কারীম।

দু-ধরনের বীজ

বীজ দু-ধরনের হয়।

১. পূর্ণ ও পরিপুষ্ট খাঁটি বীজ।

২. অপূর্ণ চিটা ও অপরিপুষ্ট বীজ।

পরিপুষ্ট বীজ ভূমিতে বপন করলেই তার থেকে সবল-সুস্থ অঙ্কুর উদ্‌গত হয় এবং তা পত্রপল্লবে সজ্জিত হয়। আর চিটা তথা অপরিপুষ্ট বীজ জমিনে বপন করলে হয় পচে যায়, নাহয় তার থেকে রোগা অঙ্কুর উদ্‌গত হয় এবং এক সময় মরে যায়, পচে যায়। তেমনি যে-আমল পরিপূর্ণ খাঁটি, তার প্রতিদানে ছাওয়াব পাওয়া যায়। আর খাঁদযুক্ত অপরিপুষ্ট ও এখলাছহীন আমল দ্বারা কিছুই পাওয়া যায় না, কোনোই লাভবান হওয়া যায় না।

দু-ধরনের প্রাণী

১. ওইসব প্রাণী, যেগুলো পবিত্র খানা খায়। যেমন– মহিষ, গরু, ছাগল। ২. মড়া, পচা ও নাপাক খায়। যেমন– কুকুর ও শূকর।

দু-প্রকারের মানুষ

১. কিছু মানুষ আছে, যারা পবিত্র ও হালাল খাবার ভক্ষণ করে। তাদের মাঝে বিনয় ভাব থাকে। তারা খেদমত করে, সত্য কথা বলে। মানুষের সাথে মহব্বত রাখে। ইত্যাকার ভালো-ভালো গুণ পবিত্র খাবার ভক্ষণকারীদের মাঝে থাকে।

২. কিছু মানুষ আছে, নাপাক, অপবিত্র ও হারাম খাবার ভক্ষণ করে। তাদের মাঝে হিংস্রতার ভাব থাকে, হানাহানির মানসিকতা থাকে, যিকির করবে, ন্যায় পথে চলবে, গীবত করবে না, অন্যের উপকার করবে।

আর নাপাক খাবার মানে তার মাঝে তাকাব্বুর, রিয়া, অহংকার, লোক দেখানো, আমিত্ব, ঘৃণা, শত্রুতা ইত্যাদি খারাপ গুণাবলি থাকবে। তাই নাপাক ও খারাপ বিষয়জ্ঞান আমাদের থেকে কীভাবে দূর হতে পারে সেজন্য আমাদের সাধনা আমরা নিজেরাই করে নিতে হবে। আর সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই আজকের এই মাহফিলে আমরা উপস্থিত হয়েছি। এখানে আল্লাহর সামনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, আমরা কি পবিত্র পথে থাকব, না অপবিত্র পথে যাব।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'তাদের পবিত্র বিষয়কে হালাল করা হয়েছে। আর অপবিত্র বিষয়কে করা হয়েছে হারাম।'[১]

গাছপালাও আমাদের চেয়ে উত্তম

আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে, গাছ কারও সাথে মারামারি করে না। গাছেরও একটা নিজেস্ব জীবন আছে। কারও সাথে তার হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই। নিজের সামর্থ্যমতো সে ফুল দেয়, ফল দেয়। মানুষের ও অন্যদের সে উপকৃত করে। বন্ধু হোক, শত্রু হোক প্রতি বছর সে ফল দেয়, অক্সিজেন দেয়, খুশবু ছড়ায়। গাছের পাতা ও শাখা ও মানুষের কাজে লাগে। অন্যের

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৫৭

তরে সে নিজেকে কোরবান করে দেয় অন্যকে উপকৃত করার জন্য। মানুষ যদি অন্তত গাছের মতো নিবেদিত হতে পারত, তাহলে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে আমাদের জীবন ভরে যেত।

এমন স্বামীও আছে, যে ঘরে গিয়ে সামান্য মুচকি হাসি দেওয়ার তাওফীকও পায়নি। এমনও স্ত্রী আছে যে, স্বামীর সামনে একটু মুচকি হাসার তাওফীক পায় না। আমাকে তো বহু মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের হালাত শোনায়। আমি জানি, মানবের জীবন কত দুর্বিষহ। আখলাক শেখা উচিত। ছোট-ছোট বিষয়ও তখন উপভোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মানসিকতা পরিত্যাগ করা দরকার।

শাশুড়ির সাথে বউ ভালো ব্যবহার করবে। শাশুড়িও বউয়ের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। কোথাও শাশুড়ির হাতে বউ নির্যাতিত হয়। আবার কোথাও বউয়ের হাতে শাশুড়ি নির্যাতিতা হয়। হীন অভ্যাস, নীচু চরিত্র পরিত্যাগ করে উত্তম আখলাক শিক্ষা করা উচিত।

আসল মাকসাদ ভুলো না

ভাই! বিভিন্ন অবস্থা দেখে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুন। মনে করুন, কারও পেটে বা মাথায় ব্যথা আছে। সে শুয়ে আছে। এমতাবস্থায় সে সংবাদ পেল, ক্ষণিক পরে ভূমিকম্প হবে এবং একটু পরেই তীব্রভাবে ভূমিকম্প শুরু হলো। এমন সময় কি ওই লোকটির পেটব্যথা বা মাথাব্যথার কথা মনে থাকবে? নাকি সে ছুটে পালাবে উন্মুক্ত স্থানে। ভূমিকম্পের ভয়ে সে যখন অস্থির হয়ে যাবে, তখন তো মাথাব্যথার কথা সে ভুলেই যাবে। পেটের ব্যথার কথা তার মনেই থাকবে না। আম্বিয়া কেরামের অবস্থাও ঠিক তেমনই হতো। কেয়ামতের ভয়াবহতা তাদের সামনে এতটা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতো যে, দুনিয়ার ছোট-বড় সমস্ত চাহিদার কথা তাঁরা ভুলে যেতেন।

তাই তো তারা বলে গেছেন, তোমরা আখেরাতকে স্মরণ করো। দুনিয়ার তুচ্ছ বিষয়াষয় নিয়ে ঝগড়ায় লেগে থেকো না। কারণ, তোমরা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। আমরা পচা ডিমের মতো। ওপর থেকে মনে হয় আমরা খুব ভালো। কিন্তু কেয়ামতের দিন বোঝা যাবে কার আমলের কী অবস্থা। আমরা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের নিকট প্রার্থনা করি, হে রব্বে কারীম! আপনি আমাদের নেক আমল করার তাওফীক দিন। নেক কাজে অগ্রসরমান থাকার তাওফীক দান করুন।

অবিচলতার প্রয়োজনীয়তা

ছোট-ছোট সমস্যার কারণে আমলহীন হয়ে থাকা কোনোভাবেই উচিত নয়। অনেককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তেলাওয়াত কর না কেন? বলে, কাজকারবার নিয়ে একটু পেরেশানিতে আছি। যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহাজ্জুদ কেন পড় না? বলে, স্ত্রীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না। ভাই! সমস্যা থাকবেই। এর ঊর্ধে অবস্থান করতে হবে। সুখে থাকুন আর দুঃখে থাকুন নিজের মামুলাত পূর্ণভাবে আদায় করা চাই। মাওলাকে ভালোবেসে রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ওঠা চাই। অবিচলতার সাথে যদি আমল করা যায়, তাহলেই দেখতে পাব, আল্লাহর অবারিত রহমত কীভাবে আমাদের সঙ্গী হয়। আজকের মুসলমান সামান্যতেই হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, প্রাচ্যে মুসলমানদের এই হয়ে গেল, পাশ্চাত্যে সেই হয়ে গেল। আল্লাহ তো আমাদের মদদ করছেন না, সাহায্য করছেন না। মানুষ আজ আশাহত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছেড়ে দিয়েছে।

একবার কোনো এক খতীব বলেছেন, আজ আমরা ভূমিকম্পের কথা শুনে আঁতকে উঠি। অথচ একটা সময় ছিল, যখন আমাদের অস্তিত্ব পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলত। আজ আমরা আঁধারঘেরা কালো রাত দেখে ভয়ার্ত হই। অথচ একটা সময়ে আমাদের অস্তিত্বের কারণে পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। এই মেঘমালা ছুটছে। আমরা ভিজে যাওয়ার শঙ্কায় উচু স্তম্ভ ও প্রাসাদে গিয়ে উঠি এখন। অথচ একটা সময় ছিল, আমাদের অস্তিত্ব এই মেঘমালাকে ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এরা আমাদের সেই পূর্বসূরী, যাঁরা সমুদ্রের বুক বিদীর্ণ করে পথ চলেছেন। পাহাড়ের বুক চিরে যারা অগ্রসর হয়েছেন। বিজলি চমকে উঠলে তাঁরা মুচকি হাসতেন। আকাশ গর্জে উঠলে তাঁরা হাসি মুখে জবাব দিতেন। তীব্র বাতাস ও তুফান এলে তার প্রবাহের দিক ঘুরিয়ে দিতেন। অন্ধকার এলে বলতেন, তোমার পথ এটি নয়– অন্য দিক যাও।

قوت تعمیر تھی کتنی خس خاشاک ہیں

اندھیاں چلتی رہیں اور اشیاں بنتے رہے

'নির্মাণের ক্ষমতা ছিল কেমন আবর্জনাময় নিম্ন স্থানে।'

অন্ধকার প্রবাহিত হচ্ছে আর সে তার নিজের বসতঘর নির্মাণ করছিল।

তাই বলছি, পরিস্থিতি যেমন হোক আমি আমার মামূলাত অব্যাহত রাখব। নিজের মাশায়েখের সামনে পাবন্দির সাথে বসতে হবে। মোরাকাবা

করতে হবে নবীজির সুন্নতের পাবন্দি ও হাদীছের ওপর পূর্ণ আনুগত্যের সাথে। দুরুদ শরীফ বেশি-বেশি পড়তে হবে।

তরবারির ছায়ায় মামূলাত

হযরত আলী (রাযি.)কে আমাদের নবীজি যে-তাসবীহাতে ফাতেমী আদায়ের কথা বলেছেন, যে-তাসবীহ হযরত আলী সারা জীবন আদায় করেছেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, জঙ্গে সিফফীনের দিন যখন আপনার অবস্থা বড় কঠিন ছিল, সেদিনও তিনি এই তাসবীহ পড়েছেন? জবাবে তিনি বলেছেন, আমি সেই রাতে ও তাসবীহাতে ফাতেমী আদায় করতে ভুল করিনি। একে বলে এস্তেকামাত বা অবিচলতা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরও এমন অবিচলতা দান করুন।

কেন সুযোগ হয় না?

ইবাদাতের কথা এলেই আমরা বলি সুযোগ হয় না। কেন আমাদের সুযোগ হয় না? আমার ভাইয়েরা! একজন মা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তার ছেলের প্রশংসা করে বেড়ায়। সময়ের খবর থাকে না। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা স্ত্রী তার স্বামীর কথা বলে বেড়ায়। যদি স্বামীর প্রতি খুশি থাকে, তাহলে প্রশংসা করে আর নারাজ থাকলে দুর্নাম করে বেড়ায়। পুরুষরা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টার নিজের ব্যবসায়ের কথা বলে। একটা ঘণ্টা কি আল্লাহর কথা বলা যায় না? আল্লাহর যিকির করা যায় না? আমরা বলি, মোরাকাবার সময় পাই না। ব্যাপারটা এমন যেন মজনু বলছে, লাইলার কথা ভাববার সময় আমি পাই না। কেমন মজনু সে?

আজকের যামানার সালেকীনও তেমন হয়ে গেছে। তারা আজ মোরাকাবার সুযোগ পায় না। আল্লাহর জন্য পাঁচটা মিনিট বের করা যায় না। পাঁচটা মিনিট অল্লাহকে দেওয়া যায় না। স্ত্রীর জন্য, বাচ্চার জন্য, সবার জন্য সময় হয়; কিন্তু আল্লাহকে ভাববার জন্য সময় হয় না।

ভাইয়েরা! আমলগুলো পাবন্দির সাথে নিয়মিত করুন। আজ থেকে আমরা আমাদের মামুলাত কাজা না করি। নিয়মিত যদি মোরাকাবা করতে পারি, তাহলে রব্বুল ইয্যাতের পক্ষ থেকে কী রহমত আসবে তা শুধু দেখার বিষয় হবে, ভোগ করার বিষয় হবে। কল্পনাও করা যাবে না, কেমন রহমত আমাদের ওপর অবতীর্ণ হবে।

অনুতপ্ত হওয়ার বরকত

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। যেব্যক্তি গুনাহকে গুনাহ মনে করে এবং নিজেকে অপরাধী মনে করে, সে কোনো-না-কোনোদিন তাওবা করার তাওফীক পাবে। সামান্য অনুতপ্ত হওয়ার পর এমনও হয় যে, আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে হলেও তাওবা করার তাওফীক দিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা একটি হাদীছে কুদসীতে বলেছেন–

عَبْدِى | اِنْ ذَكَرْتَنِىْ ذَكَرْتُكَ وَاِنْ نَسِيْتَنِىْ ذَكَرْتُكَ

'হে আমার বান্দা! তুমি যদি আমাকে স্মরণ কর, তা হলে আমি তোমাকে স্মরণ করব। আর যদি তুমি আমাকে ভুলেও যাও, তবুও আমি তোমাকে স্মরণ করব।'

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

একবার বনী ইসরাইলের ওপর বৃষ্টির বর্ষণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) গোটা কাওম নিয়ে বৃষ্টির দু'আ করার জন্য এলেন। সারা দিন দু'আ করলেন। কিন্তু বৃষ্টির সামান্য আলামতও দেখা গেল না। আল্লাহর কাছে অনেক ফরিয়াদ করলেন তিনি যে, হে আল্লাহ! যদি বৃষ্টি বর্ষিত না-ই হয়, তবে কী কারণে হবে না? রব্বে কারীম ইরশাদ করেন–

اِنَّ فِيْكُمْ رَجُلاً يُبَارِزُنِىْ مُنْذُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

'তোমাদের মাঝে এমন একজন মানুষ আছে, যে চল্লিশ বছর ধরে আমার সাথে যুদ্ধ করছে। আমার নাফরমানি করছে। তার কারণে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করছি না।'

শুনে হযরত মূসা (আ.) দাঁড়িয়ে গেলেন। রাগি গলায় তিনি সমগ্র জাতিকে লক্ষ করে বললেন–

مَنْ عَصَاهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

'কে আল্লাহর অবাধ্যতা করছ ৪০ টি বছর যাবত?'

কেউ দাঁড়াল না। কেউ জবাব দিল না। কিন্তু এরই মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। হযরত মূসা (আ.) বড় হতবাক হলেন। হে মাওলা! অপরাধীকে শায়েস্তা করার আগেই বৃষ্টি? তাহলে এত দিন দিলে না কেন? বলো রহস্য কী হে মাওলা? আল্লাহ বললেন, যখন আপনি ঘোষণা করলেন, কে সেই অপরাধী? তখন আমার সেই বান্দা মনে-মনে লজ্জিত হলো এবং বলল, হে

রব্বে কারীম! হে রহমান! আমি আমার গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হলাম। আমি লজ্জিত হলাম। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

يَا رَبِّ عَصَيْتُكَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَحْلِمْتَنِيْ فَجِئْتُكَ تَائِبًا فَاقْبَلْنِيْ

হে আল্লাহ! আমি চল্লিশ বছর নাফরমানি করেছি। আপনি আমার সাথে সহনশীলতার আচরণ করেছেন। আমাকে অপমানিত করেননি। আমাকে আযাব প্রদান করেননি। হে আমার আল্লাহ! আজ আমি তাওবা করে নিচ্ছি। আপনি আমার তাওবা কবুল করে নিন। ফলে আল্লাহ তা'আলা লোকটির তাওবা কবুল করে সেখানে সাথে-সাথে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

ইরশাদ হলো–

عَبْدِيْ اَعْرِضُ عَنِّيْ وَاَنَا مُقْبِلٌ اِلَيْهِ

'হে আমার বান্দা! তুমি আমার কাছ থেকে বিমুখ হচ্ছ? আর আমি তোমার দিকেই বরং ফিরে তাকাই।'

ভাই! আমাদের দিকেও আল্লাহ তাকিয়ে আছেন। আমাদের তো উচিত আমরা আমাদের রব্বে কারীমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব, তাঁরই অভিমুখী হব। নিজ গুনাহ থেকে সত্য তাওবা করব।

আপনি দেখবেন, ছোট বাচ্চারা অনেক সময় মায়ের মাথায়-মুখে থাপ্পর দিতে থাকে। এটা কিন্তু মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়; বরং মায়ের প্রতি তার ভালোবাসা ও মহব্বত প্রকাশের জন্য। মা বোঝেন, সন্তান আমার অবুঝ। ভালোবাসার টানে সে আমার মাথায়-মুখে এমন থাপ্পর দেয়। সেজন্যই তো তার কাছ থেকে সামান্য দূরে সরে গেলেই সে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। বাচ্চার এমন ভালোবাসা প্রকাশে মা বড় খুশি হন। সন্তানকে চুমুয় চুমুয় ভরে দেন।

তেমনি যে মানুষ তার রবকে ভালোবাসবে, মহব্বত করবে, রবের ইবদাত করবে, তেলাওয়াত করবে, তাহাজ্জুদ পড়বে, রব্বে কারীম বুঝবেন, বান্দা আমাকে মহব্বত করে, ভালোবাসে। যদিও মাঝে-মাঝে মানুষ হিসেবে গুনাহ করে ফেলে, আমার অবাধ্যতা করে ফেলে। কিন্তু এটা আমার সাথে গোঁড়ামি করে নয়, বরং আমার বান্দার ভুল হয়ে যায়। আল্লাহ ভাবেন, আমার অবুঝ বান্দা, অজ্ঞ গোলাম। তাই আল্লাহ মাফ করে দেন। যেন সহজেই আমরা রব্বে কারীমকে রাজি করিয়ে নিতে পারি।

আল্লাহর রহমতের ভরসা

রবের রহমত বড়ই প্রশস্ত। আমার বন্ধুগণ! আমরা যদি আঁচল প্রসারিত করতে পারি, সেই আঁচল কখনও খালি ফিরবে না। একজন আল্লাহওয়ালার ঘটনা। তিনি দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। মসজিদে প্রবেশ করেই পেছনের কাতারে চুপচাপ বসে গেলেন। কেউ একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত! এত দ্রুত আসছিলেন; অথচ শেষ কাতারে বসে গেলেন। ঘটনা কী? তিনি বললেন, আমি মাহফিল শেষ হয়ে যাওয়ার এবং মাহফিলের ছাওয়াব ও আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয় করছিলাম। আর যত আগে যেতে পারব তত আগেই তো রহমতের ছায়া পেয়ে যাব। তাই দ্রুত দৌড়ে এসেছি। যখন মসজিদে পৌঁছে গেছি, তখন তো রহমতের ছায়ায় এসে গেলামই। তাই শান্ত হয়ে বসে পড়লাম। কারণ, রহমতের খাযানা এত বিশাল ও অসীম যে, যদি রহমত প্রথম থেকেও বণ্টন করা হয় এবং সকলকে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তবুও শেষ হবে না। আমিও ইনশাআল্লাহ রহমতের ভাগ পাব।

দেখুন, আল্লাহর রহমতের ওপর আল্লাহর বান্দাদের ভরসা কত বেশি এবং কত দৃঢ় ছিল। আমাদের উচিত আল্লাহর রহমতের ওপর মজবুত ভরসা রাখা।

আল্লাহ অসহায়দের সহায়

স্মরণ রাখুন, যে-বান্দা ব্যথা ও তাড়না নিয়ে আল্লাহর সমীপে কোনো আর্জি পেশ করে, আল্লাহ বান্দার সেই আর্জি কবুল করে নেন। কারণ, বান্দা তখন একথা বোঝে ও প্রকাশ করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমার আর কোনো সহায় নেই। আল্লাহ ব্যতীত আমার সমস্যার সমাধান করার মতোও কেউ নেই। আমার প্রয়োজনাদি পুরো করারও কেউ নেই। তো এমন অবস্থায় এই নিঃস্ব-অসহায় বান্দাদের সহায় হয়ে যান আল্লাহ রব্বুল আলামীন।

হাদীছে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বশীর নামে এক সাহাবি ছিলেন। তার মা ইন্তেকাল করেছেন। বাবা আছেন। জিহাদের আহ্বান এল। বশীরের বাবা শাহাদাতের তামান্নায় চলে গেছেন। জিহাদের ময়দানে শরীক হয়েছেন। আল্লাহর শান দেখুন। জিহাদে বশীরের বাবা শহীদ হলেন। জিহাদের কাফেলা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিল, শিশুরাও নিজ-নিজ আত্মীয়কে দেখার জন্য মদীনার বাইরে চলে এলেন।

বশীর সকলের সাথে মদীনার বাইরে এসে বাবাকে দেখার অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু একে-একে সকলেই এল। সব সাহাবি এলেন। আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী সকলে এলেন। কিন্তু বশীরের বাবা আসেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নবীও এলেন। বাবা এলেন না দেখে বশীর নবীজির কাছে ছুটে গেল। বলল, হে আল্লাহর হাবীব! আমার বাবা আসবে কবে? নবীজির হৃদয় কেঁদে উঠল। শহীদ বাবার সন্তান বশীর। মাসুম বাচ্চাটা নবীজির সম্মুখে। শিশুকে বুকে নিয়ে বললেন, বশীর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আয়েশা তোমার মা হবেন আর আমি তোমার বাবা হব? ছোট্ট বশীর বলে উঠল, আমার আল্লাহ আমার ইচ্ছে পূর্ণ করেছেন।

দেখুন, আল্লাহ অসহায়কে কীভাবে সহায় দান করলেন! কীভাবে নবীকে তাদের সহায় বানিয়ে দিলেন। তাই আজ আমরা আপন আঁচল পেতে আল্লাহর সামনে বলব, তুমি ছাড়া কেউ নেই আমাদের। কোনো সহায় নেই আমাদের। হে আল্লাহ! আজ আপনার দুয়ারে আমরা হাজির। আমরা শান্তি চাই হে আল্লাহ!

نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی

میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں

যেখানে শান্তি পাবে, আজ সেখানে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা নিতে না পারলে আর কোথা থেকে নেব?

আমার এই অপরাধগৃহে তুমি রহমত দিয়ে মুক্ত করো।

হে আল্লাহ! আজ আমি গুনাহ থেকে সত্য হৃদয়ে তাওবা করছি। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। বরকত দিয়ে দিন হে মালিক!

হযরত ঈসা (আ.)-এর ফরমান

তাওরাত কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ.) আপন কাওমকে বলেছিলেন, হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, প্রার্থনা করো। তোমাদের দেওয়া হবে। খোঁজো; পেয়ে যাবে। দুয়ারে আঘাত করো; তোমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেওয়া হবে। তোমাদের মধ্যে এমন মানুষ কে আছে, যার সন্তান তার কাছে খাদ্য চাইলে সে তার মুখে পাথর মারবে? তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যার সন্তান তার কাছে মাছ চাইলে সে তার সন্তানের মুখে সাপ নিক্ষেপ করবে? হে লোকেরা! যদি তোমরা খারাপ হয়েও

তোমার সন্তানের সঙ্গে দয়ার আচরণ করতে পার, তাহলে আমার আল্লাহ ভালো হয়েও তোমাদের সঙ্গে কেন দয়ার আচরণ করবেন না? আমার বন্ধুগণ! কুরআনের ঘোষণা–

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ

'যে কেউই আপন পথে আমল করে।'[১]

হে আমার বান্দা! তুমি গুনাহ করে, গুনাহগার হয়ে আমার দরবারে এসেছ। আমি তোমার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করব। আমি ক্ষমাকারী আল্লাহ। এসো আমার দরবারে। আমি তোমাদের মাফ করে দেব।

বান্দার অপেক্ষায় আল্লাহ

আমার বন্ধুগণ! পিতামাতা যেমন সন্তানের ঘরে ফেরার অপেক্ষা করেন, আমার আল্লাহও তাঁর বান্দা তাঁর দরবারে ফিরে আসার অপেক্ষা করেন। মা-বাবা অপেক্ষা আরও বড় ব্যাকুলভাবে আল্লাহ তার গুনাহগার বান্দার অপেক্ষা করেন। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে–

مَنْ اَقْبَلَ اِلَيَّ لَقِيْتُهٗ مِنْ بُعْدِىْ

'যে আমার দিকে অগ্রসর হয়, আমি তাকে অগ্রসর হয়ে অভিনন্দন ও স্বাগতম জানাই।'

আল্লাহু আকবার! রহমান মাওলা অভ্যর্থনা জানান! চলুন; আল্লাহ আমাদের অপেক্ষায় আছেন। আজই আল্লাহর কাছে সত্য হৃদয়ে তাওবা করুন। আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে নিন। আল্লাহ তাঁর রিজা ও সন্তুষ্টি আমাদের দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন। পাঞ্জাবের ভাষায় কেউ একজন বলেছেন–

سن فریاد میرے سوہنیا اللہ تے میں ہور سناواں کینوں

تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی تے میرے جئے ملکو تینوں

আমাদের ফরিয়াদ শোনো হে আল্লাহ! তোমার কাছে ফরিয়াদ করার মতো বহু মানুষ আছে। কিন্তু যার কাছে ফরিয়াদ করব, তিনি একা তুমিই হে খোদা! আঁচল পাতার স্থান তো তুমিই হে মালিক! আমাদের ভাগ্যে লিখে দাও ক্ষমার ফয়সালা।

---

১. সূরা ইসরা : আয়াত ৮২

হে আল্লাহ! আমাদের মতো বহু বান্দা আছে, যে তোমাকে ডাকছে। কিন্তু তোমার মতো তো আমাদের আর কেউই নেই, যাকে আমরা ডাকব। মেহেরবানি করো হে মাওলা! মাফ করে দাও হে মাওলা! আঁচল পেতেছি আজ হে মাওলা! হে আল্লাহ! তোমার সকল বান্দা-বান্দীকে তুমি মাফ করে দাও। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আত্মীয়তার বন্ধন

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করো।'

কী চমৎকার শিক্ষা উম্মতের তরে নবীজির। একজন মানুষ আমার সঙ্গে আত্মীয়তা নষ্ট করতে চায়। আমার নবী আমাকে সেই আত্মীয়তা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যের সাথে প্রেম-ভালোবাসা, মায়া মমতা এবং নৈকট্য ও আত্মীয়তার বাঁধনে চলতে-ফিরতে এবং পারিবারিকভাবে জীবন যাপন করতে গিয়ে একের সাথে অন্যের মনকষাকষির ঘটনা ঘটতেই পারে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এটা যেন মারাত্মক আকার ধারণ না করে। তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে, তোমার আত্মীয়ের কাছে মাফ চেয়ে নেবে। আর তোমার আত্মীয়ের প্রতিও নির্দেশ, সে যেন তোমাকে মাফ করে দেয়।'

আত্মীয়তার বন্ধন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ

وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ مَقَامٍ اٰخَرَ: وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম

ইসলাম স্বভাবজাত দীন। আল্লাহর এক মহা নেয়ামত। সফল জীবনের সবচেয়ে উত্তম পন্থা এই ধর্মে অগণিত। মিলেমিশে, প্রেম ও ভালোবাসার বাঁধনে আবদ্ধ থেকে জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কারণ, মানবের আছে অনুভব ও অনুভূতি, আছে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। যখন মানুষ প্রেম-ভালোবাসার আবেশে থাকবে, তখনই একে অন্যকে আনন্দ দিতে পারে। আবার বিদ্বেষও সৃষ্টি হবে এবং একে অন্যের শত্রু হবে। এটাও স্বভাবিক।

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

ইসলাম যেভাবে বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করেছে, যেভাবে এক বান্দাকে আরেক বান্দার নিকটবর্তী করেছে, এই সম্পর্কটি দ্বিপাক্ষিক। একটা সম্পর্ক আছে মাখলুক তথা বান্দার আত্মীয় ও পরিজনের সঙ্গে। এক্ষেত্রেও শরীয়তের সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির সঙ্গে, প্রেম ও ভালোবাসার সাথে যেন জীবন যাপন করা হয়।

দ্বিতীয় সম্পর্ক আপন খালেক তথা আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সাথে। মানুষকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহর সাথে যেন সম্পর্ক স্থাপন করে রাখে। বান্দা যদি ভুল করে বসে, তাহলেই একে তার জীবনের বিপর্যয় বলা হবে। যদি কেউ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়, তাহলে তাকে সুস্থ মানুষ বলা হবে না। তো একজন মানুষ মাখলুক তথা তার স্ত্রী-বাচ্চা ভাই-বোন ও মা-বাবার সঙ্গে ভালো ও প্রেমের সম্পর্ক বড় দারুণভাবে রাখল ঠিক; কিন্তু আল্লাহর নাফরমানি করল, তাহলে বুঝতে হবে, এলোকটি প্যারালাইসিস-আক্রান্ত মানুষই। এ দুনিয়াদার মানুষ।

আবার একজন মানুষ এমন যে, সে আল্লাহর ইবাদত পরিপূর্ণভাবে করে ঠিক; কিন্তু সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বাঁধনগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। তাহলে বুঝতে হবে, এ-লোকটিও প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। এ-লোকটিও আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ তাকেই ভালোবাসেন, যে উভয় সম্পর্কই বহাল ও নিরবচ্ছিন্ন রাখে, অটুট রাখে।

ইসলামের সৌন্দর্য

ইসলামের একটি সুন্দর দিক হচ্ছে এই যে, এটি জীবন যাপনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মহব্বতের জোর তাগিদ প্রদান করে। একটি হাদীছে বর্ণিত আছে; হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ

'হে লোকেরা! তোমরা সালামের বিস্তার ঘটাও। অসহায়দের খাবার খাওয়াও। পরস্পরে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করো। তাহাজ্জুদের নামায আদায় করো। তারপর জান্নাতে সালামতির সঙ্গে প্রবেশ করো।'[১]

এমন আরও একটি হাদীছ আছে। সেখানে তিনটি বিষয়ের কথা আছে–

১। সালাম।

২। খাবার খাওয়ানো।

৩। তাহাজ্জুদ।

কিন্তু এই হাদীছের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা ব্যাপারটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

১. সুনানে দারেমী : হাদীছ নং ১৫১২

কাকে বলে আত্মীয়তা রক্ষা?

আত্মীয়তা রক্ষা মানে স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখা। ইসলাম সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন রাখাকেই পছন্দ করে। এটি দীনে ইসলামে বড় চমৎকার শিক্ষা। মানুষ যেন পরস্পরে একটি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যিন্দেগি যাপন করে। এতে সামাজিক শক্তি মজবুত হবে।

শক্তিশালী সমাজের বুনিয়াদ চারটি

একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো–

১. বংশধারা : কোন মানুষ কোন খান্দানের, কোন বংশের।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

'পরিচয় নির্ণয়ের জন্য তোমাদের বংশ-বংশ ও গোত্র-গোত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১]

২. বিবাহ : বংশধারা সুসংরক্ষিত রাখার জন্য বিবাহপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। নারী ও পুরুষ এক হয়ে জীবন যাপন করতে হলে বিবাহ করতে হবে। বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষ এক সাথে জীবন যাপন করা গুনাহ ও অন্যায়।

বিবাহের উপকারিতা অনেক। বিবাহ দ্বারা বংশের পরিচয় সৃষ্টি হয়। নারী তার রক্ষক পায়। নারী তার স্বামীর উত্তরাধীকারী হয়। বিবাহের এ পদ্ধতি না থাকলে পুরুষরা নারীর সাথে তেমন আচরণই করবে, যেমন আচরণ করে টিস্যু পেপারের সাথে। ব্যবহার করে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। ইসলাম নারীকে নিরাপত্তা দিয়েছে। সুরক্ষিত থাকার মাধ্যম দিয়েছে। এ-কারণে বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম।

৩. আত্মীয়তা রক্ষা : বিবাহের পর আত্মীয়তা রক্ষা করা। তোমাদের ঘরসংসার হলো। স্বামীর পরিবারের সঙ্গে বউ ও তার পরিবার ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবে। আবার বউ ও তার পরিবারের সঙ্গে স্বামী ও তার পরিবার ভালো ব্যবহার করবে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

৪. মীরাস বা উত্তাধিকার : মৃত্যুর পরে মীরাস। মীরাস তথা উত্তরাধিকারের কথা ইসলামে বড় সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। খুলে-

---

১. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১৩

খুলে বলে দেওয়া হয়েছে মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার ওয়ারিসদের মাঝে কীভাবে বণ্টন করতে হবে। এ চারটি বিষয় এমন, যা পরিবারের স্তম্ভ, সমাজের বুনিয়াদ এবং আমাদের জীবন যাপনের ভিত্তি। এ-চারটি বিষয় থাকলে নির্মিত হবে শক্তিশালী সমাজ।

ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে আত্মীয়রা পরস্পরে যেন ভালো সম্পর্ক রাখে। তবে সামাজিকভাবে এক সাথে থাকতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি হবে। মনকষাকষি হবে। এমতাবস্থায় যদি প্রত্যেকে জিদ দেখায়, তাহলে একজনের চেহারা পূর্বমুখী থাকবে, আরেকজনের চেহারা পশ্চিমমুখী থাকবে। তাই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, উভয়েই যেন ভালো হয়। নিজের জিদ ও হটকারিতাকে থামিয়ে দাও, নিয়ন্ত্রণ করো। অন্যকে কাছে টানো, ভালোবাসো। এমন করার নামই আত্মীয়তা রক্ষা।

শরীর ও রূহের দৃষ্টান্ত

মানবদেহ নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি। প্রত্যেক অঙ্গের আলাদা-আলাদা গুণ আছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ নিজ গুণাবলি হিসেবে অন্য অঙ্গের বিপরীত। যেমন– চোখ অবলোকন করে। আর অন্য কানো অঙ্গের অবলোকন ক্ষমতা নেই। জিহবা ও মুখ দ্বারা কথা বলা যায়। বাকি কোনো অঙ্গ দ্বারা কথা বলা যায়। বোঝা গেল, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একটি আরেকটির বিপরীত। বলা যায় বহু বিপরীত উপদানের সমষ্টি হচ্ছে মানবদেহ। কিন্তু আল্লাহ সকল অঙ্গের মাঝে এমন একটি অঙ্গ দিয়ে সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছেন, যা সকল অঙ্গকে একীভূত করে দিয়েছে। জিনিসটির নাম হলো রূহ। যতক্ষণ মানবদেহে রূহ থাকবে, ততক্ষণ সকল অঙ্গ ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাবে।

একজন জীবিত মানুষের হাত আহত হলে পা কখনও বলে না, আমি ডাক্তারের কাছে যেতে পারব না। আবার আঘাত লাগল হাতে আর অশ্রু বের হলো চোখ দিয়ে। অথচ ব্যথা তো চোখ পায়নি। যেহেতু গোটা দেহের সমস্ত অঙ্গ এক হয়ে গেছে, তাই অঙ্গগুলোর একটি ব্যথিত হলে অন্য সকল অঙ্গই ব্যথিত হয়। আবার ব্যথিত অঙ্গ সুস্থ হয়ে গেলে অন্য সকল অঙ্গই শান্তি ও পুলক অনুভব করে। এমনিভাবে পেট, নাক, কান বা যে-অঙ্গই অসুস্থ হয়, তার কারণে সব অঙ্গ সহমর্মী হয়ে যায়। কারণ, ভিন্ন-ভিন্ন কাজের ও বিপরীত গুণাবলির অঙ্গগুলোকে এক করে দিয়েছে রূহ। এ রূহকে যদি শরীর থেকে বের করে দেওয়া হয়, তাহলেই দেখা যাবে, সকল অঙ্গ বিপরীত হয়ে

আছে। মৃত্যুর পর যদি হাত কেটেও ফেলা হয়, তবু তার চোখ কাঁদবে না। এমনকি অন্য হাতটি পর্যন্ত প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হবে না। পা পলায়নের জন্য দৌড় দেবে না বা ডাক্তারের কাছে ছুটবে না। কারণ, এখন আর রূহ নেই, যে রূহ মানবদেহের সকল অঙ্গকে এক সুতোয় বেঁধে একীভূত করে রেখেছিল।

ঘরে দীন দেহে রূহের মতো

এবার আপন ঘরের দিকে তাকান। ঘরে আল্লাহ যতজন সদস্য সৃষ্টি করেছেন, আপন অবস্থানের দিক থেকে প্রত্যেক সদস্য একে অন্যের বিপরীত। যেমন– যিনি বাবার অবস্থানে আছেন, তিনি তো অন্য সকলের বিপরীত। আবার যে ছেলে, সে অন্যদের চেয়ে বিপরীত। মা অন্যদের চেয়ে বিপরীত। মেয়ে অন্যদের চেয়ে বিপরীত। প্রত্যেক সদস্য অন্যজনের বিপরীত। তবে সকল বিপরীত সদস্য মিলে একটি সমষ্টি। এই বৈপরীত্যের মাঝে আল্লাহ একটি নেয়ামত দান করেছেন। সেই নেয়ামতটির বরকতে ঘরের সকল সদস্য মিলে এমনভাবে একীভূত হয়ে গেছে যেমনিভাবে রূহ থাকলে দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঐক্যবদ্ধ থাকে। আর সেই নেয়ামতটির নাম হচ্ছে ইসলাম। যদি আমাদের ঘরে দীন বিদ্যমান থাকে, তাহলে আমাদের ঘরটি হবে রূহওয়ালা দেহের মতো। তাহলেই একজনের অনুভূতি, স্বপ্ন ও চাহিদা উপলব্ধি করবে আরেকজন। একের দুঃখে ও ব্যথায় দুঃখিত ও ব্যথিত হবে সকলে। একজনের হাসি-আনন্দে খুশি হবে সকলে। পরস্পরের মাঝে প্রেম সৃষ্টি হবে, ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। পরস্পরিক ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়ত। আর যদি এই দীন ঘরে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে ঘরটি হয়ে যাবে রূহবিহীন দেহের মতো।

ইসলাম এই ঐক্যবদ্ধতা দর্শনের সীমারেখা আরও বিস্তৃত ও বিস্তারিত করে দিয়েছে। বলেছে, শুধু ঘরের সদস্যবৃন্দের মাঝেই নয়, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, পাড়া-পড়শীর মাঝেও দীনের সুতোয় এই ঐক্য ও সম্প্রীতির বাঁধন বড় মজবুতভাবে নির্মিত হবে। তাই তোমরা পরস্পরে আত্মীয়তার বাঁধন রক্ষা করো। কারণ, তারা তোমাদের রক্তসম্পর্কীয় স্বজন, তাদের জড়িয়েই তোমাদের জীবন। সেজন্যেই আত্মীয়তা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে শরীয়ত। আর যে এই আত্মীয়তার বন্ধনকে কেটে দেবে, তাকে শরীয়ত ঘৃণা করে। মানুষের মর্যাদা এজন্যই যে, মানুষ একজন অন্যজনকে উপলব্ধি করতে পারে। একে অন্যকে বুঝতে পারে। এই উপলব্ধি, একে অন্যকে

বুঝতে পারার এই ক্ষমতা যদি মানুষ পরিত্যাগ করে, তাহলে মূল্যে ও সম্মানে মানুষ মানুষ থাকবে না।

মানুষ ও রোবটের মাঝে পার্থক্য

ধরুন, আপনার ঘরে একটি রোবট আছে। আপনি তাকে পানি আনতে বললেন। রোবট আপনাকে পানি পান করাল। সে কি নেকি পাবে? পাবে না। কারণ, তার মাঝে অনুভূতি নেই। অথচ মানুষ যদি আপনাকে পানি পান করায়, তাহলে মানুষের নেকি হবে। কারণ, মানুষের মাঝে মহব্বত, সহমর্মিতা ও ভালোবাসা বিদ্যমান।

এক ইংরেজ ছিল বিজ্ঞানী। তিনি একটি ফিকশন লিখলেন। ফিকশন বলা হয় কাল্পনিক নিবন্ধকে। তো তাতে তিনি নিজেই একটি প্রশ্ন করলেন আবার নিজেই তার উত্তর দিলেন। আমি ছাত্রজীবনে সেটি পড়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আপনাদের শোনাচ্ছি। 'বিজ্ঞানে আরও উন্নতি হবে। এক বিজ্ঞানি রোবট তৈরি করবে, যে কিনা সর্ব দিক থেকে মানব অপেক্ষা উত্তম হবে। যেমন– মানুষ আলোতে দেখে– আঁধারে দেখে না। রোবট আলোতেও দেখবে, অন্ধকারেও দেখবে। মানুষ কয়েকশো গজ দূরের জিনিস দেখতে পায় না। রোবট হাজার মাইলের দূরত্বেও স্পষ্ট দেখতে পাবে। মানুষ খুব সীমিত এরিয়ার ভেতরের জিনিসের ঘ্রাণ পায়। রোবট বহু দূরের এলাকা থেকেও ঘ্রাণ পাবে।

আমরা একটি জাদুঘরে ছোট একটি পতঙ্গ দেখতে পেলাম, যে ১০ মাইল দূরত্ব থেকেও উপস্থিতির অস্তিত্ব টের পায়। কুকুরের নাকের ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতাও মানুষ অপেক্ষা বহু তীব্র। কুকুরকে এখন গোয়েন্দাগিরির কাজেও ব্যবহার করা হয়। এভাবে কত-না জন্তু আছে, যেগুলোর অনুভূতি ক্ষমতা মানুষ অপেক্ষা তীব্র। আর ওই যে রোবট, তার মাঝেও এই ব্যাপারটা থাকবে। মানুষ পড়াশোনা করলে জীবনভর একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পড়ে এবং উন্নতি করে। যে ডাক্তারি শিখেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং শেখেনি; এভাবে প্রত্যেক মানুষ একটা কি দুটা বিদ্যায় পারদর্শী হয়। হয় ডাক্তার হয়, নাহয় ইঞ্জিনিয়ার হয়, নাহয় সাহিত্যিক বা ভাষাবিদ বা রসায়ন শাস্ত্রবিদ হয়। যেকোনো একটা হয়। কিন্তু এই যে রোবট এর মধ্যে এতটা ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মেমোরি আছে যে, দীনি, দুনিয়াবি সর্ব প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সে শিক্ষা করতে পারবে। মানুষ বেশির চেয়ে বেশি পাঁচ বা ছয়টা ভাষা

আয়ত্ত করতে পারে এবং কথা বলতে পারে। কিন্তু রোবট পৃথিবীর শতাধিক ভাষা বলতে ও বুঝতে পারবে।

মোটকথা সর্ব দিক থেকে মানব অপেক্ষা বেশি কাজ করতে সক্ষম হবে রোবট। মানুষ কয়েক ঘণ্টা কাজ করে ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু রোবটের কোনো ক্লান্তি থাকবে না। ক্ষুধা থাকবে না। পিপাসা থাকবে না। মোটকথা, বিজ্ঞানীরা এমন একটা রোবট তৈরি করবে, যে কিনা সব দিক থেকে মানুষের চেয়ে উন্নত হবে।

লোকটি এত সব কথা বলার পর বললেন, যখন কেয়ামত অসবে, তখন আমি আল্লাহর সামনে এই রোবটকে পেশ করব এবং বলব, হে আল্লাহ! তুমি মানুষ বানিয়েছ আর আমি রোবট বানিয়েছি। তুমি আমার শাহী কর্ম দেখো। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখি তোমার শাহী কর্ম। লোকটি বলল, আমি দুটি রোবট দাঁড় করাব। আমি সুইস টিপ দেব আর সাথে-সাথে চলতে শুরু করবে রোবট। দৌড়াতে শুরু করবে, কাজ করতে শুরু করবে, কথা বলতে শুরু করবে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা কোনো একটা রোবটের মধ্যে কুদরতিভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে সেটি ভেঙে যাবে। বাকি দুটা আপন কাজ ও দৌড়ঝাঁপে মগ্ন থাকবে।

এবার আল্লাহ বলবেন, তোমার রোবটের কী হলো? লোকটি বলবে, একটি নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি দুটা তো চলছে। এবার আল্লাহ তা'আলা তিনজন মানুষকে সামনে আনবেন। একজনকে হঠাৎ কঠিন ব্যথায় আক্রান্ত করে দেবেন। ফলে সে চিৎকার ও আর্তনাদ শুরু করবে। সাথে-সাথে তাকে চিকিৎসা করতে শুরু করবে। জিজ্ঞেস করবে, কোথায় তোমার ব্যথা ভাই? আবার বলবে চলো, হাসপাতালে যাই। বলবে, দেখি, একটু মালিশ করে দিই। আবার বলবে, কিছু খাবে কি? কোনো খাবারের ব্যবস্থা করব কি? এভাবে একজনের বিপদে বাকি দুজন ছুটে আসবে। চোখের পানি ফেলবে। এবার আল্লাহ তা'আলা বলবেন, কী মিয়া! তুমি কী বানিয়েছ? তুমি যা বানিয়েছ, তা এত অনুভূতিহীন যে, একটা রোবট ভেঙে গেল, কিন্তু দ্বিতীয় রোবট তার কিছুই উপলব্ধি করল না। তার বিপদে সাড়া দিল না। তার সহমর্মিতায় কাঁদল না। তার সহযোগিতায় এগিয়ে এল না। অথচ দেখো, আমি যে মানব সৃষ্টি করেছি, তার অনুভব-অনুভতি এবং ভাব ও উপলব্ধি দেখো। তার সহমর্মিতা দেখো, অন্যের প্রতি তার আবেগ ও ভালোবাসা দেখো। বলো, আমার এ সৃষ্টি উত্তম, না তোমার এই রোবট উত্তম।

আল্লাহর এই আশ্চর্য জবাব দেখে বান্দা হতভম্ব হয়ে যাবে। আল্লাহর সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে আর বলবে, বাস্তবেই তোমার সৃষ্টির চ্যালেঞ্জকারী নেই কেউ।

বন্ধুগণ! এটি কাল্পনিক একটি ফিকশন। তবে এর দ্বারা এতটুকু তো স্পষ্ট হয় যে, প্রতিটি যান্ত্রিক বস্তুর ওপর মানবই মর্যাদাবান। মানবের অনুভব ও অনুভূতি আছে। মানবের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা আছে। মানবের মাঝে অন্যকে মহব্বত করার দিল আছে। স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার হৃদয় আছে। যদি মানুষের মাঝ থেকে মহব্বত, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, স্নেহ প্রীতি আর শুদ্ধ করার অনুভূতি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মানবের মাঝে আর সেই মেশিন ও যান্ত্রিক রোবটের মাঝে আর কী প্রার্থক্য থাকল? তাই তো ইসলাম প্রতিটি আত্মীয়স্বজনের পরস্পরের মাঝে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার জোর তাগিদ দিয়েছে। আর একেই বলা হয় আত্মীয়তা রক্ষা। যেখানেই রক্তসম্পর্কীয় কোনো আত্মীয় থাকবে, সকলের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা নিবেদন করতে হবে।

প্রেম শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে হতে হবে

তবে এই যে পারস্পরিক প্রেম ও ভালোবাসার কথা বলা হচ্ছে, তা হতে হবে শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া সীমারেখার আওতায়।

এমনটা করা যাবে না যে, আমার কাজ শরীয়তের খেলাফ হয়ে গেল। কেউ বলল, আমাকে গুনাহ করতে দাও; অন্যথায় আমি নারাজ হয়ে যাব। শুনে আপনিও তাকে সেই গুনাহের কাজ করতে দিয়ে দিলেন। তাহলে তো সবই বরবাদ হয়ে গেল।

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে গিয়ে মাখলুকের আনুগত্য করা যাবে না।'[১]

মা-বাবা যদি বলেন, নামায পড়ো না। তাহলে মা-বাবার ওই কথাটাও মান্য করা যাবে না। মা-বাবা যদি ঘুস নিতে বলে বা সুদ খেতে বলে বা হারাম কোনো জিনিস নিতে বলে, হারাম কোনো কাজ করতে বলে, তাহলে তা মান্য করা যাবে না। তাই পারস্পরিক ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক হবে শরীয়তের বৈধ সীমারেখায়। শরীয়ত এরই নির্দেশ প্রদান করে।

---

১. আল-মু'জামুল কাবীর : পৃ. ১৭

এখন কোনো বান্দা মুছল্লায় বসে ইবাদাত তো করে ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর অন্য বান্দাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়– কারও হৃদয় কষ্ট পাচ্ছে কিনা এ নিয়ে না তার কোনো অনুভব অনুভূতি আছে, না তার হৃদয়ে কারও জন্য ভালোবাসা আছে, না সে বাবা-মার সাথে সুসম্পর্ক রাখে, না ওস্তাদের সাথে, না পীরের সাথে, না পাড়াপড়শীর সাথে। কারও সাথেই সে ভালো আচরণ ও সুসম্পর্ক রাখে না। বরং উল্টো সকলকে কষ্ট দিয়ে বেড়ায়। এমন লোক জাহান্নামি।

শরীয়তে মুহাম্মদীর সুন্দর শিক্ষা

প্রিয় ছাত্র বন্ধুগণ! বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করুন। আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত আমাদের এমন সুশোভিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত দীন দান করেছেন। যে দীন পারস্পরিক ভালোবাসা বন্ধনকে সুদৃঢ় করার নির্দেশ প্রদান করে। আবার এই ভালোবাসার বন্ধনের বিনিময় অনেক বেশি দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। নবীজি ইরশাদ করেছেন–

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'যে তোমার সাথে ভালোবাসার বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি সেই বন্ধন ও সম্পর্ক গড়ো।'[১]

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে একটি মোজেজা দান করেছিলেন। তাহলো, তিনি নিজেই বলেছেন, আমি হলাম আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। সামান্য কটা শব্দে তিনি অনেক কথা বলে ফেলতে পারতেন। সমুদ্রকে প্রবিষ্ট করে ফেলতে পারতেন কুয়ার ভেতরে। দেখুন, মাত্র দু-তিনটা শব্দের ভেতর কীভাবে আলোচিত হয়ে গেল পারিবারিক বন্ধন সুরক্ষিত রাখার মূলনীতি। صِلْ مَنْ قَطَعَكَ বারবার পড়ুন। অর্থটি নিয়ে ভাবুন। যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেয়, তুমি তার সাথে সম্পর্ক নির্মাণ করো। কত আশ্চর্য সুন্দর শিক্ষা এটি। একজন মানুষ আমার থেকে দূরে সরে যেতে চায়, পৃথক হয়ে যেতে চায়। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব তার সাথে জুড়ে থাকতে। তার সাথে সম্পর্ক জুড়িয়ে রাখতে। তার কাছে থাকতে, পাশে থাকতে, প্রিয় থাকতে। কারণ, আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানে পাশাপাশি থাকতে গিয়ে কিছু বাদবিবাদ তো হবে। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ দিকে তো শরীয়ত আমাদের নির্দেশ দিয়ে দিল, যদি

---

১. মুসনাদে আহমাদ : হাদীছ নং ১৬৬৯

ভুলক্রমে অন্যের সাথে কোনো সমস্যা হয়ে যায়, তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। আবার যার কাছে মাফ চাওয়া হচ্ছে, তাকেও শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, তুমি তাকে মাফ করে দাও এবং দ্রুত করে দাও। আরে ভাই! দক্ষ ড্রাইভারও তো কখনও-কখনও একসিডেন্ট করে বসে। তেমনি দুজন ভালো মানুষের মাঝেও কখনও কোনো বিবাদ বেঁধে যেতে পারে। কিন্তু শরীয়ত বলেছে, বিবাদ হবে। তবে তাকে স্থায়ী হতে দেবে না।

বিবাদটা মিটিয়ে নেবে। অনুভূতিকে জাগ্রত রাখো। মানুষ যদি অনুভূতিহীন হয়ে যায় এবং এই যে ব্যাপারগুলো বলা হলো, তা যদি উপলব্ধিই না করতে পারে, তাহলে তা হবে শরীয়তের লঙ্ঘন। শরীয়ত একে অপছন্দ করে। তাই তো আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَآءَ اِلَيْكَ

'যে তোমার ওপর জুলুম করল, তাকে তুমি মাফ করে দাও। আর যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করল, তার সাথে তুমি ভালো আচরণ করো।'[১]

কী দারুণ সৌন্দর্য। এটিই মানুষের মর্যাদা এবং মহা মর্যাদা। যে-বান্দার সাথে এই তিন সৌন্দর্য এসে যাবে, সে ঘরের একজন উত্তম সদস্য হবে আর আচরণে ও সামাজিকতায় কতটা ভালো ব্যক্তি হবে, তা শুধু কল্পনারই বিষয়, চিন্তারই বিষয়। সে যে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের একজন ভালো বান্দা হতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

আজ আমাদের রক্ত সাদা হয়ে গেছে। আমাদের ভেতর মমতা নেই। আমরা এক ভাই অন্য ভাইয়ের দুঃখ বুঝি না। এটা কেয়ামতের একটা আলামত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামতের একটা আলামত হচ্ছে, পরস্পর আত্মীয়তার অনুভূতি খতম হয়ে যাবে। শরীয়ত বড় চমৎকারভাবে মানুষের পারস্পরিক বন্ধনের নির্দেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ

'তোমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের ওপর দয়া করো। তাহলে আসমানওয়ালা তোমাদের ওপর দয়া করবেন।'[২]

---

১. জামেউল আহাদীছ : হাদীছ নং ১৫৭৮

২. সুনানে তিরমিযি : হাদীছ নং ১৮৩৭

হযরত জারীর (রাযি.) বর্ণনা করেন–

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ

'যে মানুষের ওপর রহম করে না, আল্লাহও তার ওপর রহম করে না।'[১]

رحم শব্দটি رحمان শব্দ থেকে উদ্‌গত। যে অন্যকে রহম করবে, আল্লাহ তাকে রহম করবেন। যে অন্যকে রহম করবে না, আল্লাহ তাকে রহম করবেন না।

مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান দেয় না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২]

ভাই! ইসলামের সৌন্দর্যের ওপর কোরবান হোন। সাধারণত দেখা যায় যৌবনে মানুষ একজন আরেকজনের সুখ-দুঃখের খবর রাখে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কেউ কারও সঙ্গ দেয় না। ফলে ইসলাম এই শিক্ষা প্রদান করে–

اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللهِ تَعَالٰى اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ

'সাদা চুলওয়ালা মুসলিমকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার তুল্য।'

এবার বলুন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে সম্মানদানের জন্য এর চেয়ে বড় শিক্ষণীয় কথা আর কী হতে পারে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ

'যে-বান্দা অন্যকে দয়া করবে না, সে-ও দয়া পাবে না।'[৩]

এক হাদীছে নবীজি ইরশাদ করেছেন–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ وَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

'সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার। আর আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ মাখলুক সে, যে আল্লাহর মাখলুকের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করে।'[৪]

---

১. আত-তায়িফুর রাজিয়্যাহ ফিদ্দুরূস : পৃ. ১৪৪
২. মাউসূআতুর রদ্দ আলাল মাযাহিব ৪৮/৩৪৫
৩. রিয়াজুস সালিহীন ১/১৭১
৪. শু'আবুল ঈমান ২/৪৩

একবার আমাদের প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজার হয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। নবীজি দোকানদারদের দেখে বললেন–

زِنْ وَارْجِحْ

'পরিমাপ করো এবং পাল্লা ভারী করে ঝুঁকিয়ে দাও।'[১]

এটি একটি মূলনীতি সমগ্র মানবজাতির জন্য। যেন শিক্ষা দেওয়া হলো, জীবনভর তোমার লোকসান আর তোমার ক্ষতিকে বরদাশত করো। সহ্য করো। অন্যের উপকার করতে থাকো। তোমার যদি কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, তবু অন্যকে উপকার করো। এক হাদীছে তো বর্ণিত হয়েছে, বিরোধকারী আত্মীয়কে সাহায্য করা এবং তাদের জন্য খরচ করা আরও বেশি ছাওয়াবের কাজ।

আত্মীয়তা রক্ষার উপকারিতা

আত্মীয়তা রক্ষাকারী এবং প্রেম ভালোবাসার সঙ্গে সকল আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক জুড়নেওয়ালা বান্দার মর্যাদা ও ফায়দা সম্পর্কে হাদীছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে।

মহব্বত বৃদ্ধি

আত্মীয়তা রক্ষায় মহব্বত বৃদ্ধি পায়। যেব্যক্তি সর্বদা তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে, সময়-সময়ে তাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে, সাহায্যের হাত বাড়ায়, তার সাথে তার এই আত্মীয়দের মহব্বত গভীর থেকে গভীরতর এবং গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। সবাই তাকে ভালোবাসে।

সম্পদ বৃদ্ধি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন বান্দার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, বরকত হয়। যতটুকু সম্পদই তার থাকে, সেটুকুই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। যে তার আত্মীয়দের হাদিয়া দেয়, উপহার দেয়, আত্মীয়দের জন্য খরচ করে, তার সম্পদ উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পায়। যে তার আত্মীয়দের বেশি-বেশি দাওয়াত দেবে, দেখবেন তার সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেকে সম্পদ স্বল্পতার অভিযোগ তোলে। আপনি আপনার আত্মীয়স্বজনের

---

১. সুনানে তিরমিযি ৫/১২৫

জন্য খরচ করতে শুরু করুন। দেখবেন কীভাবে আল্লাহ আপনার সম্পদ বাড়িয়ে দেন।

হায়াত বৃদ্ধি

আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে হায়াতও বৃদ্ধি পায়। তিরমিযি শরীফে বর্ণিত আছে, এমন বান্দার মৃত্যুকে আল্লাহ দূরে হটিয়ে দেন। তার বয়স ও হায়াত বাড়িয়ে দেন। এটি মূলত সেই সম্পদের বিনিময়, যা সে আত্মীয়দের জন্য খরচ করেছে।

রিযিক প্রশস্ত হয়

এমন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা সুপ্রশস্ত রিযিক দান করেন। এক্ষেত্রে এমন হবে যে, তার রিযিকে বরকত হবে। দেখতে অল্প দেখা যাবে; কিন্তু অল্পতে কাজ হবে অনেক। তার সর্বপ্রকার টেনশন ও দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

অপমৃত্যু থেকে হেফাযত

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে খারাপভাবে মৃত্যু বরণ করা থেকে হেফাযত করেন, রক্ষা করেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কত বড় অনুগ্রহ আমাদের ওপর! আমাদের জন্য কত সুন্দর নিয়ম করে দিয়েছেন যে, বান্দা যদি আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, তাহলে আল্লাহ তাকে অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করেন। এটি আত্মীয়তার রক্ষার কত বড় নেয়ামত একটু চিন্তা করুন। আজকের যুগে কত মানুষের মৃত্যু কত নির্মমভাবে হয়। অপমৃত্যু কেউই কামনা করে না। আবার হাদীছে একথাও বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও মুসিবত দূর হয়ে যায়।

আপনারও নিশ্চয় বহুবারের অভিজ্ঞতা আছে যে, চলতি পথে বহুবার একসিডেন্ট হতে গিয়েও অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেছেন। কেন? নিশ্চয় কোনো ভালো কাজের কারণে আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সদকা যেমন বিপদাপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তেমনি আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক মানুষকে মুসিবত থেকে হেফাযত করে।

তাই বলি, ভাই! আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আল্লাহ আপনাকে অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করবেন।

গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায়

যেব্যক্তি আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহও মাফ করে দেবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'নিশ্চয় নেক আমলসমূহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'[১]

তাই আমাদের উচিত বেশি-বেশি নেক কাজ করা।

আমল কবুল হয়

অল্লাহ এমন বান্দার আমল কবুল করে নেন। মানুষ তো আল্লাহর শান অনুযায়ী ইবাদত করতে অক্ষম। নানা রকম ভ্রান্তি জড়ানো ইবাদত তো কবুল না হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ সেই ইবাদত কবুল করে নেবেন আত্মীয়তা রক্ষা ও স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার বিনিময়ে।

আরে ভাই! বাজারের একটি পণ্য আপনার পছন্দ না হলে তো আপনি সেটি ক্রয় করেন না। তেমনি আমাদের একাগ্রতাহীন সেজদা, অনাগ্রহের নামায রিয়াসম্বলিত ইবাদাত কেয়ামতের দিন আল্লাহও তো পছন্দ করবেন না। বলবেন, এমন আমলের জরুরত আমার নেই। তখন আমাদের অবস্থা কেমন হবে! দেখুন, গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়ার আলাদা ব্যাপার। আবার নেক কাজ সম্পাদন করার পরও তা কবুল না হওয়ার গ্লানি আলাদা ব্যাপার। আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা নেক আমলগুলো কবুল করে নেন।

জান্নাতের হকদার হওয়া

নবীজি বলেছেন, যে-মানুষ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন, জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেবেন।

রহমত নাযিল হবে

যে-জাতি আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই জাতির ওপর রহমত নাযিল করবেন। যেব্যক্তি উত্তম ব্যবহার করবে, তার

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

কোনো ভালো কাজের কারণে আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সদকা যেমন বিপদাপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে, তেমনি আত্মীয়তা ও সুসম্পর্ক মানুষকে মুসিবত থেকে হেফাযত করে।

তাই বলি, ভাই! আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব ও সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। আল্লাহ আপনাকে অপমৃত্যু থেকে হেফাযত করবেন।

গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায়

যেব্যক্তি আত্মীয়দের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহও মাফ করে দেবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

'নিশ্চয় নেক আমলসমূহ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।'[১]

তাই আমাদের উচিত বেশি-বেশি নেক কাজ করা।

আমল কবুল হয়

অল্লাহ এমন বান্দার আমল কবুল করে নেন। মানুষ তো আল্লাহর শান অনুযায়ী ইবাদত করতে অক্ষম। নানা রকম ভ্রান্তি জড়ানো ইবাদত তো কবুল না হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু আল্লাহ সেই ইবাদত কবুল করে নেবেন আত্মীয়তা রক্ষা ও স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার বিনিময়ে।

আরে ভাই! বাজারের একটি পণ্য আপনার পছন্দ না হলে তো আপনি সেটি ক্রয় করেন না। তেমনি আমাদের একাগ্রতাহীন সেজদা, অনাগ্রহের নামায রিয়াসম্বলিত ইবাদাত কেয়ামতের দিন আল্লাহও তো পছন্দ করবেন না। বলবেন, এমন আমলের জরুরত আমার নেই। তখন আমাদের অবস্থা কেমন হবে! দেখুন, গুনাহের কারণে লজ্জিত হওয়ার আলাদা ব্যাপার। আবার নেক কাজ সম্পাদন করার পরও তা কবুল না হওয়ার গ্লানি আলাদা ব্যাপার। আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা নেক আমলগুলো কবুল করে নেন।

জান্নাতের হকদার হওয়া

---

১. সূরা হূদ : আয়াত ১১৪

নবীজি বলেছেন, যে-মানুষ আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন, জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দেবেন।

রহমত নাযিল হবে

যে-জাতি আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই জাতির ওপর রহমত নাযিল করবেন। যেব্যক্তি উত্তম ব্যবহার করবে, তার ওপরও আল্লাহ রহমত নাযিল করবেন। আর যদি কোনো গোত্র এই মহান গুণের অধিকারী হয়, সেই গোত্রের ওপরও আল্লাহ রহমত নাযিল করেন।

আল্লাহু আকবার! আমাদের উচিত সর্বদাই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা।

বরকত নাযিল হয়

একইভাবে এমন গুণের কারণে অবারিত বরকতও নাযিল হয়। হাদীছে বর্ণিত আছে, যে-দেশে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষাকারী বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ সেই দেশের ফলফলাদি ও শস্যের মধ্যে বরকত দান করেন। ফলে ফল-ফসল বেশি উৎপন্ন হয় এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়

আত্মীয়তা রক্ষা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার আরেকটি বড় ধরনের ফায়দা ও উপকারিতা হচ্ছে, হাদীছ শরীফে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আত্মীয়তা রক্ষাকারী বান্দার সঙ্গে খোদ আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে সম্পর্ক স্থাপন করেন।

শরীয়তের একটি বিধান হলো–

جَزَاءٌ مِّنْ جِنْسِ الْعَمَلِ

'যেমন আমল তেমন প্রতিদান।'

তাই সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে সম্পর্ক করেন। আবার যেব্যক্তি তার আত্মীয়স্বজনের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলে, আল্লাহ তা'আলাও ওই বান্দার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেন।

যেব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করে, নামায পড়া আর দীনের অন্যসব কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে অপছন্দ করেন।

আত্মীয়তা ছিন্নকারী, আল্লাহর সামনে সেদিন ফেরেশতারা তার আমল উপস্থাপনই করেন না।

আল্লাহর রহমত হতে মাহরুমি

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে, সে যেন আমাদের মজলিসে না বসে। এক যুবক উঠে ঘরে গেল। সে তার খালার মনে কষ্ট দিয়েছিল। তার সঙ্গে কথা বলছিল না। গিয়ে খালার কাছে মাফ চেয়ে নিল এবং ফিরে এসে মজলিসে বসল। ফিরতে দেখে নবীজি তাকে বললেন, আমি কথাটা এজন্য বলেছি যে, যে-মজলিসে আত্মীয়তা ছিন্নকারী বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ তা'আলা সেই মজলিসে রহমত বর্ষণ করেন না।

আজ আমরা কি আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছি? আমাদের জীবনে বরকত আসবে কীভাবে? আমাদের জীবনে রহমত আসবে কী করে? আমাদের রিযিকের সংকীর্ণতা কী করে দূর হবে? আজ আমরা বরকতের অভিযোগ তুলি। কিন্তু যে-পথ ও পদ্ধতিতে চললে বরকত আসবে, তা তো আমরা মান্য করছি না।

তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন রাখা নিষেধ

মানুষের সম্পর্ক সবার সাথে এক হয় না। সবার সাথে মনের মিল এক রকমও হয় না। কারও রাগ বেশি হওয়ার কারণে তার দিকে হৃদয় যায় না। তাই শরীয়ত বলেছে, একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করো না। অন্তত সালাম-কলাম করো। রাগ করে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখাকে, সম্পর্ক ছিন্ন রাখাকে শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং শরীয়ত বলেছে, রাগ ছুড়ে ফেলো এবং পরস্পরকে মাফ করে দাও।

পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও

দেখুন, এটি আমাদের শরীয়তের সৌন্দর্য যে, পরস্পরের ভালোবাসাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে শরীয়ত। তাই আমরা যদি ইসলামের এই শিক্ষার ওপর আমল করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবন বড় সুন্দর ও উপভোগ্য হয়ে যাবে। আমাদের জীবন হবে বড়ই আনন্দময়। ইসলাম ভালোবাসা বণ্টনকারী দীন। আমরা যদি ইসলাম অনুসারে জীবন যাপন করি, তাহলে দুনিয়ায় বসে আমরা জান্নাতের স্বাদ পেতে শুরু করব। পরস্পরে হিতকামী হয়ে যাব। প্রত্যেকেই অন্যকে নিজের ওপর প্রাধান্য দানকারী হতে পারব। একে অন্যের ভাই হয়ে যেতে পারব।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

'হে আল্লাহর বান্দারা! ভাই-ভাই হয়ে জীবন যাপন করো।'[১]

নিজের হিসাব নিন

শরীয়ত তো নির্দেশ দিয়েই রেখেছে–

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ

'আত্মীয়তা রক্ষা করো।'

وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

'যে তোমার ওপর জুলুম করেছে, তুমি তাকে মাফ করে দাও।'

أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

'যে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে, তার সঙ্গে তুমি সুন্দর ব্যবহার করো।'

এই হাদীছটি সামনে রেখে আজ নিজের হিসাব নিন। নিজেকে প্রশ্ন করুন, নির্দেশনাগুলো আপনি কতটুকু মান্য করছেন? যদি বলে, হ্যাঁ মান্য করতে পারছি, তাহলে শুকরিয়া আদায় করুন এবং এর ওপর অটল থাকার চেষ্টা করুন। আর যদি বলে, না; মান্য করতে পারছি না, তাহলে আজই তাওবা করুন এবং সত্য ও সুন্দরের পথে ফিরে আসুন।

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ুন

যাদের ব্যাপারে আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা আছে, অথচ লোকগুলো ঈমানওয়ালা, তাহলে আমরা আমাদের ঘৃণাকে খতম করে নেব। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করব। আমরা আমাদের আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করব। হাদীছে আছে, যে বান্দার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করবে, আল্লাহ তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবেন। হাদীছে আছে, আত্মীয়তা রক্ষা রহমতের একটি শাখা। যে একে ভেঙে দেবে, আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

---

১. মুসনাদে আহমাদ ১৯/৪৩০

কুধারণার বিষ

'অন্যের প্রতি বদগুমানি তথা খারাপ ধারণা কেন সৃষ্টি হয়। একটি মূলনীতি হৃদয়ে গেঁথে নিন। খারাপ ধারণা ওই সময়ই আসবে, যখন আপনি যিকির করবেন না বা যখন আপনি শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। যে রাবেতা ও বন্ধন তৈরি করে রাখবে, শায়খের সাথে যিকির করবে তার দ্বারা বদগুমানি তথা খারাপ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। যার মাঝেই অন্যের প্রতি খারাপ ধারণার প্রবণতা আছে, বুঝতে হবে তার আত্মায় কালিমা আছে। তার হৃদয়ে মলিনতা আছে। তাই আত্মার পরিশুদ্ধি চাই। আত্মা পরিশুদ্ধ হলে বদগুমানি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।'

কুধারণার বিষ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ـ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ظَنُّوْا بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ خَيْرًا

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

যিকিরের অবস্থান

কুরআনুল কারীমে আমাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আমরা যেন বেশি-বেশি আল্লাহকে স্মরণ করি।

ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করো।'[১]

যিকিরের অবস্থান মানবের হৃদয়ে। মানুষের আত্মায়। সেই যিকির প্রকাশ পায় মুখে আর স্মরণটা হয় হৃদয়ে। আপনি যখন চাকরির সুবাদে দূরে থাকবেন, তখন আপনার চিঠিতে-বার্তায় বলেন, বাবা! তোমাকে আমার হৃদয় বারবার স্মরণ করে। বলেন না, বাবা! তোমাকে আমার মুখ বারবার স্মরণ করে। তো মা যে লেখেন, তোমাকে আমার হৃদয় স্মরণ করে, এর দ্বারা বোঝা যায়, স্মরণের স্থানটা মানুষের হৃদয়ে। তাই আল্লাহর স্মরণও হবে এই হৃদয়েই, এই আত্মায়ই, এই কলবেই।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৪১

কলবের যিকিরের ফজিলত

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে-যিকির ফেরেশতারা শুনতে পায় তথা মুখে উচ্চারিত যিকির, তার চেয়ে যে-যিকির তারা শুনতে পায় না, তথা হৃদয়ে ভাবিত যিকির ৭০ গুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ। প্রকাশ্য ও উচ্চৈঃস্বরের যিকির এবং গোপন তথা নিম্নস্বরের যিকির উভয়টাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মনে-মনে যে যিকির অর্থাৎ– অপ্রকাশ্য, গোপন ও নিম্নস্বরের যিকিরকে হাদীছের ভাষায় 'যিকরে সিররী', 'যিকরে খামেল' ও 'যিকরে খফী' বলা হয়। সবগুলোই মনে-মনে যিকির করাকে বোঝায়। একেই অন্য শব্দে রুজু ইলাল্লাহ, ইনাবাত ইলাল্লাহ, ও তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ বা আল্লাহতে সমর্পিত ও প্রত্যাবর্তিত বলা হয়।

'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ' সৃষ্টির পথ ও পদ্ধতি

তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ অর্জনের তরে সালেকদের আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। যেমন– কুরআন শিখতে আসা ছাত্রকে আগে নূরানী কায়দা পড়ানো হয়। যদি কেউ বলে, নূরানী কায়দা পড়ার কথা তো কোনো হাদীছে পাওয়া যায় না, তাহলে তাকে বলতে হবে, জনাব বেকুব সাহেব! ছোট বাচ্চাকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দেওয়ার একটি মাধ্যম হলো এই নূরানী কায়দার পাঠ। যেন সে সহজে হরফ উচ্চারণের নিয়মনীতি আয়ত্ত করতে পারে। কায়দা পড়লেই তো পরে তার জন্য কুরআন পাঠ সহজ হয়ে যাবে।

তেমনিভাবে এই যে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির, এটিও মানবের কলবের মধ্যে তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যম। আর যখন তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তাকে ফিকির (আল্লাহ ভাবনা) বলা হয়। এটি যিকির অপেক্ষা উত্তম।

তেমনিভাবে মানবের হৃদয় যখন মানবেরই মাঝে বন্দি থাকে, তখন এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে মাশায়েখে কেরাম আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরের আমলে মশগুল করে দেন। ফলে বান্দার দিলে আল্লাহর ভাবনা বসে যায়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির দ্বারা তার হৃদয়কে ধৌত করা হয়। ফলে তখন অন্য কোনো নামের যিকিরের জরুরত থাকে না। ফলে দশম সবক থেকে ৩৫ তম সবক পর্যন্ত যতগুলো মোরাকাবা হয়, কোনোটাতেই নামের যিকির নেই। তো শুরুতে যে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করানো হলো এটা ওষুধের সমপর্যায়ে, যেন প্রাথমিকদের জন্য তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ সহজ হয়ে যায়।

যাতি ও সিফাতি তাজাল্লির মাঝে পার্থক্য

একথাটাও মনে রাখবেন যে, যে-মানুষ সিফাতি নাম যেমন সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি নামের যিকির বেশি করবে, সে ফানার মাকামে আল্লাহকে পেয়ে যাবে। কারণ, তার হৃদয়ে সিফাতি নামসমূহের আলোচনা ছিল। তাই সামান্যের জন্য সে আল্লাহর যাতের দিদার পাবে। তারপর তার ওপর সিফাতের পর্দা এসে যাবে। তখন এই সালেক আল্লাহকে সিফাতের পর্দায় দেখতে পায়। যে সালেক শুধু আল্লাহর যিকিরকারী হবে, তার উন্মুক্ত নৈকট্য নসিব হবে। যখন তার দিদার নসিব হবে, তখন আর সিফাতের পর্দা আসবে না।

সেজন্য আমাদের সেলাসেলায়ে আলিয়া নকশবন্দিয়ার বড় এক বুযুর্গ ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.) একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, যারা সিফাতি নামের যিকির করে। আর যখন আল্লাহর তাজাল্লি তাদের নসিব হয়, তখন তাজাল্লিয়ে যাতী বারকীও নসিব হয়। অর্থাৎ– তাজাল্লিয়ে যাতী বিজলির চমকের মতো একবার চমক দেখিয়ে নেকাব পরে নিল। কিন্তু যারা যাতি নামের যিকির করে, তাদের 'ওসলে উরয়ানী' নসিব হয়। উন্মুক্ত দর্শনের সৌভাগ্য তারা পেয়ে যায়। যেন একবার চেহারা থেকে নেকাব সরিয়ে নেয়া হয়েছে তো হয়েছেই। এবার সর্বদার জন্য সালেকের নসিব হতে থাকবে চেহারার দর্শন, রূপের দিদার। একে 'তাজাল্লিয়ে যাতী দায়েমী' বলা হয়। সাধারণ মানুষেরা তো মনে করে, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহর যিকির কেন করা হয় না। বলুন, এই মারেফাতী কথা আমি তাদের কী করে বোঝাব? এটা তো বুঝবে ওইসব লোক, যারা আপন চক্ষু দ্বারা রব্বে কারীমের দিদার লাভ করেছে। তারা বুঝতে পারে, আসমা তথা নাম আর সিফাত তথা গুণাবলির যে-পর্দা ওপরে আসে, সেই পর্দা মানবের জন্যে কী পরিমাণ অস্থিরতার কারণ হয়।

আল্লাহ-আল্লাহ যিকির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত

কুরআনের বাণী–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

'আপনি বলুন, আল্লাহ। তারপর তাদের আপন শান্তিতে ক্রীড়াকৌতুকে ছেড়ে দিন।'[১]

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৭২

হাদীছে আছে–

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَايُقَالَ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ

'সেসময় পর্যন্ত কেয়ামত সংগঠিত হবে না, যে সময় পর্যন্ত জমিনের ওপর আল্লাহ-আল্লাহ বলা হবে।'[১]

এখানে আল্লাহ-আল্লাহ শব্দ দুবার এসেছে। যদি হাদীছটিতে শুধু একবার আল্লাহ শব্দ ব্যবহৃত হতো, তাহলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু হাদীছে তো আল্লাহ-আল্লাহ শব্দ দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। এখন যদি কেউ বারবার দুবার-দুবার করে আল্লাহ-আল্লাহ, আল্লাহ-আল্লাহ বলে, তাহলে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কী আছে? নবীজির যবান থেকে নিঃসৃত শব্দ। তাই তা নিয়ে ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই যে, আল্লাহ-আল্লাহ কেন বলা হবে?

একটি প্রশ্নের জবাব

অনেকে বলে, এটি কেমন কথা যে, নাম নিতে থাকবে; অথচ আর কিছু বলা হবে না? এটা তো বেয়াদবি।

আমি তাদের বলব, ভাই! আল্লাহকে নিজেদের মতো করে ভাববেন না।

اَلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَلٰى نَفْسِهٖ

'মানুষ অন্যকে নিজের ওপর অনুমান করে।'

কোনো মানুষকে যদি বারবার নাম ধরে-ধরে ডাকা হয় আর কথা যদি না বলা হয়, তাহলে মানুষটা কিন্তু চরমভাবে রেগে যায়। দেখুন ভাই! এটা বান্দা ও মানুষের বিষয়। বান্দাও আল্লাহর বিষয় ভিন্ন। এখানে তো ব্যাপার মহব্বত ও ভালোবাসার। বান্দা যখন প্রাণভরা মহব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহ বলে, আল্লাহর প্রেমের সাগর তখন দারুণভাবে উথলে ওঠে।

দেখুন, একটি ছোট শিশু, তার মাকে কীভাবে ডাকে? মা-মা। এভাবেই তো নয় যে, হে আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মা! হে আমার সুন্দর ও ভালো মা! এভাবে গুণাগুণ বলে-বলে তো কোনো শিশু তার মাকে ডাকে না। কিন্তু মায়ের হৃদয় হু-হু করে ওঠে। ছুটে আসেন সন্তানের কাছে। যত কাজই থাকুক সব ছেড়ে সন্তানের কাছে চলে আসেন। বুকে টেনে নেন। তেমনিভাবে যখন আল্লাহর বান্দা আল্লাহকে 'আল্লাহ!' বলে ডাকে, তখন

---

১. সুনানে তিরমিযি ৩/৩১৩

আল্লাহর প্রেমের সাগরে ঢেউ শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ মুতাওজ্জুহ হন তার বান্দার দিকে। বান্দাকে তিনি রহমতের কোলে টেনে নেন।

আল্লাহ-আল্লাহ বলার মজা

আমরা তো এখনও আল্লাহ-আল্লাহ বলার মজা-ই পাইনি। সে-কারণেই আমরা প্রশ্ন তুলি, আল্লাহ-আল্লাহ জপে লাভ কী? ভাই! যারা আল্লাহ নাম জপে মজা পেয়েছেন, তাদের মুখে তো মিষ্টতা এসে যায়। দেখুন, মিষ্টতা একটি শব্দ। আর টক একটি শব্দ। মিষ্টতা আর টক শব্দ উচ্চারণ করলে মুখে পানি এসে যায়। তাহলে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করলে মজা আসবে না কেন? আর্শ্চয কথা! আচারের নাম নিতে মুখ পানিতে ভরে যায় আর আল্লাহর নাম কি এতটুকুও প্রভাব সৃষ্টি করে না? আল্লাহ নাম উচ্চারণে হৃদয় শীতল হবে না কেন?

আল্লাহ শব্দের প্রভাব

খাজা আবুল হাসান খিরকানি নামে এক বুযুর্গ অতীত হয়েছেন। তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আবু আলী ইবনে সিনা তার সাহচর্যে এলেন। হযরত তখন ইসমে যাতের যিকিরের ফাযায়েল বলছিলেন। এত-এত ফাযায়েল তিনি বললেন যে, আবু আলী সিনা হতবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, একটিমাত্র নাম যিকির করলে এতসব ফায়দা ও ফাযায়েল?

হযরত বড় কঠিনভাবে তার জবাব দিলেন। বললেন, হে গাধা! তুই এর কী বুঝবি? এত বড় ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীকে যখন ভরা মাহফিলে হযরত আবুল হাসান খিরকানি (রহ.) গাধা বললেন! শুনে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অবস্থা পবির্তন হয়ে গেল। এবার হযরত জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা এভাবে ভিন্ন রকম হয়ে গেল কেন? ইবনে সিনা বললেন, আপনি তো রাগ হওয়ার শব্দই ব্যবহার করেছেন। এবার হযরত বললেন, আমি গাধা শব্দটা বললাম আর তাতেই তোমার অবস্থা এমন বিবর্ণ হয়ে গেল! আল্লাহ শব্দ উচ্চারণে কি তোমার ওই সকল ফায়দা ও ফজিলত অর্জিত হয়ে তোমার অবস্থা পরিবর্তন হতে পারবে না? গাধা শব্দ শুনে তোমার ওপর-নিচ সর্বত্রই পরিবর্তন এসে গেল। আল্লাহ শব্দ শুনে কি তোমার মাঝে কোনোরূপ পরিবর্তন আসতে পারবে না?

আসল কথা হলো, আমরা আল্লাহর যিকিরের মজা সম্পর্কে অনবিজ্ঞ ও অজ্ঞ। এ-কারণেই আমাদের হৃদয়ে এসব প্রশ্ন জাগে।

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کردے
کہ تیرے بحر کی موج میں اضطراب نہیں

আল্লাহ তোমাকে কোনো তুফান সম্পর্কে অবহিত করে দিন। কারণ, তোমার সাগরের মৌজে নেই কোনো শক্তি-প্রতাপ।

দেখুন, এক কিশোর একটা কিশোরীকে ভালোবাসে। তাদের একজনের সামনে যদি শুধু আরেকজনের নামটা উচ্চারণ করা হয়, তাহলে কেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তারা! দুনিয়ার সামান্য সম্পর্কের কারণে মানুষ এমন হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কারণে কেমন হবে?

অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা কখন সৃষ্টি হয়

অন্যের প্রতি বদগুমানি তথা খারাপ ধারণা কেন সৃষ্টি হয়। একটি মূলনীতি হৃদয়ে গেঁথে নিন। খারাপ ধারণা ওই সময়ই আসবে, যখন আপনি যিকির করবেন না বা যখন আপনি শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। যে রাবেতা ও বন্ধন তৈরি করে রাখবে, শায়খের সাথে যিকির করবে তার দ্বারা বদগুমানি তথা খারাপ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। যার মাঝেই অন্যের প্রতি খারাপ ধারণার প্রবণতা আছে, বুঝতে হবে তার আত্মায় কালিমা আছে। তার হৃদয়ে মলিনতা আছে। তাই আত্মার পরিশুদ্ধি চাই। আত্মা পরিশুদ্ধ হলে বদগুমানি এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।

কাকে বলে বদগুমানি

অন্যের ব্যাপারে খারাপ কিছু চিন্তা করা ও অন্যকে খারাপ মনে করাকে বলা হয় বদগুমানি। শরীয়ত বদগুমানিকে হারাম করেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ

'তোমরা অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কুধারণা হলো সবচেয়ে মারাত্মক মিথ্যাচার।'[১]

ঈমানদারদের ব্যাপারে বদগুমানি করা কবীরা গুনাহ।

---

১. আবুদাউদ : পৃ. ৪২৬

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত ইরশাদ করেছেন–

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

'তারা শুধুই ধারণার অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মোকাবেলায় ধারণা কিছুই করতে পারে না।'

এজন্যই তো মানবতার দিশারী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ظَنُّوا بِالْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا

'তোমরা ঈমানদারদের ব্যাপারে ভালো ধারণা পোষণ করো– বদগুমানি করো না।'[১]

দেখুন, যেহেতু এখানে মুমিনদের ব্যাপারে ভালো ধারণার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তো কেয়ামতের দিন মানুষকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, অমুকের ব্যাপারে কেন তুমি বদগুমানি করেছ?

কী প্রয়োজন এভাবে বদগুমানি করে কেয়ামতের দিন পাকড়াও হওয়ার? আপনার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি তার ব্যাপারে সুধারণা রাখেন, তাহলে তো আপনি ছাওয়াব পাবেন। কত মজার ব্যাপার! শুধু নেক গুমান তথা ভালো ধারণা রাখার কারণেই ছাওয়াব! আর বদগুমানি করলে কেয়ামতের দিন পাকড়াও! বদগুমানি ও অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা এমন একটি রোগ, তাওবা করেও যার প্রতিকার পাওয়া যায় না। এক লমহায় বান্দা তার সারা জীবনের সমস্ত আমল ধ্বংস করে দেয় শুধু এই বদগুমানিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে। সেজন্য ঈমানদারদের ব্যাপারে বদগুমানি রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

'নিশ্চয় কিছু-কিছু ধারণা গুনাহ।'[২]

বদগুমানির চিকিৎসা

আমাদের মাশায়েখে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো বান্দা অন্য কোনো মুসলমানের ব্যাপারে কোনো বিষয়ে বদগুমানির শিকার হয়, তাহলে তার

---

১. আল-মু'জামুল কাবীর : পৃ. ২৩৯
২. সূরা হুজুরাত : আয়াত ১২

উচিত বিষয়টির একটি ব্যাখ্যাগত সঠিক দিক চিন্তা করা। এমনকি শতকরা ৯৯ ভাগও যদি খারাপ প্রকাশিত হয়, তবুও একটি নেকের দিকে তাকিয়েই ভালো ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে। তবুও মনে-মনে বদগুমানি করবে না আমাদের সালফে সালেহীনের অবস্থা তো বড়ই আশ্চর্যজনক ছিল যে, কোনোভাবেই তারা অন্তরের বদগুমানিকে স্থান দিতেন না।

হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত

একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত নদী পার হচ্ছিলেন হযরত যুননূন মিসরী (রহ.)। পাশেই আরেকটা নৌকায় বেশ কটা যুবক-যুবতি আরোহী ছিল। তারা হইহুল্লোড় করছিল। হযরতের নৌকায় আরও যারা ছিল, সকলে ওদের এই ব্যাপারটা নিয়ে বদগুমানি করল। আরে! এরা মজা উড়ানোর জন্য এখানে দরিয়ায় এসেছে। লোকেরা রাগ হয়ে হযরতকে বলল, হযরত! এই বেহায়া-বদমাশদের বদ দু'আ করুন আল্লাহ যেন ওদের নদীতে ডুবিয়ে দেন।

বাস্তব ঘটনা দেখে হযরত যুননূন মিসরী হাত তুললেন। কিন্তু বদদু'আর পরিবর্তে তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল দু'আর শব্দমালা, হে আল্লাহ! তাদের যেমন দুনিয়ার আনন্দ দান করেছেন, তেমনি আখেরাতের আনন্দও তাদের দান করুন। ফল এই দাঁড়াল যে, ওরা সকলেই তাওবা করার তাওফীক প্রাপ্ত হলো। আর আখেরাতের আনন্দ তো তখনই মিলে, যখন মানুষটি দুনিয়ায় তাওবা করে যেতে পারে। কত চমৎকার কথা!

হযরত আলী হাজবিরির দৃষ্টান্ত

তিনিও একবার নদীতে সফর করছিলেন। সেদিন তিনি মাথা মুণ্ডন করেছিলেন। সাধারণ মানুষজন ও কিছু যুবক কিশতিতে আরোহী ছিল। যুবক ছেলেগুলোর একজন এসে তাঁর মুণ্ডিত মাথায় হাত দিয়ে বলল, ওহ! দারুণ মোলায়েম তো। এটা দেখে আরও কিছু যুবক এসে তার মাথা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হাসি-তামাশা শুরু করে দিল। কিন্তু হযরত তো মোরাকাবায় মশগুল ছিলেন। তুমুল হাসাহাসি করতে লাগল। ছেলেগুলোর একজন তার মাথায় হাত দেয়, আরেকজন টোকা মারে। এভাবে ওরা হযরতের মুণ্ডিত মাথাটা নিয়ে তামাশা করছিল। এমনকি নৌকার সমস্ত লোকেরা এই বেয়াদবিতে শামিল হয়ে গেল। হযরত চুপচাপ বসে থাকলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরতের মনে এলহাম করলেন, হে আমার প্রিয় বান্দা! তুমি এখন এদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করলেই তা কবুল করা হবে। নৌকাটা ডুবিয়ে সব ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

কিন্তু হযরত বললেন, হে আল্লাহ! আপনি বরং তাদের হৃদয়-কিশতিটা উল্টিয়ে দিন। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন। বর্ণিত আছে, ওই কিশতিতে যত লোক ছিল, সকলেই সময়ের অলি-বুযুর্গ হয়ে গেল। এটিই হচ্ছে সুধারণা। একেই বলে তাছাওউফ। আজ তো আমরা তাছাওউফের চর্চাও করি আবার তুমুলভাবে বদগুমানিও করি ।

আত্মার ওপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ

ভাইয়েরা! অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবেন না। নিজের দিকে তাকান। নিজের অবস্থাটা দেখুন। ঈমানদার ও আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে বদগুমানি বন্ধ করুন। আজ আত্মাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে শয়তান। শয়তান যখন ইচ্ছে মনে বদগুমানি উদিত করছে। আমি আবারও বলছি, কোনো ঈমানদারের ব্যাপারে বদগুমানি করবেন না। এমনকি কাউকে কবীরা গুনাহে মগ্ন দেখলেও বদগুমানি করবেন না। পারলে চুপ থাকো; তবুও কারও ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখবেন না।

গুনাহকে ঘৃণা করুন– গুনাহগারকে নয়

একটি মূলনীতি ভালো করে বুঝে নিন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কাঁচা পিঁয়াজ খাইও না। কারণ, আমি এর গন্ধ অপছন্দ করি। মুহাদ্দিছীনে কেরাম এখান থেকে সূক্ষ বিধান বের করেছেন যে, নবীজি তো এখানে বলেননি আমি পিঁয়াজ অপছন্দ করি। বরং বলেছেন, আমি এর গন্ধ অপছন্দ করি। এর দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের উচিত গুনাহকে ঘৃণা করা– গুনাহগারকে নয়।

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے

مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

নেশা খেলে সবারই তো আসে মাতালতা। তবে মজা তো তখনই অনুভূত হয়, যখন সাকী নিয়ন্ত্রণ করে নেয় নেশার মাতালতা।

সুধারণা এমনই হওয়া চাই

আরে ভাই! সবাই তো বদগুমানি রাখতে পারে। কিন্তু গুনাহগারদের প্রতি সুধারণা রাখা বুযুর্গানে দীন দ্বারাই সম্ভব হয়। কারণ, এটি আল্লাহর সিফাত। বান্দা গুনাহ করে। তবু আল্লাহ তার ওপর নারাজ হয়ে যান না।

দুনিয়াতে মা-ই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সন্তান অন্যায় করা সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহর অলিরা কাউকে তাড়িয়ে দেন না। এমনকি আয়নায়ও দেখান না, এই দেখো ভাই! তোমার চেহারাটা এমন।

মুমিনের সজাগ দৃষ্টি

হযরত মুরশিদে আলম (রহ.)-এর নিকট একজন সাধারণ মানুষ আগমন করলে কেউ একজন বলল, হযরত! লোকটি দুনিয়াবি উদ্দেশ্য এসেছে। শুনে হযরত বললেন, ওই পীরের ওপর লানত, যার কাছে তার মুরিদ এসেছে অথচ পীরের খবর নেই মুরিদ কী জন্য এসেছে। আরে ভাই! পুলিশও তো পাঁচজন মানুষকে চলতে দেখলে বুঝে যায় তাদের মধ্যে কোনজন অপরাধী। আর যে-বান্দা আল্লাহর হুকুম মতো রাতদিন জীবন পরিচালনা করেন, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা কী পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন চিন্তা করুন। হাদীছ শরীফে তো বর্ণিত হয়েছে–

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ

'তোমরা মুমিনদের সজাগ দৃষ্টি ও সচেতনতাকে ভয় করো। কারণ, তারা আল্লাহপ্রদত্ত নূর দিয়ে অবলোকন করে।'[১]

হযরত জুনাইদ বাগদাদি (রহ.)-এর সজাগ দৃষ্টি

একবার হযরত জুনাইদ বাগদাদি উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় মাথায় পাগড়িবাঁধা ও গায়ে জুব্বাপরিহিত সুদর্শন এক যুবক এল। বলল, اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ এই হাদীছটির অর্থ কী? হযরত তার মাথা তুলে তার মুখটা এক নজর দেখলেন এবং বললেন, হে খ্রিষ্টানের সন্তান! এই হাদীছের অর্থ হলো, তোমার হেদায়েতের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং কালেমা পড়ে তুমি মুসলমান হয়ে যাও।

শুনে তো যুবক ঘেমে গেল। বলতে লাগল, হযরত! আমি কালেমা পড়ছি। আমি ইসলাম গ্রহণ করছি। আমি বাস্তবেই খ্রিষ্টান। কিন্তু এসেছি মুসলমানের বেশ ধরে। উদ্দেশ্য ছিল, আপনার কাছে হাদীছের মর্ম জিজ্ঞেস করব। পরে বলব, আমি মুসলমান নই–খ্রিষ্টান; কিন্তু আপনি বুঝতে পারেননি। আপনার কাছে তো ফেরাসাত নেই।

---

১. তিরমিযি, হাদীছ নং ৩০৫২

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত

হযরত মুহাজিরে মাক্কি (রহ.)-এর দুই মুরীদের মধ্যে ঝগড়া ছিল। উভয়ে ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের মুরীদ। তবে একজনের হৃদয়ে মহব্বত ছিল স্বাভাবিক। যার হৃদয়ে মহব্বত বেশি ছিল, সে শায়খের নিকট এলে শায়খ তার সাথে মহব্বতসুলভ আচরণ করতেন। দ্বিতীয়জন বিষয়টা দেখে হিংসা করত, কেন হযরত তাকে এত মহব্বত করেন?

আল্লাহর শান দেখুন, একবার বেশি মহব্বতকারী লোকটি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেল। এবার দ্বিতীয়জন বলতে লাগল, আমি শায়খের কাছে গিয়ে সব বলে দেব। সে হযরতের নিকট এল এবং বলল, হযরত! আপনার অমুক মুরীদ আপনাকে খুব মহব্বত দেখায় এবং আপনিও তাকে মহব্বত করেন, সে তো এই-এই করেছে এবং এই কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আমার কাছে তার প্রমাণ আছে। লোকেরা তাকে গুনাহ করতে দেখেছে। তাকে গুনাহ করা অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে।

হযরত বললেন, আচ্ছা! মনে হয়, আল্লাহর একটি নাম আছে 'মুযিল' তথা গোমরাহকারী। সম্ভবত এই নামের তাজাল্লি তখন তার ওপর পড়েছে। তাই সে গুনাহ করে বসেছে। আল্লাহ তো হেদায়েতও দিতে পারেন আবার গোমরাহও করতে পারেন। লোকটা অস্থিরতায় পড়ে গেল। ভাবল, আমার এই সংবাদ প্রদানে তো তেমন কোনো প্রভাব পড়ল না। লোকটা বদগুমানি করতে এসেছে; কিন্তু হযরত তার হৃদয় থেকে সমূলে বদগুমানি উপড়ে ফেললেন। আল্লাহওয়ালাদের মন এতটাই পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, লোকেরা কবীরা গুনাহের শিকার হয়ে আসে, তবুও তারা ঘৃণা করে না। তারা বরং মানুষের ইসলাহের জন্য সচেষ্ট হন।

অন্তদৃষ্টিও আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হবে

এই ঈমানি চেতনা, এই সজাগ দৃষ্টি কোনো ইল্‌মে গায়ব নয়। আল্লাহর অলিরা গায়েব জানেন এমন ধারণা রাখা শিরক ও হারাম। মানবাত্মায় অন্তর্চক্ষু আছে। সেই চক্ষু দিয়ে সেই জ্যোতি দিয়ে মুমিন দেখতে পায় অন্যের সকল ভাব-ভাবনা। কোনো এক কবি বলেন–

دل بینا بھی کر خدا سے طالب

آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

'অন্তর্দৃষ্টিও তুমি আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও। চোখের পাওয়ার ও দৃষ্টি শক্তি এক জিনিস আর হৃদয়ের পাওয়ার আর অন্তরের পাওয়ার এক জিনিস নয়।'

لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

'চোখ অন্ধ হয় না; বরং তাদের বক্ষে যে আত্মা আছে, তা-ই অন্ধ হয়ে যায়।'[১]

বদগুমানির হাতিয়ার ক্রিয়া করে কখন

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার বহু রকম চাবিকাঠি আছে। শয়তানের কাছে বহু হাতিয়ার আছে। তার বদগুমানিও একটি হাতিয়ার। যে তার হৃদয়কে উন্মুক্ত ছেড়েছে, লাগামহীন রাখে, শয়তান তাকেই এই হাতিয়ার দিয়ে আঘাত হানে। শয়তান কোনো মানুষকে ধোঁকা দিতে হলে, মানুষকে প্রতারিত করতে হলে আগে তাকে বদগুমানির ফাঁদে ফেলে। ফলে লোকটি ঈমানদারদের ব্যাপারে বদগুমানি করে বসে। নিজেকে মনে করে সবার চেয়ে ভালো আর সকলকে মনে করে নিজের চেয়ে খারাপ।

বদগুমানির অপারেশন

কয়েক যুগ আগের কথা। একব্যক্তি রাগ হয়ে বলতে লাগল, এই এলাকায় আমিই শুধু সঠিক পথে আছি। আর কেউ সঠিক পথে নেই। আমি সেখানে লোকটার পাশেই ছিলাম। আমি নির্জনে নিয়ে তাকে বললাম, তুমিই যেহেতু উত্তম; তো দেখাও তোমার চরিত্রের দর্পণ। আমি তাকে বলতে লাগলাম, তুমি কি এটা কর না, ওটা কর না, এই অন্যায় কর না। লোকটা আমার প্রশ্নবাণে ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। আমার পায়ে পড়ে বলে, হযরত! মাফ করে দিন। আমি বললাম, তুমি নিজেকে বড় কিছু মনে করছ। নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করো যে, তোমার এই কথাবার্তার সময় আমি চুপ ছিলাম এবং তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি সকলকে খারাপ ও অজ্ঞ মনে করছ। এটা বদগুমানি, এটা গুনাহ। তোমার এই বদগুমানির বিষয়টা সেদিন অপারেশন করে দিলাম। সব সময় এই অপারেশন চালানো হয় না। মাঝেমাঝেই এমনটা করতে হয়।

---

১. সূরা হজ : আয়াত ৪৬

ধোপার কাছে ময়লা কাপড়ই যায়

হযরত লাহোরি (রহ.)-এর নিকট এক গুনাহগার নওজোয়ান আসত। লোকেরা হযরতকে বলল, হযরত! আপনি একে আপনার কাছে আসতে নিষেধ করে দিন। কারণ, আপনার বদনাম হচ্ছে। শুনে হযরতের চোখে পানি এসে গেল। বললেন, দেখো, আমি কেমন যেন একজন ধোপা, যে মানুষের কাপড় ধৌত করে। আর শোনো, ধোপার কাছে ময়লাযুক্ত কাপড়ই আসে– পরিষ্কার কাপড় ধোপার কাছে মানুষ পাঠায় না।

ভাইয়েরা! সব মানুষ তো ভালো নয়। সকলেই যদি ভালো হতো, তাহলে চোখ বন্ধ করে ঘরে বসে ঘুমালোই তো হতো। আত্মার দাগগুলো পরিষ্কার করা জরুরি। দিলের দাগ দুর করতেই মানুষ এখানে আসে। লোকেরা নিজেদের কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে ভালো হওয়ার জন্যই তো আমাদের কাছে আসে। তাদের আসতে দাও, ভালো হতে দাও।

লাইলাতুল কদরেও মাহরুমি

হৃদয় পরিচ্ছন্ন ও অন্যের প্রতি বিদ্বেষহীন হতে হবে। কারও প্রতি শত্রুতা না থাকতে হবে, ঘৃণা না থাকতে হবে। হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করুন। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহগারের গুনাহ মাফ করে দেন; তবে কিছু গুনাহগারের গুনাহ মাফ করেন না। এসব গুনাহগারের মধ্যে মুমিনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী অন্যতম। অন্যের প্রতি বদগুমানকারী, ঈমানদারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের গুনাহ কদরের রাতেও আল্লাহ মাফ করেন না। দেখুন, কত বড় হতভাগা! হাদীছ শারীফে আরও বর্ণিত হয়েছে, যেব্যক্তি অন্যের ভুলভ্রান্তি দ্রুত মাফ করে দেয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ভ্রান্তিগুলো দ্রুত মাফ করে দেবেন। অন্যের ওজর-অজুহাত যে দ্রুত কবুল করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তার ওজর-অজুহাত দ্রুত কবুল করে নেবেন।

নাজাতের ফয়সালা আল্লাহ নিজের হাতে রেখেছেন!

মহান আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয় যে, নাজাতের ফয়সালা তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিয়েছেন। যদি এর জিম্মা কোনো বান্দাকে দেওয়া হতো, তাহলে কী যে অবস্থা হতো! হযরত বেলাল (রাযি.) বলেছেন, হে আল্লাহ! তোমার রহমতের ওপর আমরা কোরবান হই। তুমি হেদায়াতের

দায়িত্ব নিজহাতে রেখে দিয়েছ! এটি আল্লাহ তা'আলার রহমত। তিনি জান্নাত-জাহান্নামের দায়িত্ব নিজহাতে রেখেছেন– কোনো বান্দার হাতে রাখেননি। আল্লাহর রহমতের খাযানার দায়িত্ব যদি তোমাদের হাতে থাকত, তাহলে খাযানা শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা সেই রহমতের খাযানা বন্ধ করে রাখতে। আমাদের অবস্থা তো এমনই। মানুষ তো এমনই করে। তাই আল্লাহ যেমন রহমান, তেমনি চাইলে তিনি আমাদের নাজাত দিয়ে দিতে পারেন।

আত্ম-অবলোকন ও অপদৃষ্টি

নিজেকে একটু প্রশস্ত করুন। নিজের হৃদয়টাকে একটু বড় করুন। মনটাকে প্রসারিত করুন। নিজেকে খারাপ মনে করুন। হযরত শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন–

مرا پیر دانائے مرشد شہاب
دو اندر فرمود بر روئے آب
یکے آنکہ بر خویش خود بین مباش
دیگر آنکہ بر غیر بد بین مباش

আমাকে আমার শায়খ শিহাবুদ্দীন নদীর তীরে বসে মাত্র দুটি শব্দে আমাকে তাছাওউফ বুঝিয়ে দিলেন। দুটি শব্দে বলে দিলেন তাছাওউফের সারাংশ।

১. নিজের ব্যাপারে আত্ম-অবলোকনকারী না হওয়া– শুধু নিজেরটাই না দেখা

২. অন্যদের ব্যাপারে অপদৃষ্টি তথা খারাপ ধারণা না রাখা।

আত্মদৃষ্টি মানে শুধু নিজের ভালোটা-ই দেখা। আর অপদৃষ্টি মানে অন্যদের শুধু খারাপগুলো দেখা। আমরা তো তা-ই করি। নিজেদের দোষ চোখে পড়ে না। অন্যের দোষ ভালোই ধরতে জানি। আবার আমরা বেশ ভালোভাবেই সূফী হওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমাদের বুনিয়াদি রোগই এখনও দূর হয়নি। আমাদের চোখ অন্যদের দোষের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। তাই আমরা অন্যের দোষ দেখার সময় একটু নিজের দোষগুলোর প্রতি তাকাতে পারি না। আমরা অন্যের দোষ খুঁজে ফিরি। আমাদের জন্য এটা অত্যন্ত বড় বিপদ যে,

আমরা নিজের দোষ দেখি না। নিজের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আমরা আড়াল করে রাখি।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত যখন কোনো মানবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন তার নিজের দৃষ্টির সামনে নিজের দোষগুলো প্রকাশ করে দেন। ফলে সে সংশোধন হতে পারে। আর যদি তিনি কারও ওপর নারাজ হয়ে যান, তখন তার দৃষ্টি থেকে তার নিজের দোষগুলো আড়াল করে দেন। ফলে সে বান্দা সংশোধন হতে পারে না। এমন লোকেরা নিজেদের দোষ নিজেরা দেখতে পায় না। কিন্তু সকল মানুষ তার দোষ দেখে তাকে চিনে ফেলে। এসব লোক নিজেদের মনে করে আমরা বড় নেককার, বড় সূফী, যিকিরকারী আর সব মানুষ খারাপ। অমুক খারাপ, তমুক খারাপ। এভাবে সকলকে সে খারাপ ভাবে আর নিজেকে ভাবে ভালো।

এক নারী তার বাচ্চাকে সৌচ করাল। ঘটনাক্রমে সে-সময় একটু মল তার হাতে লেগে গিয়েছিল। এমন সময় শিশু-কিশোররা নতুন চাঁদ উঠেছে বলে হইচই করতে লাগল। মহিলা সেই নাপাক হাত নিয়েই চাঁদ দেখতে চলে এল এবং চাঁদ দেখতে লাগল। মহিলাদের অভ্যাস হলো কোনো কিছু দেখতে গেল হয়তো চিবুকে বা নাকের ওপর হাত রেখে দেখে। এই মহিলাও তেমনই করল। একটু পরে বলতে লাগল, হায় রে! এবারের চাঁদে এমন দুর্গন্ধ কেন? অথচ বাস্তবতা হলো, চাঁদে তো কোনো গন্ধ-দুর্গন্ধ ছিল না। মহিলার নিজের হাতেই ছিল দুর্গন্ধ। যারা অন্যদের দোষ বলে বেড়ায়, তাদের অবস্থা এই মহিলার মতোই।

মুরীদের জন্য শায়খ হচ্ছেন আয়নার মতো

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ

'মুমিন মুমিনের আয়নাস্বরূপ।'[১]

আয়নায় মানুষ নিজ চেহারার দাগ দেখতে পায়। তাই যেসব মানুষ অন্যদের দোষ বেশি-বেশি দেখে, তাদের উচিত নিজের দোষ তালাশ করা। অন্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংশোধন করো যে, অন্যদের দোষ দেখে বুঝতে হবে, তার নিজের মাঝে দোষ আছে। এই দোষগুলোই আয়নার মধ্যে

---

১. সূরা আবুদাউদ : হাদীছ নং ৪৯৩০

দেখতে পাচ্ছে। দেখুন, কেউ যদি আয়না দেখে আর নিজের চেহারার কোনো দোষ ও সমস্যা জানতে পারে, তাহলে সে কিন্তু আয়নার সাথে শত্রুতা করে না। শায়খও তোমার আয়না। তাই তিনি তোমার দোষগুলো ধরিয়ে দেবেন।

মাশায়েখে কেরাম কিতাবে লিখেছেন, মানুষ যখন শায়খের মাঝে দোষ দেখতে শুরু করবে, তাহলে বুঝবে, এই দোষগুলো তার নিজেরও রয়েছে। শায়খের আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পাচ্ছে। হযরত মির্জা মাযহার জানে জানা (রহ.)-এর নিকট একজন মানুষ এল। লোকটি হিন্দু ছিল। সে বলতে লাগল, আমার 'কাশফুল কুলুব' অর্জিত আছে। 'কাশফুল কুলুব' মানে আমি অন্তরসমূহ ছেঁকে দেখে ফেলতে পারি, সেগুলোতে কী আছে। এটি কাশফের একটি প্রকার। আল্লাহওয়ালা বুযুর্গগণকে আল্লাহ তা দান করেন। তাদের কিছু দৃশ্য আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দেন।

লোকটার কথা শুনে হযরত বললেন, আচ্ছা! তাহলে আমার হৃদয়টা দেখো তো। লোকটা দেখল এবং বলে দিল, হযরত! আপনার দিল তো কালো। আর কালো হলো অন্ধকার। আমি অন্ধাকার দেখতে পাচ্ছি। হযরত বললেন, আচ্ছা। এই নেয়ামত তোমার নসিব হয়েছে কীভাবে? লোকটা বলল, হযরত! আমি প্রতিটি কাজ আমার নফসের বিপরীতে করি। ফলে আমি এই নেয়ামত পেয়েছি। সামান্য সময় নিয়ে হযরত বললেন, আচ্ছা! তুমি কেন মুসলমান হচ্ছ না? লোকটা বলল, আমার মন চায় না।

হযরত এবার তাকে শক্ত করে ধরলেন। তুমি-না সব কাজ তোমার নফসের বিপরীত কর। বিপরীত হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করছ না কেন? লোকটা ধরা খেয়ে গেল। তার ওপর হযরতের তাওয়াজ্জুহ পড়েছিল। এবার লোকটা কালেমা পড়ে মুসলামান হয়ে গেল। কালেমা পড়ার পর হযরত বললেন, এবার আমার হৃদয় দেখো। লোকটা দেখে বলতে লাগল, হযরত! এখন আপনার হৃদয়ের চারপাশে শুধু নুর আর নুর। আলো আর আলো দেখতে পাচ্ছি।

হযরত বললেন, দেখো ভাই! আমার হৃদয়টা হলো আয়না। তুমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন দেখেছ, তখন তাতে তোমারই অন্ধকার দেখতে পেয়েছ। এখন দেখেছ ইসলাম গ্রহণের পর। ফলে আমার হৃদয়ের আয়নায় তোমারই আলো দেখতে পেয়েছ।

আল্লাহওয়ালাদের পাত্র

তাই অন্যের ওপর বদগুমানি বড়ই খারাপ বিষয়। আল্লাহওয়ালারা কখনও কোনোভাবেই অন্যের ওপর বদগুমানি করতেন না। আশ্চর্য! কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিরাও তাঁদের সামনে আসত। তাদের প্রতিও তাঁরা বদগুমানি করতেন না। তাঁরা আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা রাখতেন। তাই তাঁরা অন্যদের হেদায়েত করার মাধ্যম হতেন। মাশায়েখে কেরাম যদি দোষ দেখেই তাদের প্রতি রেগে যেতেন এবং তাদের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তাদের সামনে বসতেও পারতাম না। আমাদের জুতা মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হতো।

আমরা হযরত বাবুজি আবদুল্লাহ (রহ.)কে কতবার দেখেছি যে, তাঁর কাছে কেউ গেলেই তার দোষগুলো তাঁর সামনে খুলে যেত। এ-কারণে তিনি লোকটাকে বলতেন, ভাই! এই গুনাহ থেকে তাওবা করো, ওই গুনাহ থেকে তাওবা করো। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন হলো যে, লোকেরা ভয়ে হযরতের দরবারে যাওয়াই ছেড়ে দিল।

একবার এক ডিসি তাঁর কাছে এলেন। সকলের সামনেই তিনি তাকে বললেন, শোনো, মিথ্যা কথা বলবে না। ডিসি বললেন, মিথ্যা তো আমি বলি না। হযরত লোকটার দিকে এমন প্রখর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবং বললেন যে, দেখো, তোমার চেহারাটা আমি যেভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমার কলবের চোখ দ্বারা তোমার কলবটাও সেভাবেই দেখছি। তুমি আমার সামনেও মিথ্যা বলছ। এবার ডিসি মেনে নিলেন যে, হ্যাঁ; হযরত আমি মিথ্যা বলেছি।

এটিই আল্লাহওয়ালাদের পাত্র। তাঁরা মানুষের দোষ দেখে ফেলা সত্ত্বেও এবং তার হৃদয়ের ভাবনাগুলো জেনে ফেলা সত্ত্বেও তারা চুপ থাকতেন। দেখেও না দেখার ভান করতেন। হযরত ওছমান (রাযি.) উপবিষ্ট। একটি লোক এল। আসার সময়ে লোকটা বেগানা নারীদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে এসেছে। হযরত ওছমান (রাযি.) বললেন, 'লোকদের যে কী হয়ে গেল?' আল্লাহু আকবার! কত দরদ ও কোমলভাবে হযরত ওছমান কথাটি বললেন! লোকটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি যে, মনে ব্যথা পেতে পারে। তাই বললেন, লোকদের যে কী হয়ে গেল? আমাদের মাহফিলে চলে এসেছে; অথচ কুদৃষ্টি করে আসার কারণে তাদের চোখ থেকে যেনার গুনাহ টপপট করে পড়ছে! দেখেননি; তবে তাঁর কাশফ হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, তার চোখ থেকে কিছু একটা ঝরে-ঝরে পড়েছে।

তো দেখুন, আল্লাহওয়ালাগণ বহু কিছু দেখে ফেলেন। তবুও জবানে কিছু বলেন না। তবু তাঁরা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আল্লাহর বান্দাদের মহব্বত করেন। অথচ আমাদের অভ্যাস হলো, যদি কেউ আমাদের কারও ব্যাপারে একটি শব্দও বলে দেয়, তাহলে সর্বদার জন্য আমরা কুধারণাকারী হয়ে যাই। তার সাথে ঘৃণার আচরণ শুরু করে দেই।

রক্তপণ দিতেই হলো!

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ বা অন্য কোনো সাহাবির ঘটনা। যুদ্ধে এক কাফেরের ওপর আক্রমণ চালালেন। কাফের লোকটি তরবারি দেখেই কালেমা পড়ে নিল। কিন্তু সাহাবি চিন্তা করলেন, লোকটা তো বাঁচার জন্য কালেমা পড়েছে। নবীজির সামনে এই বিষয়টি উত্থাপন করা হলো। ফলে প্রশ্ন করা হলো, কেন লোকটার ওপর তরবারি চালানো হলো? জবাবে সাহাবি বললেন, সে তো তরবারি থেকে বাঁচার জন্য কালেমা পড়েছে। মূলত সে কাফেরই ছিল। নবীজি বললেন, তুমি কি তার হৃদয়ে প্রবেশ করে দেখেছ? সাহাবি বললেন, না। নবীজি বললেন, এখন তোমাকে রক্তপণ দিতে হবে।

দেখুন, আল্লাহর নবী একজন সাহাবিকে বললেন যে, তুমি এরকম কল্পনাপ্রসূত বিশ্বাসে লোকটার ওপর আঘাত করেছ। তোমাকে জরিমানা দিতে হবে। আর আমরা তো আজ ঈমানদার লোকদের ব্যাপারেও বদগুমানি ও খারাপ ধারণা করে বসি!

বদগুমানি একটা আখলাকি রোগ

কেয়ামতের দিন কিছু মানুষ এমন হবে যে, নিজেদের ভালো মনে করার ফলে তাদের আগে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। কারণ, তারা আল্লাহর মাখলুকের সাথে বদগুমানি করত। এটা একটা বদ-অভ্যাস। কারও মাঝে শত ভালো গুণ থাকলেও বদগুমানির কারণে তা দেখে না। ভাই! আপনার এই আখলাকি রোগ দূর করুন। তা না হলে আপনি অন্য বান্দার সাথে যা করছেন, আল্লাহ আপনার সঙ্গে তা-ই করবেন। আজ ক্ষমার আদর্শ কোথায় গেল? আজ ছাড় দেওয়ার মানসিকতা কোথায় গেল? খায়েরখাহি কোথায় গেল? আজ আমরা একসাথে থাকি; অথচ মানুষের ছোটখাট ব্যাপারগুলো নিয়ে বদগুমানি করি। এটা তো ইসলামের শিক্ষা নয়। এটা একটা আখলাকি রোগ। তাই আল্লাহর কাছে কেঁদে-কেদে দু'আ করতে হবে। এ রোগের চিকিৎসা সবচেয়ে কঠিন।

নবীজির ব্যাপারে এক যুবকের বদগুমানি

নাউজুবিল্লাহ! নবীজির ওপর এক যুবকের বদগুমানি ছিল! খারাপ ধারণা ছিল! সে বলতে লাগল, সবার জন্য মাত্র চারটা বিবাহের অনুমতি আর নবী নিজে করেছেন এগারোটা। কেন? আমি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করলাম। বললাম, দেখো, যখন মানুষের বিবাহের নেশা থাকে, মানুষ যে-বয়সে যুবক থাকে, সেই বয়সে আমাদের নবীজি কাকে বিবাহ করেছেন? একজন চল্লিশোর্ধ নারী খাদীজাতুল কুবরাকে, আগেই যার দুই-দুবার বিবাহ হয়েছিল। নবীজি কি কুমারী কোনো নারী পাননি? আরে! কাফেররা এসে বলত, মক্কার যে কুমারীর ওপর আপনি হাত রাখবেন, তাকেই আপনার গোলামিতে দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। সব রকম সামানপত্র দেওয়ার জন্য তারা তৈরী ছিল। অথচ পঁচিশ বছর বয়সি নবী কাকে বিবাহ করলেন ? ৪০ বছরের এক নারীকে। ৪০ বছর বয়সে নারীদের রূপ-রং আর কতটুকুই থাকে? কতটুকুই শক্তি-ক্ষমতা থাকে তার? ৩০ বছরের নারীর দেহই তো এমন হয়ে যায় যেন কবরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। ৪০ বছরের নারীর অবস্থা তাহলে কী হবে? একদিকে ৪০ বছরের বুড়ি, আরেক দিকে ২৫ বছরের যুবক। বলো, একে কি যৌনচাহিদা ও জৈবিক লালসা পূরণের নিমিত্তে ছিল বলা যায়? তুমি কি এখানে এমন কিছু দেখতে পাও? বরং নবীজি তো ইসলামকে বুলন্দ করার জন্য তা করেছেন। আমরা তো ভাই! দেখতে পাই, নবীজির নিয়ত এমন ছিল যে, একজন প্রভাবশালী নারী– যার খান্দান মুসলমান হয়ে যাবে, যার কারণে আরও বহু লোক মুসলমান হয়ে যাবে, নিজের চাচির পরামর্শে তিনি এই নারীকে বিবাহ করেছেন। কোন নিয়তে এই বিয়ে হলো? দীনের নিয়তে, দীনের খাতিরে। এটা চাহিদা নিবারণের বিবাহ ছিল না কোনোভাবেই।

এবার দেখুন, তাঁর সাথে নবীজির সময় কীভাবে কেটেছে? ৫৩ বছর পর্যন্ত বয়স হিজরতের দেড় কি দুই বছর পূর্বে খাদিজা (রহ.)-এর ওফাত পর্যন্ত নবীজি দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করেননি। বয়স ৫০ বছরেরও বেশি হয়ে গেল। যৌবন শেষ হয়ে বার্ধক্য এসে গেল। এতটা বছর নিজের চেয়ে ১৫ বছরের বড় একজন নারীর সঙ্গে কাটিয়ে দিলেন। তখন পর্যন্ত খাদিজার বয়স হয়েছিল ৬৬/৬৭ বছর। তখন পর্যন্ত এক খাদিজা-ই ছিলেন নবীজির স্ত্রী। তাহলে বলুন, জৈবিক চাহিদার কোনো বিষয় কি এখানে আছে বা থাকতে পারে?

নবীজি হিজরত করে যখন মদীনায় গেলেন, তখন খাদীজার এনতেকাল হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা নবীজির নেকাহে সব ধরনের স্ত্রী দিলেন। সর্বপ্রকার স্ত্রী-ই তখন তাঁর সংসারে এল। কুমারীও এল। বিধবাও এল। বড়-বড় নেতাদের কন্যারা-দাসিরা নবীজির মালিকানায় এল। নানা গোত্রের, নানা সম্প্রদায় ও দেশের লোকদের সাথে সম্পর্ক আছে এমনসব নারীকে আল্লাহ তা'আলা নবীজির স্ত্রী হিসেবে দান করলেন। কেন? কারণ কী? কারণ এই যে, নবীজির গোটা জীবন, জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গ এমনকি বিন্দুবিসর্গও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি ও হাদীছের কিতাবাদিতে সুসংরক্ষিত থাকা একান্ত অপরিহার্য বিষয় ছিল।

আর হিজরতের পর তো নবীজির নতুন এক জীবনের সূচনা হয়েছিল। আর এই সময়টাতেই ইসলাম চার দিকে প্রচারিত হওয়ার দরকার ছিল। কুরআন নাযিল হওয়ার দরকার ছিল। নবীজির গোটা বরকতময় জীবন গ্রন্থবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল। তার জন্য তো পুরুষদের বিশাল একটি জামাত নিবেদিত ছিলেন। তারা মসজিদে নববীর আঙিনা সুফফায় না খেয়ে পড়ে থাকতেন। নবীজীবনের কোনো একটি বিষয়ও যেন ছুটে না যায়, অনাগত উম্মাহকে যেন সব পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য ঘরের বাইরে পুরুষরা আছে। কিন্তু ঘরোয়া বিষয়গুলো সংরক্ষণের জন্য তো একদল ঘরোয়া মানুষের প্রয়োজন ছিল। মনে করুন, ঘরেও মানুষ আছেন। কিন্তু কতজন? যদি একজন হতেন, তাহলে কাফেরদের জন্য প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকত যে, নবীজির অমুক বিষয়টির বর্ণনাকারী একজন; সুতরাং বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় বা বলতে পারত, অমুক বিষয়টির বর্ণনাকারী একজন নারীমাত্র আর নারীরা তো বেশির ভাগই আবেগতাড়িত হয়, বেশির ভাগই তারা ভুলে যায়। আবার যদি বৃদ্ধ হতেন, তাহলে বলত, আরে! বৃদ্ধ মানুষের তো স্মরণশক্তিই লোপ পেয়ে যায়। ফলে এভাবে আরও নানা রকম কথা বলে-বলে নবীজির জীবনের নানা অধ্যায়ের বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কাফেররা প্রশ্ন তুলতে পারত।

এমনিভাবে গরিব নারী হলেও প্রশ্ন তুলত। শুধু নেতৃস্থানীয় নারী হলেও প্রশ্ন তুলত। শুধু কুমারী হলে ও প্রশ্ন তুলত। শুধু বৃদ্ধা হলেও প্রশ্ন তুলত। শুধু স্বাধীন নারী হলেও প্রশ্ন তুলত। শুধু দাসী হলেও প্রশ্ন তুলত। এমন অনেক প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলাও যত প্রকার নারী হতে পারে, প্রত্যেক প্রকারেরই একজন করে নারী নবীজির স্ত্রীরূপে দান

করলেন। নানা গোত্রের নানা সম্প্রদায়ের নানা প্রকৃতির ৯/১০জন নারীকে নবীজির স্ত্রী বানিয়ে দিলেন। ফলে নবীজির ঘরোয়া বিষয়গুলোও এমন গ্রহণযোগ্যরূপে ইতিহাস ও হাদীছের কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেল যে, নবীজির কোনো বিষয়ে আর কোনোরূপ প্রশ্ন তোলার সম্ভাবনা বাকি থাকল না।

বয়সের দিকে তাকালে শুধু হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকেই দেখতে পাওয়া যায়, তিনি স্মরণশক্তিতে প্রখর ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের স্ত্রীও ছিল, যারা অভিজ্ঞতায় বড় পাকা ছিলেন। আবার নেতৃস্থানীর ব্যক্তিবর্গের কন্যা হিসেবে আবু সুফিয়ানকন্যা উম্মে হাবীবা ছিলেন।

মোটকথা, জীবনের প্রতিটি পর্ব ও অনুষঙ্গের এবং সমাজের সকল স্তরের নারী-ই নবীজীবনে দৃষ্টিগোচর হয়। এতে সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এই স্ত্রী নির্বাচন খোদ আল্লাহ তা'আলা এজন্য করলেন যে, আপনার জীবনীকে সুসংরক্ষিত রাখার জন্য নানা জীবনের সকল শ্রেণির নারী আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিলাম।

এবার বলুন, নবীজীবনের ঘরোয়া পরিবেশের কথা কারা বর্ণনা করলেন? একদল মহীয়সী নারী বর্ণনা করলেন। মাত্র একজ-দুজন নয়– এই কাজের জন্য মোট এগারোজন রমণীকে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত নির্বাচন করেছেন। এই ১১ জন নারী যদি আল্লাহর নির্বাচিতই হয়, তো আমাদের বোঝা উচিত, পরওয়ারদেগার আল্লাহ যেভাবে পুরুষদের এক সুবিশাল জামাত নির্বাচন করেছেন, যার সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, যাঁরা নবীজির বাইরের যিন্দেগি বর্ণনা করেছেন। আর ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নারীদলও আল্লাহ নির্বাচন করেছেন, যেন তারা নবীজির ঘরোয়া যিন্দেগিকে উম্মাহর কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। বিশেষ করে অনাগত উম্মাহর জন্য ইতিহাসে সংরক্ষিত করে দিতে পারেন।

এবার দেখুন, জীবনের অধ্যায় দুটি–

১. বাইরের জীবন।

২. ঘরোয়া জীবন।

বাইরের জীবন, যা ইসলামের অর্ধেক, তা আমরা পেয়েছি পুরুষ সাহাবিদের মাধ্যমে। আর ঘরোয়া যে জীবন, যা ইসলামের বাকি অর্ধেক তা আমরা পেয়েছি নবীজির পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের মাধ্যমে। শোনো হে জ্ঞানান্ধ! প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবন নবীজি কাটিয়ে দিলেন একজন স্ত্রী খাদিজা

(রাযি.)-এর সঙ্গে। অথচ এই সময়টাই ছিল নবীজির যৌবনকাল। তারপর এল দীনের চাহিদার সময়। ইসলামের তরে ছিল যে-সময়টা, তখন শুধু দীনের জন্য, ইসলামরে জন্য আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের ১১ জন নারীর একটি ছোট্ট দলকে নবীজীবনের জন্য নির্বাচন করলেন। বলো, এখানে এমন কী কথা ও কী বিষয় আছে, যা তোমাদের বুঝে আসছে না? তোমদের জীবন তো এমন হীন যে, তোমরা তোমাদের বউদের কাছ থেকে নির্জনে বসে অঙ্গীকার নাও, দেখো, আমার জীবনের কোনো বিষয় মানবসমাজে বলতে পারবে না। কোনো সমস্য হলে আমরা নিজেরাই তা বুঝব। বাইরের কেউ যেন তা না জানে। আমাদের ব্যক্তিগত কোনো বিষয়ের সংবাদ যেন ঘরের বাইরে না যায়। কারণ, এমন নোংরা তোমাদের জীবন, যা প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমরা মানুষের রোষানলে পড়ে যাওয়ার ভয় কর। আর আমাদের নবীজির জীবন দেখো। এমন পবিত্র জীবনের ওপর সমস্ত পৃথিবী কোরবান হোক। নিজের ঘরে নিজ স্ত্রীদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা ঘরে আমাকে যা কিছু করতে দেখ, তোমাদের ওপর ফরজ যে তোমরা বিশ্ববাসীর নিকট আমার জীবনের সমস্ত বিষয় পৌঁছে দাও। সকল মানুষের মাঝে আমার সকল বিষয় ছড়িয়ে দাও। এ হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করবার মতো এক অমীয় যিন্দেগি।

ভাই! বদগুমানি না করে এই কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখুন। আজ তো লোকেরা আল্লাহর ওপরও বদগুমানি করে।

আল্লাহর ওপর বদগুমানি

আমদের অবস্থা হলো, আমরা আল্লাহর ব্যাপারেও বদগুমানি করি। এক নারী ফোন করল, দু'আ করুন, জানি না আমাদের সংসারটা টিকবে কিনা। আমার স্বামী আল্লাহর কাছে খুব প্রার্থনা করেন। কিন্তু দু'আ-প্রার্থনা কবুল হয় না। তাই তিনি বলেন, আল্লাহর মাঝেও পক্ষপাতিত্ব আছে। নাউযুবিল্লাহ! তিনি শুধু দাড়িওয়ালা মৌলভীদের দু'আ কবুল করেন। বলুন, এখন আমার স্বামীর ঈমানের অবস্থা কী?

তো দেখুন, আল্লাহর যাত ও সত্তার ওপর আজ মানুষ বদগুমানি শুরু করে দিয়েছে। ভাই! ঈমান রক্ষা করুন। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তাঁর গোত্র ও ফেরাউন বহু অভিযোগ তুলেছিল। একবার তিনি তুর পর্বতে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! তুমি ওদের মুখগুলো বন্ধ করে দাও। তখন আল্লাহ ওহী নাযিল করলেন, হে মূসা! লোকদের মুখ তো আমার বিরুদ্ধেও বন্ধ নেই; তোমার বিরুদ্ধে আর কেন বন্ধ করব।

কাঁদার স্থান

বদগুমানিও একটা বিস্ময়কর পর্দা। একটা মানুষের সঙ্গে ৩০ বছর সংসার করেছে। ৩০ বছরের চেনাজানা মানুষ। তার ব্যাপারেও বদগুমানি করে। আরে! তার ৩০ বছরের জীবনের প্রতিটি রাত ও দিন তো তোমার সামনেই। কারও কথা শুনে তুমি তোমার স্ত্রীর ওপর বদগুমানি করছ কেন? তোমার আকল-জ্ঞানের ওপর আফসোস হয়। কেয়ামতের দিন তোমাকে গলা ঝাপটে লোকেরা জবাব চাইবে, কেন তুমি বদগুমানি করেছ? সেদিন জবাব দিতে হবে।

বদগুমানি একটা বাতেনি রোগ। একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাধি। আজ বদগুমানি করছ; কাল কাঁদবে; কিন্তু লাভ হবে না। ভাই! আজই কান্নাকটি করে নিন। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমানদারদের প্রতি বদগুমানি করা থেকে হেফাযতে রাখো। নিজের নফসকে বোঝান। বলুন, আমার থেকে কেয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হবে। অন্য কে তো জিজ্ঞেস করা হবে না। তাই নিজের জন্য নিজেই ফিকির করুন–

نہ تھی جو اپنی برائیوں کی خبر
رہے دیکھتے اوروں کے عیب وہنر
پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر
تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

নিজের খারাবি আর দোষের খবর তো ছিল না। অন্যের দোষত্রুটি দেখায় মশগুল ছিলে। যখন নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি পড়ল, অন্য কারও কোনো দোষ তখন আর দৃষ্টিতে থাকল না।

আমাদের হযরত বলতেন–

تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو

'তুমিই তোমার পরিণতি ডেকে এনেছ। তোমার পরিণতি তোমাকেই ভোগ করতে হবে।'

হযরত সুফিয়ান ছাওরি (রহ.) বলেছেন, একটা গুনাহ করার কারণে আমি ৫ মাস তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত ছিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করল, কেমন

গুনাহ? জবাবে বললেন, একবান্দা কেঁদে-কেঁদে দু'আ করছিল। তখন আমার দিলে খেয়াল এল, লোকটা মনে হয় রিয়াকার তথা মানুষকে দেখানোর জন্য কাঁদছে। এভাবে আমার অন্তরে শুধু গুমান তথা ধারণা জন্ম নিয়েছিল। আল্লাহ আমাকে এর কারণে পাকড়াও করলেন। বললেন, একথা তুমি ভাবলা কেন? আমাকে ৫ মাস পর্যন্ত রাতের মুনাজাত থেকে মাহরুম করে দিলেন। বললেন, তুমি আমার সাথে মুনাজাতের উপযুক্ত নও।

বদগুমানি এমনই মারাত্মক বিষয়! আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই রোগ থেকে হেফাযত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

বিস্ময়কর আটটি বিষয়

'যদি বলা হয় কয়েক বছরের জন্য আপনাকে এই পাকা প্রাসাদটা দেওয়া হলো আর এই কাঁচা ঘরটা সর্বদার জন্যই আপনাকে দেওয়া হলো; আপনি এ দুটির যেকোনো একটি ঘর নির্বাচন করে নিন, তখন আপনি নিশ্চই চিন্তা করে যে-ঘরটা আপনাকে সর্বদার জন্য দেওয়া হবে, সেটিই গ্রহণ করবেন। যদিও সেটি মাটির তৈরী কাঁচা ঘর।

আল্লাহ্ তো তা-ই বলেছেন যে, হে আমার বান্দা! এই দুনিয়ার জীবনের ঘর তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী। আর ওই যে আখেরাতের ঘর, তা চিরস্থায়ী। যদি ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমার হুকুম-আহকাম মেনে চল, তাহলে আখেরাতে চিরস্থায়ী ঘর পাবে। আর যদি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘরে ভোগবিলাসে মত্ত হও, তাহলে চিরস্থায়ী ঘর বরবাদ হয়ে যাবে। বন্ধুগণ! এ ক্ষেত্রে আপনি কী জবাব দেবেন? আপনি কি ক্ষণস্থায়ী জীবন গ্রহণ করবেন, নাকি চিরস্থয়ী জীবন?'

আটটি আশ্চর্য বিষয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

কাফের ও মুমিনের জীবন-কল্পনায় পার্থক্য

জীবনের ব্যাপারে মানুষের অনুভব ও উপলব্ধি নানা রকম। নাস্তিকরা মনে করে, তারা নিজে-নিজেই জন্ম হয়েছে আর এই জীবনটা শুধুই ভোগের জন্য। তাই যে যেভাবে পার জীবনটাকে উপভোগ করো, নিজেদের চাহিদা মেটাও। তাই তারা এই পার্থিব জীবনকেই নিজেদের জন্য সব কিছু মনে করে আয়েশ ও মস্তিতে মেতে থাকে। পক্ষান্তরে জীবনের ব্যাপারে মুমিন বান্দাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। মুমিন জানে ও বোঝে, একমাত্র আল্লাহ আমাকে বানিয়েছেন। এই পার্থিব দুনিয়া একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। আমি পরীক্ষার হলে অবস্থান করছি। কেয়ামতের দিন এ-জীবনের হিসাব হবে। ভালো কাজের প্রতিদান আর মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে।

তো অনুভব ও উপলব্ধি হিসেবে মানবজীবনগুলো যাপিত হয় ভিন্ন-ভিন্ন ধারায় ও ভিন্ন-ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। মুমিন এই জগতের আনন্দকেও ক্ষণস্থায়ী মনে করে আর দুঃখ-কষ্টকেও ক্ষণস্থায়ী মনে করে। তারা জানে সমগ্র জগতে ফেতনার উপকরণ ছড়িয়ে আছে। সবই ধ্বংসশীল। আর কাফেররা মনে করে, আমি ভোগের জন্যই জন্ম নিয়েছি। আরও মনে করে, আমি মৃত্যুবরণের তরেই জন্মেছি। কাফের বলে, জীবনকে জীবের মতো করে ইচ্ছেমতো চলতে দাও, থাকতে দাও। আর মুমিন মনে করে, মরতে হবে তো ভালো করে মরতে দাও, সুন্দর করে মরতে দাও। এমন জীবন যাপন করো, যেন তোমাদের মৃত্যু আসে ভালোরূপে এবং পরিণাম ও পরিণতিও

যেন হয় ভালো। আল্লাহর দৃষ্টিতেও যেন হও প্রিয় ও পছন্দনীয়। যে কারণে দুনিয়ার পেরেশানিগুলো মুমিনকে পেরেশান করে না। বড়-বড় মুসিবত আসে, পরীক্ষা আসে; কিন্তু মুমনি চূড়ান্ত পর্যায়ের ধৈর্য ধারণ করে, বিপদকে সহ্য করে। মুমিন জানে, এই সমস্যা সামান্য কটা দিনের জন্য। একদিন এই সমস্যা শেষ হয়ে যাবে। আমাকে এই দুনিয়া থেকে একদিন আরও সামনে যেতে হবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِدُوا لِلتُّرَابِ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

'হে মানবজাতি! তোমরা মাটির জন্য জন্মাও, ধ্বংস ও শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য জন্মাও আর বিনাশের জন্যে নির্মাণ করো।'[১]

দুনিয়ার ধোঁকা

দুনিয়ায় যে-সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, সে মৃত্যুবরণ করার জন্যই জন্মগ্রহণ করছে। যে-ঘর নির্মিত হচ্ছে, তা বিদ্ধস্ত হওয়ার জন্যই নির্মিত হচ্ছে। এভাবে প্রতিটি জিনিস এখানে সৃষ্টি হচ্ছে ধ্বংসের জন্য। তাই তো যুগে-যুগে যত মানব এ-ধরায় জন্মগ্রহণ করেছে, সবাই আবার এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছে। এটি পরিত্যাগের জায়গা। এটি একটি পান্থশালা। কিন্তু এর মাঝে লোভ ও লালসার এমন উপকরণ ছড়িয়ে আছে, যার কারণে মানবাত্মা এ-দুনিয়া ত্যাগ করতে চায় না। মানুষ আসল অবস্থা ভুলে গিয়ে দুনিয়ার মস্তিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই তো আজ যুবতি-কিশোরীদের যদি বলা হয়, উঠো; নামায পড়ো, তারা বলে, আরে! আমরা কী দাদি-মা হয়ে গেছি নাকি। তাদের যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, নামায পড়া মা-দাদিদের কাজ। আগে জব করতে হবে, প্রাসাদ নির্মাণ করেত হবে, বিয়ে হবে, বাচ্চা হবে; তার পর যখন বুড়ো হব, তখন-না নামায-রোযা ধরব।

এভাবে দুনিয়ার এই সুসজ্জিত জীবনের আকর্ষণ প্রতিনিয়ত আমাদের ধোঁকা দিয়ে চলছে। তাই তো বর্ণিত হয়েছে, এই দুনিয়া ধোঁকার স্থল। ভালো-ভালো মানুষও ধোঁকার শিকার হযে যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র দুটি শব্দে বিষয়টা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ

'দুনিয়া বড়ই সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল।'[২]

---

১. কানযুল উম্মাল : ৪০/৪৩০
২. আল-জামউ বাইনাস সাহীহাইন : ২/৩৫৮

মিষ্ট জিনিস খেতেই মন চায়। পেট ভরে যায়, তবু মন ভরে না। দুনিয়ার আয়েশ থেকে মন কখনও ফেরে না। মানুষ লম্বা সূচি তৈরি করে নেয়– এই করব, সেই করব। এমন ভাব দেখায়, যেন আর মরতে হবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

'দুনিয়ার স্বাদ ধ্বংসকারী মৃত্যুকে বেশি-বেশি স্মরণ করো।'[১]

তোমরা এমন প্রাসাদ তৈরি করছ যে, মনে হয়, তোমরা চির দিন এখানে থেকে যাবে।

মরতে হবে এ-কথাটা যখন হৃদয়ে থাকবে, তখন আর এসব উপায়-উপকরণের প্রতি মন ঝুঁকবে না।

৮০ বছরের বৃদ্ধকে ধোঁকা

আমার এক বন্ধু বলল, আমার আশি বছর বয়সি দাদা নামায পড়েন না। আপনি তাকে কিছু নসিহত করে দিন। বৃদ্ধকে আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া হলো। কুশল বিনিময়ের পর কথা শুরু করলাম। আমি তাকে নানা কথা বুঝিয়ে বললাম, এখন তো আপনার কোনো কামকাজ নেই। নামাযটা সব সময় আদায় করবেন। যে-ই আমি নামাযের কথা বললাম, সাথে-সাথে নিজের হাঁটুটা ধরে বলল, পীর সাহেব! এই হাঁটুতে ব্যথা আছে; ভালো হয়ে গেলেই নামায পড়তে শুরু করব। চিন্তা করুন, কত বড় ধোঁকা! ৮০বছরের বৃদ্ধ অপেক্ষায় আছে, হাঁটুর ব্যথা ভালো হলে নামায পড়বে। আজ শিক্ষিত-উচ্চশিক্ষিতরাও ধোঁকায় পড়ে আছে। মৃত্যুর কথা ভুলে গেলেই এমন হয়।

এক সেক্রেটারী সাহেবকে ধোঁকা

এক সেক্রেটারী সাহেবের একটি ঘটনা বলছি, যিনি পাঞ্জাবের বাজেট তৈরি করতেন। অনেক বড় উচ্চশিক্ষিত মানুষ। অনেক যোগ্য ও ভদ্র। একদিন আমি তার বাড়িতে গেলাম। জানতে পারলাম, তিনি নামায পড়েন না। তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন। নাতিপুতিও হয়ে গেছে অনেক। তিনি বললেন, হযরত! আমি ভালো একটি নিয়ত করেছি। আমার এই পুতিঁকে হাফেয বানাব। যেদিন সে হাফেয হয়ে নামায পড়াতে পারবে, তার পিছে সেদিন থেকে আমি নামায শুরু করব।

---

১. সুনানে তিরমিযি : ১/২৯৭৭

দেখুন, এই লোকটি কত বড় ধোঁকার শিকার! কবে তার এই ছেলের ছেলে হাফেয হবে! কবে বালেগ হবে আর কবে এই সেক্রেটারী নামায শুরু করবে! সেই নাগাদ বাঁচবে কিনা তারইবা নিশ্চয়তা কী? এভাবে মানুষ আজ দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে-পড়ে দীন-ঈমান-সুন্নত ছেড়ে উন্মাদের মতো জীবন যাপন করছে।

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

'পার্থিব জগত ধোঁকার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১]

আশ্চর্য আটটি বিষয়

এক বুযুর্গ বলেছেন, আটটি বিষয় বড়ই আশ্চর্যের।

প্রথম বিষয় : আমার বড় আশ্চর্য ওই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে জানে, অবশ্যই মৃত্যু আসবে, তবুও সে অট্টহাসিতে লিপ্ত হয়। যেব্যক্তির ব্যাপারে ফাঁসির আদেশ জারি হয়েছে, তার চেহারায় কি হাসি থাকে? তো আমরা জানি, মৃত্যু আসবে, কষ্ট হবে, তবু আমরা কীভাবে উল্লাসে মগ্ন হই! হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, মৃত্যু কেঁচি দিয়ে কাটার চেয়েও মারাত্মক। উত্তপ্ত তেলে ভুনা করার চেয়েও কষ্টদায়ক। আগুনে কাজ করতে গিয়ে সামান্য পুড়ে গেলে কত কষ্ট হয়। অথচ আগুনে পোড়া ওই সামান্য স্থান থেকে রূহ গুটিয়ে অন্য জায়গায় সরে গেছে মাত্র। বাকি সবই তো ঠিক আছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক সাহাবি অসুস্থ। মালাকুল মওত এসেছে। রূহ কবজ করার জন্য তার বুকে আঙুল রাখল। নবীজি উক্ত সাহাবিকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি বললেন, হে মালাকুল মওত! আসানির সাথে কাজ নাও। ফেরেশতা আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনার সাহচর্যপ্রাপ্ত সাহাবিগণের রূহ যেন আরামের সাথে কবজ করি। আপনার সাহাবিগণের রূহ কবজ করার জন্য তো আমি একটি আঙুল ব্যবহার করি আর সাধারণ মানুষের রূহের ওপর তো আমি প্রথমে থাবা মারি।

তাই মালাকুল মওত যখন রূহের ওপর থাবা মারবে, তখন দুনিয়ার স্বাদ আর হাসি-আনন্দের কথা বুঝে আসবে। হযরত ঈসা (আ.)কে তাঁর গোত্রের লোকেরা বলল, আপনি আমাদের মোজেযা দেখান। তিনি গোত্রের লোকদের

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৮৫

একটি গোরস্তানে নিয়ে গেলেন। কবরে যে মাইয়েত ছিল, তাকে বললেন, আল্লাহর অনুমতিক্রমে উঠে আসো। আল্লাহ হযরত ঈসা (আ.) কে মৃতকে জীবিত করার মোজেযা দিয়েছিলেন। ফলে সামান্য সময়ের মধ্যে এক নওজোয়ানের লাশ যিন্দা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঈসা (আ.) তার সাথে কথা বলতে লাগলেন। যিন্দা লাশ বলল, আমার মৃত্যু হয়েছিল জোয়ান বয়সে। আমি অমুকের ছেলে। মৃত্যুর পর হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঈসা (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার জোয়ানকালে মৃত্যু হলো তো চুলগুলো সাদা কেন? যুবক বলল, হাজার বছরের ব্যবধানের পরও মৃত্যুকালে আমি যেমন ছিলাম, আজও সেই আগের মতোই অনুভব করছি। কিন্তু আপনার আওয়াজ শুনে আমি ভেবেছি, কেয়ামত এসে গেল বুঝি। ওই দিনের ভয় আমার কালো চুলগুলোকে একেবারে সাদা বানিয়ে দিয়েছে।

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا

'সে দিনের কঠোরতা বাচ্চাকে বুড়ো বানিয়ে দেবে।'[১]

দ্বিতীয় বিষয় : আমার আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ব্যাপারে, যে জানে, দুনিয়া ধ্বংসশীল; তবুও সে দুনিয়া উপার্জনে ব্যস্ত!

যদি বলা হয় কয়েক বছরের জন্য আপনাকে এই পাকা প্রাসাদটা দেওয়া হলো আর এই কাঁচা ঘরটা সর্বদার জন্যই আপনাকে দেওয়া হলো; আপনি এ দুটির যেকোনো একটি ঘর নির্বাচন করে নিন, তখন আপনি নিশ্চই চিন্তা করে যে-ঘরটা আপনাকে সর্বদার জন্য দেওয়া হবে, সেটিই গ্রহণ করবেন। যদিও সেটি মাটির তৈরী কাঁচা ঘর।

আল্লাহ তো তা-ই বলেছেন যে, হে আমার বান্দা! এই দুনিয়ার জীবনের ঘর তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী। আর ওই যে আখেরাতের ঘর, তা চিরস্থায়ী। যদি ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমার হুকুম-আহকাম মেনে চল, তাহলে আখেরাতে চিরস্থায়ী ঘর পাবে। আর যদি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ঘরে ভোগবিলাসে মত্ত হও, তাহলে চিরস্থায়ী ঘর বরবাদ হয়ে যাবে। বন্ধুগণ! এ ক্ষেত্রে আপনি কী জবাব দেবেন? আপনি কি ক্ষণস্থায়ী জীবন গ্রহণ করবেন, নাকি চিরস্থয়ী জীবন?

হজে একবার এক বুড়ো আমার পাশে ছিলেন। কেউ তাকে তার বয়স জিজ্ঞেস করলে জবাব দিল, দেহের বয়স তো ৭৫ হয়ে গেছে; কিন্তু মনের বয়স ২৫ ছাড়ায়নি। বন্ধুগণ! দুনিয়াকে ধোঁকার কেন্দ্র বলা হয়েছে। সে-

---

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ১৭

কারণেই মৃত্যুর স্মরণ ভালো লাগে না। মরতে ভালো লাগে না। অন্যথায় যে মানুষটা আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে নিয়েছে, সে তো সর্বদা অপেক্ষায় থাকে, এ দুনিয়ানামক কয়েদখানা থেকে কবে মুক্তি পাব। কবে আসবে মৃত্যুর ডাক। যখন একটা বাচ্চা পয়দা হলো, তখন এক কানে আযান, আরেক কানে একামত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর সময় জানাযা হবে। মাঝে সময় কতটুকুই।

কবির ভাষায়–

آتے ہوئے آذان ہوئی جاتے ہوئے نماز

اتنی ذرا سی دیر میں آئے اور چلے گئے

আসার সময় তোমার কানে আযান দেওয়া হয়েছে। যাওয়ার সময় নামায পড়া হবে। এতটুকু সময় নিয়েই তুমি এলে আর চলে গেলে।

এক বাদশাহ শাহী মহল নির্মাণ করল। তারপর ঘোষণা দিল, কেউ যদি এর মাঝে কোনো দোষ ধরে দিতে পারে, তাকে আমি পুরস্কার দেব। এক বুযুর্গ প্রাসাদটা দেখে বললেন, এর মাঝে দুটা দোষ আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কী সেগুলো? বুযুর্গ বললেন, তাহলো– এক. এই মহলটা চিরকাল থাকবে না। দুই. এর মালিক আপনিও চিরদিন থাকবেন না।

তৃতীয় বিষয় : বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, যে জানে, সব জিনিস তাকদীর অনুযায়ী হয়, তবুও সে যা ছুটে গেছে, তার জন্য আফসোস করে। যখন হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হবে যে, যা তাকদীরে আছে, তা-ই হবে, তা-ই পাব, তাহলে কোনো কিছু ছুটে গেলে বা না পেলে এত আফসোস কেন? বরং কোনো জিনিস হাতছাড়া হলে চিন্তা করবে, এটা আমার ভাগ্যে ছিল না, আমার তাকদীরে লিখিত ছিল না।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

'... যাতে কোনো কিছু হাতছাড়া হয়ে গেলে তার জন্য আক্ষেপ না কর আর যা কিছু হাতে আসে, তার জন্য উল্লসিত না হও।'[১]

কোনো জিনিস না পেলে আফসোস করো না। যদি পেয়ে যাও, তাহলে আনন্দে উল্লসিত হয়ো না। হযরত আব্দুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর একটি

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ২৩

বাণিজ্যিক জাহাজ অন্য দেশ থেকে আসবার কথা ছিল। একব্যক্তি এসে খবর দিল, হযরত! দরিয়ায় তুফান শুরু হয়েছে আর আপনার জাহাজের ব্যাপারে সংবাদ এসেছে, সেটি ডুবে গেছে। হযরত জিলানি (রহ.) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! একটু পরে সংবাদ এল ডুবিডুবি করে জাহাজটা বেঁচে গেছে এবং নিরাপদে তীরে এসে ভিড়েছে। এবারও হযরত বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত! দুবার দুরকম সংবাদ আপনি পেলেন এবং অভিন্ন উত্তর দিলেন। এর হেকমত কী? হযরত বললেন, ডুবে যাওয়ার ব্যাপরে আমার হৃদয়ে কোনো আফসোস ছিলো না। তাই প্রথমবার আলহামদুলিল্লাহ বলেছি। আবার বেঁচে যাওয়ার সংবাদেও আমার হৃদয়ে কোনো উল্লাস ছিল না। তাই এবারও আলহামদুলিল্লাহ বলেছি।

দেখুন, আল্লাহতে যার পূর্ণ বিশ্বাস আছে, তার হালত এমনই হয়। তারা বিপদে সবর করেন আর সুখে শুকরিয়া আদায় করেন।

চতুর্থ বিষয় : আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, আখেরাতে হিসাব নেওয়া হবে এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে দুনিয়ায় ধনসম্পদ জমা করে। আজকের যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা হলো, প্রত্যেক বান্দার তামান্না এমন–

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ

'হায়! আমাকে যদি কারুনের মতো অর্থকড়ি দেওয়া হতো!'[১]

প্রত্যেকে চায় সম্পদশালী হতে, ধনবান হতে, মহল নির্মাণ করতে, প্রাসাদ তৈরি করতে। কারও মন চায় না মৃত্যুবরণ করতে। ভাই! যখন দুনিয়ার উপায়-উপকরণ বেড়ে যায়, তখন গুনাহের দুয়ার খুলে যায়। আপনি হয়তো গুনাহ করবেন না; কিন্তু আপনার সন্তানরা গুনাহে ডুবে যাবে। তাই সম্পদ কামনা করা উচিত নয়। বরং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! এমন সম্পদ দাও, যা আমার জন্য বিপদ ডেকে আনবে না, আমার ও আমার সন্তানের জন্য যা কল্যাণকর হবে। একব্যক্তি তার সন্তানের ব্যাপারে বলছিল, আমার সন্তানটা শিক্ষা গ্রহণ করেছে, বড় হয়েছে, ব্যবসা করছে, বিপুল অর্থকড়ির মালিক হয়েছে এবং সামান্য নাস্তিকতা অর্জন করেছে। বলুন, এত-এত সম্পদ দিয়ে হবে কী যদি নাস্তিক হওয়ার কারণে অমানুষের মতো জীবন যাপন করে জাহান্নামে যায়।

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭৯

এক তো হলো মালদার। আরেক হলো মালের চৌকিদার। মালদার হচ্ছে সে, যাকে আল্লাহ অর্থকড়ি দিয়েছেন আর ওই অর্থ সে আল্লাহর রাস্তায় দুই হাতে খরচ করে। আর মালের চৌকিদার হলো, যেব্যক্তি সকালে একবার সম্পদের হিসাব করে, বিকেলে একবার সম্পদের হিসাব করে। সম্পদ শুধুই জমা করে। না নিজের জন্য খরচ করে, না আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ

'হালাল সম্পদের হিসাব হবে আর হারামগুলোর কারণে আযাব হবে।'

ভাই! সম্পদ থাকলেই ঝামেলা। হিসাব তো দিতেই হবে। হালাল হলে তো বাঁচা গেল। হারাম হলে আযাবে পড়তে হবে। তাই আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, হে আল্লাহ! এতটুকু সম্পদ দাও, যেন অন্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী থাকি এবং সম্পদের আপদ থেকেও রক্ষা পাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের ধনীদের চেয়ে গরিবরা পাঁচশত বছর আগে জান্নাতে যাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন–

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন মিসকিন অবস্থায়, মৃত্যু দান করুন মিসকিন অবস্থায়। আর আমার হাশর করুন মিসকিনদের দলে।'[১]

اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

'যার ঘর নেই, দুনিয়া তার ঘর। যার সম্পদ নেই, দুনিয়া তার সম্পদ। আর যার আকল নেই, সে-ই দুনিয়ার জন্য সম্পদ জমা করে।'[২]

মানে মালের হিসাব দিতে হবে মাল উপার্জনকারী আর মাল ভোগ করবে তার সন্তানরা! আজ যত মানুষ ধোঁকা ও প্রতারণা করে সম্পদ উপার্জন করছে, সকলে সন্তানদের দোহাই দিয়েই তা করছে। এক ঘুসখোরকে কেউ জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন এভাবে ঘুস নাও? জবাব দিল, আমার তো দুবেলা খেলেই চলে। সন্তানরা যেন ভালো জায়গায় পড়তে পারে, ভালো-ভালো খেতে পারে সেজন্য ঘুস খাই। দেখুন, সন্তানের জন্য কামাই করতে গিয়ে নিজের জন্য জাহান্নাম নিশ্চিত করে নিচ্ছে।

---

১. সুনানে ইবনে মাজা ১২/১৫৪

২. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৪/৩৬৫৮

অথচ কুরআনের ঘোষণা হলো–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষাবিশেষ।'[১]

সাহাবায়ে কেরাম বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভাতা বাড়ানো দরকার। তিনি ভাতা যা নিচ্ছেন, তাতে সংসার চলছে না। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াল, কথাটা তাঁর কাছে কে উত্থাপন করবে। আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো, কথাটা তাঁরই কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রাযি.)-এর মাধ্যমে তার কানে দিতে হবে। হযরত হাফসা (রাযি.) বিষয়টি হযরত ওমরকে জানালেন যে, লোকেরা তো আপনাকে আপনার ভাতা বৃদ্ধি করার জন্য নিবেদন জানাচ্ছে।

সংবাদটা শুনে ওমর (রাযি.) বললেন, হাফসা! কে বলেছে কথাটা? হাফসা (রাযি.) বললেন, আমি নাম বলতে পারব না। ওমর (রাযি.) বললেন, বেটী! আমি যদি তার নামটা জানতে পারতাম, তাহলে দোররা মেরে তার খবর নিয়ে ছাড়তাম! হাফসা! তুমি তো নবীজির ঘরে জীবন যাপন করেছ। বলো তো আমার হাবীবের জীবনটা কেমন ছিল? হাফসা (রাযি.) বললেন, গেরুয়া রঙের দুটি কাপড় ছিল। কাফেলা আগমনের সময় এই দুটি পরিধান করতেন। চাটাইয়ের ওপর ঘুমুতেন। খেজুরের ছালের বালিশ মাথার নিচে দিতেন। একবার আমি রুটিতে ঘিয়ের ডিবার বেঁচে যাওয়া অংশটুকু লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দেখলাম, নবীজি নিজেও খুবই আগ্রহের সঙ্গে ভক্ষণ করছেন এবং অন্যদেরও খেতে দিচ্ছেন। নবীজি একদিন খেতেন, একদিন উপবাস থাকতেন। এমনভাবে কখনও তিনটি দিন অতিক্রম হয়নি যে, তিন দিন নবীজি লাগাতার পেট ভরে খাবার খেয়েছেন।

এবার হযরত ওমর বললেন, আমার নেতা একভাবে জীবন যাপন করেছেন আর আমি আরেকভাবে জীবন যাপন করব এ হতে পারে না। তাহলে তো আমার গন্তব্যই বদলে যাবে।

দেখুন, ভাইয়েরা! আমাদের পূর্বসূরিদের জীবন কেমন ছিল আর আজ আমাদের জীবন কেমন। আমরা তো সম্পদ উপার্জনকে সাফল্য ভেবে বসেছি।

---

১. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৫

পঞ্চম কথা : আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, যে জাহান্নামের আগুনের খবর জানে, তবুও সে গুনাহ করে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فقالت رَبِّ اَكَلَ بَعْضُ بَعْضًا

'জাহান্নামের আগুন আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করে বলবে, হে আল্লাহ! আমার কিছু অংশ এত গরম যেন অপর অংশকে খেয়ে ফেলবে।'[১]

ভাবুন, কত গরম আগুন! এই আগুনে মানুষকে জ্বালানো হবে!

আগুনের একেবারে ভেতরের অংশটুকুর রং হলুদ। তার খানিক বাইরের অংশটুকু লাল। এই অংশটুকু ভেতরের অংশের চেয়ে বেশি গরম হয়। একেবারে বাইরের অংশ হলো নীল। এই অংশটি আরও বেশি গরম। তার চেয়েও বেশি গরম হলো একেবারে শেষের অংশ, যা কিনা দেখা যায় না। বোঝা গেল, আগুন যত গরম হতে থাকে, তত কালো হতে থাকে। আর ১৪ শত বছর আগেই নবীজি বলে দিয়েছেন, জাহান্নামের যে আগুন যত গরম তা তত অন্ধকার, তত কালো হবে।

একবার আমার এক স্টিল মিলে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। লোহাকে এমনভাবে গলানো হয় যে, লোহার ক্ষুদ্র একটা খাল পানির মতো বয়ে চলে। তারা বলল, এই মেশিনের আগুনের টেম্পারেচার এত বেশি যে, আগুন দেখা-ই যায় না। কিন্তু এতটা-ই গরম যে, লোহা ভেতরে যাওয়ামাত্র গলে যায়, সেদিন সেই আগুন দেখে আমি মনে-মনে ভাবছিলাম, হে আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন কেমন হবে!

তো আজকের এই গুনাহ মানুষকে জাহান্নামের সেই আগুনে ঢুকিয়ে দেবে। সেজন্য গুনাহের জীবন পরিত্যাগ করে আমাদের নেকের জীবন গ্রহণ করা দরকার। এর জন্য আমাদের তাওবা করা দরকার। এক মুহূর্তের গুনাহ শত-শত বছরের শাস্তি ডেকে আনবে। এক মুহূর্তের গুনাহ মানুষকে হাজার-হাজার বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবে। আমার বড়ই বিস্ময় লাগে যে, একজন মানুষ জাহান্নামের আগুনের খবর জানে; কিন্তু তারপরও সে গুনাহ করে!

---

১. সুনানে তিরমিযি ৭/৬৫১

ষষ্ঠ বিষয় : আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, যে জান্নাতের অকল্পনীয় নেয়ামতের কথা শুনেছে; তবুও জান্নাতের আমল করে না। দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিসেই শান্তি খোঁজে। ভাই! সব সময় জান্নাতের আমল করুন। আল্লাহর কাছে জান্নাত তলব করুন। জান্নাত প্রার্থনা করুন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাই।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

'আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।'[১]

চিন্তা করুন। শান্তির আবাস তথা জান্নাতের প্রতি আহ্বান করছেন খোদ আল্লাহ তা'আলা। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত আল্লাহ তা'আলার দিদার। তাই এই নেয়ামতও আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করব।

فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

'প্রবল ক্ষমতাধর মালিকের দরবারে হবে আমাদের মজলিস।'[২]

আমাদের আয়েশ হবে জান্নাতে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ

'আখেরাতের আয়েশ ছাড়া তো কোনো আয়েশ নেই। সেখানে মন যা চাবে, তা-ই পাওয়া যাবে।'[৩]

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِیْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ

'সেখানে তোমরা যা-ই কামনা করবে, তা-ই প্রাপ্ত হবে।'[৪]

---

১. সূরা ইউনুস : আয়াত ২৫
২. সূরা কামার : আয়াত ৫৫
৩. আল-মু'জামুল কাবীর পৃ. ৫৯৪৯
৪. সূরা হা মীম আস-সাজদাহ : আয়াত ৩১

দুনিয়ায় মেহমান আসে। মেজবান চেষ্টা করে মেহমানকে এমন জিনিস দিতে, যা সে চায়, যাতে সে খুশি হয়। কিন্তু কখনও সব জিনিস মেহমানের মর্জি মোতাবেক বানানো যায় না।

আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত তো রাজাধিরাজ। তিনি জান্নাতকে এমন করে বানিয়েছেন যে, যা ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা জান্নাতবাসী তার মর্জি মোতাবেক সব কিছু পেয়ে যাবে।

সপ্তম বিষয় : আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, যে শয়তানকে দুশমন বলে জানে, তবুও সে শয়তানেরই আনুগত্য করে।

খোদ আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতও বলে দিয়েছেন–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

'শয়তান তোমাদের দুশমন। কাজেই তাকে তোমরা দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করে নাও।'[১]

দেখুন, আমরা মুখে বলি, শয়তান আমাদের দুশমন। কিন্তু আমরা শয়তানের কথামতোই চলি।

কেউ যদি আপনার মা-বাবার শরীর থেকে কাপড় খুলে নেয়, আপনি তার সাথে কেমন দুশমনি করবেন? যদি কাপড় খুলে আপনার মা-বাবাকে ঘর থেকে বের করে দেয়, তাহলে আপনি লোকটার ওপর কতটুকু রাগ হবেন এবং তাকে নিজের কেমন দুশমন মনে করবেন? শয়তান তো আমাদের তেমনই দুশমন। যে আমাদের বাবা আদম আর মা হাওয়াকে জান্নাতের পোশাক খুলে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। আজ আমরা বুঝি না। তবুও আমরা শয়তানের আনুগত্য করে চলি।

শয়তান মানুষের এমন দুশমন, আপনি যতভাবেই তাকে খুশি করেন, যতভাবেই তাকে অনুনয়বিনয় করেন, যতভাবেই তাকে তোশামোদ করেন, সে আপনাকে ধোঁকা দেবেই। সে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করবেই। আমরা সবার সামনে বলি, শয়তান আমাদের দুশমন। অথচ আড়ালে-নির্জনে সেই শয়তানেরই অনুসরণ করি আমরা!

তাই তো আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত বলেন–

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৬

'হে বনি আদম! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিইনি যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না? নিশ্চয় সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।'[১]

وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

'এবং তোমরা শুধু আমার ইবাদাতই করবে। এটি সরল-সঠিক পথ।'[২]

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ .

'তোমাদের একটি বড় দলকে শয়তান প্রবঞ্চিত ও ভ্রষ্ট করেছে। তোমরা কি বুঝবে না?'[৩]

আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাইব। আল্লাহ যেন শয়তানের প্রতারণা থেকে আমাদের হেফাযত করেন।

সাইয়্যেদুনা আবু হুরাইরা (রাযি.) নিজের বার্ধক্যের বয়সে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে চুরি ও যেনা থেকে হেফাযত করুন। কেউ একজন প্রশ্ন করলেন, হযরত! আপনি এত বুড়ো বয়সে এসেও এ কী দু'আ করলেন? হযরত আবু হুরায়রা বললেন–

كَيْفَ اٰمَنَ عَلٰى نَفْسِيْ وَالشَّيْطَانُ حَيٌّ

'শয়তান জীবিত থাকতে আমি কীভাবে আমার নফসের ওপর ভরসা করব?'

তো যতদিন পর্যন্ত শয়তান জীবিত আছে, তত দিন পর্যন্ত নিজেদের গুনাহ থেকে রক্ষা করতে হবে।

হযরত রাবেয়া বছরি (রহ.) পর্যন্ত শয়তান থেকে তাহাজ্জুদ পড়ে আশ্রয় চেয়েছেন। আল্লাহর কাছে আমাদেরও তো উচিত নামায পড়ে-পড়ে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে দু'আ করা, হে আল্লাহ! শয়তান আমাদের দেখে আমরা শয়তানকে দেখি না। কীভাবে শয়তান আমাদের ধোঁকা দেয় আমরা বুঝতে পারি না। মেহেরবানি করে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমাদের রক্ষা করো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অন্তিম প্রহরে তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেল ১ মানে না। তারপর বললেন ১ মানে না। কয়েকবার তিনি

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬০
২. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬১
৩. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬২

এভাবে না-না বললেন। শিষ্যরা জিজ্ঞেস করলে যুগের ফকীহ ও ইমাম জবাব দিলেন, শয়তান আমার সামনে এসে আমাকে বলতে লাগল, হে ইমাম আহমদ! তুমি তো ঈমান বাঁচিয়ে এই দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ। আমি বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের হালতে না যাবে, ততক্ষণ আমি তোর আক্রমণ থেকে নিরাপদ নই।

আমাদের পূর্বসূরিগণ এভাবেই নিজেদের রক্ষা করেছেন।

অষ্টম বিষয় : আশ্চর্য বোধ হয় ওই ব্যক্তির ওপর, যে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাতের যাত ও সত্তাকে জানে; তবুও অন্যের ভাবনায় নিজের হৃদয়কে বিভোর রাখে। দেখুন, আজ আমাদের অন্তর আল্লাহকে ছেড়ে কার-কার ভাবনায় মশগুল হতে পারে? কেউ সম্পদের কথা ভাবে, কেউ স্ত্রী-বাচ্চার কথা ভাবে। এভাবে আজ আমরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে একেকজন একক রকম ভাবনায় বিভোর হয়ে আছি। ইমাম রাযি (রহ.) বলেছেন, হে আল্লাহ! দিন ভালো লাগে না তোমার স্মরণ ব্যতীত। রাত ভালো লাগে না তোমার সাথে গোপনে আত্মসমাহিত হওয়া ব্যতীত।

আমাদের জীবনও হোক এমনই।

কবির ভাষায়–

یاد میں تیری سب کو بھلادوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانۂ دل آباد رہے
سب خشیوں کو آگ لگادوں، غم سے تیرے، دل شاد رہے
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان اے میرے الہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

তোমার স্মরণে মগ্ন রেখে বাকি সবকিছু আমাকে দাও ভুলিয়ে। কিছু যেন মনে না থাকে তোমাকে ছাড়া। তোমার ওপর সব লুটিয়ে দাও যেন হৃদয়ের ঘর আবাদ থাকে। সব আনন্দ ফেলে দাও আগুনে। তোমার চিন্তায় যেন হৃদয় সতেজ থাকে। তোমার কাছেই ফরিয়াদ হে খোদা! সকলকে আমার দৃষ্টি থেকে সরিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আজ থেকে আমার দম যত দিন থাকে,

তত দিন আমার যবান সিক্ত রাখো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা।

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے
تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے

কারও কাছে কোনো ইচ্ছে নেই। কারও সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আপন কাজেই বিভোর আমি। তোমারই যিকিরে, তোমারই ফিকিরে, তোমারই স্মরণে, তোমারই নামে হবে আমার সব কিছু।

আল্লাহ! আমাদের জীবনও তেমন বানিয়ে দিন। আমরাও যেন আপন যিন্দেগি আপনার স্মরণে কাটাই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ধোঁকার ঘর এই দুনিয়ার ধোঁকা-প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। ঈমান রক্ষা করে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

: ২৬তম খণ্ড সমাপ্ত :